সূচীপত্র।

—:*:—

স্বদেশী

প্রথম খণ্ড।] কার্ত্তিক, ১৩১২। [প্রথম সংখ্যা।

"বন্দে মাতরম্।"

মঙ্গলাচরণ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

সর্ব্বে উচুঃ—যতোঽনন্ত শক্তেরনন্তাশ্চ জীবাঃ
যতো নির্গুণাদপ্রমেয়া গুণাস্তে।
যতো ভাতি সর্ব্বং ত্রিধাভেদভিন্নম্
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥

প্রত্যক্ষ ও কল্পনাধিগম্য এ[illegible] অদৃশ্য ও কল্পনাবহির্ভূত অনন্ত বিশ্বের কেন্দ্রীভূত অনন্ত শক্তিমান্ পুর[illegible]মি অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত অনন্ত কালের নিয়ামক, তুমি নির্গু[illegible] অপ্রমেয় গুণরাশির বিভাসক, তুমি অনন্ত জগতের স্রষ্টা, পাতা [illegible]া, তুমি পরম পুরুষ, পরম মঙ্গলালয়; তোমার পবিত্র পাদপদ্মে আমরা [illegible]পাত করি। তুমি স্বয়ং নিত্য, নির্বিকার ও সদানন্দ; ত্বদীয় স্তব, স্তুতি, আ[illegible]ধনা ও কীর্ত্তন তোমার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তোমার সৃষ্ট জীবগণের নিত্য[illegible]োজন ও নিতান্ত ক্ষেমঙ্কর। ঐকান্তিকী

ভক্তিতন্ত্রী সমুত্থিত নাদ, তোমার মঙ্গলতন্ত্রী সমুত্থিত নিত্য নাদতরঙ্গাশ্রয়েই পরিস্ফুটিত হইয়া সার্থকতা লাভ করে। মাতৃভূমির সন্তানগণের সমকণ্ঠ উচ্চারিত এই নব স্বদেশানুরাগ, যেন ঐকান্তিক রূপে পরিণত হইয়া তোমার করুণাশ্রয় লাভে সম্বর্দ্ধিত ও সুফলপ্রসূ হয়, ইহাই প্রার্থনা।

সামান্য মানবের কি সাধ্য যে, এই বিশাল ভূখণ্ডের ত্রিংশ কোটী অধিবাসীর নিদ্রাভঙ্গ করে। কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গের কাল নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু জীবনী-শক্তির চিহ্নমাত্র বিহীন, নিস্পন্দ ভারত সন্তানের নিদ্রাভঙ্গের আশা দূরে থাক্, কল্পনাও যে এতদিন স্বপ্নাতীত ছিল! ভগবন্! তোমারি ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়, আজ সমগ্র ভারতবাসীর মোহনিদ্রা বিদূরিত; তুমি যদি তাহাদের কর্ণে

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত"

এই মহামন্ত্র প্রদান না করিতে, যদি সেই মন্ত্রের সহিত অমৃতময়ী মর্ম্মস্পর্শিনী শক্তি সংযোজিতা করিয়া না দিতে, তাহা হইলে এই অধঃপতিত জাতির বহুবর্ষব্যাপিনী সুখসুষুপ্তি অচিরেই চিরনিদ্রায় পর্য্যবসিতা হইত।

চিদানন্দময়! এক্ষণে, এই প্রবোধিত সন্তানগণকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান কর, হিতাহিত নির্ব্বাচনের প্রবৃত্তি প্রদান কর, উৎসাহ, আশা ও ভরসা প্রদান কর; যাহাতে, আবার যেন সেই রাক্ষসী নিদ্রা তাহাদের আক্রমণ না করে, কিম্বা, যেন অত্যধিক উৎসাহে আত্মবল বিস্মৃত হইয়া, উল্লম্ফনে আপনার অস্থিচূর্ণ না করে, অথবা, যেন অনুচিত দ্রুতধাবনে আত্মশক্তির অপচয় না করে। যেন এই স্বদেশ প্রেম: দেশবাসীর আন্তরিক হয়; যেন সমগ্র ভারত-বাসীর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সমস্বরে নিনাদিত হয়—

"বন্দে মাতরম্"।

উদ্বোধন।

শ্রীভগবানের কৃপায় আজ ভারতে শু[illegible] উপস্থিত। দেশবাসী এতদিন পরে, আজ নিজের দেশকে চিনিতে প[illegible]য়াছেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে, মহানুভব কবি সুমধুর কণ্ঠে গাহিয়াছিলে[illegible] "আর ঘুমাও না দেখ চক্ষু মেলি"। সে সঙ্গীতে, কোন স্থানে, কাহারও নি[illegible]ভঙ্গ হইল; কিন্তু মোহ ঘুচিল না,

চক্ষু উন্মীলিত হইল না; কবি সদুঃখে গাহিলেন—"কারে বা উচ্চে ডাকিতেছি আমি—আর কি ভারত সজীব আছে ?" কেহ সাড়া দিল না, জীবনের চিহ্ন কোথাও লক্ষিত হইল না। তাহার পর, দার্শনিক কবি মাতৃস্তোত্র রচনা করিলেন—"বন্দে মাতরম্"; সে বন্দনা, কোথাও, কাহারও কর্ণে অমৃত সিঞ্চন করিল, কিন্তু আলস্য ঘুচিল না, কেহ তাহাতে যোগ দিল না, কেহ প্রবোধিত হইল না; নিদ্রার সুখস্বপ্নের বাধা জন্মাইতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু, কি মন্ত্রশক্তি প্রভাবে আজ সমগ্র ভারতবাসী জাগরিত; দেশবাসী আজ স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত। এই স্বদেশপ্রীতি, আজ ভারত সন্তানের চিরাভ্যস্ত আলস্যকে বিদুরিত করিয়া, দেশময় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপিত করিয়া, দেশবাসীগণকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। তাই, আজ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্বরে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া, কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। ভাই স্বদেশী! নিদ্রা কুহকিনী অলক্ষ্যে তোমার কতই না সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে! এখন সে নিদ্রাঘোর অপসৃত হইয়াছে; এখন, একবার নিজের দেহ প্রতি নিরীক্ষণ কর; বিদেশীয়গণ তোমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া, তাহা হইতে রক্ত শোষণ পূর্ব্বক, তোমাকে কঙ্কালসার করিয়াছে; ক্ষতোৎপন্ন কীটগণ, তোমার শরীরের প্রত্যেক স্থানে সুখে অবস্থিতি করিতেছে; চালনার অভাবে, প্রত্যেক গ্রন্থিতে বাত আশ্রয় করিয়াছে; মস্তিষ্ক বিকল হইয়াছে। যে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে তুমি প্রবোধিত হইয়াছ, সেই মন্ত্রের সাধনা কর, দেহে বল পুনঃ সঞ্চারিত হইবে; প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর, শরীর অক্ষত হইবে; একতার বন্ধন সুদৃঢ় কর, সন্ধিবাত অচিরে বিদুরিত হইবে এবং সত্য ও ধর্ম্মরূপ তোমার মূলমন্ত্র আশ্রয় কর, মস্তিষ্কের বল পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। জাগরিত হইয়াছ, উঠিয়া দাঁড়াও, কার্য্য আরম্ভ কর এবং অভীষ্টসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত, নিরুৎসাহ বা নিরস্ত হইও না। পুনঃ পুনঃ সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র স্মরণ কর—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"।

কার্য্যারম্ভে অনেক বিভীষিকা, অ[illegible]পৎপাত, অনেক বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে; উৎসাহের আশ্রয়েই [illegible]কে অতিক্রম করিতে হইবে। মন সুদৃঢ় কর; কিছুতেই পশ্চাৎপদ [illegible] না ভগ্নমনোরথ হইও না, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিও না, জগতের নিকট [illegible]াস্পদ হইও না। পৃথিবীর লোকের চক্ষু আজ তোমাদের উপর স্থাপিত [illegible]য়াছে; রাজা তোমাদের কার্য্যাবলি পরীক্ষা করিতেছেন, প্রতিবেশীগণ [illegible]নিমেষ নয়নে তোমাদের গতিবিধি

পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, শত্রুগণ তোমাদের পরাজয়ের অবসর প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। যদি রাজসম্মানের বাসনা থাকে, প্রতিবেশীর সৌহার্দ্দ প্রাপ্তির বাঞ্ছা থাকে, এবং শত্রুর ঈর্ষানলকে ভস্মীভূত করণের অভিলাষ থাকে, যদি মানব নামে পরিচিত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হইও না; বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পরিচিত অপরিচিত, কাহাকেও অঙ্গীকার পালনে পরাঙ্মুখ হইতে দিওনা। প্রতিজ্ঞা মুখের নয়, অন্তরের; মুখে, প্রকাশ্যে কিম্বা সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করি নাই বলিয়া, তাহা অবশ্যপালনীয় নহে, এ যুক্তি হীনচেতার, উন্মত্তের ও নির্ব্বোধের। অন্তরের মধ্যে অন্বেষণ কর,— হিন্দু হও, মুসলমান হও, খৃষ্টীয়ান হও, জৈন হও, ভারত-মাতার সন্তানমাত্রের হৃদয়ে কি, প্রতিজ্ঞাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে না? ধমনীতে কি, ঐ স্বদেশপ্রীতি সঞ্চালিত হইতেছে না? যে তাহা অনুভব না করিবে, সে কুলাঙ্গার,— সে দেশের কণ্টক।

শুভক্ষণ বহুবার আসে না, এরূপ শুভক্ষণ যুগ যুগান্তরেও একবার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই শুভ মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার কর; ধীরচিত্তে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। সাধনাই সিদ্ধি। “যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ”——ইহা দুর্ব্বলের জন্য; যে অকৃতকার্য্য হইবে, তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য। যত্ন করিলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, তদ্‌ব্যতীত অন্যরূপ ফল নাই। সন্দিগ্ধ মনই হতাশ্বাস সঞ্চয় করে; কিন্তু ঐকান্তিকী প্রার্থনায় ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয়; মানব দেবত্ব, অমরত্ব প্রাপ্ত হয়; ঐহিক মঙ্গল সামান্য কথা।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

বিজিত ও পরপদদলিত, সুতরা[illegible] ও উৎসাহহীন, অপরিজ্ঞাত আত্ম-শক্তি, তজ্জন্য পরমুখাপেক্ষী, সুপ্ত অ[illegible], সেই হেতু বিলুপ্ত আত্মগৌরব, এবং অপরিণামদর্শী, তন্নিবন্ধন অলস ও [illegible]শিশ্নোদরপরায়ণ; ইহাই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার পরিচায়ক। দেশে[illegible] সকল শ্রেণীর লোকই এক্ষণে প্রায় শোচনীয় অবস্থায় উপনীত। জমীদার[illegible] অনেকেই ঋণগ্রস্ত বা কপর্দ্দকমাত্র-সম্বল; মধ্যবিত্তগণ অবলম্বনবিহীন; [illegible]দ্রগণ বস্তুক্ষিত, জীর্ণ, শীর্ণ ও নিরন্ন।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এক্ষণে ভারতের নিত্যসহচর। আমাদের দেশের অস্থি-স্বরূপ কৃষককুল, অনশনে বা অর্দ্ধাশনে জীর্ণপ্রায়; তাহাদের ভূমি সারবিহীন ও অনুর্ব্বর, বলীবর্দ্দগণও প্রভুর সমতুল্য বা অধিকতর হীনাবস্থ; দেশের মাংস ও পেশীসম শিল্পীকুল প্রায় ধ্বংসাবস্থায় উপনীত; রক্তস্বরূপ বণিকগণ, হৃৎপিণ্ডস্বরূপ ক্ষত্রিয়বংশ এবং মস্তিষ্কস্বরূপ ব্রাহ্মণবর্গ নামমাত্রে অবস্থিত। দেশে ধর্ম্মভাব লুপ্ত, সত্য অপহৃত, বিশ্বাস বিনষ্ট, একতা উৎসন্ন এবং উৎসাহ বিতাড়িত। আলস্য, অসত্য ও অবিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। প্রাকৃতিক নিয়ম ও যুগ ধর্ম্মানুসারে, একের পতন ও অন্যের উত্থান অবশ্যম্ভাবী। অট্টালিকার স্থানে শ্মশান ও শ্মশানের স্থানে অট্টালিকা, অরণ্যের পরিবর্ত্তে নগর ও নগরের পরিবর্ত্তে অরণ্য, ভূখণ্ডের অধোগমনে সমুদ্রতল ও সমুদ্রতলের উত্থানে ভূমিখণ্ড, এবম্বিধ ব্যাপারই কালচক্রের অলঙ্ঘনীয় গতি-বিজ্ঞাপক। এই গতিবশেই, মানবজাতির শীর্ষস্থানীয় আর্য্যগণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং আধুনিক সভ্যনামাভিহিত জাতিগণ বিস্ফারিত বক্ষে পুরোভাগে সংস্থাপিত। বিদ্যা, জ্ঞান, দয়া, দাক্ষিণ্যস্বরূপ সুরভিকুসুমরাজিপরিশোভিত নন্দনকাননসম ভারত-উদ্যান, অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও অদূরদর্শিতারূপ কণ্টকক্রমপূর্ণ অরণ্যে পরিণত; শৌর্য্য, বীর্য্য, শিল্প, পণ্যরূপ সুরম্য সৌধশ্রেণীবিরাজিত, ধরিত্রীর রাজধানী-সম আর্য্যনিবাসভূমি, কাপুরুষতা, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষরূপ মকর, কুম্ভীর ও নক্ররাজসঙ্কুল সমুদ্রতলে অবস্থিত।

কালচক্রের গতি অপ্রতিহতপ্রভাব, সুতরাং এই বর্ত্তমান ব্যবস্থাও চির-স্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে। কিরূপে, কোন্‌কালে এই অবস্থার সেই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন সম্ভবপর, তাহা মানবের অনুমানসাধ্য নহে। এই কালচক্র যাঁহার আজ্ঞাপরিচালিত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাবলি যাঁহার ইচ্ছাধীন, সেই মহাপুরুষেরই ইহা অনুমানসাপেক্ষ। ভারতবাসীর উচ্ছেদসাধন তাঁহার অভিপ্রেত নহে; সেই হেতু, আমাদের অধঃপাতের এই চরম দশায়, সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ পুরুষ, সহসা ভারতবাসিগণের অন্তরে স্বদেশপ্রীতিরূপ মহাশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। এই শক্তি, ভারতের সেই পূর্ব্বাবস্থা প্রত্যানয়নে সক্ষম হইবে কিনা, তাহা কে বলিতে পারে? কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং এই শুভ আন্দোলন স্থায়ী ভাবে প্রযুক্ত হইলে, ইহা যে প্রভূত মঙ্গলকর হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই আন্দোলনের আকস্মিক আবির্ভাবনিবন্ধন, কেহ কেহ ইহার ফল সম্বন্ধে

সন্দিহান। তাঁহাদের ধারণা, এরূপ মহৎ কার্য্যের সাধারণতঃ সর্ব্বত্র যেরূপ পূর্ব্ব সূচনা, আভাষ, উন্মেষ, আরম্ভ, শ্রীবৃদ্ধি, ব্যাপকতা ও উৎকর্ষ, এইরূপ ক্রম-বিকাশ স্বাভাবিক, সেইরূপ ধারাবাহিক ঘটনা পরম্পরার অসদ্ভাব হেতু, ইহার সাফল্য ও স্থায়িত্ব অসম্ভব কিম্বা নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক। কিন্তু তাঁহাদের যুক্তি নিতান্তই ভ্রমাত্মক।

কালগতি যেরূপ বিচিত্র, কালের ক্রীড়া-বৈচিত্র্যও তদনুরূপ। দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন, শীতের পর বসন্ত ও বসন্তের পর গ্রীষ্মাগম, এগুলি যেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ, সেইরূপ সর্ব্বভূতেরও বোধগম্য; কিন্তু মেঘোদয়েই বজ্রপাত অবশ্যম্ভাবী নহে, কিম্বা বজ্রপাতেই মানবের মৃত্যু সূচিত হয় না। বৃষ্টিপতনের পূর্ব্বে যেমন মেঘোদয় নিশ্চিত, ভূকম্পনের সেরূপ পূর্ব্বসূচনা সাধারণের অপরিজ্ঞাত। পূর্ব্ব সূচনার অভাবনিবন্ধন, ভূকম্পন অনৈসর্গিক নহে। সেই হেতু, অনুমানসাধ্য না হইলেও, ভারতীয়গণের পুনরভ্যুত্থান অসম্ভবপর নহে। আকস্মিক হইলেও ভূকম্পনের ফল, ইহার প্রভাব ও স্থান ব্যাপকতার উপরই নির্ভর করে। স্ফুলিঙ্গ, ফুৎকার প্রভৃতি গার্হস্থ অগ্নিসন্দীপনী প্রক্রিয়ার অসদ্ভাবেও, দাবানলের ক্রিয়া সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর নহে। দুষ্প্রবেশ্য মহারণ্যের কণ্টকদ্রুমরাশি ভস্মীকরণের জন্য, এইরূপ দাবানলই উপযুক্ত; অতলস্পর্শী সমুদ্রতল হইতে উদ্ধার সাধনের জন্য, প্রবল ভূকম্পনেরই প্রয়োজন।

এই শুভ আন্দোলনের ভবিষ্য ফল, কালের তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্য গহ্বরে নিহিত থাকিলেও, বর্ত্তমান ফল অতীব বিচিত্র ও হৃদয়োন্মাদকারী। দেশীয় নেতৃবৃন্দের আন্তরিক উৎসাহ, ঐকান্তিক পরিশ্রম, বিপুল অধ্যবসায় ও অকাতর স্বার্থত্যাগ; ছাত্রগণের কার্য্যতৎপরতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, একতা ও স্বদেশপ্রীতি এবং সাধারণের অযাচিত সহানুভূতি নিতান্তই মর্ম্মস্পর্শী ও আশাপ্রদ। ভারতবাসীর পক্ষে এই ব্যাপার অদ্বিতীয়, অচিন্তনীয় ও অভিনব। এই আন্দোলন ফলে ভারতবাসীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া, যদি অতীত-স্মৃতি পুনরানয়ন করে, যদি বর্ত্তমান অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দে[illegible] পরিণামচিন্তার সার্থকতা উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে, ইহাই সে[illegible] ও [illegible]ক্রান্ত যুগান্তর উপস্থিত না করিবে কেন?

আমাদের কর্ত্তব্য।

(১)

বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে, সমগ্র জগৎ অতিক্রুতভাবে অগ্রসর হইয়াছে, কেবল ভারতসন্তান মোহ নিদ্রাঘোরে রক্তশোষকগণের তাড়নায়, সুদূর পশ্চাতে পরিচালিত হইয়া গিয়াছে। শোষণ যন্ত্রণা মর্ম্মস্পর্শী না হওয়া পর্য্যন্ত নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে, দেশের কতই সর্ব্বনাশকর অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে, ও কত অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয় অননুষ্ঠিত রহিয়াছে! বহুক্ষণ-ব্যাপী নিদ্রার পর সহসা জাগরিত হইলে, তৎক্ষণাৎ চৈতন্যসঞ্চার হয় না, দৃষ্টি-শক্তিও কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অনেকটা অবশ থাকে; সুতরাং ঠিক সেই অবস্থায় ধাবন বা উল্লম্ফনে, পতন খুব সম্ভবপর। দারুণ কৃশ ও সর্ব্বস্বান্ত অবস্থায়, দ্রুত ধাবিত হইয়া, বহুপথ অতিক্রমণে অগ্রগামী-গণের সঙ্গ লাভ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া, দুরাশা। কিন্তু, পাছে কার্য্যের অভাবে, উৎসাহ লোপ পাইয়া, আবার আলস্য এবং তৎসহ সেই রাক্ষসী নিদ্রা আবার উপস্থিত হয়, সেই ভয়ে, কার্য্যের সূচনা নিতান্ত বিধেয়। সেইজন্য, এক্ষণে অতি ধীরভাবে, বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইবে। যে অর্থ, সামর্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, কার্য্যনিপুণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলি নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারে যত্নবান হওয়া ও সেই সঙ্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই এখন যুক্তি-সঙ্গত। ইহার বিপরীত আচরণের ফল নিশ্চয়ই আশঙ্কাজনক।

কর্ম্মফল, শুভ, অশুভ বা মিশ্র এই ত্রিবিধ; শুভেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও, বুদ্ধি ও বিবেচনার দোষে, ইহার ফল নিরবচ্ছিন্ন শুভ হওয়া সম্ভব নহে। দুর্ভিক্ষজনিত অনশনক্লিষ্টের জন্য, এককালে প্রচুর ও গুরুপাক খাদ্যের ব্যবস্থা তাহার জীবন সংশয়ের কারণ। রোগের প্রকৃত অবস্থা অবগত না হইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলে, সে ঔষধে উপকার না হইয়া অপকারই সম্ভব। চিকিৎসককে যেমন, রোগীর বয়স, দেহের গঠন, রোগের কারণ, অবস্থা ইত্যাদি সম্যক্ অবগত হইয়া ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে হয়, সেইরূপ, বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া, প্রতীকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

এসময়ে, একটীও অবিহিত কার্য্যের ফল অতি শোচনীয় হইবে; এই দেশব্যাপী উৎসাহসম্ভূত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রতিহত হইলে, কিম্বা সুফলপ্রদ না হইলে, তজ্জনিত নিরুৎসাহও হয়ত, সেইরূপ দেশব্যাপী হইতে পারে।

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে বুঝিতে হইবে, আমাদের এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি। আপামর সাধারণের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়—"দেশের টাকা যাহাতে দেশেই থাকে" সেই উপায় করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। "দেশের টাকা" অর্থে আমরা কি বুঝি ; প্রচলিত মুদ্রাদি, স্বর্ণরৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান্ ধাতু ও মণি মুক্তাদি রত্ন, ইহাই সাধারণ ধারণা। ইহাদের বিনিময়ে সকল দ্রব্য সংগ্রহ করা যায়, এইজন্য ইহারা প্রথম শ্রেণীর সম্পত্তি। কিন্তু, সকল দ্রব্যের অভাব, সকল সময়েই, স্বর্ণ রৌপ্যাদিদ্বারা দূর করা যায় না ; বাস্তবিক অপ্রাপ্য হইলে, পর্ব্বত পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্বারাও, একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করা যায় না। একমুষ্টি অন্নও সময়ে জীবন রক্ষা করে, কিন্তু যথেষ্ট স্বর্ণ রৌপ্যাদিও, এক দিনের জন্য জীবন রক্ষা করিতে পারে না। অন্ন বস্ত্রাদির অসদ্ভাব না থাকিলে, স্বর্ণ রৌপ্যাদির অভাব কিছুই করিতে পারে না। অন্নের অভাবই আমাদের দেশের প্রধান অভাব এবং অন্নাভাবেই দেশময় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। এই অন্নাভাবেই কৃষককুল শীর্ণ, জীর্ণ ও মুমূর্ষু এবং শিল্পীকুল ধ্বংসপ্রায়।

এখন দেখিতে হইবে, এ অন্নাভাব কেন? তণ্ডুল, গোধূম প্রভৃতি প্রধান খাদ্য, প্রতি বৎসর, এদেশ হইতে প্রায় ১৪।১৫ কোটী মণ রপ্তানি হইয়া, নানাদেশের লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে, আর ভারতসন্তানগণ অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে কেন? মহামারী দেশ ছাড়িতে পারিতেছে না কেন? ইহার উত্তর—

"আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযুক্ত অন্নসংস্থান রাখিতে না পারিয়া, অপরিমিত অন্ন বিদেশে রপ্তানি করিতেছি"।

কেন করি? আমাদের অভাব মোচনের জন্য।

এই অভাব কি? এইখানেই বিষম সমস্যা ; অন্নাভাবই প্রধান অভাব ; ইহা বুঝিয়াও, আমরা অন্ন বিক্রয় করিয়া অন্নাভাবের দারুণ ক্লেশ সৃষ্টি করিতেছি। তবে, অন্নাভাব অপেক্ষা আমা[illegible]র আরও প্রয়োজনীয় অভাব বর্ত্তমান, কিম্বা আমরা অদূরদর্শী, অথবা [illegible] নিতান্ত অর্থগৃধ্নু পিশাচ।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বু[illegible] পারা যাইবে যে, এই তিনটী কারণই আমাদের দেশে বর্ত্তমান। [illegible], লবণকর প্রভৃতি অবশ্যদেয় রাজকরজনিত অর্থের অসদ্ভাব, আম[illegible] অন্নাভাব অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় ; রাজকর বাকি রাখিলে, এখ[illegible] প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয় নাই বটে, কিন্তু প্রায় তদবস্থই হইতে হয় ; এই অ[illegible] বিদূরীকরণের জন্য, আমাদের

দেশের শোণিতসম অন্নাদি বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় করিতে, আমরা অবশ্য বাধ্য। কিন্তু, বিলাসিতা, সুরাপান, মোকর্দ্দমা প্রভৃতি বিষয়ে, অযথারূপে ঐ অর্থের অপব্যয়, এবং স্বদেশজাত দ্রব্য পরিহার করিয়া, বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারে ঐ অর্থের অসদ্ব্যয়, আমাদের অপরিণামদর্শিতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। দেশীয় শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি, ও নূতন শিল্পাদি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, অত্যল্প সুদের লোভে, ঐ অর্থ বিদেশীয় বণিকগণের হস্তে, কিম্বা রাজকোষে ন্যস্ত রাখা, আমাদের অদূরদর্শিতা, অর্থগৃধ্নুতা ও হৃদয়হীনতাই বিজ্ঞাপিত করে।

এই অন্নক্লিষ্ট দেশে, অত্যধিক রাজকর প্রবর্ত্তন নিবারণ ও দেশের মঙ্গলের জন্য, রাজকরোৎপন্ন অর্থ ব্যয় করণের চেষ্টা, রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য; বিলাসিতা, সুরাপান, মোকর্দ্দমা প্রভৃতি বিষয়ক অযথা অর্থব্যয় নিবারণ, সামাজিক আন্দোলনের লক্ষ্য; স্বদেশজাত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে, বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার জনিত অসদ্ব্যয় নিবারণ, এবং দেশীয় শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি ও নূতন শিল্পাদি প্রতিষ্ঠার সদুপায় অবলম্বনই, স্বদেশী আন্দোলনের মূলভিত্তি। দরিদ্রগণের অন্ন সংস্থানের উপায় উদ্ভাবন, এবং দেশে ধর্ম্মভাব সংস্থাপনের প্রয়াস, বোধ হয় দৈব আন্দোলন সাপেক্ষ; কেননা, এই দুইটী বিষয়েই আমাদের বিশেষ আস্থা লক্ষিত হইতেছে না! কিন্তু দৈব-সাপেক্ষ হইলেও

"দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥"

এই ঋষিবচন স্মরণ করিয়া, আমরা এই শেষোক্ত দুইটী মূল বিষয় সাধারণের লক্ষ্য-স্থানীয় করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইব। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই দুইটী বিষয় আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইলে, অপর অনেকগুলি আন্দোলন অতি সহজসাধ্য হইবে।

দেশে, ধর্ম্মভাব যতদিন পুনরুদ্দীপিত না হয়, সত্যের পুনরুদ্ধার না হয়, বিশ্বাস পুনর্জ্জীবিত না হয়, একতা পুনঃস্থাপিত না হয়, এবং উৎসাহ প্রত্যানীত না হয়, ততদিন দেশহিতকর [illegible] কার্য্যের অনুষ্ঠান, কিছুতেই সুফলপ্রদ হইবে না। উৎসাহ একতা-মূল[illegible] অপরের সহানুভূতি অভাবে, উৎসাহ অনেক সময়েই বিফল বা বিনষ্ট [illegible]। বিশ্বাসই একতার ভিত্তি-স্বরূপ; বিশ্বাস সত্যের উপর সংস্থাপিত; এবং [illegible]ত্য ধর্ম্মাশ্রিত। সুতরাং ধর্ম্মে আস্থাই মনুষ্যত্বের মূলমন্ত্র। দয়া ধর্ম্মেরই [illegible]; দরিদ্রের দুঃখে সহানুভূতি, ধর্ম্মজ্ঞান-

শূদ্রের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। স্বার্থপর, অধার্ম্মিকগণের শীর্ষস্থানীয়, বা পশু-প্রকৃতিক হইতে স্বতন্ত্র নহে।

এতদিন আমরা স্বার্থের মোহে মুগ্ধ ছিলাম; এখন ভাবিতেছি, সে মোহ বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু, যতদিন না স্বার্থত্যাগের প্রোজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি গৃহে গৃহে পরিলক্ষিত হইবে, ততদিন আমরা পূর্ব্বেরই ন্যায় অকর্ম্মণ্য, ও পশুবৎ আত্মচিন্তা-পরায়ণ আছি, ইহাই স্থির জানিয়া রাখিতে হইবে। দেড়শত বৎসর-ব্যাপী মহাপাপাচরণের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, এই দেশহিতরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে, স্বার্থ-পশু বলি না দিলে, সে যজ্ঞ চিরদিনই অসম্পূর্ণ থাকিবে। "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" এ উক্তি এরূপ যজ্ঞের মন্ত্র নহে। দেশোদ্ধারের পাণ্ডা সাজিয়া, বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া, দিঙ্‌মণ্ডল ফাঁকা আওয়াজে নিনাদিত করিয়া বেড়াইব, অথচ গাত্রে একটু আঁচড়ের চিহ্নও লাগিবে না, ইহাতে, ভ্রমণের ক্লেশ, সময়াতিপাত ও স্বরভঙ্গের ক্লেশ জনিত যে সামান্য ফল প্রত্যাশা করিতে পারা যায়, তাহাই কিয়ৎপরিমাণে লব্ধ হইবে। তাহার অধিক ফলের আকাঙ্ক্ষা, আকাশকুসুম-সম অসম্ভবপর।

যাঁহারা দেশে ধর্ম্মভাব সংস্থাপনে জন্য আন্তরিক চেষ্টা পাইতেছেন, যাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য নিজ-স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং দরিদ্রগণের অন্নসংস্থানের জন্য, যাঁহারা সত্যই ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত দেশহিতৈষী, তাঁহাদের কর্ত্তব্য পথই অনুসরণীয় এবং তাঁহারাই ভারতের সুযোগ্য সন্তান। ভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

আমাদের দেশ শ্রমজীবী-প্রধান। কৃষিই আমাদের প্রধান অবলম্বন; কতকগুলি শিল্প ও কতকগুলি শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্য, অপর কতকাংশ লোকের জীবনোপায়। অবলম্বন-বিহীন লোকেরও এদেশে অসদ্ভাব নাই। আমাদের অপেক্ষা জীবনোপায়-বিহীন লোক, সভ্য জগতের অপর কোথাও নাই। সেই জন্য,এদেশের লোক কুলিরূপে অপর দেশে কাজ করিতে যায়। শ্রম ও শিল্পজীবীগণের অধিকাংশই নিরন্ন বা অর্দ্ধাশন অবস্থায় দিনপাত করে। যিনি ইহাদের অন্নসংস্থানের উপায় উদ্ভা[illegible] করিয়া দিবেন, তিনিই মহাপুরুষ। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতিই যথার্থ ও অনুকরণ[illegible] এই দেশব্যাপী স্বদেশ-প্রেমোন্মত্তাবস্থায়, যদি এই দরিদ্রগণের জীবনে[illegible]য়ের কোন পথ উন্মুক্ত না হয়, তাহা হইলে, এই আন্দোলন অসার ও নি[illegible]ল। কিন্তু, যদি এই আন্দোলনের ফলে, তাহাদের অর্দ্ধাশনের এক গ্রাসও [illegible] নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে, ইহাকে

স্বদেশ-প্রীতি নাম না দিয়া, স্বদেশ-দ্রোহিতা নামে আখ্যাত করাই সর্ব্বাংশে উপযোগী হইবে। ভগবান্ করুন, যেন আমাদের এ দুর্ম্মতি না হয়। যাঁহার কৃপায় আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তিনি অবশ্যই আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবেন; যেন, আমরা দেশে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া, সত্য ও বিশ্বাস সংস্থাপনের জন্য যত্নবান্ হইতে পারি; যেন দরিদ্রগণকে, আত্মীয়স্বজনের ন্যায়, সমভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইতে পারি; যেন তাহাদের শোণিতসম শস্যাদি অযথা পরিমাণে বিক্রয় না করি; যেন এই শোণিত বিক্রয় লব্ধ অর্থের অপব্যয় নিবারণ করিয়া, কৃষির উন্নতি, ও পুরাতন শিল্পাদির প্রতিষ্ঠায় সদ্ব্যয় করিয়া, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সদুপায় উদ্ভাবিত করিতে পারি। ভগবান আমাদের সহায় হউন।

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

এ বৎসরের জন্য হিন্দুর দুর্গাপূজা শেষ হইল। সেই মহাশক্তিরূপিণী দশভুজাকে তিন দিন ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া, সপত্নী-গঙ্গাসলিলে বিসর্জ্জন করা হইল। অসুরনাশিনী অসুরকে বিনাশ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল। জগন্মাতা যেমন জাহ্নবী সপত্নীবৈরীকে প্রেমালিঙ্গন করতঃ, তাঁহার সহিত মিলিতা হইয়া, উভয়ের অভিন্নভাব দেখাইয়া গেলেন, ভক্ত সন্তানগণও শত্রুশূন্য হইয়া, বিজয়োৎসবে বন্ধুভাবে পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গন করিল। পাপরূপ অরি বিনষ্ট হওয়ায়, সকলেই পুণ্যময়, সকলেই আনন্দময়, সকলেই পরস্পর ভ্রাতৃভাবে, পুলকিত চিত্তে মিলিত হইয়া, স্বর্গসুখ উপভোগ করিল। বাস্তবিক, হিন্দুর দুর্গোৎসব স্বর্গসুখের আকর, বিজয়া পুণ্যের খনি। বিজয়ার দিন, শত্রুকেও মিত্রভাবে আদর অভ্যর্থনা ও আলিঙ্গন করিতে হইবে; সেদিন আর হিন্দুর মনে মালিন্য থাকিবে না, কপটতা থাকিবে না।

যাহারা হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করে, আহা, তাহারা যদি হিন্দুর দুর্গাপূজা দেখিয়া, হিন্দুর বিজয়োৎসব দেখিয়া, উহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক অর্থ বুঝিতে পারিত। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাহাদের সে গূঢ় অর্থ বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তাই তাহারা উপহাস করে।

বর্ষার শেষে, যখন নির্ম্মল আকাশ শরচ্চন্দ্রে শোভিত হয়, যখন পৃথিবী শস্যপূর্ণা হয়, যখন ভারতের কৃষক পরিশ্রমের পর বিশ্রাম ও শান্তিলাভ করে, তখন ভারতের সরলচিত্ত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যপরায়ণ হিন্দু, শক্তিরূপিণী ভগবতীর আরাধনার বিহিত অবসর বুঝিয়া, তদ্গতচিত্তে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হয়। ত্রেতাযুগে, রামচন্দ্র নিশাচর রাবণ বধের জন্য, মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন; সেই অবধি হিন্দুগণ তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। হিন্দুর আর রাজত্ব নাই, আর স্বাধীনতা নাই, কিন্তু ধর্ম্ম আছে; এই মহাদেবীর পূজাই তাহার প্রমাণ।

মনুষ্যকে দশদিক হইতে নানা শত্রু আক্রমণ করে; তাই, মহাশক্তি দশভুজে অস্ত্র ধারণ করিয়া, ভক্তের শত্রুনাশের জন্য আগমন করেন। আবার, দশ অস্ত্র প্রহারেও, পাছে শত্রুরূপী অসুর বিনষ্ট না হয়, সেই জন্য, সিংহসেবকের সাহায্য আবশ্যক বিবেচনায়, তাহাকেই বাহকস্বরূপে আনয়ন করেন। নিজপুত্র দেবসেনাপতি কার্ত্তিক ও সিদ্ধিপ্রদাতা গণেশকেও সঙ্গে লইয়া আসেন। কার্ত্তিক, জননীর সাহায্যার্থ এবং গণেশ, অসুর বিজয়কার্য্য সিদ্ধির ফল প্রদানের জন্য আগমন করেন। আবার, শত্রুনাশের পর, ভক্তগণকে বিদ্যাদান ও ধনদান প্রয়োজন ভাবিয়া, স্নেহময়ী জননী, নিজ কন্যা বিদ্যারূপিনী বীণাপাণী ও ধনপ্রদায়িনী লক্ষ্মীকে আনেন। মহাশক্তির আরাধনা ব্যতীত, বিদ্যালাভ, ধনোপার্জ্জন ও কার্য্যসিদ্ধি হয় না, তাই তিনি সরস্বতী-লক্ষ্মী-গণেশ-জননী। তিনি, ধর্ম্ম-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িণী; তাই, ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া, ভক্তের শত্রুনিধন ও তাহাকে চতুর্ব্বর্গ ফলদান করিতে, স্বগণ সহিত আসেন। ভক্তের মুক্তিলাভ হয়। অনেক দেবদেবীও মহাদেবীর সঙ্গে আসেন, সেগুলিকে চালচিত্রে সুন্দররূপে অঙ্কিত করা হয়। বাস্তবিক, যেন সমস্ত স্বর্গ, মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য আনন্দোৎসবে মিলিত হয়। সেইজন্যই, প্রকৃত হিন্দু, দুর্গোৎসবে স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। যাঁহার বাটীতে দুর্গোৎসব হয় তিনি ধন্য, তাঁহার অর্থ প্রকৃত সৎকার্য্যে ব্যয়িত হয়। তিনি, তিন দিন, আত্মীয়, কুটুম্ব, নিমন্ত্রিত, আগন্তুক সকলকে সমাদর অভ্যর্থনা করিয়া, কি আনন্দই অনুভব করেন! পূজাবাড়ীতে সকলেই আনন্দে মগ্ন, সকলেরই মনে ধর্ম্মভাব, সকলেই সরল ভাবে, ভ্রাতৃভাবে মিলিতেছে, ইচ্ছামত বেশ ভূষা করিয়া, চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ভোজন ও পান করিয়া ও করাইয়া সুখবোধ করিতেছে। গরিব ভিখারীদিগকে প্রচুর অন্নদান ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইতেছে। সঙ্গীত শ্রবণে

সকলে পুলকিত হইতেছেন। দেবীর পূজার স্থানে, নানাবিধ ফলমূল, গন্ধ পুষ্প, ও ধূপধূনার সমাবেশ ও সুগন্ধে আমোদিত; এবং ব্রাহ্মণগণ উচ্চৈঃ পূজামন্ত্র পাঠ করিয়া সমবেত হিন্দু পুরুষ ও মহিলাদিগের চিত্ত, ভক্তি ও পুলকে আপ্লুত করিতেছেন। বাস্তবিক, পূজার মন্ত্র ও স্তোত্রগুলি কি শ্রুতিমধুর, কি হৃদয়গ্রাহী; চণ্ডীপাঠ শুনিয়া কোন্ হিন্দুর মন না তদ্গত হয়?

হিন্দু পৌত্তলিক নহে। হিন্দু মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিটীর আরাধনা করে না। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এইটী হিন্দুধর্ম্মবীজমন্ত্র। সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান বলে; হিন্দুধর্ম্মও তাহাই বলে, এবং হিন্দু সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখিতে পায় ও সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকেই পূজা করে। মৃত্তিকাই হউক আর প্রস্তরই হউক, হিন্দুর চক্ষে সকলই ভগবানের আবাস স্থান; কিন্তু ধ্যানস্থ হিন্দু মৃত্তিকা কি প্রস্তর ভাবেন না; সেই নিরাকার চিন্ময় পরমেশ্বরকেই ভাবিয়া থাকেন। তাই বলি, হিন্দু পৌত্তলিক নহে। যাহারা হিন্দুকে পৌত্তলিক বলে, তাহারা বিষম ভ্রান্ত।

দুর্গা প্রতিমা দেখিলে, দেশীয় শিল্পকরকে ধন্যবাদ দিতে হয়। রণপ্রমত্তা মহাদেবীর মুখমণ্ডলের কি মাধুরী, দেখিলে ভয় না হইয়া ভক্তির উদয় হয়। ত্রিগুণ ও ত্রিজগৎপ্রকাশক ত্রিনয়ন, শান্তিসুধার আকর। যেন অভয়া মূর্ত্তি মনুষ্যহৃদয়ে সাহস ও উৎসাহ উৎপাদন করিতেছেন! লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্ত্তিও ভক্তি উদ্দীপক। আর, অসুর যেন ক্রোধ ও হিংসার জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। অলঙ্কারগুলিও মাল্যকরগণের কারুকার্য্যের পরিচায়ক। আমাদের পৌত্তলিকতার যে শিল্পের যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি হয় ইহাও লাভ।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে, হিন্দু মুসলমান সকলেই নববস্ত্র পরিধান করে। যে সক্ষম হয়, নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া ব্যবহার করে। যাঁহাদের বাড়ীতে পূজা হয়, তাঁহারা বাড়ী সংস্কার করাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। বিজয়ার দিন সকল হিন্দুই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কর্ত্তব্য কার্য্য সকলই করা হয়। বর্ষার পর রোগোৎপত্তির সময়, সেই জন্য মনের প্রফুল্লতারও প্রয়োজন। হিন্দুর দুর্গোৎসবে এই সকল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়।

দুর্গোৎসবে ধর্ম্মভাব এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদিগুণের প্রস্ফুরণ হয়, এবং সামাজিকতারও সুবিধা হয়। আত্মীয় স্বজনের সমাগম ও মিলন, বৎসরে একবারমাত্র এই দুর্গোৎসবের সময়েই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আজকাল আমাদের অনেককেই কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে থাকিতে হয়; কেবলমাত্র

দুর্গা-পূজাবকাশে বাড়ী যাওয়া ঘটে। পিতা,মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ হয় ও কিছুদিন একত্রে থাকিয়া সুখসম্ভোগ হয়। ইহা কি সামান্য লাভের কথা?

কিন্তু হায়! পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে! দুর্গাপূজা অসভ্যতা, ও ইহাতে বাজে খরচ হয় বলিয়া, উঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। পূজার সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যে গ্রামে ৫০ খানি প্রতিমা হইত, এখন সেগ্রামে ৫খানিও দেখা যায় না। যাঁহারা যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন, তাঁহাদের ও পূজা করিবার মতি নাই। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বরাবর দুর্গোৎসব করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই, পাছে তাঁহাদের নাম ডুবে, সেই ভয়ে, অতি কষ্টে, ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এ সকল ভাল লক্ষণ বলিয়া বোধ হয় না। আমরা পরাধীন, ধর্ম্মই আমাদের জীবন ও একমাত্র শান্তির জিনিষ; সেই ধর্ম্ম হারাইলে আমাদের আর কি থাকিবে?

দেশীয় শিল্প।

(১)

পুরাকালে, এদেশে প্রধান প্রধান শিল্প ও বৃত্তি লইয়া এক একটী জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। ভূস্বামিগণ আপন আপন অধিকার মধ্যে, প্রয়োজনমত অন্ততঃ প্রধান জাতিগুলির স্থাপনা না করিয়া, নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। অনেককে নিষ্করভূমি দিয়া বাস করাইতেন। শাস্ত্রালাপ, শাস্ত্রচর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তারে তাঁহাদের যেরূপ আগ্রহ ছিল, শিল্পোন্নতির জন্যও তাঁহাদের সেইরূপ আগ্রহ ছিল। এই জন্য, তাঁহারা যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। শিল্পীগণও উৎসাহ পাইয়া, আপনাদের নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিত। এক একখানি বস্ত্র, তরবারি, শীতলপাটী, মস্‌লন্দী বা একটী হস্তীদন্তনির্ম্মিত দ্রব্য, এরূপ দীর্ঘকালে প্রস্তুত হইত ও তাহার কারু-কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া এত অধিক মূল্য প্রদত্ত হইত যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বহু শতাব্দি ব্যাপিয়া, এইরূপে বহুবিধ শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সেই জন্য, প্রাচীন ভারতবর্ষ যেমন সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ জ্যোতিষ ও যোগশাস্ত্রের জন্য শিক্ষিতজগতে বিখ্যাত, এদেশের শিল্পও একসময়ে সেইরূপ বিখ্যাত হইয়াছিল। কিন্তু ভূস্বামিগণের বংশধর ও স্থলাভিষিক্তগণ এতদিন

দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান ছিলেন; উৎসাহে নিরস্ত থাকিয়া, তাহাদের বিনাশ সাধনে এতদিন সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন।

এদেশের শিল্পজাত দ্রব্যসকল ইউরোপের নানা দেশে রপ্তানি হইত; সেই বিদেশীয়গণ ক্রমশঃ সেগুলির অনুকরণে, কলের সাহায্যে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, এদেশে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। এদেশের অধিকাংশ লোক অবস্থাহীন ও অনেকে অদূরদর্শী বলিয়া, দেশীয় শিল্পজাতদ্রব্য ব্যবহার করে না; সুতরাং দেশীয় শিল্প প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

সম্প্রতি, বড়লাট কর্জ্জন সাহেব বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব করাতে, এবং দেশীয় লোকের মতের বিরুদ্ধে সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার সংকল্প করাতে, দেশের নেতাগণ বিদেশীয় দ্রব্যের বর্জ্জন করিবার জন্য সবিশেষ আন্দোলন করিতেছেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলে, দেশীয় শিল্প পুনর্জ্জীবিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে যদি শেষে গবর্ণমেণ্ট বিমুখ হইয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে আমাদের আশা নির্ম্মূল হইবে। যদিও গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করেন যে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি হওয়া উচিত, সেটী তাঁহাদের আন্তরিক কথা কিনা, সে বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে। গবর্ণর জেনারল লর্ড বেণ্টিঙ্ক এদেশের অনেক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন; এবং তিনি যে ভারতবর্ষের হিতৈষী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাঁহার সেক্রেটারী ভারত সচিবের নিকট এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, এদেশের লোক কেবলমাত্র কৃষিজাত দ্রব্য সকল উৎপন্ন করিবে, ও সেই সকল দ্রব্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া, তাহা হইতে শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত করা চাই। ইহা দ্বারাই গবর্ণমেণ্টের মতলবের বেশ উপলব্ধি হইতেছে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যখন প্রকাশ্যভাবে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হওয়া আবশ্যক বলেন, তখন আর সে বিষয়ের আন্দোলনে আমরা অপরাধী হইতে পারিনা।

যদিও, দেশীয় শিল্পের অবস্থা মন্দ হইয়াছে, কিন্তু এখনও যে ইহা একবারে বিনষ্ট হয় নাই, ইহাই আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। এক একটী শিল্প এক এক শ্রেণীর জাতীয়বৃত্তি হওয়ায়, ও বহুকাল ধরিয়া পুরুষানুক্রমে এক এক শিল্পে নিযুক্ত থাকায়, শিল্পবৃত্তি ও সংস্কার, দেশমধ্যে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সহসা তাহা বিনষ্ট হইবার নহে। যদিও অনেক শিল্পী উদরান্নের অভাবে জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, তথাপি এখনও অনেকে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে

দিনপাত করিতে প্রস্তুত, কিন্তু জাতীয় মূর্ত্তি পরিত্যাগে লজ্জা, ঘৃণা ও অপমান বোধ করে। সেই জন্যই অনেকগুলি শিল্প বিনষ্ট হইলেও, এখনও এদেশের কতকগুলি শিল্প মুমূর্ষু-দশাপন্ন হইয়াও জীবিত আছে। এদেশে এখনও নানাবিধ উত্তম উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকা জেলার তন্তুবায়েরা মস্‌লিন নামে বহুমূল্য বস্ত্র প্রস্তুত করে, তাহারা অল্পমূল্যের পরিধেয় বস্ত্রও প্রস্তুত করিয়া থাকে। পাবনা জেলার কাপড়ও উত্তম এবং বিখ্যাত। বাঙ্গালায় প্রায় সকল জেলাতেই তাঁতির বাস। শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে নানাবিধ ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হয়। হুগলী, হাবড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বালেশ্বর প্রভৃতি জেলায় অনেক গ্রামেই এখনও সুন্দর সুন্দর বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। হাবড়ার হাটে প্রচুর দেশী কাপড়ের আমদানী হইয়া থাকে। দেশী তাঁতের কাপড় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা কিছু অধিক মূল্যবান হইলেও, অনেক দিন স্থায়ী হয়। যদি দেশী কাপড়ের কাটতি অধিক পরিমাণে হয়, তাহা হইলে তাঁতি ও বিক্রেতাগণও অল্পলাভে বিক্রয় করিতে পারে। গরিব লোকদের জন্য, জোলা নামক মুসলমানেরা এবং হিন্দু চর্ম্মকারগণ মোটা কাপড় প্রস্তুত করে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি সকল স্থানেই মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়। এদেশে কাপড় প্রস্তুত করিবার লোকের অভাব নাই; তবে আজকাল চরকা কাটা সূতার অভাব হইয়াছে। এখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, এবং দেশের অপর সাধারণ লোকের সাধ্য সূতাকাটা প্রথা প্রায় বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, ও তাঁতির সংখ্যা হ্রাস হওয়ায়, পূর্ব্বের ন্যায়, চরকায় সূতা কাটিয়া যোগান, সহসা সম্ভরপর নহে।

বোম্বাই, আহম্মদাবাদ, নাগপুর, বরোদা, বেওয়ার ও ঘুস্থুড়িতে কতকগুলি সূতা ও কাপড়ের মিল (কল) হইয়াছে। এই সকল মিলে গত বৎসর প্রায় ৭০ লক্ষ মণ সূতা ও ১৫৮৭ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ মণ সূতা ও ৮৭৫ লক্ষ গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। বিদেশ হইতে গত বৎসর ২২৯ কোটী গজ কাপড় ও কেবল মাত্র পৌণে চারি লক্ষ মণ সূতা আমদানি হইয়াছে। প্রতি বৎসর সূতার আমদানির পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে; ইহার প্রথম কারণ, দেশীয় মিলে সূতার উৎপত্তি ও দ্বিতীয় কারণ, দেশীয় তাঁতি-সংখ্যার হ্রাস। দেশীয় মিলে সূক্ষ্ম সূতা অধিক উৎপন্ন হইতেছে না। এই সকল মিলে অধিক সূক্ষ্ম সূতার জন্য বন্দোবস্ত করিলে ও আরও কতকগুলি সূতার কল স্থাপিত হইলে ভাল হয়।

সুতার কাপড় ব্যতীত, এদেশে নানাবিধ রেশমী কাপড়ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায়, বেহারে ভাগলপুর, মুঙ্গের, গয়া ও অন্যান্য স্থানে উত্তম তসর ও গরদ কাপড় উৎপন্ন হয়। বারাণসীর শাড়ী ও ধুতি জগদ্বিখ্যাত বলিলে চলে। মান্দ্রাজে, মসলিপট্টম জেলায় সুন্দর সুন্দর রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। কাশ্মীর, অমৃতসর, রামপুর প্রভৃতি স্থানে নির্ম্মিত পশমী শাল, আলোয়ান প্রভৃতি, ভারতের গৌরবের জিনিষ। দেশের অনেক স্থানে জামা, কোট ইত্যাদির জন্য সুদৃশ্য চেক ও অন্যান্য কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। কানপুর, কানানোর ও নাগপুরের কলেও এই সকল কাপড় প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের নানাস্থানে গালিচা, কম্বল ও সতরঞ্জ (দরি) তৈয়ার হয়। ভুটানের পাহাড়িয়ারা সুন্দর মজবুত কম্বল প্রস্তুত করিয়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করে। রাঁচি, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে উত্তম কম্বল ও কম্বলের আসন তৈয়ার হইয়া থাকে। আগ্রার দরি প্রসিদ্ধ; আরা জেলাতেও দরি প্রস্তুত হয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের নানা স্থানে কম্বল, গালিচা ও দরি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের কাঁসারিগণ যে সকল পিত্তল কাঁসার বাসনাদি প্রস্তুত করে, তাহা বহুদিন স্থায়ী হয় এবং ভাঙ্গিলেও অর্দ্ধমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। আমরা এই সকল দেশীয় বাসন পরিত্যাগ করিয়া, বিদেশীয় ভঙ্গপ্রবণ ও অল্পদিন স্থায়ী কাচ ও এনামেলের বাসন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই কাঁসারি বাস করে ও বাসন তৈয়ার করে; তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়ার বাসন বিখ্যাত। উড়িষ্যায় নির্ম্মিত কাঁসার বাসন খুব মজবুত। বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া, দীর্ঘনগর প্রভৃতি স্থানের ও বিষ্ণুপুরের কাঁসারীগণও পরিপাটী বাসন প্রস্তুত করে। তাঁতিদের ন্যায় কাঁসারিদেরও দুর্দ্দশা হইয়াছে।

এদেশে সুন্দর সুন্দর পাথরের বাসনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। গয়া, বালেশ্বর, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের বাসন প্রসিদ্ধ। আরও অনেক স্থানে অল্প মূল্যের পাথরের থালা, বাটী প্রভৃতি তৈয়ার হয়। আজকাল এনামেলের বাসনের আমদানিতে পাথরের বাসনের আদর নাই।

দেশীয় শিল্পসম্বন্ধে জানিবার বিষয় অনেক আছে, আমরা ক্রমশঃ সংবাদ সংগ্রহ করিয়া উপরোক্ত ও অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে যত্নবান থাকিব।

বস্ত্র-শিল্প।

(১)

খাদ্যের ন্যায় বস্ত্রও সভ্য সমাজের অবশ্য-প্রয়োজনীয়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-শরীর হইতে, খাদ্যের ন্যায়, বস্ত্রোপকরণও প্রায় তুল্য পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফল, মূল ও শস্যাদির ন্যায়, উদ্ভিজ্জ হইতে আমরা তুলা, পাট শণ প্রভৃতি সংগ্রহ করি; রেশম, পশম ও চর্ম্ম, জন্তু-শরীর হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

আদিম অবস্থায়, বৃক্ষের ত্বক্ ও পশুচর্ম্মই মানবের পরিধেয় ছিল; অতি পুরাকাল হইতে, অনেক দেশেই, পশুলোম নির্ম্মিত পরিধেয় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু বস্ত্রের ব্যবহার ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। যদিও কোন্ প্রাচীন কাল হইতে, ভারতে বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, তথাপি, প্রাচীন ভারতের সভ্যতার প্রারম্ভেই যে ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বৈদিক কালে, (আধুনিক-গণের মতে প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে), এদেশে বস্ত্র বয়ন কার্য্য ও তাঁত প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদের ৬ম, ৯সূ, ৪অ, ৫অধ্যায়ে ঋষি বলিতেছেন—"নাহং তংন্তুং ন বিজানাম্যোত্তুং ন যং বয়ংতি সমরেঽতমানাঃ" আমি তন্তু বা ওতু (টানা ও পড়্যান) জানিনা, কিম্বা সতত চেষ্টাদ্বারা যে বস্ত্র বয়ন করে, তাহার কিছুই জানিনা। ২ম, ৩সূ, ২অ, ৫অধ্যায়ে—"উষা সা নক্তা বয্যেব রণ্বিতে তংন্তুং ততং সংবয়ংতী সমীচী", দিবা ও রাত্রি বয়ন-নিপুণা রমণীদ্বয়ের ন্যায় গমনাগমন করতঃ বিস্তৃত তন্তু বয়ন করিতেছে। আরও কতকগুলি স্থলে "বিততং বয়ংতী", "বস্ত্রমথিং ন তায়ুং" প্রভৃতি উল্লেখ আছে। বৈদিক সন্ধ্যা-মন্ত্রে "তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীং", "রক্তাঙ্গীং রক্তবাসসাং", "শ্বেতাঙ্গীং শ্বেতবাসসাং", "কৃষ্ণাঙ্গীং কৃষ্ণবাসসাং" প্রভৃতি বস্ত্র সম্বন্ধে বহুল প্রয়োগ আছে; ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, সে সময়ে বস্ত্রের বহুল ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। উপনিষৎ, পঞ্চদশী, যোগী যাজ্ঞবল্ক, বশিষ্ঠ, মনু প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের পর রচিত; সুতরাং এই সকল গ্রন্থেও বস্ত্র সম্বন্ধে অনেক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্রের ব্যবহার যে এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রও এদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে

প্রচলিত; কার্পাস যে এদেশ হইতে নীত হইয়া অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা তুলা বিষয়ক প্রবন্ধে দেখান হইবে।

পুরাকাল হইতেই ভারতের বস্ত্র দেশের অভাব পূর্ণ করিয়া, বহুল পরিমাণে নানা দেশে রপ্তানী হইত, এবং সর্ব্ব দেশেই বিশেষ সমাদৃত হইত। বস্ত্রশিল্পের এই বহুল বিস্তৃতি, দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার একটী প্রধান উপায় ছিল। এই শিল্পের এদেশে এত উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল যে, এখন পর্য্যন্ত ইহার নৈপুণ্যে পৃথিবীর লোক আশ্চর্য্য বোধ করে; কিন্তু ইহার যন্ত্রাদির এদেশে প্রায় কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। সেই বৈদিক কালের চরকা ও প্রায় সেইরূপ তাঁতই আবহমান কাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। চরকার ব্যবহার প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। তথাপি, এখনও এই হস্তচালিত চরকায় যে অতি সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয়, অপর কোন দেশে বা কোন কলে তাহার অনুরূপ হইতে পারে না। ঢাকার মস্‌লিন জগদ্বিখ্যাত। বাবু টি, এন্, মুখার্জ্জি তাঁহার ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত, ভারতের শিল্প বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, যখন মিসরে পিরামিড সকল প্রস্তুত হইতেছিল, বাদসাহ সলোমন জেরুসালেমে রাজত্ব করিতেছিলেন, রোমুলাস রোম নগরের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন ও বাগ্‌দাদের হারুণ আল্‌রসিদ নিশিভ্রমণে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই পুরাকাল হইতেই, এদেশে এই মস্‌লিন প্রস্তুত হইতেছে। কি ধৈর্য্য, একাগ্রতা ও নৈপুণ্যগুণে এই সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপন্ন হয়, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। আমরা শুনিয়াছি, বিষ্ণুপুরের একজন ধোপা তাঁতি, তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, ছয় মাসে এক যোড়া ধুতি প্রস্তুত করিয়াছিল। কুড়িগজ দীর্ঘ ও এক গজ প্রস্থ একখানি মস্‌লিন একটী অঙ্গুরীর ভিতর প্রবিষ্ট হইতে পারে। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এরূপ উৎকৃষ্ট মস্‌লিন প্রস্তুত হইতে পারিত যে, একখানি ১৫ গজ দীর্ঘ ও ১ গজ প্রস্থ বস্ত্র ওজনে প্রায় ৪ তোলা হইত। এরূপ একখানি বস্ত্রের মূল্য সে সময়ে চারিশত টাকা ছিল। ১৮৪০ সালে ডাক্তার টেলার সাহেব বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময়ে এইরূপ একখানি বস্ত্র ৭ তোলার ন্যূন ওজনের হইতে পারিত না, এবং তাহার মূল্য প্রায় ১০০৲ টাকা ছিল। এখনও ঢাকা হইতে ২০ মাইল উত্তরে ধামরাই নামক গ্রামের স্ত্রীলোকগণ উচিত মূল্য পাইলে, এইরূপ বস্ত্রের সূতা কাটিতে পারে। এই সূতার মূল্য ছটাক প্রতি ১০০৲ টাকা দিলেও অধিক দেওয়া হয় না, এবং একখানি দশগজ দীর্ঘ ও একগজ প্রস্থ মস্‌লিন ৫ মাসের ন্যূন সময়ে বয়ন করা যায় না। বর্ষাকাল

ভিন্ন অন্য ঋতুতে এরূপ সূক্ষ্মসূতার বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারেনা। অধুনা ঢাকা মস্‌লিনের মূল্য, ইহার সানার সুতার সংখ্যা হিসাবেই নিরূপিত হয়। এখনকার উৎকৃষ্ট মস্‌লিনের প্রতি গজে ১৮০০ টানা ও ২২০০ পড়্যান সূতা থাকে; তদপেক্ষা নিকৃষ্টে, টানায় ১৪০০ ও পড়্যানে প্রায় ১৭০০ সুতা থাকে। * সূতার সংখ্যা অধিক হইলেই অধিক সূক্ষ্ম সূতা ব্যবহৃত হয়। যুক্ত প্রদেশের সেকন্দরাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মহম্মদ নগর, কাশী ও ফয়জাবাদ নগর এখনও সূক্ষ্ম মস্‌লিনের জন্য বিখ্যাত।

এই বহু প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট শিল্প, বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে, বিহীনশ্রী ও নষ্টপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। বিদেশে রপ্তানী দূরে থাক, স্বদেশেই ইহার আদর ও প্রচলন লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টরের বাষ্পীয় যন্ত্রচালিত মিলের কাপড়ই যে, ভারতের বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বনাশ সাধনের কারণ, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু সাধারণ প্রতিযোগিতায় ম্যাঞ্চেষ্টর এ শিল্প বিনাশে কৃতকার্য্য হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, মিলের কাপড়, হস্তচালিত তাঁতের সহিত সাধারণ প্রতিযোগিতায় এখনও পরাজিত হইবে। এই শিল্পের উচ্ছেদ সাধনের জন্য কি কুটীলনীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা মহানুভব মহারাষ্ট্রীয় লেখক শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত "দেশের কথা" নামক বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তকে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিরূপে শুল্কভার স্থাপনে, বাণিজ্যপোত বিনাশে, ও ক্রীতদাসাপেক্ষা হীন-স্বভাব-সম্পন্ন দেশীয় কর্ম্মচারীগণের সাহায্যে, তন্তুবায় কুলের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, তাহা অবগত হইলে, যুগপৎ বিস্ময়, খেদ ও গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। অপরিণামদর্শী স্বদেশীয়গণও, এই প্রধান ও প্রয়োজনীয় শিল্পের নিদারুণ অবনতি স্বচক্ষে দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। কেবল নিশ্চিন্ত থাকা নয়, যাহাতে ইহার অধঃপাত শীঘ্রতর হয়, সেজন্য অনেকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। সেই অসহায় অবস্থায়, সেইরূপ ভীষণ অত্যাচার হইতে কিয়ৎ পরিমাণেও পরিত্রাণ লাভ করা, ভারতের শিল্প ব্যতীত আর কোন দেশের শিল্পেরই সাধ্য ছিল না। যে কিয়দংশ তাঁতিগণ এখনও বস্ত্রবয়নে ি ক্তে আছে, তাহারা জাতীয়বৃত্তি পরিত্যাগে পরাঙ্মুখ, ও সেই জন্য অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও, বয়ন কার্য্যে নিযুক্ত আছে; কিন্তু

* Glimpses of India নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে।

উদর-জ্বালায় অনেকে জাতীয়বৃত্তি পরিত্যাগও করিয়াছে এবং অপর বৃত্তির অভাবে, কিম্বা বৃত্তি ত্যাগ না করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া, অনশনে অনেক তাঁতি জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। আমরা অনেক গ্রাম দেখিয়াছি, যেখানে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে পাঁচশত ঘর তাঁতির বাস ছিল, কিন্তু এক্ষণে পঞ্চাশ ঘরও অবশিষ্ট নাই। যাহারা দারুণ অত্যাচার ও অনশন ক্লেশ সহ্য করিয়া, এবং প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া, আমাদের এই প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

কিন্তু ধন্যবাদে উদরপূর্ত্তি হয় না, এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকারেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই পুরাতন শিল্পকে যদি আমরা বাস্তবিক গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করি, যদি আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের অত্যাচার ও অনাদর নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বুঝিয়া থাকি, ও যদি ইহার পুনরুন্নতি সত্যই আমাদের বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলেই আমাদের স্বদেশ-প্রীতি আন্তরিক বলিয়া বুঝিতে হইবে; নচেৎ ইহা অন্তঃসার-বিহীন ও বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।

কিন্তু আমাদের সে লক্ষ্য কোথায়? স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম অবস্থায়, আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলাম; মনে করিয়াছিলাম, ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, আমাদের সুমতি হইতেছে, এইবার আমাদের নষ্টপ্রায় শিল্পগুলির জীর্ণ সংস্কার হইবে, এইবার আমাদের অন্নক্লিষ্টগণের অন্ন সংস্থানের পথ উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু দেশের লোক "দেশী মিল, দেশী মিল" শব্দে যেরূপ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহাতে সে আশা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। দেশী মিলের কাপড় পাইয়া লোক চরিতার্থ বোধ করিতেছে, ও ম্যাঞ্চেষ্টরের কাপড়ের সহিত তুলনা করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছে; কেহ বা, দেশোদ্ধার হইল বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে; কেহ বা, ইহার অপ্রাপ্তিতে নৈরাশ্য সাগরে ডুবিতেছে। কতকগুলি বিক্রেতাও সুযোগ বুঝিয়া, বিদেশীয় কাপড়ে দেশী মিলের ছাপ বসাইয়া, মূর্খদিগকে সহজেই প্রতারিত করিবার উপযুক্ত অবসর স্থির করিয়াছে। তাঁতের কাপড় সম্বন্ধে আপাততঃ এই কয়েকটী সন্দেহ বা নৈরাশ্যসূচক প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে।

১ম। কেহ বলিতেছেন, "শস্তা না হলে, আমাদের গরীবলোক কিনতে পারবে কেন"?

২য়। কেহ বলেন, "কলের প্রতিযোগিতায় দেশী তাঁত দাঁড়াইতে পারিবে কেন?"

৩য়। কেহ ভাবিতেছেন, "এত বস্ত্র হাতের তাঁতে যোগাইতে পারিবে কেন ?"

এইরূপ আরও অনেক প্রশ্ন উঠিতেছে ও উঠিবে। আমরা এইরূপ প্রশ্নগুলি পাইলে, তাহার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব বলিয়া, এই পত্রিকা-খানির অবতারণা করিয়াছি।

আপাততঃ ঐ তিনটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের উত্তর---

১ম। দেশী তাঁতের কাপড়, মিলের কাপড় অপেক্ষা, প্রকৃত পক্ষে শস্তা।

কাপড়ের মূল্য, ইহার স্থায়িত্ব এবং সূত্রের সূক্ষ্মতা ও সংখ্যার উপর নির্ভর করে। অন্ততঃ এই তিনটিই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিলাতী দ্রব্যের আমদানিতে, আমাদের বিলাস প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হওয়ায়, আমরা স্থায়িত্বের পরিবর্ত্তে, বহির্দৃশ্যকেই মূল্যের নিরূপক করিয়া লইয়াছি। বহির্দৃশ্য অর্থাৎ চাকচিক্য দেখিতে গেলেও, দেশী মিলের কাপড় তাঁতের কাপড়ের নিকট পরাজিত হইবে। সুতরাং, এখন সূত্রের সূক্ষ্মতা ও সংখ্যা নিরূপণের জন্য, একখানি দেশী মিলের, ও সমান নম্বর সূতার একখানি তাঁতের কাপড় লইয়া, একজন পারদর্শী লোকের সাহায্যে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাঁতের কাপড়ে, মিলের কাপড় অপেক্ষা অনেক অধিক সূতা আছে; কলের কাপড়ের সূতার পাইট না হওয়ায়, এলান অবস্থায় আছে, ও সেই জন্য ঘন-সন্নিবিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু তাঁতের কাপড়ের সূতার পাইট হওয়ায়, ইহা তারের মত ও পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। সূতার পাইট হইলে কিম্বা অধিক সূতা থাকিলে, কাপড় নিশ্চয়ই অধিক মজবুত হয়। পরীক্ষার জন্য গৃহীত মিলের কাপড়খানি যদি পাঁচ মাস টিকে, তাহা হইলে তাঁতের কাপড়খানি অন্ততঃ ছয় মাস টিকিবে। সুতরাং কলের কাপড়খানির জন্য ৸৵০ আনা দাম দিলে, তাঁতের কাপড়খানির জন্য ১৵০ আনা দাম দেওয়া না যাইবে কেন ? আমরা জানি, কাপড়ের স্থায়িত্ব বিবেচনা করিয়াই, বাঙ্গালা দেশের সাঁওতাল ও অনেক জঙ্গলী জাতীয় লোক, এবং অনেক দরিদ্র শ্রেণীর কৃষক, ও উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ গ্রাম্য লোকে, মূল্য দিয়া কলের কাপড় ব্যবহার প্রায় করে না। তাহারা ২।০ আনা কিম্বা ২॥০ আনা যোড়া মূল্যের খুব মোটা কাপড় ব্যবহার করে এবং ঐ কাপড় এক বৎসর স্থায়ী হয়। অর্দ্ধ শিক্ষিত ও বিলাস-প্রিয় লোকেই,স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা না করিয়া,কলের কাপড় ব্যবহার করে।

তাহাদের বুঝাইবার ভার, দেশের শিক্ষিতগণের উপর, এবং তাঁহারা যেরূপ বুঝাইয়া দেন, ঐ সকল লোকও প্রায় তাহাই বিশ্বাস করে।

দেশী কাপড়ের ব্যবহার জন্য সহসা সংকল্প হওয়ায়, ইহার মূল্য সম্প্রতি একটু অধিক হইয়া উঠিয়াছে; এবং আরও কয়েক দিন এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। কিন্তু ক্রমশঃ ইহা নিশ্চয়ই হ্রাস হইয়া আসিবে। আমরা "কলের আবশ্যকতা" বিষয়ক প্রবন্ধে ইহা বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আপাততঃ যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতেই বা লোক স্বীকৃত হইবে কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর—"প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য" ও "পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য।" প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিলে, মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, কোন সৎকর্ম্মেরই অধিকারী হওয়া যায় না।

এতদিন বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহাররূপ যে অখাদ্য ভক্ষণ করা হইয়াছে, দেশের তন্তুবায়গণের অন্ন-সংস্থানের পথ বন্ধ করিয়া, তাহাদের অধিকাংশের বিনাশ সাধন করা হইয়াছে, ও অবশিষ্টাংশকে অর্দ্ধাশনে রাখা হইয়াছে, এইরূপ মহাপাপের জন্য একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারিলে, আমাদের দ্বারা দেশের কোন কার্য্যই সাধিত হইবে না। অন্ততঃ যদি এক বৎসর এই মূল্য বৃদ্ধি স্বীকার করিতে পারি, তবেই দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইবে, নচেৎ সে আশা দুরাশা। তন্তুবায় কুল ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, আমাদের প্রয়োজন মত বস্ত্র যোগাইয়া দিবে ও আমাদের স্বদেশ-প্রীতিব্রতে সাহায্য করিবে, ইহা উন্মত্তের কল্পনা। অন্ততঃ কিছু দিন তাহারা উপযুক্ত আহার পাইলে, দেহে বলসঞ্চয় করিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিবে, ইহাই স্বাভাবিক।

আমরা এতদিন দেশীয় তাঁতিদের নিকট বিলাস-সজ্জার উপযুক্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র চাহিতেছিলাম, তাহারাও সেজন্য এইরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্রই যোগাইয়া আসিতেছিল। যিনি ইহার জন্য যেরূপ মূল্য দিয়াছেন, তিনি তদনুরূপ বস্ত্রই পাইয়া আসিয়াছেন। দেশী তাঁতে যেরূপ অধিক মূল্যের উপযুক্ত বস্ত্র পাওয়া যায়, কোন মিলে সেরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু, যিনি সামান্য মূল্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ক্রয় করিতে গিয়াছেন, তিনি যদি উৎকৃষ্ট বস্ত্র না পাইয়া পরিতাপ করিয়া থাকেন, তাহার জন্য তাঁতিরা দায়ী হইতে পারে না। এখন আমরা দেশী মিলের বস্ত্রের অভাবে, নিত্য পরিধেয়, অপেক্ষাকৃত মোটা কাপড়ের

জন্য, দেশী তাঁতের কাপড়ের অনুসন্ধান করিতেছি; তন্তুবায়গণও এখন সেইরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে; ইহাতে তাহাদের তাঁতের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে আমরা তাহাদের নিকট হইতে আমাদের প্রয়োজন মত বস্ত্র পাইতে আশা করিতে পারি। কিন্তু, আমাদের আন্তরিক লক্ষ্য যদি তাহাদের উন্নতির দিকে না থাকিয়া কেবল মিলের উন্নতির দিকেই থাকে, তাহা হইলে অতি অল্পকাল মধ্যে তাহাদের অবস্থা আবার শোচনীয় হইয়া আসিবে; এবং এই আন্দোলনের সুযোগ নিস্ফল হইলে, তাহাদের উন্নতির দ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

কল কারখানার আবশ্যকতা।

দরিদ্র ও অশিক্ষিতগণের প্রতিপালন ও পরিচালন ভার, সর্ব্বদেশে, সকল সময়েই, শিক্ষিত ও ধনী সমাজের উপর নিহিত। শেষোক্ত সম্প্রদায়ই দেশের ভদ্র ও প্রধান-পদবাচ্য। তাঁহাদের সংখ্যা, প্রথমোক্তের তুলনায়, মুষ্টিমেয় হইলেও, তাঁহাদেরই এই কর্ত্তব্য-জ্ঞানের ঐকান্তিকতার উপর দেশের ও সমাজের মঙ্গল নির্ভর করে; ইহাঁরা দরিদ্র ও অশিক্ষিতগণের মঙ্গল কামনায় দৃষ্টিহীন হইলে, সে দেশের সমাজ বিশৃঙ্খল, ও দেশে দুর্দ্দশার একশেষ হওয়াই স্বাভাবিক। এই কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাবই আমাদের দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ। রাজা বিদেশীয় ও আমাদের সমাজের কল্যাণ বিষয়ে আন্তরিক আস্থাবিহীন; উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ যেন একটী বিভিন্ন শ্রেণীর জীব, তাঁহারা সমাজের সহিত প্রায় সংশ্রব-শূন্য; জমিদারগণও এতদুভয়ের পন্থানুসন্ধিৎসু; প্রধান প্রধান বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীগণ আত্মস্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত; এবং পণ্ডিতগণ কোনরূপে স্ব স্ব গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্যই চিন্তিত। সুতরাং সমস্ত শিক্ষিত ও ধনী সমাজই দেশের মঙ্গল-বিধানে উদাসীন; তাঁহারাই দেশের ভদ্রনামধেয় হইলেও, সামাজিক কর্ত্তব্যজ্ঞান বিহীন।

অধুনা ইহাঁদের মতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু এই কর্ত্তব্য-দৃষ্টি প্রবল হইয়াছে কিনা, তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না; যে উপায়ে সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়, সেইরূপ উপায় অবলম্বিত হইবার বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে না। তাঁহারা দেশে কল কারখানা স্থাপনের জন্য বিশেষ

উৎসুক হইয়াছেন। কল কারখানা আধুনিক সভ্যতার প্রধান নিদর্শন, উন্নতির উপযোগী ও দেশের কল্যাণকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, সকল প্রয়োজন সাধনের জন্যই যে ইহা সমান উপযোগী, তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। অন্ন প্রস্তুত করিবার জন্য আমাদের অনেক সময় অতিবাহিত হয় ও ইহা আয়াসসাধ্যও বটে; কিন্তু অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধনের জন্য কল কারখানা স্থাপন, বোধ হয় এদেশে এখনও কাহারও অভিপ্রেত নহে; কেননা, এখনও ইহা দেশের লোকের জন্য বিদেশ হইতে আমদানী হয় নাই। অন্নের ন্যায় বস্ত্রও আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয়; কিন্তু, বস্ত্রের আমদানী বিদেশীয় মিল হইতে বহুল পরিমাণে হইতেছে; সেই জন্য, তাঁহারা দেশে মিল স্থাপন করিয়া ইহা উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

বস্ত্র বয়নের জন্য কল কারখানা স্থাপন প্রবৃত্তির আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী।

পূর্ব্বে বস্ত্র-শিল্প এদেশের অনেক লোকেরই প্রধান অবলম্বনীয় ছিল; বিদেশীয় মিল হইতে বস্ত্রের আমদানী হওয়ায়, ইহাদের মধ্যে অনেকে অবলম্বনবিহীন হইয়া পড়িয়াছে; তথাপি এখনও দেশের অনেক লোকেরই ইহাই অবলম্বন।

"It is the largest industry in the country next to Agriculture.... ....This ancient industry has suffered greatly from the introduction of machine-made goods and though possessed of considerable vitality seems to be steadily decaying". Review of the Trade of India 1904-05.

ভাবার্থ—"কৃষির পর বস্ত্র-শিল্পই এদেশের একমাত্র প্রধান শিল্প। মিল-জাত বস্ত্রের আমদানীতে এই প্রাচীন শিল্প বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং যদিও এখনও ইহা কতকটা জীবিত আছে, তথাপি ক্রমাগতই ইহার অবনতি হইতেছে।" ১৯০৪-৫ সালের ভারতের বাণিজ্য বিষয়ক সরকারি রিপোর্ট।

দেশের এই একমাত্র প্রধান শিল্পের অবনতি প্রতিবিধানের জন্যই যদি আমাদের আগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, সেই অবনতিমূলক মিল জাত বস্ত্র উৎপাদনেই আমাদের প্রবৃত্তি কেন হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমাদের দেশ দরিদ্র; পূর্ব্বে দেশে এরূপ দারিদ্র্য ছিল না। বিদেশীয় মিল হইতে এক বৎসরে রেশম, পশম ও কার্পাসজাত বস্ত্র ও সূত্রের আমদানীর মূল্য প্রায় ৪৪ কোটী টাকা। এই বিদেশীয় আমদানীই দেশের দরিদ্রতার একটী প্রধান কারণ।

"Manchester ruined Dacca".

Glimpses of India.

"ম্যাঞ্চেষ্টারই ঢাকার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে।" তথাপি আমরা দেশী ম্যাঞ্চেষ্টার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইব কেন?

"We hear moreover of her hitherto matchless fabrics and the much desired objects of Commerce for probably 3000 years, beaten out of even her home market by the comparatively recent but now gigantic cotton manufactures of England" On the Culture and Commerce of Cotton in India.

ভাবার্থ—"ভারতের এখন পর্য্যন্ত অতুলনীয় বস্ত্রশিল্প এবং প্রায় তিন সহস্র বৎসরের এই নিতান্ত প্রার্থনীয় পণ্য, ইংলণ্ডের আধুনিক ও বিস্তৃত বস্ত্রশিল্প কর্ত্তৃক ভারতের বাজার হইতেই দূরীকৃত হইতেছে।"

বিলাতী মিলই যে ভারতের বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে ও এখন পর্য্যন্ত ক্রমাগত করিতেছে, তাহা দেশ ও বিদেশের সকলেই জানে। তথাপি সেই বিলাতী মিলকে ভারতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা কেন?

অনেকে উত্তর করিবেন—ভারতের প্রয়োজনীয় বস্ত্র হাতের তাঁতে যোগান সম্ভব নহে। আমরা এই যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, বিগত বৎসর (১৯০৪-৫ সালে) কার্পাস-বস্ত্র (যায় জামা, কোট, পেণ্টুলেন প্রভৃতির কাপড়)—

বিলাত হইতে আমদানী —————— ২২৯ কোটী গজ

দেশী মিলে প্রস্তুত —————— ৬৭ " "

দেশী হাতের তাঁতে (দেশী মিলের দ্বিগুণ-সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ)* —————— ১৩৪ " "

মোট ৪৩০ কোন গজের মধ্যে ৬+৯ =১৫ কোটী গজ বিদেশে রপ্তানী বাদে, অবশিষ্ট ৪১৫ কোটী গজ কার্পাস বস্ত্র এদেশে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব বৎসর, বিদেশীয় বস্ত্রের আমদানী পরিমাণ, গত বৎসর অপেক্ষা ২৬ কোটী গজ কম। গত বৎসর এই ২৬ কোটী গজ অধিক পরিমাণ কাপড় আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবার কোন কারণই নাই। সুতরাং এই অধিক পরিমাণ কাপড় আমরা প্রয়োজনীয় বস্ত্রের পরিমাণ হইতে বাদ দিতে পারি।

* সরকারী অনুমান যে অযৌক্তিক নহে তাহা পরে দেখান যাইবে।

২। ইহার পূর্ব্ব বৎসরও আমাদের বিলাস বুদ্ধি নিদ্রিত ছিল না। ইহার অনুরোধে আমরা যে অন্ততঃ ১০ কোটী গজ কাপড়ও আমদানী করিয়াছি ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

৩। দেশী ১৩৪ কোটী গজ কাপড়ের মধ্যে, আমরা বিলাসোপযোগী মিহি ধুতিই অনেক ব্যবহার করি। আপাততঃ ইহারও ১০ কোটী গজ কাপড় বাদে, আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের পরিমাণ করিতে পারি।

৪। দেশী তাঁতের কাপড় বিলাতী কাপড় অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী হয়; বিলাতী কাপড় ৫ মাস স্থায়ী হইলে, একখানি দেশী কাপড় অন্ততঃ ৬মাস স্থায়ী হয় ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং স্থায়িত্ব বিষয় বিবেচনা করিয়াও প্রয়োজনীয় বস্ত্রের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে।

সুতরাং ১৯০৪-৫ সালে ব্যবহৃত ৪১৫ কোটী গজ বস্ত্র হইতে

১ম কারণে—	২৬ কোটী গজ
২য় "	১০ " "
৩য় "	১০ " "
৪র্থ "	৬০ " "

মোট—১০৬ কোটী গজ বাদে অবশিষ্ট ৩০৯ কোটী গজ কাপড়ই আমাদের অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। উপরোক্ত হিসাবে যে কাপড় অতিরিক্ত বলিয়া বাদ দেওয়া গেল, প্রকৃত পক্ষে ইহার পরিমাণ আরও অধিক হইবে। দেশী মিলে যে ৬৭ কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন হয়, তাহার ৯ কোটী গজ বিদেশে রপ্তানী হয়, ও ৫৮ কোটী গজ কাপড় দেশে ব্যবহৃত হয়। যদি প্রচলিত দেশী মিলের কাপড় আর অধিক উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে আমাদের দেখিতে হইবে যে, অবশিষ্ট ২৫১ কোটী গজ কাপড় হাতের তাঁতে উৎপন্ন হইতে পারে কিনা।

১ম। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতে এখনও ২৭ লক্ষ লোক তাঁতে বস্ত্রবয়ন করে ও তাহাদের ২৭ লক্ষ সহচর বা যোগাড়দার আছে। পূর্ব্বে এদেশে আরও অনেক তাঁতি ছিল; তন্তুবায় শ্রেণী ব্যতীত, অপর শ্রেণীর লোকও বহুল পরিমাণে বস্ত্রবয়ন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ইহাদের অনেকে, অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; অনেকে অবলম্বন-বিহীন হইয়াছে, ও

অনেকে অপর পরিশ্রম সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। দেশী বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলন হওয়ায়, অনেকে আবার এই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। অতি অল্পদিন মধ্যে যে, বস্ত্রবয়নকারীর সংখ্যা অন্ততঃ দেড়গুণ হইবে, এরূপ অনুমান নিতান্ত ভ্রমাত্মক নহে। এখন দেশী তাঁতে ১৩৪ কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। তাঁতির সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য ইহার পরিমাণ অতি অল্পদিন মধ্যে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশও বর্দ্ধিত হইবে, ও তাহা হইলে ১৮০ কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন হওয়ার আশা অবৈধ হইবে না।

২য়। দেশীয় বস্ত্রের প্রচলন অধিক না থাকায়, তাঁতিরা এই কার্য্যে অধিক সময় নিযুক্ত থাকিত না। অনেক তাঁতিই এখন ২।৪ বিঘা জমী চাষও করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যাহারা দিন ৫।৭ ঘণ্টা তাঁতের কাজে নিযুক্ত ছিল, এখন দেখিতেছি, তাহারা উৎসাহ পাইয়া প্রায় ৮।১০ ঘণ্টা কাজ করিতেছে। তাহাদের তাঁত চলিলে, কৃষিকার্য্যের জন্য মজুর নিযুক্ত করিয়া, সম্বৎসর তাঁতের কাজেই নিযুক্ত থাকিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে; কেননা, বর্ষাকালে তাহাদের কৃষিকার্য্য করিতে হয়, কিন্তু এই সময়ই বস্ত্রবয়নের অতি উপযুক্ত সময়। সুতরাং এই উৎসাহজনিত অধিক কাপড়ের উৎপত্তিও, অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ অধিক বা বৎসরে অন্ততঃ ৫০ কোটী গজের ন্যূন হইবে না। তাহা হইলে এই হিসাবে মোট উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ ১৮০ + ৫০ = ২৩০ কোটী গজ হইবে।

৩য়। দেশীয় তাঁতে সাধারণতঃ যে কাপড় প্রস্তুত হইতেছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি, দরিদ্র শ্রেণীর ব্যবহার্য্য অত্যন্ত মোটা ও অবশিষ্ট অধিকাংশই, ভদ্র বিলাসীগণের উপযুক্ত মিহি। মিহিবস্ত্র যে খানি দুই দিনে উৎপন্ন হয়, তাহার স্থলে নিত্য-ব্যবহার্য্য অপেক্ষাকৃত মোটা কাপড়ের একখানি, অনায়াসে দেড় দিনে প্রস্তুত হইতে পারে। সুতরাং আমরা অধিক সংখ্যক নিত্য ব্যবহার্য্য কাপড় দেশী তাঁত হইতে লইলে, আরও ২১ কোটী গজ কাপড় অবশ্য পাইতে পারিব। সুতরাং এই হিসাবে, উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ ২৫১ কোটী গজ হইবে ও আমাদের প্রয়োজনীয় অভাব পরিপূর্ণ হইবে।

উন্নত ধরণের তাঁত প্রবর্ত্তিত হইলে, অনেক অধিক কাপড় উৎপন্ন হইবে, এবং আমরা যে পরিমাণে এই তাঁতের প্রচলন করিতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের প্রয়োজনীয় বাদে বিলাসোপযোগী বস্ত্র পাইবার, ও বস্ত্রের মূল্য হ্রাসের আশা করিতে পারিব। আমরা এক একটী কারণে উৎপন্ন বস্ত্রের

বৃদ্ধি পরিমাণের যে হিসাব দেখাইলাম, তাহা বাস্তবিক হিসাবে অনেক অধিক হওয়াই সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র এই হিসাবে পাইতে পারি কিনা, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকগণ বিশেষ বিবেচনা কিম্বা মফস্বলে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, আমাদের একটী যুক্তিও কাল্পনিক নহে। আমাদের দেশে অবলম্বন বিহীন লোকের সংখ্যা প্রচুর। "Nearly one hundred million of people of British India are living in extreme poverty". Pioneer. "বৃটীশ ভারতের প্রায় ১০ কোটী লোক ঘোর দারিদ্র্যে কাল যাপন করে।" সুতরাং এই কাজে পুনঃপ্রবৃত্ত লোকের সংখ্যা ২৭ লক্ষের অনেক অধিক হইতে পারে বলিয়াই আশা করা যায়। অন্ততঃ যাহাতে অনেক লোকই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে, সে জন্য আমাদেরও যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। আমরা দেশের লোককে এরূপ আবশ্যকীয় অপর অবলম্বন দিতে পারি না। দেশের ভদ্রলোক আন্তরিক উৎসাহ দেখাইলে, দেশের প্রয়োজনীয় বস্ত্র দেশী তাঁত হইতেই পাইবার জন্য যে এক দিনও আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে না, ইহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আমরা এত দিন এই শিল্পের উন্নতির জন্য একটুও চেষ্টা করি নাই। এখন সহসা অপরের দেখা দেখি, কল কারখানা আনাইয়া ইহার উন্নতি করিতে গেলে, তাহাতে বাস্তবিক উন্নতি কি অবনতি হইবে তাহা আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। প্রতিযোগিতায় মূল্য হ্রাস হয়; কিন্তু মিল আমদানী করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া, নিতান্ত অযৌক্তিক ও অসঙ্গত কিনা, তাহা আমাদের দেখা উচিত।

ভারতের সূতা ও কাপড়ের কলের সংখ্যা প্রায় ১৫০ দেড় শত। কাপড়ের কলগুলিতে কেবল মাত্র ৬৭ কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত হয়। এক একটি কাপড়ের কল স্থাপনে প্রায় ৮।১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এইরূপ একটি কাপড়ের কলে এক সহস্রের অধিক শ্রমজীবীর আবশ্যক হয় না, কিন্তু এই ৮।১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে, অন্ততঃ দশ সহস্র তাঁতির ও তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণ লইয়া অন্ততঃ অর্দ্ধ লক্ষ লোকের পুরুষানুক্রমের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এক জন তাঁতি উন্নত ধরণের তাঁতে, ছোট বড় কাপড়ে, দিন অন্ততঃ ১২ গজ বুনিতে পারিলেও, বৎসর দশ সহস্র তাঁতির দ্বারা প্রায় সাড়ে চারি কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত হইতে পারিবে, সুতরাং ১৫টি কল স্থাপনের প্রয়োজনীয় অর্থ দ্বারা সমস্ত দেশী মিলে উৎপন্ন ৬৭ কোটী

গজ কাপড় প্রস্তুত হইতে পারিবে, এবং ঐ অর্থে সাড়ে সাত লক্ষ লোকের অন্ন সংস্থানের পথ উন্মুক্ত হইতে পারিবে।

এক্ষণে সুতার সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক; কাপড়ের কলে সুতা ও কাপড় উভয়ই প্রস্তুত হয়। আমাদের চরকায় ও টাকুতে, পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় সকল সুতা প্রস্তুত হইত, কিন্তু এখন আর সে আশা নাই। এখনও, মিহি ও মোটা কতক সুতা উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি যৎসামান্য। দেশের লোক বিশেষ চেষ্টা ও স্বার্থ ত্যাগ না করিলে, কল কারখানা ব্যতিরেকে, দুই চারি বৎসর মধ্যে যে, দেশের প্রয়োজনীয় সুতা উৎপন্ন হইতে পারে না, আমরা সে কথা বলিতেছি না। আমরা আরও বলি, আমাদের সেই চেষ্টাই প্রার্থনীয়; কেন না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেশের লোককে বস্ত্র শিল্প ভিন্ন আমরা আর এমন প্রয়োজনীয় কোন অবলম্বনই দিতে পারি না। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের সে প্রবৃত্তি হইবে কি? এরূপ স্বার্থ ত্যাগের সঙ্কল্প আসিবে কি? যদি সে আশা না থাকে, তাহা হইলেই, আমাদের কতকগুলি সুতার কল স্থাপন করিতে প্রয়াসী হওয়া উচিত।

দেশীয় মিল গুলি হইতে, গত বৎসর প্রায় ৫৮ কোটী পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত হইয়াছিল, ও বিদেশ হইতে প্রায় ৩ কোটী পাউণ্ড সুতা আমদানি হইয়াছিল। দেশের চরকার উৎপন্ন সুতার পরিমাণের কোন হিসাব পাওয়া যায় না; তথাপি, ইহাতে উৎপন্ন সুতার পরিমাণ প্রায় ১৮ কোটী পাউণ্ড বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে *। মোট এই ৭৯ কোটী পাউণ্ড সুতার মধ্যে, ২৯ কোটী পাউণ্ড সুতা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল; অবশিষ্ট ৫০ কোটী পাউণ্ড সুতা হইতে, দেশে ৬৭+১৩৪=২০১ কোটী গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমাদের প্রয়োজনীয় মোট ৩০৯ কোটী গজ কাপড়ের জন্য ৭৭ কোটী পাউণ্ড সুতার প্রয়োজন হইবে। দেশীয় মিলেই ৫৮ কোটী পাউণ্ড ও চরকায় ১৮ কোটী পাউণ্ড, এখন দেশে মোট এই ৭৬ কোটী পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত হইতেছে, সুতরাং সুতার জন্য আমাদের অভাব কেন হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই সুতার রপ্তানি কতক পরিমাণে বন্ধ করিয়া দিলে, ও দেশী চরকায় অধিক সুতা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, সুতার অভাব একদিনের জন্যও হইবে না।

দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইতে পারে, তাহার রপ্তানির

---

* এই অনুমানের কারণ পরে প্রকাশিত হইবে।

ব্যবস্থা করাই দেশের ধনাগমের উপায়। রপ্তানি বন্ধ না করিবার জন্যই, আমরা দেশে সূতার কল স্থাপনের চেষ্টা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াছি।

দেশীয় মিলে যে সূতা উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশই মোটা। গত বৎসর দেশী মিলে —

১ হইতে ২৫ নম্বর	...	৫৩১৪ লক্ষ পাউণ্ড
২৬ " ৪০ "	...	৪৫৭ " "
৪০এর ঊর্দ্ধ "	...	১৩ " "

মোট ৫৭৮৪ লক্ষ পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল, ও বিদেশ হইতে,

১ হইতে ২৫ নম্বর	...	২৫ লক্ষ পাউণ্ড
২৬ " ৪০ "	...	২০০ " "
৪০এর ঊর্দ্ধ "	...	৫০ " "

মোট ২৭৫ লক্ষ পাউণ্ড সূতা আমদানী হইয়াছিল, অর্থাৎ দেশী মিলে প্রস্তুত প্রায় ৫৮ কোটী পাউণ্ড ও বিদেশ হইতে আমদানী কেবল মাত্র পৌনে তিন কোটী পাউণ্ড। (সূতার নম্বর অধিক হইলেই তাহা অধিক সূক্ষ্ম হয়)। ২৬ হইতে ৪০ নম্বরের সূতায় সাধারণ ব্যবহার্য্য অপেক্ষাকৃত মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়। ৫০এর ঊর্দ্ধ সংখ্যার সূতা হইতেই মিহি কাপড় প্রস্তুত হয়। এই অপেক্ষাকৃত মোটা ও মিহি সূতাই অর্থাৎ ২৬ হইতে ঊর্দ্ধ সংখ্যার সূতাই আমরা বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণে আমদানী করি। বিদেশ হইতে সূতার আমদানী প্রতি বৎসর কমিয়া যাইতেছে। গত বৎসরে ১৯০২—০৩ সাল অপেক্ষা প্রায় ৩৯ লক্ষ পাউণ্ড কম সূতা আমদানী হইয়াছে। দেশীয় মিলে মিহি সূতা উৎপন্ন করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা হইতেছে, ও প্রতি বৎসর ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে; সুতরাং অতি অল্প দিনেই আমরা দেশীয় মিল হইতে মিহি সূতা অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হইব। দেশী চরকায় ও টাকুতে যেরূপ মিহি সূতা উৎপন্ন হয়, মিলে এখনও সেরূপ মিহি সূতা উৎপন্ন হইতে পারে না। চরকা ও টাকু ব্যবহার অধিক হইলে, মিহি সূতার জন্য আমাদের চিন্তিত হইতে হইবে না।

আমাদের দেশে, হস্ত পরিচালিত তাঁতেই যে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র

উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা বিশদরূপে দেখাইবার জন্য আমরা চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু লোকের সংস্কার এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে সহজে ইহা পরিবর্ত্তিত করা অসম্ভব। তাঁহারা জানেন,দেশের তাঁতির সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে; পূর্ব্বে আমাদের দেশ হইতে বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইলেও, দেশের লোকের তখন বস্ত্রাভাব বিশেষ ছিল; দেশের লোক সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়াছে, সভ্যতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং কাপড়ের প্রয়োজনও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে।

দেশে পূর্ব্বে অনেক তাঁতি ছিল, তথাপি লোকে যে বস্ত্রাভাব অনুভব করিত, বিদেশে রপ্তানিই ইহার প্রধান কারণ। বিদেশীয় রপ্তানির মধ্যে, অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রই অধিক ছিল। দেশের ধনবান লোকেও সূক্ষ্ম বস্ত্রের ব্যবহার অধিক করিত। সে কালে এইরূপ একখানি বস্ত্র ৫০০৲ টাকায়ও বিক্রীত হইত, এবং এইরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্রে লাভও অত্যধিক ছিল। সেই জন্য, তখনকার অনেক তন্তুবায় ও বস্ত্র-ব্যবসায়ী বিশেষ ধনশালী হইয়াছিল; সুতরাং সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্যই অনেক লোক নিযুক্ত থাকিত; অনেক বিভিন্ন শ্রেণীর লোকও এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। কিন্তু, একখানি ঐরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র ৫।৬ মাসের ন্যূন সময়ে প্রস্তুত হইত না। অধিক সংখ্যক তন্তুজীবী বিদেশীয়গণের জন্য সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত থাকায়; দেশে পূর্ব্বে বস্ত্রাভাব ছিল, তখন চরকায় ও টাকুতে মোটা ও মিহি সকল রকম সূতা প্রস্তুত করিতে হইত। গৃহস্থগণ অনেক স্থলে সূতা প্রস্তুত করিয়া তাঁতিদিগকে বস্ত্র বয়ন করিতে দিত। তাহারা সূতা প্রস্তুত করিয়া যোগাইতে না পারিলে, বয়নের কার্য্যও বন্ধ থাকিত।

দেশের তাঁতির সংখ্যা হ্রাস, ও লোক-সংখ্যা এবং সভ্যতা বর্দ্ধিত হইলেও, অবলম্বন-বিহীন লোকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশীয় বস্ত্রের যদি প্রচলন হয় ও আমরা ইহার উন্নতি কল্পে মনোযোগী হই, তাহা হইলে, দেশের পূর্ব্ব সংখ্যক তন্তুবায় অপেক্ষা অনেক অধিক তন্তুবায় আমরা প্রস্তুত করিতে পারি। দেশের যে দশ কোটী লোক অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতেছে, তাহাদের এক কোটী লোককেও যদি আমরা বস্ত্র বয়ন ও সূতা কাটায় নিযুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে,৫৫ লক্ষ লোক দ্বারা যে ১৩৪ কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, এই এক কোটী অতিরিক্ত লোক দ্বারা, আমাদের প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট ১০৫ কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত করাইতে পারিব না কি?

ইহাই আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য নহে কি? এই এককোটী লোকের জীবনোপায়ের পরিবর্ত্তে, দেশে ১০০ কল স্থাপন করিয়া, ১ লক্ষের অনধিক লোক প্রতিপালনের চেষ্টা কি গর্হিত হইবে না?

কেহ কেহ বলিবেন, দেশে প্রতি বৎসর এই ৪৪ কোটী টাকার কাপড় আমদানী হইতেছে, তবে ২।১টি কাপড়ের কল স্থাপনে ক্ষতি কি? অনেকগুলি কাঁটা না ফুটিলে জীবন সংশয় হয় না; তাই বলিয়া, সাধ করিয়া কেহ একটি কাঁটাও আপনার অঙ্গে ফুটাইতে চাহে না। একটি মশার রক্ত শোষণে, জীবন সংশয় হয় না বলিয়া দংশন জ্বালা সুখপ্রদ নহে। যাহা দেশের বাস্তবিক ইষ্টপ্রদ না হইয়া বরং অনিষ্টকর তাহার প্রচলন কোনও ক্রমে যুক্তি-সিদ্ধ নহে।

সুতরাং দেশ হিতৈষীগণ কর্ত্তৃক বস্ত্র বয়নের মিল স্থাপনের চেষ্টা না হইয়া, তাঁতের সংখ্যার উন্নতি এবং চরকার অধিক প্রবর্ত্তনই নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত।

আমরা বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার বর্জ্জন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; সুতরাং দেশের অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি বিধানের প্রতিকূল, ৮।১০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশীয় বস্ত্র বয়ন কল কোন ক্রমেই ক্রয় করিতে পারি না।।

উন্নত ধরণের তাঁত ও চরকা দেশে প্রস্তুত করিলে, দেশের টাকা, অধিকাংশই দেশেই থাকিয়া যাইবে, ও সর্ব্ববিষয়েই দেশের লোকের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

কল কারখানা স্থাপনে, দেশের সামাজিক অনিষ্ট সাধিত হয় কিনা, ইহাও আমাদের বিচার্য্য। একটি কাপড়ের কলে প্রায় সহস্র শ্রমজীবীর প্রয়োজন হয়; সুতরাং নানা স্থানের লোক আনাইয়া কলের কাজ করাইতে হয়; তাহারা স্ত্রী, পুত্র ছাড়িয়া, বিদেশে আসিয়া, কিরূপে জীবন নির্ব্বাহ করে, তাহা কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরের নিকটস্থ কোন একটি মিলের মজুরদিগকে দেখিলেই জানা যাইতে পারে। ইহারা প্রায়ই উদ্ধত-স্বভাব, বিলাসপ্রিয়, সুরাপায়ী, লম্পট ও ঋণ-দায়গ্রস্ত। দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, সহস্র-সংখ্যক এইরূপ একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করা অপেক্ষা, এই টাকায়, স্ত্রী-পুত্র-পালন-তৎপর, সামাজিক বন্ধনের অন্তর্ভুক্ত, মিতব্যয়ী, বিনয়ী ও সৎস্বভাব-সম্পন্ন দশ সহস্র সংখ্যক গৃহস্থের জীবনোপায়ের বিধান করা কি সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর নহে?

কাপড়ের কল স্থাপন হইলেই, ইহার স্থায়িত্ব যে নিঃসন্দেহ, তাহা যেন কেহই মনে করিবেন না। বঙ্গদেশে পূর্ব্বে ২।১টী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। বোম্বাই, আহাম্মেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কাপড়ের কলগুলির অবস্থাও এক সময়ে শোচনীয় হইয়া আসিয়াছিল। আমরা দেশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থ, এই স্থায়িত্ব বিষয়ে অনিশ্চিত কার্য্যে ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইব কেন?

কেহ কেহ বলিবেন, এরূপ ভয় করিতে গেলে, কোন কার্য্যেই অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু, যখন ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে বরং দেশের অনিষ্টকর ও ইহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত বলিয়া বুঝি, তখন দেশহিতৈষিতার ভাণে এ অপব্যয়ে অগ্রসর হইব কেন? ইহার জন্য যে অর্থ, চিন্তা, পরিশ্রম প্রভৃতি আবশ্যক, তাহা দেশের বাস্তবিক ও নিশ্চিত মঙ্গলবিধানে প্রযুক্ত হওয়াই উচিত।

সকলেই জানেন, বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে ভাল কাপড় প্রস্তুত হয় না। বায়ুমণ্ডলে কতক পরিমাণে আর্দ্রতা না থাকিলে কাপড়ের কলের কাজ হয় না। বায়ু শুষ্ক হইলে সূতা ছিঁড়িয়া যাইতে থাকে, সেই জন্য সমুদ্র-তীর ব্যতীত অপর স্থানে কাপড়ের কল ভাল চলে না। ম্যাঞ্চেষ্টারের বায়ুমণ্ডল স্বাভাবিক আর্দ্র অথচ উষ্ণ নহে, সেই জন্য সেখানে কাপড়ের কল এরূপ সৌভাগ্যশালী। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল কাপড়ের কল আছে, সেখানে জানালা দরজা প্রভৃতি বায়ু প্রবেশ পথগুলি ও কারখানার মেজে জলসিক্ত করিয়া রাখিয়া, কৃত্রিম উপায়ে বায়ুর আর্দ্রতা সৃষ্টি করিতে হয়; ইহাতে শ্রমজীবীগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটে, সুতরাং তাহারা বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস বিশ্রাম বা চাষের কাজের জন্য দেশে চলিয়া যায়। এই শ্রমজীবীগণের অনেকেই অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয়। ৪০ বৎসরই অধিকাংশের পরমায়ু এবং ৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধ প্রায় কেহই বাঁচে না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা অবশ্য কর্ত্তব্য?

স্বার্থের প্রেরণায় দেশ মধ্যে অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ও আরও অনেকগুলি হইবে। রাজপুতানা বেওয়ারের কৃষ্ণা মিল কোম্পানি, ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, আর একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলে আমাদের দেশের টাকা দেশেই থাকিবে; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেও দেশের ততদূর ক্ষতি হইবে না, কারণ তজ্জনিত নিরুৎসাহ দেশব্যাপী হইবে না। আমাদের দেশের বাস্তবিক হিতাকাঙ্ক্ষীগণ কোন কার্য্যে নিষ্ফল না হন ও তাঁহাদের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, অর্থব্যয়

প্রভৃতি, দেশের নিতান্ত কল্যাণকর কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া স্বার্থক হন, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

রেলী ব্রাদার্স প্রভৃতি কয়েকটী কোম্পানীও এ দেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক হইয়াছে; এই সকল কোম্পানির অগাধ মূলধন। ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের কল কৃতকার্য্য হইবে কিনা, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ। কল কারখানার কার্য্যে ইয়ুরোপীয়গণ বিশেষ পারদর্শী। ভারতীয় কলের অধিকারীগণ, এরূপ কার্য্য শিক্ষা করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হন নাই, এমন কি, কলের বিভিন্ন যন্ত্রগুলির নামও জানেন না। এরূপ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন লোকের দ্বারা পরিচালিত কার্য্যের ফলও উপযুক্ত রূপই হইতেছে। এদেশের শ্রমজীবীগণের বেতন বিলাতের শ্রমজীবী অপেক্ষা অনেক কম; বিলাতের অপেক্ষা এদেশের মিলে অধিক ঘণ্টা সময় কাজ হয়; এ দেশের তুলাই অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়, সুতরাং তুলার জাহাজ ভাড়াও লাগে না; অথচ উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা অধিক। কিন্তু উপরোক্ত কারণে দেশী মিল জাত বস্ত্রের মূল্য অনেক কম হওয়াই উচিত! দেশীয় মিলে উৎপন্ন বস্ত্র বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট; অবশ্য দেশীয় তুলার নিকৃষ্টতার জন্য বস্ত্রও ভাল হইতেছে না। কিন্তু তাঁহারা চেষ্টা করিলে, দেশে অনায়াসে এতদিনে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদন করাইতে পারিতেন; অপর দেশীয় লোক এতদিন ইহাতে এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিত না। এদেশে যে কল গুলি ব্যবহৃত হয় তাহা উৎকৃষ্ট ধরণের; অথচ বিলাতে ব্যবহৃত কল অপেক্ষা এই কলগুলির স্থায়িত্ব কাল অনেক কম। অনভিজ্ঞ লোক দ্বারা চালিত হওয়ার জন্যই এই অসুবিধা গুলি ঘটিতেছে।

রেলী ব্রাদার্স কোম্পানি কিম্বা অপর যে কেহই এ দেশে কাপড়ের কল স্থাপনে উদ্যোগী হউন, দুই বৎসরের কম সময়ে একটি কলের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। এই দুই বৎসর মধ্যে, আমরা যাহাতে দেশব্যাপী এই উৎসাহের আশ্রয়ে, দেশে উন্নত ধরণের তাঁত, চরকা প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত করিয়া, হস্ত পরিচালিত তাঁতেই কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হই, সে জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। * এখন আর এক দিনও বৃথা

* দেশে কবে মিল স্থাপিত হইবে বলিয়াও, সে আশায় লোক কাপড়ের ব্যবহার বন্ধ করিয়া থাকিতে পারিবে না; বাজারে দেশী তাঁতের বা দেশী মিলের কাপড় না পাইলেই, বিলাতী কাপড় লইতে বাধ্য হইবে; তখন আবার তাহাদিগকে সহজে নিরস্ত করিতে পারা যাইবে না।

কালক্ষেপ করিবার সময় নাই। মিলের কাপড়ের জন্য যাহাতে লোকের আগ্রহ কম হয়, সে জন্যও সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব ও মান্দ্রাজের অধ্যক্ষ চ্যাটার্টন সাহেব বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, হস্ত পরিচালিত তাঁত কলের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম; ইয়ুরোপের অনেক দেশে এরূপ তাঁত কলের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং আমাদের দেশেও ইহা কোন কারণে অসম্ভব নহে। আমাদের উৎসাহ অভাবেই আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের দুর্দ্দশা হইয়াছে। কল প্রবর্ত্তনে এই শিল্প উন্নতি লাভ না করিয়া, আরও অধোগতি প্রাপ্ত হইবে, এবং বহুলোকের অন্ন সংস্থানের পথ বন্ধ করিবে। সুতরাং কলের কাপড়ের ব্যবহার আমাদের সর্ব্বাংশেই পরিত্যাজ্য।

আপাততঃ আমরা দেশী মিল জাত কাপড় ব্যবহারে এই বিপুল উৎসাহ দেখাইয়া লাভবান হইতেছি কিনা, তাহাও দেখা উচিত। দেশে মিলগুলি হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১০॥০ সাড়ে দশ কোটী টাকার কার্পাস বস্ত্র ও সূতা বিদেশে রপ্তানী হইতেছিল; আমরা দেশী মিলের কাপড় ব্যবহার করায়, যদিও মিলাধ্যক্ষগণ রাত্রি দিন কল চালাইয়া কিছু অধিক কাপড় প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তথাপি এই রপ্তানীর পরিমাণ অনেক কমিয়া আসিতেছে, ও বিদেশ হইতে যে টাকা আমদানী হইতেছিল, সেই টাকার পরিবর্ত্তে দেশের টাকা দেশে থাকিতেছে, ও আমাদের ইহাতে প্রায় কিছুই লাভ হইতেছে না। তবে, ইহাতে আমাদের প্রতিজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালিত হইতেছে, এবং তাহাও নিতান্ত প্রার্থনীয়। সুতরাং দেশী তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্রের যতদিন আধিক্য না হয়, ততদিন আমাদের বিদেশ হইতে ধনাগমের পথ বন্ধ রাখিতে হইতেছে। সেই জন্য, আমাদের দেশী তাঁতের উন্নতি বিষয়ে যত বিলম্ব হইবে, ততই আমাদের দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

বিলাতে প্রথম কল স্থাপনের সময়ও অনেক প্রতিবাদ হইয়াছিল; এমন কি, দেশের মজুরগণ কলের প্রবর্ত্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ভাবিয়া, কলগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল; কিন্তু নানা কারণে তাহাদের আপত্তি সফল হয় নাই। এ প্রবন্ধে সে কারণ গুলির বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থানাভাব। এক্ষণে এই মাত্র বলিতে পারি যে, বিলাত ও ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন। বস্ত্র শিল্পই যদি বিলাতের লোকের প্রধান অবলম্বন হইত, অপর অবলম্বনের পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইত, যন্ত্রগুলি সমস্তই

বিদেশ হইতে আনাইতে হইত, তাহাদের বাণিজ্য জাহাজ গুলির পৃথিবীময় ভ্রমণ করিবার বাধা থাকিত, যদি যুদ্ধ জাহাজ এই বাণিজ্য পোতের রক্ষণা-বেক্ষণে নিযুক্ত না থাকিত, তাহা হইলে এই প্রতিবাদ নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হইত। বিলাতের মজুরগণের নৈতিক জীবন কল কারখানা প্রতিষ্ঠায় যে উন্নত হয় নাই, ইহাও অনেকে জানেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কল কারখানা স্থাপনে আমরা বিরোধী নহি। কিন্তু যে কার্য্যগুলি গৃহস্থগণের অবশ্য অবলম্বনীয়, বা তাহাদের অনায়াস সাধ্য, সেই শ্রেণীর কার্য্যগুলির জন্যই কল কারখানা স্থাপনে বিরোধী। যাহা কল কারখানা ব্যতিরেকে আমাদের সাধ্য নহে, যাহাতে সমাজের স্বল্প ক্ষতির আশঙ্কা থাকিলেও, পরিণাম ফল যথেষ্ট উন্নতি-বর্দ্ধক, এরূপ বহুবিধ নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিল্প বিষয়ে মন না দিয়া, যাহাতে দুই চারি কোটী পরিমাণ লোকের অন্ন সংস্থানের পথ সংকীর্ণ হয়, সেরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা কোন হৃদয়বান লোকেরই অনুমোদিত হইতে পারে না।

একটী সামান্য সূচের জন্য আমরা বিলাতের মুখাপেক্ষী, আর বিলাত হইতে মিল আনাইয়া যে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারিব, সে আশা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক।

(ক্রমশঃ)

তাঁত সংবাদ।

বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্‌ডার্স্‌ এ্যাসোসিয়েশন—পার্ক ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ইহারা তিন প্রকার তাঁত লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষার ফল যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

দি ইংলিশ লুম (দিহাটারসলি, এণ্ড সন্‌স্‌)।—এই লুমে আপাততঃ প্রত্যহ দশ ঘণ্টা পরিশ্রমে চারিখানি পাঁচ গজা কাপড় প্রস্তুত হয়; তবে বয়নকারী বিশেষ অভ্যস্থ হইলে, ছয়খানি পর্য্যন্ত কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাতে মোটা সূতার কাপড়ই ভাল হয়। দশ হইতে ত্রিশ নম্বর সূতার কাপড় মিনিটে আড়াই ইঞ্চি অবধি বোনা হইতে পারে। ৪০নং সূতারও কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু সূতা ছিঁড়িয়া যায়; ৪০নং সূতা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর

কাপড় এ লুমে বয়ন করিবার একেবারেই সুবিধা হয় না। এই লুম লৌহ নির্ম্মিত, ইহাতে পায়ে এবং হাতে কাজ করিতে হয়। ইহার কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে লৌহের কারখানা ব্যতীত মেরামত অসম্ভব। মূল্য ২০০৲ টাকা।

জাপানী লুম।—ইহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত; দৈনিক ৯ ঘণ্টা পরিশ্রমে তিনখানি ৫ গজ × ৪৪ ইঞ্চি কাপড় হইতেছে। কারিকর অভ্যস্থ হইলে পাঁচখানি পর্য্যন্ত বয়ন করিতে পারে। ইহাতেও ৪০নং সূতা অবধি সহজে বয়ন করা যাইতে পারে; সূক্ষ্ম সূতার কাপড় প্রস্তুত করা ইহাতেও তত সুবিধা নহে। ইহার কল অত্যন্ত সহজ, সামান্য সূত্রধরেও মেরামত করিতে পারে। মূল্য ১৫০৲ টাকা।

ফ্লাই শাটল লুম।—ইহাও কাষ্ঠ নির্ম্মিত; কল অতি সহজ; দৈনিক নয় ঘণ্টা পরিশ্রমে একজোড়া কাপড় বয়ন হইতে পারে। ইহাতে সূক্ষ্ম এবং মোটা উভয়ই বয়ন হইতে পারে। মূল্য ৫০৲ টাকা।

হ্যাভেল এবং চ্যাটার্টন সাহেবেরা বলেন,—ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ল্যাণ্ড্‌হোল্‌ডার্স্‌ এ্যাসোসিয়েশন্‌ হইতে এই সকল লুমে বয়ন কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্কুল খোলা হইবে। এক মাস কি দেড় মাসে যে কেহ এই কার্য্যে শিক্ষিত হইতে পারেন। শিক্ষার্থীগণ এই এ্যাসো-সিয়েশনের নিকট আবেদন করিয়া নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিতে পারেন।

সিমুলিয়া হ্যাণ্ড লুম ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোং, ৩৬নং কৃষ্ণ সিংহের লেন, কলিকাতা।—ইঁহারা ফ্লাইশাটল লুম প্রস্তুত করিয়া বয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, ও উৎপন্ন কাপড় বিক্রয় করিতেছেন। প্রত্যেক লুমের দাম ৫০৲ টাকা। যে কেহ বারটা হইতে তিনটার মধ্যে গমন করিয়া, ইহার কার্য্যাদি দেখিয়া আসিতে পারেন। এখানে দৈনিক ৮।৯ ঘণ্টা পরিশ্রমে একজোড়া ৫ গজ কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। ইঁহারা সূতা রং করিবারও একটী কারখানা খুলিয়াছেন।

গ্রেষ্ট্রীটে গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্লাইশাটল লুম প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন এবং বয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এ লুমেও দৈনিক একজোড়া কাপড় প্রস্তুত হয়। লুমের মূল্য ৪০৲ টাকা।

৬নং বৃন্দাবন বসুর লেন, হোগোলকুঁড়িয়া, কলিকাতা।—জহরলাল ধর এক প্রকার ফ্লাইশাটল লুম প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন।

৬নং ব্যাপারীটোলা লেন, কলিকাতা নিবাসী ভূতপূর্ব্ব রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীদীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক প্রকার নূতন তাঁত প্রস্তুত করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়াছি লুধিয়ানা হইতে লুম ম্যানুফ্যাকচ্যারিং কোম্পানি জাপানী তাঁতের অনুরূপ এক প্রকার তাঁত প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

স্বদেশী শিল্পপ্রসঙ্গ।

রেশমী এবং পশমী কাপড়।—লুধিয়ানা আসাউসা কোং, লুধিয়ানা, পঞ্জাব। ইঁহারা বিবিধ শ্রেণীর সাধারণ ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আর, সি, বি এণ্ড কোম্পানী, উজান বাজার গৌহাটী-আসাম।—ইহারা নানাপ্রকার এণ্ডি এবং মুগা ধুতি, সাটী এবং চাদর মফস্বল হইতে প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। কানপুর, উলেন মিলস্ কোং।—নানাবিধ পশমী বস্ত্র, গেঞ্জী, মোজা, কম্বল, লুই, প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সামেদ সা এণ্ড সন্‌স, শ্রীনগর, কাশ্মীর।—ইঁহারা নানাপ্রকার পশমী গাত্রবস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। শম্ভুনাথ ও রঘুনাথ দাস, গোল্ডেন টেম্পল, অমৃতসর।—ইহারা কার্পেট, মলিদা, পট্টু, কাশ্মিরী এবং নানাবিধ কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যও প্রস্তুত করিয়া খুচরা এবং পাইকারী বিক্রয় করিয়া থাকেন। বেঙ্গল সিল্ক কোং, বহরমপুর।—ইঁহারা নানাবিধ রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

খেলিবার ফুটবল।—নন্দী এবং বিশ্বাস, ৬৮নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ইঁহারা দেশী কারিকরদ্বারা দেশীয় ফুটবল তৈয়ারি করাইতেছেন। মূল্যও সুলভ। যদি ফুটবল খেলিতেই হয়, আশা করি, ছাত্রবৃন্দ ইঁহাদের ফুটবল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

ছুরী কাঁচি।—প্রেমচাদ মিস্ত্রী, কাঞ্চননগর, বর্দ্ধমান।—ইনি বহুদিন হইতে ছুরী কাঁচি প্রস্তুত করিতেছেন। ইহার প্রস্তুত ছুরী কাঁচি এবং ডাক্তারি যন্ত্রাদি বিলাতী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; অথচ বিলাতী অপেক্ষা সুলভ। কিন্তু ইঁহার কারখানা উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অতি অল্প। আশা

করি, প্রেমচাঁদ বাবু কার্য্য বিস্তৃতি লাভ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবেন। ইণ্ডিয়া নাইফ কোং, সাঁশপুর পোঃ, বর্দ্ধমান। ইঁহারা ছুরী,কাঁচী, ক্ষুর প্রস্তুত করিয়া বেশ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। দ্রব্যের মূল্য বিলাতীর সহিত তুলনায় সুলভ, অথচ কার্য্যকারিতা এবং দৃশ্যও মন্দ নহে। দেশের লোকের ইঁহাদিগের উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

এলোপ্যাথিক ঔষধ।—বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যালওয়ার্কস লিমিটেড, ৯১নং অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা।—ইঁহারা অতি প্রশংসার সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতানুযায়ী যন্ত্রাদির সাহায্যে নানাপ্রকার এলোপ্যাথিক ঔষধ ও এসিড প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন; সাধারণের ইঁহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সুগন্ধি দ্রব্যাদি—এইচ বসু, পারফিউমার, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।—ইঁহারা বহুদিন হইতে নানাপ্রকার এসেন্স প্রস্তুত করিয়া সুখ্যাতির সহিত বিক্রয় করিতেছেন। পি, এম বাগ্‌চি এণ্ড কোং, কেমিকেল ওয়ার্কস, ৩৮নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।—ইঁহারা নানা-প্রকার গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। মতিলাল বসু এণ্ড কোং, ১২২নং পুরাতন চিনাবাজার ষ্ট্রীট।—ইঁহারা বিবিধ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

লিখিবার এবং ছাপিবার কালী।—এ, এল, রায়, হেড আফিস ও কারখানা, বারোয়ারিতলা রোড, বেলিয়াঘাটা।—ইঁহারা লিখিবার ও ছাপিবার কালী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং, ৩৮ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট।—ইঁহারা লিখিবার কালী প্রস্তুতকারক বলিয়া বিখ্যাত। পারিজাত এজেন্সী, ১৮নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট।—ইঁহাদের সারস মার্কা লিখিবার কালী বাজারে বেশ কাট্‌তি হইয়াছে।

জুতার কালী, ব্ল্যাকো, ব্রক্কো।—সেন ব্রাদার্স, তাঁতীবাজার ঢাকা।—কেদারেশ্বর সেন নামক একটী ছাত্র, সেন ব্রাদার্স নাম দিয়া জুতার কালী ব্রক্কো, ব্ল্যাকো প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। আশা করি, সাধারণে বিশেষতঃ ছাত্রসমাজ ইঁহাকে উৎসাহ দানে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইনি কনডেন্স্‌ মিল্ক ও গাটাপার্চার চিরুণি প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এইচ, কে, বসু, সিকদারবাগান ষ্ট্রীট কলিকাতা।—ইনিও ইম্পিরিয়াল ক্রিম, ও ইম্পিরিয়াল ব্ল্যাকো প্রস্তুত করিয়াছেন।

তালা চাবি।—দাস কোং, চিৎপুর লক্‌ওয়ার্কস্ টাউন আফিস, ৯৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইঁহাদের নির্ম্মিত তালা চাবি বিলাতের সমকক্ষ। ঘোষ দাস কোং, ৪২।১ লকগেট রোড, কলিকাতা। ইঁহাদের তালা চাবিরও বেশ সুখ্যাতি আছে। বেহারি লাল ঘোষ, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইঁহার প্রস্তুত তালা চাবি ও অনেকের নিকট পরিচিত।

দিয়াশলাই।—বাবু ডি, এন্ কর্ম্মকার, ৬নং হলধর বর্দ্ধনের লেন, কলিকাতা।—পেষ্ট বোর্ড কাগজের দিয়াশলাই প্রস্তুত করিয়াছেন ও ইঁহার প্রণালী শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন।

শঙ্খ নির্ম্মিত দ্রব্য।—ঢাকায় নানাবিধ সুন্দর শঙ্খ নির্ম্মিত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মেদিনীপুর, সুজাগঞ্জেও শাঁখার বালা, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিবিধ শিল্প।—কটকের মিষ্টার এম্, এস্, দাস পরিচালিত কারখানায় হস্তী দন্ত, শৃঙ্গ, এলুমিনিয়ম প্রভৃতি নির্ম্মিত নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

দেশী সিমেণ্ট।—দি গ্রেট ইষ্টারণ ট্রেডিং কোং, সিমেণ্ট বিক্রয় করিতেছেন। মূল্য সুলভ, সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হস্তীদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্য।—হরে কৃষ্ণ ভাস্কর, খাগড়া পোঃ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ইঁনি নানাবিধ খেলনা, দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। দুর্গাদাস ভাস্কর, বহরমপুর, কালিতলা, খাগড়া পোঃ, মুর্শিদাবাদ। নানাপ্রকার বোতাম পুতুল, খেলনা, প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

শ্যামাচরণ দে, সোমপাড়া, বজ্রযোগিনী। ইনিও নানাপ্রকার ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুত করিয়াছেন; মূল্য সুলভ।

লিখিবার নিব।—হরিচরণ কর্ম্মকার, রহমতপুর, বরিশাল। ইঁনি নিজ হস্তে নিব কাটা কল প্রস্তুত করিয়া নিব প্রস্তুত করিতেছেন।

সাবান।—বেঙ্গল সোপ ফেক্টরী, ৬৪।১, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দি বুল বুল সোপ ফেক্টরী, ঢাকা। ইঁহাদের কারখানাতে ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযুক্ত সাবান প্রস্তুত হইতেছে।

ষ্টীল ট্রাঙ্ক।—শ্রীজনকী সাহা স্বদেশী ষ্টীল ট্রাঙ্ক ম্যানুফ্যাক্‌চ্যারিং কোং, কারখানা, জিয়াগঞ্জ পোঃ, মুর্শিদাবাদ। ষ্টীল ট্রাঙ্ক, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। জে, এন, ব্যানার্জি, মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইনি ষ্টীল ট্রাঙ্ক প্রস্তুত করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ট্রাঙ্ক ম্যানুফ্যাকচ্যারিং কোং জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ। ইহারা ইস্পাতের নানা প্রকার বাক্স, ট্রাঙ্ক প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করেন।

খাগড়ার বাসন।—ঋষিকেশ কুণ্ড, পোঃ খাগড়া," মুর্শিদাবাদ। "আইস্-প্রুফ গেলাস প্রভৃতি উত্তম উত্তম বাসন প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

বাতি।—আসাম অয়েল কোং লিমিটেড, দিগবই পোঃ, আসাম। ইঁহারা নানাপ্রকার বাতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

বিস্কুট।—কে, সি, বসু, শ্যামবাজার, কলিকাতা। ভি, এস, ব্রাদ্রার্স, ৪১। ৪২, চাষা-ধোপা পাড়া, কলিকাতা। হিন্দু বিস্কুট ফ্যাক্‌টরী, কৈসারবাগ লক্ষ্ণৌ। ইঁহারা বিস্কুট প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

দেশী কাপড়ের হাট।—হাওড়ার হাট, উত্তর পাড়া, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের হাট। চেৎলা, রাখাল দাস আঢ্যের হাট। কলিকাতা, বৌবাজারের হাট।

দেশীবস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য প্রাপ্তির স্থান।—ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস লিমিটেড, ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট। কে, ধি সেন এণ্ড কোং, মনোহর দাসের ষ্ট্রীট। স্বদেশী বস্ত্রালয়, ৩৭২নং চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। ন্যাসান্যাল এজেন্সী, বরিশাল। দি বেহার স্বদেশী কোং লিমিটেড, ভাগলপুর। বিশ্বম্ভর এজেন্সী, ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। স্বদেশী বাজার, ১২৯।১।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পাঁড়ে ব্রাদার্স, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশী তুলট কাগজ।—বৈদ্যনাথ সাহা, ৪৪নং মনোহর দাসের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ক্রমশঃ

৩০শে আশ্বিন।

বিগত ৩০শে আশ্বিন বাঙ্গালার ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন। সমগ্র বঙ্গবাসীর ইচ্ছা, অনুনয় ও বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া, লর্ড কর্জ্জন বঙ্গভূমিকে দ্বিখণ্ড করাতে, সমগ্র বঙ্গবাসী সন্তপ্ত; কিন্তু আবার এই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ব্যপদেশে, তাঁহারা যে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য হিন্দু মুসলমান সকলেই উৎফুল্ল-হৃদয়। ৩০শে আশ্বিন প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া

যে দৃশ্য দেখা গিয়াছে, তাহা অতি বৃদ্ধেরাও কখন চক্ষে দেখেন নাই; চক্ষে দেখা কি, কেহ কখন কল্পনায়ও অনুভব করেন নাই। অসংখ্য বিপণি-শ্রেণী-শোভিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহরটীতে, কে বলিবে কখনও ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় লোকাকীর্ণ বাজারগুলি একবারে জনমানব শূন্য ও প্রায় পরিত্যক্ত। পুলিস প্রভুরা কতকগুলি দোকান খোলাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেও, সফল হন নাই। রাস্তায় পঞ্চমবর্ষীয় শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া, অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, সকলেই নগ্নপদে পূত-সলিলা গঙ্গাভিমুখে ধাবিত; আর মুখে প্রাণ-মন-মাতান "বন্দে মাতরং" ধ্বনি। গাড়োয়ানগণও আজ যেন স্বদেশ প্রেমে আত্মহারা হইয়া, সকলে এক জোটে কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তারপর, রাখী বন্ধন। সে দৃশ্যের আর কি বর্ণনা করিব! লক্ষপতি যখন নিরন্ন ভিক্ষাজীবীর হস্তে সাদরে রাখী বাঁধিয়া দিতেছেন, সে দৃশ্য দেখিয়া, কার সাধ্য আনন্দাশ্রু সম্বরণ করে। হিন্দু যখন বৃদ্ধ মৌলবী সাহেবের হস্তে সযত্নে রাখী বাঁধিয়া দিতেছেন, আর বৃদ্ধ সস্নেহে হিন্দুকে আলিঙ্গন করিতেছেন, সে দৃশ্য দেখিয়া কোন্ বঙ্গসন্তানের হৃদয় আনন্দে নৃত্য না করে?

তৃতীয় দৃশ্য, ২৯৪নং সারকুলার রোড। দ্বিপ্রহর অতীত হইতে না হইতে সকলের মুখে এক কথা—"মহাশয় সারকুলার রোড কোন দিকে?" "ফেডারেশন হল কোথায় স্থাপিত হইতেছে?" সেখানে, পঞ্চদশ সহস্র স্বদেশবাসীর সম্মুখে, মৃত্যু-শয্যা হইতে আনীত, মহানুভব আনন্দমোহন বসু। কি স্বার্থত্যাগ! স্বদেশ-প্রীতির কি প্রোজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি! সেই ক্ষীণ কণ্ঠোচ্চারিত সামান্য সংখ্যক মাতৃপূজামন্ত্রে পাষাণও গলিয়াছিল; সেই রুগ্নহৃদয়-রচিত, উৎসাহপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষা প্রত্যেক অন্তরেই আশার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। আজ এই ২৯৪নং সারকুলার রোডে "জাতীয় সম্মিলন মন্দিরে"র ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। আজ বোধ হয় বঙ্গবাসীর নবযুগ আরম্ভ হইল।

চতুর্থ দৃশ্য। সম্মিলন মন্দির হইতে রায় পশুপতি নাথ বসু বাহাদুরের বাটীর পথ। কি বিপুল জনস্রোত; কেবল অগণ্য মস্তক শ্রেণী, সকলেই বিপুল উৎসাহে যেন আত্মহারা, স্বদেশ প্রেমে যেন উন্মত্ত; কিন্তু সে উন্মত্ততায় উপদ্রব নাই; প্রেমোন্মাদে উপদ্রব থাকে না। তারপর, রায় পশুপতি নাথ বসু বাহাদুরের বাটী। বিনাহ্বানে, অযাচিত দান; সে দানে কি অদৃষ্টপূর্ব্ব আগ্রহ! প্রতিবন্ধকে কি হতাশ্বাস! আজ, দরিদ্রগণের শ্রমার্জ্জিত ধনে, জাতীয় ধন-

ভাণ্ডারে প্রথম ধনাগম হইল; এ ধন যেন অক্ষয় হয়। যথার্থ সহায় যে কি, তাহা এই দরিদ্রগণের দানলালসা যেন, আপামর সাধারণের অন্তরে অন্তরে অনুভূত করাইয়া দেয়। আর, সেই সঙ্গে মাতৃভূমির প্রধান সেবক শ্রীসুরেন্দ্র নাথের জয়গীতি; তাঁহার পাদস্পর্শের জন্য ব্যাকুলতা। ধন্য সুরেন্দ্র নাথ! তুমি এই সুদীর্ঘকাল স্বদেশবাসীর চিত্তভূমি কর্ষিত করিয়া, তাহাতে যে অনুরাগ বীজ বপনে আন্তরিক পরিশ্রম করিয়াছিলে, এতদিনে সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে; এখন তাহা শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট, সুফলপ্রসূ তরুবররূপে পরিশোভিত হইবার আশা হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

তেঁওতা গ্রামের জমিদার রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম গোলার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। অজন্মা বা দুর্ভিক্ষ হইলে প্রজাগণের অন্নকষ্ট নিবারণার্থ এই গোলার সৃষ্টি। প্রত্যেক অবস্থাপন্ন প্রজা স্বেচ্ছানুসারে যে পরিমাণ ধান্য প্রদান করে তাহাই একত্র সংগৃহীত করা হয়। তদনন্তর যে প্রজার অভাব হয়, এই সংগৃহীত গোলাজাত ধান্য হইতে তাহাকে ঋণ দেওয়া হয়। যখন সে তাহা পরিশোধ করে তখন নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ স্বরূপ অতিরিক্ত ধান্য তাহাকে জমা দিতে হয়। এই নিয়মে প্রতি বৎসর গোলার ধান্য বাড়িতে থাকে। এই গোলার কার্য্যভার কতকগুলি মাতব্বর প্রজার উপর ন্যস্ত থাকে। পার্ব্বতী বাবুর উদাহরণ প্রত্যেক জমিদারেরই অনুসরণ করা উচিত।

কলে শিক্ষা। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাপড়ের কলগুলির সত্বাধিকারীরা তাঁহাদের কলে চারিজন কৃতবিদ্য (বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী) বঙ্গীয় যুবককে বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত সাদরে আহ্বান করিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয়ে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মাননীয় জে, চৌধুরী মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিবেন।

ম্যানচেষ্টারের ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র মিঃ সরজ কুমার দত্তকে তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত

করিবার অধিকার দিয়াছেন। ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ প্রবেশাধিকার মঙ্গলজনক সন্দেহ নাই।

ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী বাহাদুর, মিঃ ডবলিউ, টি, গ্রীফিতস্ সাহেবকে, বঙ্গীয় খনিজবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেষ্টা স্বরূপ নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অবস্থিতি করিবেন। তিনি গত ১৪ই অক্টোবর ভারতযাত্রা করিয়াছেন।

এই স্বদেশী আন্দোলনে মাড়োয়ারীগণ বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা অঙ্গীকারমত গত বিজয়ার দিন বস্ত্র আমদানীর জন্য কোন নূতন চুক্তি করেন নাই। এজন্য তাঁহাদের নিকট সমগ্র বঙ্গবাসী কৃতজ্ঞ।

"স্বদেশী"র উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠান পত্রে আমরা "স্বদেশী"র উদ্দেশ্য ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। বাঙ্গালায় কতকগুলি মাসিকপত্র আছে; তাহাদের সংখ্যা, এদেশের অধিবাসী সংখ্যা ও অপর দেশের সংবাদপত্র সংখ্যার তুলনায়, অতি যৎসামান্য। এই কয়েকখানি পত্রিকারও আর্থিক অবস্থা নিতান্ত নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক; কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক দুই চারিখানি মাসিক পত্রিকা আছে; এ গুলির আর্থিক অবস্থা আবার আরও শোচনীয়। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, বাঙ্গালা ভাষা ও বিশেষতঃ কৃষি. শিল্প প্রভৃতির উপর নিতান্ত অনাস্থাই ইহার কারণ। তথাপি আমরা আবার একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা প্রকাশে উদ্যত হইলাম কেন? এই নূতন পত্রিকার উদ্দেশ্যই বা কি? ইহা সাধারণের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—"খেয়াল"। এই খেয়ালের বশেই অনেকে অনেকরূপ কাজ করে। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী", তথাপি লোকে চোরকেও ধর্ম্মের দোহাই দিতে ছাড়ে না। মাদক দ্রব্যের নিতান্ত অনিষ্টকারিতা বিশেষরূপ জানা সত্ত্বেও, সুরাপায়ী সুরা ত্যাগ করিতে পারে না। এইরূপে খেয়ালের বশ অনেকেই। উত্তর মহাসাগরে অভিযান (Arctic Expedition) বহু ব্যয় ও বিশেষ বিপদসঙ্কুল জানিয়াও, অভিযানকারীগণ বিরত হয়েন না।

এই নানাবিধ খেয়ালের উত্তেজক, কাল্পনিক আশা। চোর হয়ত ধর্ম্মকথা শুনিবে, মত্ততা হয়ত সুখের সমুদ্র আনিয়া উপস্থিত করিবে, এবার অভিধানে হয়ত বিশেষ ফললাভ হইবে, ইত্যাকার কল্পনা যে আশার সঞ্চার করিয়া দেয়, তাহাই খেয়ালের মূলভিত্তি। আমাদেরও কল্পনা যে, স্বদেশী আন্দোলনে লোকের মতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি যে, বাঙ্গালীর উন্নতির মূল, সে জ্ঞান জন্মিয়াছে, এবং কৃষি, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান যে, দেশের অবশ্য মঙ্গলকর, সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস যে, এইরূপ পত্রিকা এ সময়ের নিতান্ত উপযোগী।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—"স্বদেশের সেবা"। সেতুবন্ধনের সময় কাঠবিড়ালগণও শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্য করিয়াছিল ; সেইরূপ, এই জাতীয় অভ্যুত্থানের সময়, আমরাও আমাদের সাধ্যানুরূপ কর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছি ; সুতরাং আমাদের এই উক্তি ধৃষ্টতাসূচক নহে।

স্বদেশানুরাগ মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, ভারতবাসীগণের এতদিন সে অনুরাগ ছিলনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবানের কৃপায় সম্প্রতি সেই অনুরাগ অঙ্কুরিত হইয়াছে ; ইহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে, কিম্বা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভারতীয়গণের একতার অভাবে, কোন বিষয়ের আন্দোলন এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সেই জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা। আমাদের আধুনিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, অবশ্য-প্রয়োজনীয় সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও, আমরা পরমুখাপেক্ষী। আমাদের দেশের অতীত অবস্থার সহিত, বর্ত্তমানের তুলনা করিলে, আমরা যে মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়াছি, ইহাই প্রতীয়মান হয়। আমাদের শিল্প, জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, এখন একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। শিল্পীগণের অনেকেই অন্নাভাবে বিনষ্ট হইয়াছে ; যাহারা এখনও জীবিত আছে তাহাদের কণ্ঠাগত প্রাণ ; তাহাদের দুরবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমরা এতদিন হৃদয়শূন্য, জড়প্রায় হইয়াছিলাম বলিয়া, তাহাদের কথা একবারও ভাবি নাই, তাহাদের দুঃখে কিছুমাত্র দুঃখিত হই নাই। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পুরাকালে এদেশের লোক বাণিজ্য করিত, তাহাদের উৎকৃষ্ট অর্ণবযান ছিল, তাহারা বিদেশীয়গণের সহিত রীতিমত বাণিজ্য চালাইত। সেই বহির্বাণিজ্য এরূপ বিলুপ্ত যে, তাহা এখন উপকথার সামিল হইয়াছে। দেশের বহিঃ ও অন্তর্বাণিজ্যও এক্ষণে বিদেশীয়গণেরই করায়ত্ত।

শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ও পুরাতন অবস্থা ও ইহাদের পুনরুন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করাই, এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। কৃষিই আমাদের প্রধান অবলম্বন, ইহারও ক্রমশঃ অধঃপতন হইতেছে; আমরা কৃষি বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করিব। শিল্পও কৃষি বিষয়ক যন্ত্রাদি সম্বন্ধে আমরা পর্য্যালোচনা করিব। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানের শিল্প ও কৃষির অবস্থা কিরূপ তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা যাইবে। বৈজ্ঞানিক অবশ্য প্রয়োজনীয় তত্ত্বগুলি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইবে। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খাদ্য ও সাধারণের জ্ঞাতব্য অন্যান্য বিষয়েরও সমালোচনা প্রকাশিত হইবে। গৃহপালিত গো মহিষাদি অত্যাবশ্যকীয় জন্তুগণের উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে দুই এক কথা লেখা যাইবে। সমাজ ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতেও আমরা ক্রুটী করিব না। শিক্ষা প্রণালী ও রাজনীতি আমাদের পত্রিকাতে মধ্যে মধ্যে স্থান পাইবে।

ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তি সকলের ধ্বংস হইয়াছে বলিলেই হয়; তথাপি, সেগুলির স্মরণেও আমরা গৌরবান্বিত বোধ করি। সেই সকল বিষয়ের আলোচনা ও কি উপায়ে তাহাদের পুনরুদ্ধার হইতে পারে, ইহা ভাবিলেও আমাদের অনেক উপকার হইতে পারে। এই বিশ্বাসে আমরা এই পত্রিকা খানির অবতারণা করিলাম। ইহাতে, যত দূর সম্ভব, অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সকলের সমালোচনা করা যাইবে। ভারতীয় দর্শন, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক সম্বন্ধীয় প্রবন্ধও মধ্যে মধ্যে বাহির হইবে।

আমাদের বিনীত অনুরোধ যে, স্বদেশানুরাগী মহোদয়গণ আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। বাঙ্গালায় আজ কাল স্বদেশানুরাগের স্রোত প্রবাহিত, সেই ভরসায় আমরা এই "স্বদেশী" মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কারণ, এদেশে এরূপ একখানি পত্রিকার অভাব। আমাদের কোন বিষয়ের ক্রুটী বা ভ্রম জানিতে পারিলেই, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া সংশোধন করিব।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য যে, মফস্বলবাসী সহৃদয় পাঠকগণ কৃপা করিয়া, স্থানীয় শিল্প ও কৃষি বিষয়ের সংবাদ পাঠাইয়া, আমাদিগকে উপকৃত করিবেন। সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত, আমরা কিছুতেই সফল-মনোরথ হইতে পারিব না।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব—

যে স্থানের সংবাদ প্রেরিত হইবে, সেই গ্রামের নাম, থানা, পোষ্টাফিস ও জেলা।

১। তাঁতির সংখ্যা—

(ক) প্রচলিত তাঁতের সংখ্যা ও উন্নত ধরণের তাঁত যদি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধে একটু বিশেষ বিবরণ।

(খ) উৎপন্ন বস্ত্রাদির বিবরণ যথা—

(১) কার্পাস সূত্রের বস্ত্র, ধুতি ও শাড়ী—মিহি ও মোটা।

(২) উড়ানী, গামছা, মশারির থান, বিছানার চাদর, লেপ, তোষক প্রভৃতির খোল ও ওয়াড়ের কাপড়, জামার কাপড় প্রভৃতি।

(৩) তসর ও গরদের বস্ত্র—ধুতি, চাদর, থান প্রভৃতি।

(৪) জরীর কাজ, পশমের বস্ত্রাদি।

২। কাঁসারির সংখ্যা—

(ক) উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণী ও পরিমাণ।

(খ) স্থানীয় বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ।

৩। কামারের সংখ্যা—

(ক) উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ।

(খ) স্থানীয় বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ।

৪। অপর বিশেষ শিল্প ও শিল্পীগণের বিবরণ, যথা—শৃঙ্গের কাজ, চিরুণী, শঙ্খ, মাদুর, হস্তীদন্তের কাজ, শীতলপাটী, মছলন্দি, পাথরের বাসন প্রভৃতি।

৫। কৃষি-জাত বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিবরণ যথা—কার্পাস, ইক্ষু, আলু ইত্যাদি।

৬। অরণ্যজাত দ্রব্য, যথা—লাক্ষা, ধুনা, তার্পিণ, রেশম, মধু প্রভৃতি।

৭। খনিজ দ্রব্য, যথা—কয়লা, লৌহ, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, চূণ প্রভৃতি।

৮। অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিবরণ।

স্বদেশী।

প্রথম খণ্ড।]　　অগ্রহায়ণ, ১৩১২।　　[দ্বিতীয় সংখ্যা।

বন্দে মাতরম্।

জীবন-সংগ্রাম।

যা' কিছু বিরাজে বিশাল সৃষ্টিতে,
দৃষ্টি অন্তরালে অথবা দৃষ্টিতে—
আত্ম-রক্ষা তরে অপরে নাশিতে
নিয়ত সচেষ্ট রয়েছে সবে;
পশু, পক্ষী, কীট, প্রাণী অগণন,
স্থাবর, জঙ্গম,—জড় বা চেতন,
জীবন-সমরে ব্যস্ত অনুক্ষণ;—
ঘাত প্রতিঘাত চলিছে ভবে।
শূন্য-মার্গে, স্বর্গে, সাগর-সলিলে,
ভূধরে, ভূগর্ভে, অনলে, অনিলে,
বনে, প্রস্রবণে, শব্দে, ভূমণ্ডলে,
আলোকে অথবা আঁধার ঘোরে
দিবা, দণ্ড, পল, মাস, সম্বৎসর,
অসংখ্য অয়ন, যুগ, যুগান্তর
ব্যাপিয়া চলিছে জীবন-সমর :
কে ছিঁড়িতে পারে প্রকৃতি-ডোরে?

মুখে অট্ট অট্ট কি বিকট হাসি!
বিলম্বিত গলে মুণ্ড রাশি রাশি—
বিলোল রসনা শোণিত-পিয়াসী—
ভীমা লম্বোদরা প্রকৃতি-রাণী
'সংহার্ সংহার্' রবে নিরন্তর
উন্মত্তার বশে করিছে সমর;—
কপালী কালিকা-কঠোর অন্তর
ভক্ষিছে নিয়ত অসংখ্য প্রাণী।
গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহদলপতি,
—গগনে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক সংহতি,—
ছুটিছে নিয়ত, প্রচণ্ড সে গতি,
ভীম তুণ্ডে উঠে মহা 'মার্ মার্';—
আকর্ষণ-পাশে বাঁধি পরস্পরে
প্রমত্ত সতত জীবন-সমরে
হীনবল যেই নিমেষের তরে
তখনি বিলোপ হতেছে তা'র।

দেবাসুর-দ্বন্দ্ব পুরাণে প্রচার,—
আলোকের সনে যুঝিছে আঁধার,—
বিবেকের পাশে ইন্দ্রিয়-হুঙ্কার—
অমৃত বেষ্টিয়া গরল-স্থিতি ;—
কালচক্র বশে যেই বলবান
সেই বিনাশিয়া প্রতিপক্ষ-প্রাণ
এ জগতীতলে হ'তেছে প্রধান ;
—চিরকাল এই প্রকৃতি-রীতি !
সদাগতি সম দ্রুতবেগধারী
মহাপরাক্রান্ত মৃগেন্দ্র কেশরী
করি-কুম্ভ নখে বিদারণ করি'
জঠরে আহুতি করিছে দান ;
ভীমবক্রধারী ভীষণ শার্দ্দূল
ক্রোধে ঊর্দ্ধে তুলি সুদীর্ঘ লাঙ্গুল
বনবাসী-বৃন্দে করিয়া আকুল
হরে হীনবল জীবের প্রাণ ;
বৈনতেয় নখে বাসুকী বিদার,
দশানন শরে জটায়ু সংহার,
নিরীহ দুর্দ্দুর ফণীর আহার,
সেও ক্ষীণতরে সংহারে কত ;
ক্ষুদ্র বিহঙ্গম পতঙ্গ বিনাশে
কিন্তু নিপতিত শ্যেনের গরাসে ;
কৌশল-রচিত নিষাদের ফাঁসে
হীনবুদ্ধি শ্যেন হ'তেছে হত।
নদী, পারাবার, নির্ঝর নিকর,
অণু অণু ক্ষয় করিছে ভূধর ;
মহাদীপ্তিশালী অংশুমালীকর
সাগর-সলিল করিছে ক্ষয় ;
প্রত্যেক প্রশ্বাসে জীবের জীবন
শমন-সকাশে করিছে গমন ;
মহাদ্রুম-তলে নিত্য অগণন
ক্ষুদ্র উদ্ভিদের হ'তেছে লয়।
অণু, পরমাণু, জীবাণু আকারে,
যা' কিছু বিরাজে বিশ্ব-চরাচরে,
সবে নিজ নিজ আচরি' প্রথা
আত্ম-রক্ষা তরে, যুঝিছে সমরে ;—
শক্তি-উপাসনা পরিত্যাগ করে'
এ জগতী-মাঝে ক্ষণকাল তরে
তিষ্ঠিতে তা'দের ক্ষমতা কোথা ?

তাই বলি, ধর দানবের বল,
দেবের দৃঢ়তা, দেবের কৌশল ;
পূর্ব্ব শাস্ত্রনীতি করিয়া সম্বল
নব জ্ঞান-দীপ্ত করহ হৃদি ;

বাইবেল্‌, কোরাণ, জ্ঞানময় বেদ,
ধর্ম্মশাস্ত্রে কোথা শিখায় প্রভেদ ?
জননী পূজায়, ভুল জাতিভেদ,
তা'হ'লে তিষ্ঠিতে পারহ যদি।

কি আছিলে আগে দেখহ ভাবিয়া,
ভূত কথা ভাবি, পূত কর হিয়া,
পূর্ব্ব শক্তি তবে পাইবে ফিরিয়া,
ডুবে নাই তাহা অতল জলে ,

ভাবী চিত্রপটে কর দৃষ্টি স্থির,
জীবন-সংগ্রামে সাজ মহাবীর,
হ'য়োনা হতাশ, হয়োনা অধীর,
যতনে রতন অবশ্য ফলে।

বীর-মদে মাতি' ধর বীর-পণ—
'অভীষ্ট সাধন অথবা মরণ'—
ধরি' জ্ঞান-বল করহ শাসন
অবনী, অম্বর, সাগর-নীর।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-প্রবর-বচন—
'আপন সহায় হয় যেই জন
বিধাতা তাহার সঙ্গী অনুক্ষণ'—
জ্ঞান-গর্ভ বাক্য জানিও স্থির।

সখ্যতা-বন্ধনে বাঁধি' পরস্পরে,
আপন মর্য্যাদা বুঝহ অন্তরে,
ক্ষুদ্র আত্ম-স্বার্থে দাও ফেলি দূরে,
জ্বলিয়া যাহাতে হ'তেছ সারা;

যাদব কৌরব—সমর-কুশল,
সুন্দ উপসুন্দ দৈত্য মহাবল,
করেছে প্রবেশ কৃতান্ত-কবল
যে বিষম বিষে হইয়া জরা।

কতকাল আর ফেরুবৃত্তি ধরে'
সদা সশঙ্কিত—সদা মর্ম্মে মরে',
লুকাইয়া মুখ তমসা-বিবরে,
হেনভাবে বল জীবন র'বে?

দেখ আমেরিকা-আদিবাসী যা'রা
একে একে ক্রমে হ'ল লুপ্ত তা'রা
হত হীনবল,—জগতের ধারা—
বলী হীনবলে সংঘর্ষ যবে।

ওই দেখ শ্বেত বণিকমণ্ডলী
করি' বিনিময় ক্রীড়ার পুত্তলী
ধনরত্ন তব ল'য়ে যায় চলি'
জড়ভাবে বসি' দেখিছ ভাই!

তব দেশবাসী শ্রমজীবী যা'রা,
অশন-বসনহীন আজি তা'রা,
দিবানিশি আজি কাঁদি কাঁদি সারা,—
তবু কিগো তব চেতনা নাই?

দেব-অনুকৃতি সুন্দর আকার
লভেছ জগতে,—জগতের সার,—
কর শিক্ষা তা'র যথা-ব্যবহার;
হইবে বিজয়ী ভাবনা কিরে?

হইবে সহায়া ভৈরবী চামুণ্ডা,
নাচিবে সমরে করে খর খাণ্ডা,
দিতি-সুত-শিরে সাজিবে নৃমুণ্ডা
অচিরে আবার আসিয়া ফিরে।

শ্রীরাখালচন্দ্র দে, বি, এ।

অভাব ও প্রতীকার।

আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত বিবিধ অভাব পূরণের জন্য, আমরা নানারূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি; এবং অল্পায়াসে বা অল্প ব্যয়ে অধিক কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নানা উপায়ের উদ্‌ভাবনা করি। এই আয়াস বা ব্যয় সংক্ষেপ প্রবৃত্তি হইতেই, অশ্ব, গো, মহিষাদি পশুদ্বারা কতকগুলি কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লওয়া হয়, এবং ইহা হইতেই নানাবিধ যন্ত্রাদিরও সৃষ্টি হইয়াছে। অধুনা এই উদ্‌ভাবনী শক্তি বিপুল বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; জল, অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থ সহায়ে, বহুজন ও বহু পশু-

সাধ্য কার্য্যগুলি, সামান্য সংখ্যক লোকের সাহায্যে সাধিত হইতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্র পৃথিবীতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল; তড়িৎ যন্ত্র আবার নবযুগ উপস্থিত করিতেছে। নানাবিধ কাল্পনিক ও বাস্তবিক অভাব পরিপূরণেচ্ছাই, এইরূপ ক্রমবর্দ্ধনশীল যন্ত্রোন্নতির কারণ; এইরূপ যন্ত্রোন্নতিই আধুনিক সভ্যতার প্রধান লক্ষণ; আবার নানাবিধ অভাব সৃষ্টিই এই উন্নতি ও সভ্যতার চরম ফল।

ভারতবর্ষে এই সভ্যতা অতি অল্প দিন প্রবেশ করিয়াছে; পূর্ব্বে ইহা এ দেশে ছিল না। পুরাকালে ভারতবাসীগণের অভাব অতি অল্পই ছিল; এবং অভাব বৃদ্ধি ভারতবাসীগণের আকাঙ্খিত ছিল না। তখন আধ্যাত্মিক উন্নতিই শিক্ষিতগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রথমাবস্থায়, আধুনিক সভ্যতার প্রথম ও প্রধান নিদর্শন কাগজ কলম প্রভৃতি লিখনোপকরণও ছিল না; শ্রুতি ও স্মৃতিই তখন শিক্ষার উপকরণ ছিল; অপর উপকরণের আবশ্যক বোধ হইত না। এই স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ বিধানের জন্য ব্রাহ্মণগণ বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিতেন। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের নিকটই, তখন প্রায় সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত। ক্রমে, এইরূপ বন্দোবস্তে অনেক অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি অপর জাতির অবলম্বনীয় বিদ্যা অভ্যাসে ও অধ্যাপনায় আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত বোধ করিতে লাগিলেন; একের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অপরের নিকট সঞ্চিত থাকায়, উভয় পক্ষেরই অসুবিধা হওয়া সম্ভব। কিন্তু, অপর জাতীয়-গণের স্মৃতিশক্তি উপযুক্তরূপ তীক্ষ্ণ না থাকায়, এক একটি বিষয় শ্রুতি-মাত্রে অভ্যস্ত হইতে পারিত না, এবং একবার অভ্যস্ত হইলেও, আবার বিস্মৃত হইবার আশঙ্কা থাকিত। সেই জন্য লিখিত বিদ্যার প্রয়োজন হইল, ও লিখনোপকরণের আবিষ্কার হইল। অপরের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিই প্রথমে লিখিত হইতে আরম্ভ হইল ও তাহার সহিত অন্যান্য কতকগুলি বিদ্যাও এইরূপে লিখিত হইয়া থাকিবে। সে সময়ের সকল বিদ্যাই যে এইরূপে লিখিত হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অনেকগুলি শিল্প বিদ্যাই দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে হয়; তাহাদের জন্য লিখিত কোন পুস্তক নাই; বিশেষতঃ, আমাদের দেশে অধিকাংশ শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধেই কোন পুস্তক নাই। সেই জন্য, কাল বশে আমাদের যে সকল শিল্প লোপ পাইয়াছে তাহার কোনরূপ বিশেষ সংবাদ আমরা পাইতে পারি না। উক্ত রূপে

লিখিত শাস্ত্রাদি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নিকটই রক্ষিত হইতে লাগিল; তাঁহারা আবার, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক একখানি নকল, উপযুক্ত অধিকারী বুঝিয়া, অপরকে প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে যে শাস্ত্রগুলির বহু বিস্তৃতি হইয়াছিল, তাহাই আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি; অপরগুলি প্রায়ই লোপ পাইয়া গিয়াছে। বিলুপ্ত শাস্ত্রগুলির জন্য আমরা বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছি কিনা, তাহা বলা যায় না; কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, উপযুক্ত অধিকারী দেখিয়া এই সকল বিদ্যা প্রদত্ত হইত; সে কালে অধিকারী অভাবেই যাহাদের বিলোপ হইয়াছে, এখনকার কালে তাহাদের অধি-কারীর অনুসন্ধানও মিলিবে না। যেগুলি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহারও অধিকাংশের আমরা অধিকারী নহি, সুতরাং আদরও করি না। বেদকেই আমরা চাষার গান ও পুরাণকে উপকথামাত্র বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। অপর বহুসংখ্যক শাস্ত্রগুলি আমরা দেখিবারও বাসনা রাখি না।

সমাজের অবশ্য প্রয়োজনীয় এক একটী অভাব উৎপন্ন ও তাহা দূর করিবার উপায় অবলম্বিত হইয়া, সমাজে সুন্দর সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ায়, লোকে আধ্যাত্মিক উন্নতি লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে লাগিল; তখন আর নূতন অভাবের সৃষ্টি হইবার অবসর রহিল না। হিন্দু সমাজের মূল লক্ষ্য সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন। সুতরাং, সামাজিক অভাব পূরণের জন্য যত গুলি প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাতে উহাই বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কাল বশে, দেশে অনাচার ও অত্যাচার প্রবেশ করায় সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া, নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়াছে; এবং সেই সকল অভাব পূর্ণ করিবার জন্য, কতকগুলি উপায় দেশবাসীগণের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু অবশিষ্ট অধিকাংশ গুলি দূরীকরণের উপায় বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিধানে, দেশের এই অভিনব অভাবগুলি দূরীভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক অভাবগুলি আবার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে; সেই জন্য আমরা এই বিধানের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছি, ও আমাদের দেশের অভাব আমরা নিজেই পূর্ণ করিয়া, তৎসহ বাস্তবিক অভাবগুলিও দূর করিতে সংকল্প করিয়াছি।

বাস্তবিক অভাবগুলির মধ্যে, অন্ন, বস্ত্র, সামাজিক শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, এই কয়েকটীই মূল। শিক্ষা, লোকাচার, মান, সম্ভ্রম, প্রভৃতি অপরগুলি ইহাদেরই অন্তর্ভূত।

আধ্যাত্মিক উন্নতি মানব সমাজের মূল লক্ষ্য হইলেও, সাংসারিকের "খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না" ও বিনা পরিচ্ছদে সাংসারিক অভিমান বজায় থাকে না; সুতরাং সাংসারিকের জন্য, অন্ন ও বস্ত্র অবশ্য-প্রয়োজনীয়। সামাজিক শৃঙ্খলাও সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান সহায় বলিয়া, ইহাও আমাদের প্রধান প্রয়োজনীয়।

মূল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা সুফলপ্রদ না হইয়া কুফলই প্রসব করে, এবং লক্ষ্য স্থল হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করে। আধুনিক সভ্যতা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। মানব সমাজে যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয়, সে দিকে দৃষ্টি না থাকায়, আমরা দিশাহারার ন্যায়, নানারূপ কাল্পনিক অভাবের সৃষ্টি করিয়া সেগুলি মোচনের জন্য ক্রমাগত ব্যতিব্যস্ত হইতেছি। যাহাতে সমাজের অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় অভাবগুলি পূর্ণ হইয়া ও সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়া, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়, সে দিকে আর আমাদের দৃষ্টি নাই। বিষয় বাসনারূপ বিবিধ দুশ্চিন্তা আমাদিগকে ক্ষিপ্ত-প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কি চাই, কিসে আমাদের সমাজের বাস্তবিক কল্যাণ সাধিত হয়, সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। দেশের লোকের যদি অন্ন বস্ত্রের অভাব না থাকে, নিত্য ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অসদ্ভাব না থাকে, সমাজের শৃঙ্খলা যদি পুনঃস্থাপিত হইয়া, দেশের লোক ধর্ম্ম-চিন্তার অবসর প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা আর আমাদের স্পৃহনীয় কি থাকিতে পারে?

উন্নতি অবশ্য প্রার্থনীয়; কিন্তু যে প্রণালীতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ প্রণালী জগতের অনিষ্টকর, সুতরাং অবশ্য বর্জ্জনীয়। মানবের চিত্তবিনোদনের উপায় উদ্ভাবন অবশ্য প্রশংসার্হ; কিন্তু আশু চিত্তবিনোদক ও পরিণামে প্রভূত অমঙ্গল নিদান, মাদক সেবন প্রভৃতি নিকৃষ্ট উপায়; সুতরাং ইহার প্রসার ও উন্নতিবিষয়ক চেষ্টা নিতান্ত নিন্দনীয়। যাহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে আবর্জ্জনা উপস্থিত হয়, সামাজিক শৃঙ্খলা বিচ্ছিন্ন হয় ও সংসারে অশান্তি উৎপাদিত হয়, এতাদৃশ বিষয়ক উন্নতি, উন্নতি নামের অযোগ্য। আধুনিক সভ্যতায় ইহার সকল গুলিই বর্ত্তমান।

আমাদের দেশ।

কেবল বঙ্গদেশ নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। ইহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিনা, সেই জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা। আমরা বুঝিয়াও বুঝিনা যে, নানাবিধ এই জাতি-সমষ্টি,প্রাচীন মহত্বের পরিচায়ক বিস্ময়কর কীর্ত্তিরাশি, প্রাচীন সমৃদ্ধি-গর্ব্বিত রাজপ্রাসাদ সমূহ, অমৃতসর ও বিভিন্ন স্থানের সুন্দর সুন্দর দেবমন্দিরশ্রেণী, আগ্রার তাজমহল ও অন্যান্য সুরম্য মস্‌জিদাবলি, এবং সৌন্দর্য্য ও অতুল শোভা নিদান, মনোরম-প্রাকৃতিক দৃশ্য-সমন্বিতা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ঐতিহাসিক, চিত্রকর, পণ্ডিত ও ভ্রমণকারীগণের চিরপ্রশংসিতা, সর্ব্বজন-পূজ্যা, চিররত্নপ্রসবিনী, চিরকল্যাণ-ময়ী ভারতমাতা আমাদের জন্মভূমি। আমরা বুঝি, ভারতের পর্ব্বত, নদ, নদী আমাদের দেবতা, ভারতের তীর্থস্থান সকল আমাদের দর্শনীয়, ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ, ভারতের প্রাচীন বীরগণ আমাদের শিরোভূষণ, ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ আমাদের স্মরণীয় এবং ভারতের প্রাচান শাস্ত্রাদি আমাদের পূজনীয়; কিন্তু আমরা বুঝিনা, ভারতের সুখসমৃদ্ধিই আমাদের বাঞ্ছনীয়, ভারতবাসীর একতাই আমাদের স্পৃহণীয় ও ভারতের সেবাই আমাদের পবিত্র ব্রত। যদি প্রত্যেক ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পার্শি, শিখ, খৃষ্টীয়ান, সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা ভুলিয়া, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষকে আপনার মাতৃভূমি মনে করে, বিভিন্ন জাতীয়তা বিস্মৃত হইয়া, ভারত মাতার সন্তানগণ ভ্রাতৃজ্ঞানে পরস্পর একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং সেই সম্মিলিত শক্তি দেশের উন্নতি বিষয়ে যত্নবান হয়, তাহা হইলে অচিরেই ভারত পুনর্ব্বার সুখসমৃদ্ধির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরূঢ় হইতে পারে।

স্বদেশানুরাগ ও স্বদেশপ্রেম মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। সংকীর্ণ স্বার্থে অন্ধ হইয়া আমাদের সে প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। নিতান্ত ক্ষুদ্রচেতা না হইয়া, যদি আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে আমাদের মাতৃভূমি ও "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী", ইহা অনুক্ষণ স্মরণপথে রাখিয়া কার্য্য করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের জাতিগত উন্নতি সম্ভবপর; নতুবা, চিরকালই আমাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ও বিদেশীয়গণের পদদলিত হইতে হইবে। একজন ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন;—

"Breathes there a man with soul so dead, Who never to himself hath said, This is my own, my native land &c." ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে মনুষ্য আপনার জন্মভূমির কথা মনে করিয়া আনন্দ ও গৌরব বোধ না করে, সে আত্মাশূন্য, অর্থাৎ মনুষ্য নামের অযোগ্য।

ভারতের নৈসর্গিক অবস্থা দেখিলে বোধ হয় যে, এদেশের লোক ইচ্ছা করিলেই স্বাবলম্বী হইতে পারে; যেন জগদীশ্বর পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে ইহাকে পৃথক্‌ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উত্তরে অত্যুচ্চ পর্ব্বত হিমালয়, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকও উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতরূপ প্রাচীররক্ষিত। মধ্যভাগে বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পাছে পর্ব্বত দ্বারা সম্পূর্ণ রক্ষা না হয়, সেই জন্য পরম কারুণিক ভগবান, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড নদী ও সমুদ্র স্থাপিত করিয়া, ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ কৃপা দেখাইয়াছেন। পর্ব্বত ও পার্ব্বতীয় স্থান সকলের দৃশ্য কি মনোহর! হিমালয় ও বিন্ধ্যাচল তপোবনময় ও তপস্বীগণের আবাস স্থান; এই দুই পর্ব্বতে এমন অনেক মনোরমস্থান আছে, যে সকল স্থানকে স্বর্গ বলিলে বলা যায়। হিমালয়ই ভারতের জ্ঞান ও ধর্ম্মের আকর, হিমালয়ই ভারতের প্রধান রক্ষক ও শিক্ষক। সেই জন্যই হিমালয়কে মহাশক্তির জন্মদাতারূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এই হিমাচল হইতে পতিতপাবনী শক্তিস্বরূপা গঙ্গা ও যমুনার উৎপত্তি এবং পুণ্যতোয়া ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুনদ আবির্ভূত। উত্তর ভারতে দামোদর রূপনারায়ণ, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, মহানদী প্রভৃতি আরও কতকগুলি নদনদী আছে। দক্ষিণ ভারতে পূতসলিলা গোদাবরী নর্ম্মদা, কাবেরী ও তাপ্তী প্রবাহিতা। এই সকল নদনদীই ভারতবাসীগণের নানাপ্রকার সুখ সচ্ছন্দের কারণ। ইহাদের জল, জমীর উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং সেই জন্য ভারতের জমীতে সকল ফসল অল্পায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই সকল নদ নদী থাকাতে, আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা। ইহাদের জল অতীব স্বাস্থ্যপ্রদ ও ইহাদের দৃশ্য আনন্দবর্দ্ধক। বস্তুতঃ, শোকার্ত্ত ও তাপিত নরনারী এই সকল নদীজলে অবগাহন, জলপান, তীরস্থ বায়ুসেবন ও প্রাকৃতিক মনোহর দৃশ্য দর্শনে কতই সুখ বোধ করে ও শোক তাপ বিস্মৃত হয়। সকল নদ নদীতে নানাবিধ সুস্বাদু মৎস্য, যেন আমাদের ভোগের জন্যই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতবাসী হিন্দু-

গণের কৃতজ্ঞতাবৃত্তি এতই প্রবল যে তাহারা এই সকল পর্ব্বত ও নদী হইতে নানারূপ সুখ সচ্ছন্দের দ্রব্যাদি পাইয়া থাকে বলিয়া, ইহাদিগকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিয়া থাকে। " দেবতাগণ যেমন মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য যত্নবান, এই সকল পর্ব্বত ও নদী ঠিক সেইরূপ। আমাদের ধর্ম্মবৃত্তি ও মনোবৃত্তি, ভারতবর্ষের পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্র হইতে যে গঠিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমাদের শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্যও এই সকল নৈসর্গিক পদার্থের উপর নির্ভর করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এমন কি ভারতের সামাজিকতা ও জাতিভেদ ইহাদের দ্বারা গঠিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ভারতে ছয়টী ঋতু বিরাজিত, পৃথিবীর অপর প্রায় কোন স্থানে এরূপ ঋতু-সমাবেশ নাই। শীতপ্রধান, গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ সকল প্রকার স্থানই ভারতবর্ষে অবস্থিত। সেই জন্য, সকল দেশের সকলপ্রকার জীবেরই ইহা বাসোপযোগী এবং সকল প্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও শস্যাদি এদেশে জন্মিতে পারে।

আমাদের দেশের লোকের অভাব অল্প এবং অল্পায়াসেই সেই অভাব পূর্ণ হয় বলিয়াই, আমরা উদ্যমশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া, পৃথিবীতে নরাধম হইয়াছি। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণ, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রচর্চ্চা ও অধ্যয়ন করিয়া, ভারতকে সভ্য জগতের আদর্শ ও শীর্ষ-স্থানীয় করিয়া গিয়াছেন; আর আমরা তাঁহাদের কুসন্তানগণ, তাঁহাদের নাম ও যশঃ লোপ করিয়া, জনসমাজে অসভ্য ও অশিক্ষিত নামে পরিচিত হইতে লজ্জা বোধ করি না। যে ইংরাজ ও অন্যান্য জাতি, অতি অল্প দিন পূর্ব্বে বন্য পশুর ন্যায় অসভ্য, মূর্খ ও কদাচারী ছিল, তাহারা আমাদিগকে অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করে ও পদদলিত করে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে! আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে তাহাদের আশ্রিত, সেই জন্যই আমাদের এই দুর্দ্দশা। ইংলণ্ডের ম্যানচেষ্টারবাসীগণ আমাদের পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবে, তবেই আমাদের লজ্জানিবারণ হইবে। জর্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদের জন্য গেঞ্জিফ্রক্ মোজা, জামার কাপড়, শীতবস্ত্র প্রভৃতি আসিবে, তবেই আমরা স্বাস্থ্যপ্রদ পোষাক পরিধান করিতে পাইব এবং সভ্যসাজে সজ্জিত হইতে পারিব। বিদেশীয়গণ আমাদের জন্য লবণ, চিনি প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবে, তবেই আমাদের দৈনিক খাদ্যাদি প্রস্তুত হইবে। তাহারা যদি এই

সকল দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বন্যজন্তুর ন্যায় উলঙ্গ থাকিতে হইবে ও অনাহারে মরিতে হইবে ভাবিয়া আমরা আকুল। কি শোচনীয় অবস্থা!

ভারতবর্ষে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়, এদেশে তাঁতিরও অভাব নাই, কিন্তু, আমরা এরূপ হতভাগ্য যে সেই তাঁতিদের প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহার করিনা; প্রায় সকল তুলাই বিদেশে পাঠাইয়া দিয়া, পরিধেয়ের জন্য বিদেশীয়গণের মুখ চাহিয়া থাকি। ইক্ষু, গুড় ও চিনি এদেশে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, কিন্তু সে সকলের ব্যবহার ছাড়িয়া, বিদেশীয় শাদা চিনি ব্যবহার করায় সভ্যতার লক্ষণ মনে করি। "বিদেশীয় শর্করা-চিনি ও মিশ্রী গোহাড়ের কয়লা ও গোশোণিত দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া শাদা করা হয়; আর আমরা হিন্দু হইয়া অবিকৃত মনে সেই চিনি মিশ্রী ব্যবহার করি।" ধর্ম্মই হিন্দুদিগের জীবন ছিল; খাদ্যাখাদ্যের বিচারের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ; আমরা যখন সেই ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছি, তখন আমরা সব হারাইয়াছি। বস্তুতঃই আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান গিয়াছে, আমাদের হিতাহিত জ্ঞান গিয়াছে, আমরা অধার্ম্মিক হইয়া অনাচারী হইয়াছি; স্বদেশ হিতৈষিতা ভুলিয়াছি। বলিতে কি, সোণার ভারত সর্ব্বপ্রকারেই ছারখার হইয়াছে।

আপাততঃ আমাদের মনোভাবের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিবনা বলিয়া অনেকে কৃতসংকল্প হইয়াছেন দেখিয়া, আমরা অতীব আনন্দিত হইয়াছি এবং আশা করিতেছি, ভারতের দুঃখরজনী বোধ হয় প্রভাত হইল। আমরা এতদিন মহানিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া জীবন্মৃত হইয়াছিলাম; নিজের স্বার্থ, নিজের দেশের মঙ্গল ভুলিয়া, কেবল বিদেশীয়গণের সেবায় রত ছিলাম, সেই জন্যই আমাদের এই অধোগতি। যাহা হউক, ভগবানের আশীর্ব্বাদে অনেকদিন পরে, আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে; ইহা একটী শুভলক্ষণ। কিন্তু ভয় হয়, পাছে এই জাগ্রত অবস্থা অল্পস্থায়ী হয়; পাছে আবার মোহনিদ্রা আমাদিগকে আক্রমণ করে; পাছে আবার দেশের কথা ভুলিয়া যাই।

আমাদের দেশের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা; কিন্তু যত্নাভাবে এই উর্ব্বরাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। দেশের কৃষকগণও সরল ও সত্যপ্রিয়; কিন্তু দেশের কতকগুলি শিক্ষিতাভিমানী কুলাঙ্গারগণের প্রদর্শিত কুদৃষ্টান্তে, কুব্যবহারে ও কুপরামর্শে তাহাদের এই সদ্‌গুণাবলি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া

আসিতেছে। অনেক বৎসর ধরিয়া একই দেশে বাস ও একই জমী চাষ করিয়া, কৃষকগণ সাধারণ কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞ হইয়াছে; তাহারা জানে, কোন্ সময়ে কোন্ জমীতে তাহাদের পরিচিত কোন্ ফসল আবাদ করিতে হয়। কিন্তু তাহারা প্রায় নিরক্ষর ও অতি দরিদ্র। ভারতের শিক্ষিত ও ধনীসমাজ কৃষিই ভারতের প্রধান সম্পত্তি, ইহা জানিয়াও, ইহার উন্নতি ও পরিচালন ভার এই নিরন্ন ও অশিক্ষিত কৃষককুলের উপরেই সম্পূর্ণ ন্যস্ত রাখিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজা এ বিষয়ে প্রায় দৃষ্টিহীন; স্থানে স্থানে কতকগুলি জলপ্রণালী (Canal and Drainage system) থাকিলেও তাহার পরিমাণ নিতান্তই যৎসামান্য; সম্প্রতি দুই এক স্থানে কৃষিবিদ্যালয় ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইলেও, ইহাদের প্রয়োজনীয়তার তুলনায়, সমুদ্রে পাদ্যার্ঘের ন্যায়, এগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জমিদারগণ কৃষি ও কৃষককুলের উন্নতি বিষয়ে একরূপ নিশ্চেষ্ট। উন্নতি সম্বন্ধে রাজা ও জমীদারগণ উদাসীন থাকিলেও, ভূমিকর দিন দিন বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে না। এই দুর্নীতির পরিণাম ফলও তদনুরূপ শোচনীয় হইয়া আসিতেছে।

দেশে শিল্পীরও অভাব নাই; কৃষকগণ যে পাট তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন করে, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীগণ তাহা হইতে নানারূপ বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারে। ভারতের খনি হইতে যে সকল ধাতুদ্রব্য উত্থিত হয় ও হইতে পারে, তাহা হইতে শিল্পীগণ বহুবিধ অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু কৃষির ন্যায় ভারতের শিল্পোন্নতি ও পরিচালন ভারও দরিদ্র এবং নিরক্ষর শিল্পীগণের উপর নিহিত। যদি কেবল তাহাই হইত, তাহা হইলেও দেশীয় শিল্পের সহসা এরূপ মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হইত না। যদি দেশের শিক্ষিত সমাজ, দেশীয় শিল্পের উৎসাহ প্রদানে পরাঙ্মুখ থাকিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহাতেও দেশীয় শিল্পের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইত না। যাহাতে এদেশের শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেজন্য বিদেশীয়গণ ও তাহাদের সহচর, শুভানুধ্যায়ী, তোষামোদকারী ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য অনুকরণপ্রিয় স্বদেশীয়গণ যে নিদারুণ অত্যাচার করিয়াছে, তাহাতে ভারতের শিল্প ভিন্ন, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের শিল্পই যে জীবিত থাকিতে পারিত না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সকল শিল্পই যে এখনও জীবিত আছে তাহা নহে; অনেকগুলিই ইতিমধ্যে লোপ পাইয়া গিয়াছে।

এদেশে প্রাণীজ ও অরণ্যজাত দ্রব্যেরও অসদ্ভাব নাই; কৃষিজাত ও খনিজ

দ্রব্যের ন্যায় এগুলিও বিদেশে প্রেরিত হইয়া, সেখানকার শিল্পীকুলের সাহায্যে তাহা হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া, আমাদের ও নানাদেশবাসী-গণের অভাব পূর্ণ করিতেছে; এবং আমাদের শিল্পীকুল অবলম্বন বিহীন হইয়া, কোথাও কৃষির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, কোথাও কুলিগিরি করিয়া দিনপাত করিতেছে, আবার অনেক স্থলেই অনাহারে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য বিদেশীয়গণেরই সম্পূর্ণ করতলগত; অন্তর্ব্বাণিজ্যও প্রায়শঃ ইহাদেরই আয়ত্ত্বাধীন। সুতরাং লক্ষ্মী ইহাদেরই আশ্রয় করিয়াছেন, এবং ভারতবাসী লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গিয়াছে।

জাতিভেদ ও জাতীয়তা।

হিন্দুসমাজে জাতিভেদ একটী প্রধান দৃশ্য। বিদেশীয় সভ্য মহোদয়গণ হিন্দুর এই জাতিভেদ দেখিয়া আমাদিগকে অসভ্য ও অশিক্ষিত বলেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষায় মার্জ্জিত হইয়াছেন, তাঁহারাও এই জাতিভেদ লইয়া সময়ে সময়ে আন্দোলন করেন এবং পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রতি অযথা কটূক্তি প্রয়োগেও ত্রুটি করেন না। এখন দেখা যাউক, এই জাতিভেদের প্রকৃত ইতিহাস কি; অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে কি প্রকারে জাতিভেদ সমুদ্ভূত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে কতদূর উপকার বা অপকার সাধিত হইয়াছে। এই জাতিভেদ স্বত্বেও, ভারতবর্ষে জাতীয়তা সম্ভব কি অসম্ভব, তাহাও এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী গণ অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিল। শিক্ষিত আর্য্যগণ মধ্যএসিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আদিম অনার্য্য জাতিকে পরাজিত করতঃ, ভারতবর্ষের উত্তর ভাগে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। আর্য্যগণ যে অনার্য্যগণের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনুষ্য মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিভিন্নতা দেখা যায়। আর্য্যদিগকে বাধ্য হইয়া অনার্য্য-দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সংগ্রামপ্রিয়

কিম্বা যুদ্ধবিশারদ ছিলেন না। সুতরাং প্রবৃত্তি অনুসারে ও কার্য্যশৃঙ্খলার কারণ, আর্য্যগণ প্রথমতঃ প্রধান দুইভাগে বিভক্ত হইলেন; শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ ধর্ম্মকর্ম্ম ও সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোযোগী হইলেন এবং অপর একদল যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যবিস্তারকার্য্যতৎপর হইলেন। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ এবং শেষোক্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইলেন। আবার, আহার্য্য শস্যাদির উৎপাদন নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও ব্যবসায়ের আবশ্যকতা বিধায়, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে, কেহ কেহ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া বৈশ্য নামে পরিচিত হইলেন। পরাভূত অনার্য্যগণের মধ্যে যাহারা আর্য্যাধিকারে বাস করিতে ইচ্ছুক হইল, তাহারাই শূদ্রপদবাচ্য হইল। বিজিত অনার্য্যগণ, বিজেতা আর্য্য-গণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া, তাঁহাদের কৃষি, বাণিজ্য ও গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবন যাপন করিত। ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, আর্য্যগণ ধর্ম্ম, রাজকার্য্য ও সামাজিকতার সুবিধার জন্যই, প্রবৃত্তি অনুসারে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়েন এবং ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও আচার ব্যবহার বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে এই জাতিভেদ বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়া, ঈশ্বরতত্ত্ব, শাসনপ্রণালী, সমাজনীতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সকলের চর্চ্চায় রত থাকিতেন। তাঁহারা নৃপতিগণের মন্ত্রিত্বে ব্রতী ছিলেন এবং লোকহিতরূপ নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ধর্ম্মকর্ম্মই তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। রাজ্যবিস্তার, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। যাহারা মনে করে, ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপর ছিল বলিয়া জাতি-ভেদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আপনাদিগকে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ জাতি করিয়া, অপর সকলকে নীচ জাতিভুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ যেন স্বতঃই সমুদ্ভূত হইয়াছিল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে আর্য্যগণ তিন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বৃত্তি অনুসারে মনুষ্যের মনোবৃত্তিরও প্রস্ফুরণ হইয়া থাকে; ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের মনোবৃত্তি উচ্চ ছিল; অন্যান্য সকলে সেই জন্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিত এবং শিক্ষক ও গুরু বলিয়া ভক্তি করিত। বাস্তবিক যে সকল ঐশিক গুণ থাকাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণেই সেই সকল গুণ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল বলিয়াই, তিনি অপর সাধারণের দেবতার ন্যায় পূজ্য ছিলেন। এখনকার ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বপুরুষের গুণবর্জ্জিত

নাম মাত্রে ব্রাহ্মণ হইয়া, ক্রমশঃ সমাজে হেয় হইতেছেন; আপনাদের দোষেই তাঁহাদের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মকর্ম্ম যজ্ঞহোমাদিতে জীবন কাটাইতেন; তাঁহারা সর্ব্বদা সাত্বিক ও শুচিভাবে থাকিতেন। তাঁহারা কর্ম্মফল মানিতেন; আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইলে, এই জীবনে অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারিবে ভাবিয়া, তাঁহারা আপনাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান ছিলেন। অন্যান্য বৃত্ত্যবলম্বী-গণ ব্রাহ্মণের ন্যায় পরিচ্ছন্ন থাকিতে কিম্বা সৎকর্ম্ম করিতে সমর্থ হইত না, সুতরাং ব্রাহ্মণের সহিত মিশিতে কিম্বা একত্রে বাস কি ভোজন করিতে সঙ্কুচিত হইত। আবার শূদ্রের ত কথাই নাই, তাহারা একে বিজিত, তাহাতে আর্য্যদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। অনার্য্যগণ অসভ্য ও আচারভ্রষ্ট ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে জাতিভেদ হিন্দুসমাজে মজ্জাগত হইয়াছে বলিলেই হয়। ধর্ম্ম এবং বৃত্তিই ইহার ভিত্তি, উন্নতহৃদয় নিঃস্বার্থ ব্রাহ্মণ ইহার জন্য দায়ী নহেন!

জাতিভেদ যে একবারে সম্পূর্ণ অনিষ্টকর ইহা বলা নিতান্ত ধৃষ্টতা। প্রাচীন ভারতে যদি জাতিভেদ না থাকিত, তাহা হইলে ভারতের সাহিত্য, ভারতের ব্যাকরণ, ভারতের ন্যায়, দর্শন, জ্যোতিষ ও ভারতের অঙ্ক ও চিকিৎসা শাস্ত্র জগতে বিখ্যাত হইতে পারিত না। এই সকলই প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি। ব্রাহ্মণ সাংসারিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিয়া, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা, মানসিক বৃত্তি সকলের উৎকর্ষ সাধন করিতেন, এবং সৃষ্টিতত্ব, দেহতত্ব প্রভৃতি জটিল ও গূঢ় বিষয় সকল চিন্তাশক্তি দ্বারা মীমাংসা করিতে সক্ষম হইতেন। ব্রাহ্মণ ঋষিগণ যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির ন্যায়, যুদ্ধ কার্য্য, আহার্য্য আহরণ ও ব্যবসায় প্রভৃতি বিষয় কার্য্যে রত থাকিতেন, তাহা হইলে প্রাচীন ভারত সভ্য জগতে আদরণীয় হইত না। ভারতের ক্ষত্রিয়গণ বিপুল বিক্রমশালী ও যুদ্ধনিপুণ ছিলেন। এদেশের বৈশ্যগণও শিল্পকার্য্যে এরূপ দক্ষ হইয়াছিলেন যে, ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য জগতের সর্ব্বত্র আদৃত হইত এবং এখানকার শিল্পের অনুকরণেই ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানের শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। জাতিভেদ ছিল বলিয়াই যে, শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, একথা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্য ভগবানের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকার্য্যক্ষম হইতে পারে না; সুতরাং বিবিধ কার্য্যের জন্য মানব সমাজে শ্রেণী বিভাগের প্রয়োজন।

জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশেই, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, এবং বংশাবলীক্রমে সেই সকল বৃত্তির উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। কৃষকের পুত্র বাল্যকাল হইতেই কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিবার সুবিধা পায় বলিয়াই, যৌবনে সেই কার্য্যে পারদর্শী হইয়া উঠে। সেইরূপ, শিল্পকরের সন্তানও পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, তাহার উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়। পুরুষানুক্রমে এক বৃত্তির অনুশীলনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মস্তিষ্ক প্রভৃতির অংশ বিশেষও, সেই বৃত্তির সাধনানুরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।

জগতে বিভিন্নতাই যেন প্রাকৃতিক নিয়ম। ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে নানাজাতি দেখা যায়; কোন কোন জন্তু সুদৃশ্য ও বুদ্ধিমান, আবার কোন কোন জন্তু কদাকার ও নির্ব্বোধ। উদ্ভিদ জগতেও বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষলতা চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান। মনুষ্যও যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায়, হয়ত সকল মনুষ্য এক জাতিভুক্ত ছিল; প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনা হইতে মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি গঠিত হইয়া থাকে। ভারতের প্রকাণ্ড পর্ব্বত, নদী ও অপূর্ব্ব নৈসর্গিক ঘটনা দেখিয়া, আর্য্য ব্রাহ্মণগণ তদ্গতচিত্তে তাহাদের ও সৃষ্টিকর্ত্তার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এখানকার জমির শস্যোৎপাদিকা শক্তি এবং এখানকার বিস্তীর্ণ অরণ্যের বিবিধ বৃক্ষাদি দেখিয়া আর এক সম্প্রদায়, কৃষি ও শিল্পই সুবিধাজনক কার্য্য বলিয়া, সেইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল এবং পুরুষানুক্রমে তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া তাহার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। ফলতঃ, জাতিভেদই প্রাচীন ভারতের সকল বিষয়ের উন্নতির মূল কারণ ছিল।

তবে জাতিভেদ যে, নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির কারণ এবং ইহা দ্বারা উপকার ভিন্ন অপকার সাধিত হয় নাই, আমরা একথা বলিতে চাহি না। আর্য্যগণ প্রথমতঃ যে ভাবে চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম্ম ও শিক্ষা-কার্য্য, রাজ্যশাসন এবং শিল্প কৃষি ও বাণিজ্য সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হইত। ক্রমশঃ এক এক জাতির মধ্যে এত শাখা প্রশাখার উৎপত্তি হইল যে সকল বিষয়ের বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ও ধর্ম্ম বিষয়ে নানাবিধ বিভিন্ন মত হওয়াতে, হিন্দুরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল এবং একতার

অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রথমে যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, তাহাতে ব্রাহ্মণ সমাজের নেতা এবং ক্ষত্রিয়রাজা সমাজ রক্ষক ছিলেন। ক্রমে, ব্রাহ্মণেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হইল এবং রাজার সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইল; সুতরাং সমাজে ঈর্ষা, দ্বেষ, বিবাদ, বিসম্বাদ আরম্ভ হইয়া, একতারূপ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় লোক প্রসারিত হইয়া, বাস করিতে লাগিল ও স্ব স্ব বৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিল; এইরূপে, এক সমাজ হইতে শত সহস্র বিভিন্ন সমাজের উৎপত্তি হইয়া পরস্পরের পূর্ব্ব ভ্রাতৃভাব ও সহৃদয়তা লোপ পাইল। বাস্তবিক, প্রত্যেক জাতির বহুসংখ্যক শাখা প্রশাখা হওয়াতেই, আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, কুলীন, শ্রোত্রীয়, বংশজ প্রভৃতি বহুসংখ্যক শ্রেণী। ইহাদের মধ্যে বিবাহ হয় না ও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণও বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। এরূপ অবস্থায় সকল শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব ও সম্মিলন সম্ভবপর নহে বলিয়া মনে হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, জাতিভেদ আছে বলিয়া কি এদেশে জাতীয়তা অসম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অবস্থার পর্য্যালোচনা ও তুলনা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতে, হিন্দুরাজা ধর্ম্ম ও সমাজ-রক্ষক ছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণমন্ত্রীর পরামর্শ ও উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতেন; সকল জাতীয় প্রজা, ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও ক্ষত্রিয় রাজাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। রাজা ও প্রজা একই ধর্ম্মাবলম্বী এবং একই সমাজভুক্ত থাকায়, কোন বিষয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল না। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখন রাজা ইংরাজ, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী, প্রজাগণ হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতি ও নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজা আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। আমরা অবাধে আপন আপন ধর্ম্মকার্য্য ও সমাজকার্য্য করিতে পারি। তবে রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আমাদের একতা না হইবে কেন? রাজনৈতিক ব্যাপারে এবং শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে, হিন্দু, মুসলমান, পার্শি প্রভৃতি সকলেই সমদুঃখসুখভোগী; সুতরাং সেই সকল বিষয়ে সকলের সহানুভূতি থাকিয়া, একতাসূত্রে বদ্ধ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। দেশে সর্ব্বত্র রেলওয়ে বিস্তারিত হওয়াতে, পূর্ব্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমন কষ্ট সাধ্য নহে; আবার, ডাকের বন্দোবস্ত এবং সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় সকল জাতির লোক

অনায়াসে মিলিতে পারে এবং পরস্পরের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে। এখন জাতিভেদের কঠোরতারও অনেক হ্রাস হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে এক বিদ্যালয়ে একত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে ও অনেক সময় একত্রে বাস করে; তাহাতে তাহাদের জাতিগত বিদ্বেষ ভাব কমিয়া যায়। এই সকল কারণে বলা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে জাতীয়তা অসম্ভব নহে। যে জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

জাতিভেদ যে কেবল আমাদের দেশে আছে তাহা নহে। ইংরাজ প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে, জাতিভেদ পূর্ণমাত্রায় আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোন ইংরাজ ধনী, নির্ধন ইংরাজের সহিত একত্র বাস কি ভোজন করেন না। ধর্ম্ম বিষয়ে খ্রীষ্টিয়ানদের ভিতর বিলক্ষণ দলাদলি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রোটেষ্টাণ্ট, রোমান কাথলিক এবং জর্ম্মন লুথেরিয়ন এই তিন প্রধান খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায় সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিবাদে প্রবৃত্ত। ছোট নাগপুরে রাঁচী প্রভৃতি জেলায় এবং সাঁওতাল পরগণায়, কোন সাঁওতাল কিম্বা অন্য কোন আদিম অসভ্য জাতীয়কে খ্রীষ্টিয়ান করিবার জন্য, এই তিন সম্প্রদায়ের মিসনারীগণ যেরূপ বিবাদ করিয়া থাকেন, তাহা দেখিলে, তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া যায়, এবং তাঁহাদিগকে নীচ প্রবৃত্তি সঙ্কীর্ণমনা অধার্ম্মিক বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে বিবাদ বিসম্বাদ থাকিলেও. ইংরাজ প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানগণের মধ্যে যে জাতীয়তা ও একতা আছে, আমরা সর্ব্বদা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়া থাকি। তাহা হইলে, আমরা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও, কেন জাতীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিব না? বর্ত্তমান ভারতবর্ষে জাতীয়তা না হইলে, আমাদিগকে অচিরে অধঃপাতে যাইতে হইবে। বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জন লইয়া আজকাল যে আন্দোলন চলিতেছে ইহাতে সকল জাতিরই সহানুভূতি আবশ্যক। হিন্দুর মধ্যে যেমন শিল্পী আছে, মুসলমানও অপরাপর জাতির মধ্যেও শিল্পীর অভাব নাই। বিদেশীয় জিনিষের ব্যবহার জন্য, সকল জাতির শিল্পীর দুর্দ্দশা হইয়াছে; তাহাদের দুরবস্থা ঘুচিলে, দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে এবং আমরা নিশ্চয়ই সকলেই সমভাবে উপকৃত হইব। অতএব সকলেরই এই আন্দোলনে যোগদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং ইহা হইতেই জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই আন্দোলন যাহাতে স্থায়ী হয় ও কার্য্যে পরিণত

হয়, তাহার জন্য সকলেরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। আজকাল অনেক বিষয়ই জাতীয়তার অনুকূল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন জাতিভেদের কঠোরতা কতক কতক কমিয়াছে। আজকাল দেশের নেতাগণ বিভিন্ন জাতির লোক। ব্রাহ্মণ এখন শূদ্রকে নেতা বলিয়া গণ্য করে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সেরূপ বৈরীভাব নাই। এই সকল দেখিয়া আশা করা যায় যে, অচিরে ভারতবর্ষে জাতীয়তা বদ্ধমূল হইবে এবং আমাদের মনের সংকীর্ণ ভাব বিলুপ্ত হইবে।

জাতিভেদ ও ধর্ম্মভেদ স্বত্বেও ভারতবাসীদের ভিতর একতাসূত্র বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া, আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, আমরা সকলে মাতৃভুমির উন্নতির জন্য একত্র হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে ভ্রাতৃভাবে বিচরণ করিব। হিন্দুস্থানের অধিবাসী বলিয়া আর্য্যগণের ধর্ম্ম যেমন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তেমনই সমগ্র ভারতবাসীর একতা ও জাতীয়তা "ভারত ধর্ম্ম" বলিয়া অভিহিত হউক। এই নূতন ভারতধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তারের সুচারু বন্দোবস্ত আবশ্যক। যাহাতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী এই ধর্ম্মের উপাসক হয়, তাহার আয়োজন করিতে হইবে। মাতৃভুমি এই ধর্ম্মের উপাস্যদেবতা, স্বদেশপ্রেম ইহার মন্দির এবং "বন্দে মাতরম্" ইহার বীজমন্ত্র। প্রত্যেক জাতির লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতবিদ্য পারদর্শী ব্যক্তিগণ, এই সার্ব্বজনীন ভারতধর্ম্ম প্রচারক হউন এবং জাত্যভিমান ও পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া, সকলকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করুন। কলিকাতায় যে ফ্রেডারেশন হল (Frederation Hall) হইবে, ইহাকেই ভারতধর্ম্ম মন্দির নাম দিলে ভাল হয় ; এবং প্রতি জেলাতে ঐরূপ এক একটী হল প্রস্তুত হউক। এই নূতন ধর্ম্মোপাসকগণ মধ্যে মধ্যে সমবেত হইয়া, কি কি উপায়ে দেশের মঙ্গল হইবে, প্রাচীন ভারতের গৌরব রক্ষিত হইবে ও দেশীয় শিল্প ও কৃষির উন্নতি হইবে, এইরূপ বিষয় সকলের আলোচনা করিবেন। একটী জাতীয় ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। যাহাতে এই ভাণ্ডার স্থায়ী হয়, ইহার সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় এবং এই অর্থের সদ্‌ব্যয় হয়, সকলকে বিশেষরূপে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা এতদিন নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি এবং মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি, স্বদেশানুরাগে জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমরা যদি আবার মনুষ্যনামের যোগ্য হইতে চাহি, যদি পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হই, যদি ভারতের শিক্ষা ও শিল্প বজায় রাখিতে চাহি, তাহা হইলে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হইয়া, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই মহাবাক্যটী স্মৃতিপথে রাখিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আর বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া সময় কাটাইলে চলিবে না। ভারতের ত্রিশ কোটী লোক যে একদিনে একমত হইয়া, একযোগে কার্য্যারম্ভ করিবে, এরূপ আশা করা যায় না; আবার, রাজারও সহানুভূতি না থাকায়, আমাদের কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিতে পারে; তাই বলিয়া যেন আমরা ভগ্নোৎসাহ না হই। প্রথম প্রথম আমাদের উদ্যম নিষ্ফল হইলেও, পরে আমাদের জয় হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব, হে ভারতবাসী ভ্রাতৃগণ! এস, সকলে আমরা ভারতধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মাতৃভুমির হিতসাধন মহাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিই। আমাদের স্বাধীনতা নাই; বহুকাল বিদেশীয়দের পদদলিত হইয়া দুরবস্থার এক শেষ হইয়াছে; একতার অভাবই এই দুর্দ্দশার প্রধান কারণ; এস, আমরা সেই একতা মহাঅস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আমাদের পূর্ব্ব গৌরব রক্ষণে প্রবৃত্ত হই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই আমাদের এই একতা ও জাতীয়তার শিক্ষাগুরু; আমরা সেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি উপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইয়া, আমাদের সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্যাপন করিব, দেশের দরিদ্রতার অপনোদন করিব। ভগবান আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হউন। তাঁহার কৃপায় আমাদের কুসংস্কারগুলি দূরীভূত হইয়া, জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ও বদ্ধমুল হইবে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বীজশক্তি।

তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্বপানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন জঘন্য নহে।
হেমচন্দ্র।

শক্তি অনন্তরূপিণী; দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে শক্তির বিকাশ। এই বিকাশ বা রূপ অবলম্বন করিয়াই, মানবের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি; কিন্তু শক্তিতত্ত্ব এরূপ রহস্যময় ও জটিল যে, তাহার মূল অনুসন্ধানে সক্ষম হওয়া অল্পায়ু মানবগণের অসাধ্য।

পুরাকালে ভারতের ঋষিগণ আশ্রমে বাস করিয়া, শক্তিতত্ত্বের তথ্য সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন। এক একজন মহর্ষির বহুসংখ্যক শিষ্য থাকিতেন। সুনিয়ম সহায়ে তাঁহাদের দীর্ঘ জীবন লাভ হইত; সাংসারিক দুশ্চিন্তার অভাবে এবং ধর্ম্মাচার অবলম্বনে, তাঁহাদের একাগ্রতা বৃদ্ধি ও চিন্তাশক্তির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইত। এরূপ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মানব-শ্রেষ্ঠগণের দীর্ঘজীবনব্যাপী চিন্তাপ্রসূত তত্ত্ব সকল যে, অতি বিস্ময়কর, অন্যের দুর্ব্বোধ্য ও অতি গভীর ভাবপূর্ণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই মহর্ষিগণ আবার, তাঁহাদের জীবনার্জ্জিত তত্ত্বসম্পত্তি শিষ্যগণকে দান করিয়া যাইতেন। শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যিনি গুণশ্রেষ্ঠ, তিনিই যে, গুরুর বিশেষ কৃপাপাত্র হইতেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এই উপযুক্ত শিষ্য, গুরুদেবের আসন গ্রহণ করিয়া, সেই তত্ত্ব সকলের গবেষণায় জীবন উৎসর্গ করিতেন; গুরুদেব জীবনের অন্তিম সময় পর্য্যন্ত যতদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, অগ্রসর হইতে থাকিতেন। এই গুরুশিষ্যপরম্পরারূপে, বহু সহস্র বর্ষব্যাপী সাধনায়, তাঁহারা শক্তিতত্ত্বের যে অনির্দ্দেশ্য উচ্চতম সোপানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তুলনায় কীটানুকীট সম, অল্পায়ু, একাগ্রতাবিহীন, একজীবনব্যাপী সাধনাসাপেক্ষ, আধুনিক মানবের পক্ষে ততদূর অগ্রসর হওয়া নিতান্ত অসম্ভবপর।

কিন্তু, যখন অসাধ্য বা অসম্ভবপর ব্যাপারও জগতে সংঘটিত হয়, তখনই আমরা, আমাদের ধারণা ভ্রমাত্মক বুঝিয়া, তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব, প্রহ্লাদও ভগবত্তত্ত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহর্ষিগণ আচরিত আজীবন সাধনায়ও যাহা দুঃসাধ্য, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর তাহা সাধ্য হইল কিরূপে? সত্যই কি ইহার কোন কারণ নাই? কার্য্যমাত্রই যখন কারণসম্ভূত, তখন ইহাও অবশ্যই কারণ-সাপেক্ষ। এই কারণ—বীজশক্তি। দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপু পূর্ব্বজন্মে ভক্তিভাবে এবং দৈত্যজন্মে, শাপ-বশতঃ বিদ্বেষবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, অহর্নিশি বিদ্বেষভাবেই হরিচিন্তাপরায়ণ ছিলেন। স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র রাজা উত্তানপাদ, মোহবশে ঐশ্বর্য্যমুগ্ধ থাকিলেও, অন্তরে ভগবচ্চিন্তার অবসর প্রতীক্ষা করিতেন। বিশালাকৃতি অশ্বত্থ তরু হইতে সংগৃহীত বীজ, প্রতিকূল উপাদান পরিবেষ্টিত হইয়া, সেরূপ সুদীর্ঘ অবয়বসম্পন্ন বৃক্ষে পরিণত না হইলেও, গুল্ম বা তৃণে পরিণত হয় না; এই ক্ষুদ্রকায় বৃক্ষজাত বীজ আবার, অনুকূল উপাদান সহায়ে,

প্রথমোক্তরূপ বিশাল দেহপ্রাপ্তে সক্ষম হয়। অণুপরিমাণ ক্ষুদ্রায়তন হইলেও, ভিন্ন উপাদান পরিবেষ্টিত হইলেও, জীবিতসত্ত্বে বীজশক্তির আত্মবিকাশ ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয় না। * একই ক্ষেত্রে, একই সময়ে বপন করিলেও, অশ্বত্থ বীজ হইতে কপিথ, বা আম্রবীজ হইতে উড়ুম্বররক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না।

কালবশে, কর্ম্মফলে, ঘটনাচক্রে, ভাগ্যদোষে ও দৈব বিড়ম্বনায় হিন্দুসন্তান আজ অধঃপতিত। এই অধঃপাত দর্শনে সংক্ষুব্ধ-অন্তর পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় "হৃদয়ের আবেগ" প্রকাশ করিয়াছেন। * তিনি মহামহোপাধ্যায় ও পূজনীয়, তাঁহার কথা অবশ্যমান্য ও অনুসরণীয় এবং প্রতিবাদ-স্থানীয় নহে। কিন্তু আবেগ-জনিত উক্তি, অনেকস্থলে কতক পরিমাণে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে; তিনিও "কথাটি বোধ হয় আজও অনেকেরই প্রীতিকর হইবে না" বা কতকটা অসাময়িক হইবে বলিয়া আভাষ দিয়াছেন; নচেৎ, তাঁহার কথা অপ্রীতিকর হয় বলিয়া আমরা জানি না। সেই জন্যই আমরা তাঁহার উক্তির সমালোচনায় সাহসী হইয়াছি। আবেগবশে তিনি বলিয়াছেন "আমরা ইদানিং নূতন এক মানুষে পরিণত হইয়াছি।" সত্যই কি তাই? হিন্দুর হিন্দুত্ব ঘুচিয়া গিয়া, সত্যই কি চূণাগলির ফিরিঙ্গিসম অপর জাতীয়ত্বে পরিণত হইয়াছে? ফিরিঙ্গি, দায়ে পড়িয়া এদেশবাসী হইলেও, তাহাদের লক্ষ্যস্থল বিলাত। † সমগ্র ভারতীয়গণও কি বিলাতকেই আপনাদের স্পৃহনীয় আবাসভূমি স্থির করিয়াছে? আমরা ভ্রমেও এরূপ কল্পনা করিতে পারি না। আচার, ব্যবহার প্রভৃতি অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইলেও, ভারতকেই হিন্দু মুসলমান জন্মভূমি বলিয়া, চির আবাসভূমি বলিয়া স্থির জানে। হিন্দুর হিন্দুত্ব, অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইলেও, আশ্রমবাসী মহর্ষি-গণের বহু সহস্র বৎসরব্যাপী সাধনাসম্ভূত হিন্দু বীজশক্তি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, সুতরাং এখনও বিকাশ-বাসনা-বিরহিত হয় নাই! এখনও দেশে তর্ক-চূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় হিন্দুকুলরত্নের অভাব হয় নাই; এখনও ব্রাহ্মণমণ্ডলী উপবীত পরিত্যাগ করেন নাই; এখনও ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না; এখনও শিল্পীকুল জাতীয়বৃত্তি পরিত্যাগে উৎসাহ প্রকাশ করে না; এখনও দ্বারস্থ ভিক্ষুক বা অতিথি বিমুখ হইলে, গৃহস্থ আপনাকে প্রত্যবায়ভাগী বলিয়া বিবেচনা করে; এখনও দেশে দেবার্চ্চনা

* "বঙ্গবাসী" ১৮ই কার্ত্তিক।

† বা ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া।

লোপ পায় নাই; এখনও হিন্দুগৃহে সতীনারী গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজিতা; হিন্দুতরু খর্ব্বাকৃতি হইলেও পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পতিভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ প্রভৃতি সুরভি কুসুমরাজি-বর্জ্জিত হয় নাই; অতিথি-সৎকার, দয়া, দাক্ষিণ্য, দেবতায় আস্থা প্রভৃতি সুফল প্রসবে একেবারে ক্ষান্ত হয় নাই; এখনও হিন্দু আপনাকে হিন্দু সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদানে গর্ব্বিত বোধ করে; তবে তাহারা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে একেবারে অনধিকারী কেন?

কবিবর হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটাও?"

"প্রহরী পাহারা" রূপধারীগণের মধ্যেও, সামান্য মুষ্টিমেয় বিকৃত-মস্তিষ্ক জনকয়েকমাত্র আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়া, সমগ্র দেশবাসী এখনও স্বদেশী আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই। নিতান্ত উন্মাদগ্রস্ত হিন্দুরও অনেকে অখাদ্য ভোজনকে ঘৃণিত বলিয়া বোধ করে; যৌবন-চাপল্য-সুলভ ভ্রান্তিক্রমে, হিন্দুপিতা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সন্তানগণের হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হয়; তাঁহারাও স্বদেশী পরিচ্ছদ পরিধানে আগ্রহ প্রকাশ করেন ও এখনও করিতেছেন; তথাপি দেশবাসী স্বদেশী পরিচ্ছদ ব্যবহারে অনধিকারী? তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের এ যুক্তির সারবত্তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তাঁহার আশা উচ্চ ও সঙ্কেতও তদনুরূপ, তাহা আমরা বুঝি; কিন্তু অস্থি-চর্ম্ম-সার দুর্ব্বলের পক্ষে উল্লম্ফন চেষ্টা কি যুক্তিসঙ্গত? পুরাতন বিলুপ্ত-প্রায় শিল্পাদির পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়া ও নূতন শিল্পাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দেশের অন্ন সংস্থানের পথ যদি উন্মুক্ত হয়, সমাজের সুশৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত হইয়া, দেশে যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনর্ব্বার সংস্থাপিত হয়, তবেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা, তাহা আমরা বুঝি; কিন্তু এই স্বদেশী আন্দোলন কি তাহার প্রধান সহায় নহে?

এই আন্দোলনের মূল কারণ তিনি জানিতে চাহিলেন কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা কি কাহারও অবিদিত? দরিদ্রের মুখের গ্রাস বিদেশী বণিক কাড়িয়া লইতেছে, শিল্পীকুল অবলম্বন বিহনে উৎসন্ন যাইতেছে, অত্যধিক করভারে দেশ প্রপীড়িত হইতেছে, ইহা কেহ কি উপলব্ধি করে

নাই? এই আন্দোলন সহায়ে ইহার প্রতিবিধান চেষ্টা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে বলিয়া, ইহার পূর্ব্বে সে চেষ্টাজনিত কোন কার্য্য কি অনুষ্ঠিত হয় নাই? বঙ্গ-বিভাগ-ব্যপদেশোৎপন্ন আন্দোলন-বাত্যা দেশের এই দুরবস্থা প্রতিবিধান সংকল্প-বহ্নির ভস্ম মাত্রকেই অপসারিত করিয়াছে; কিন্তু এই বহ্নি আরও অনেক দিন পূর্ব্বে দেশময় উৎপন্ন হইয়াছে।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, সেই হেতু "দেশীয় সামগ্রী", "দেশীয় শিল্প, প্রভৃতি ধ্বনি তাঁহার "শ্রবণ বধির" করিতেছে, কিন্তু অনেকেরই কর্ণে ইহা যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে; তাঁহারা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছেন, যেন এই ধ্বনি উত্তরোত্তর আরও প্রবল হয়, ইহার বিরাম যেন ভারতীয়-গণের জীবনে আর সংঘটিত না হয়। তিনি এই আন্দোলনে আশ্চর্য্যবৎ হইতেছেন, কিন্তু অনেকে আবার ইহাতে আনন্দে উন্মত্তবৎ হইতেছে।

তাই বলি ভগবন্! এ সময়ে তুমি নৈরাশ্য-গীতি গাহিও না। এক সময়ে, তোমার উপদেশে কত বিকৃত-মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, কিন্তু তোমার নৈরাশ্য গীতি কিছুতেই এ সময়ের উপযোগী হয় নাই, তাহা তুমি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছ। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া উপদেশ প্রদান কর; দেশ এবং পাত্রের নীচাংশই তোমার লক্ষ্য হইয়াছে; কিন্তু পাত্রের অপরাংশ ও কালের প্রশ্ন তোমার আবেগোক্তিতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই কেন?

উদরান্নের সংস্থান হইলে মস্তিষ্ক পূর্ব্ব প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে, অপ্রতিকূল উপাদান পাইলে হিন্দু বীজশক্তি পুনর্বিকাশের অবসর প্রাপ্ত হইবে।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

(২)

বিষম সমস্যার অবস্থা উপস্থিত; যুদ্ধ বিগ্রহে জয় পরাজয়ের ন্যায়, এই আন্দোলনে সফল বা নিষ্ফল হওয়ার উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে; দেশের কুলাঙ্গারগণ ইহা বুঝেন নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করেন না এবং চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহাদের দেশ স্বতন্ত্র, ভাব স্বতন্ত্র ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র, স্বীয় অরণ্য গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহারা জম্বুক-রাজ; দেশের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক নাই। পৃথিবীর লোক ইহাকে "বঙ্গের আন্দোলন" নাম

দিয়াছে; এরূপ আন্দোলনে দেশের অবশ্যম্ভাবী সুফল উপলব্ধি করিয়া, বিভিন্ন প্রদেশের, এমন কি সুদূর ভুটান, আফগানিস্থান ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের অধিবাসীগণও ইহার অনুসরণ করিতেছে; দেশ বিদেশের চিন্তাশীল মনীষিগণ ইহার সাফল্যে উৎসাহ প্রকাশ ও অসাফল্যে দেশের নিশ্চিত অমঙ্গল সুচনা করিতেছেন, আর এই কূপমণ্ডুকগণ চতুর-চূড়ামণির ন্যায় আপনাদিগকে ইহার সম্পর্ক-বিরহিত বলিয়া স্থির জানিয়া নিশ্চিন্ত, বা ইহাকে নিতান্তই কুফলপ্রদ স্থির করিয়া, ইহার বিনাশে বদ্ধ পরিকর হইয়া আছেন। কাণ্ড-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত, অব্যবস্থিতচিত্ত, হৃদয়হীন কিম্বা স্বার্থান্ধ কোন রাজকর্ম্মচারীকে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক দেশের সুপুত্রগণের প্রতি অত্যাচার পরবশ দেখিয়া, এই বিভীষণ-কুলধর্ম্মীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন এবং স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থানুকূল যুক্তির সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া দশন-পংক্তি-শোভা বিস্তারিত করিতেছেন। তাঁহারা দেশের শত্রু, দেশবাসীর তাঁহারা বিমাতৃসন্তান, সুতরাং তাঁহারা দেশবাসীর দৃষ্টির সুদূরেই অবস্থিতি করুন।

কিন্তু, দেশের কুলরত্ন ও কুলপ্রদীপগণেরও কি সকলে আমাদের অবস্থা বুঝিতেছেন? যদি বুঝিয়া থাকেন তবে কৃতকার্য্য হইবার জন্য তাঁহাদের উপযুক্ত উদ্যোগ কোথায়? অনেকস্থলে কতক কতক হৈ চৈ হইলেও কতকগুলিস্থান যে বিশেষ নিস্তব্ধ; এবং প্রকৃত কার্য্যের আয়োজন যে অতি অল্প স্থানেই হইতেছে। অনেক লোক দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে কৃতনিশ্চয় হইলেও, দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা যথেষ্ট হইতেছে না। দেশের লোকের এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না থাকিলে, এই আন্দোলন যে নিষ্ফল হইবে, জগতের নিকট দেশ যে ঘৃণিত ও উপহাসাস্পদ হইবে, দেশের অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ শোচনীয় হইবে, দেশ যে পূর্ব্বাবস্থা হইতে অন্ততঃ এক শতাব্দি পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা অনেকে কি উপলব্ধি করিতেছেন না? দেশের মুখে চূণ কালি পড়িবার ভয়, কুলাঙ্গারগণেরই নাই; কিন্তু অবশিষ্টগণের তাহা নাই কেন? তাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ, স্বার্থত্যাগ ও অকাতর পরিশ্রম যে এক্ষণে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না কেন? দেশময় সর্ব্বসাধারণকে ইহা বুঝাইয়া দিতেছেন না কেন? জনকয়েক প্রধান নেতা প্রকৃত কার্য্যের জন্যও বদ্ধ পরিকর হইয়া বিপুল পরিশ্রম করিতেছেন; ছাত্র-বৃন্দ প্রাণপণে এই আন্দোলন সজীব রাখিতে সচেষ্ট; কিন্তু অবশিষ্টগণ তদ্রূপ উৎসাহপূর্ণ হন নাই কেন? বারোয়ারি কিম্বা কোন ক্রিয়াকাণ্ডে যে পাণ্ডার

দলে উৎসাহের অভাব থাকে না, আহার নিদ্রার অবসর থাকে না, পরিশ্রমে কাতরতা প্রকাশ পায় না, দেশের অন্ন বস্ত্র সংস্থানের উপযোগী এই অবশ্য-কল্যাণকর মহদনুষ্ঠানে, সেই সকল লোকের তদনুরূপ উৎসাহ ও ক্ষিপ্রকারিতা নাই কেন? জন কয়েকের চেষ্টাই কি এই মহাযজ্ঞে যথেষ্ট হইবে? জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, ঠিক সেইরূপ চেষ্টা যে নিতান্ত প্রয়োজন। আর কালবিলম্বের অবসর নাই; এইক্ষণে দেশের লোক উদ্যোগী না হইলে, আমাদের আশা কিছুতেই ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভাই স্বদেশী! যদি তুমি সত্যই আমাদের স্বদেশী হও, যদি দেহের রক্ত, মাংস, অস্থি ও হৃদয় পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া না থাক, তাহা হইলে আর নিশ্চেষ্ট থাকিও না; আর পরমুখাপেক্ষী থাকিও না, নিজে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; অপরে নিশ্চিন্ত আছে দেখিয়া, তুমি তোমার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না। "আমার দ্বারা আবার কি কার্য্য সাধিত হইতে পারে?" এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগ্ন-হৃদয় হইও না। তোমার দ্বারা কি কার্য্য সম্ভব, তাহা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেখ, অপরকে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা কর, নিজে দৃষ্টান্ত-স্থানীয় হইয়া, অপরকে কার্য্যের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও।

কালি।

—*—

আমরা যতগুলি কালি ব্যবহার করিয়াছি, সকল গুলিতেই একটী না একটী দোষ পাইয়াছি। ইহার কারণ, যাঁহারা কালি তৈয়ার করেন তাঁহা-দিগের মধ্যে বিজ্ঞানবিদ্ অতি অল্পই। যাঁহারা এই ব্যবসা করেন, হয়ত তাঁহারা কোন লোকের নিকট শুনিয়া শিখিয়াছেন, বা নানা প্রকার চেষ্টা করিতে করিতে এক প্রকার স্থির করিয়া লইয়াছেন; এই জন্য কোনপ্রকার কালিই দোষশূন্য হয় না। আমরা বাল্যকালে চাউল চোঁয়াইয়া কালি করিতাম। পুঁথিলেখার জন্য অনেক পণ্ডিত আজিও ঐপ্রকার কালি করিয়া ল'ন।

ভাল কালি, লিখিবার সময় কলম দিয়া সহজেই সরিয়া আইসে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে, ইহার দ্বারা ধাতুময় কলমের মুখে মরিচা পড়ে না, বা কাগজ নষ্ট হয় না, এবং উৎকৃষ্ট কালি বোতলে পুরিয়া

রাখিলে, তলায় থিতাইয়া পড়ে না। সাধারণ কালিতে হাওয়া লাগিলে থিতাইয়া পড়ে। যে কালি দিয়া দলিল প্রভৃতি লেখা হয়, তাহা ধুইয়া ফেলা যায় না, বা স্পিরিট দিয়া রগড়াইলে লেখা উঠিয়া যায় না।

কালি দুইপ্রকার প্রথম প্রকার কালি দ্বারা কাগজ রঞ্জিত হইয়া যায়, অর্থাৎ কাগজে রং লাগিয়া যায়, দ্বিতীয় প্রকার কালি কাগজের উপরিভাগে প্রলেপের ন্যায় জমিয়া যায়।

কালির প্রধান উপকরণ মাজুফল, হিরাকস এবং গঁদ; এইগুলি যিনি যেরূপ বিবেচনা করেন, সেইরূপ ভাগে মিলাইয়া লইয়া থাকেন।

মাজুফল থেঁতো করিয়া কুটিয়া, জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়; ভিজিয়া যাইলে, অল্প আঁচে সিদ্ধ করিতে হয়, যেন টগবগ করিয়া না ফুটে এই প্রকারে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া লইয়া, গঁদ ও হিরাকস মিলাইতে হয়, তাহা হইলেই কালি তৈয়ার হইল।

আমাদিগের কালি, চাউল চোঁয়াইয়া তৈয়ার হয় বলিয়া, সহজে নষ্ট হয় না; চাউল পোড়া কয়লার রং নষ্ট হইবার নহে। কিন্তু অধিক ব্যয়-সাধ্য বলিয়া সচরাচর ব্যবহার করা চলে না।

সাধারণ ব্যবহারের জন্য মাজুফল ও লোহা এবং অন্যান্য দ্রব্য সংযোগে যে কালি তৈয়ার হয় তাহা মন্দ নহে; ছাপাখানার জন্য যে কালি ব্যবহার হয় উহার বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

কালি তৈয়ার করিয়া দুই তিন মাস পর্য্যন্ত রাখিয়া দিলে, কালির রং ভাল হয়, পূর্ব্বে এই প্রকার কালি তৈয়ার করিয়া রাখা হইত; ক্রমে হাওয়া লাগিয়া পাকা কালি হইত; কিন্তু সম্প্রতি দমকল দিয়া হাওয়া দিয়া ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে ঐ কার্য্য সমাপন হইতেছে। একটি টবের ভিতর বহুছিদ্র একটি নল রাখিয়া, টবে কালি পরিপূর্ণ করিতে হয় এবং দমকল দিয়া জোরে ২।৩ ঘণ্টা বায়ু প্রবেশ করাইয়া দিলে কালির মধ্য দিয়া ভড় ভড় করিয়া বায়ু বাহির হইতে থাকে। এই প্রকারে অতি সহজে একটব কালির পাকা রং হইয়া থাকে।

সম্প্রতি এনিলীন নামক এক প্রকার রং আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহা পাথুরিয়া কয়লা হইতে উৎপন্ন। আমরা সচরাচর যাহাকে ম্যাজেণ্টা বলিয়া থাকি, উহাই এনিলীন। ঐ রং লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানাপ্রকার পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা মন্দ কালি হয় না।

যে কোন এনিলীন রং ১৫ ভাগ, ১৫০ ভাগ স্পিরিটে গুলিয়া (অবশ্য কাচ পাত্রে) ২।৩ ঘণ্টা রাখিয়া দিতে হয় ও মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিতে হয়; যেন উত্তম রূপে গলিয়া যায় পরে ১০০০ ভাগ পরিশ্রুত জল মিলাইতে হয়। পরিস্রুত জল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়, ইহার প্রস্তুত প্রণালী পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

জল মিলান হইলে, অল্প উত্তাপে উহা জ্বাল দিতে হইবে; বহুক্ষণ জ্বাল দিতে দিতে, স্পিরিটের রং একেবারে উপিয়া যাইবে। এই সময় গঁদের জল মিশাইয়া দিলেই উৎকৃষ্ট কালি হইবে। গঁদের জল করিতে হইলে ৬০ ভরি আরবী গঁদের গুঁড়া ২৫০ ভাগ জলে ভিজাইয়া, উত্তমরূপে গুলিয়া লইলেই হইল।

কিন্তু বেগুনি রঙ্গের কালি তৈয়ারি করিতে হইলে বিশেষ প্রকরণ চাই—

বেগুনি রং	॥০ আউন্স
স্পিরিট	১ "

একটি শিশিতে ভিজাইয়া অন্ততঃ ৩ঘণ্টা রাখিয়া, সময় সময় নাড়িতে হইবে। গলিয়া যাইলে, উহাতে বড় বোতলের ১ বোতল পরিশ্রুত জল মিলাইতে হইবে। জল দেওয়া হইলে অল্প উত্তাপে উহা জ্বাল দিতে হইবে। বহুক্ষণ ধরিয়া জ্বাল দিতে দিতে স্পিরিটের গন্ধ একেবারে থাকিবে না। আরবি গঁদ ২ ড্রাম, অর্দ্ধ বোতল জলে পূর্ব্বের ন্যায় গুলিয়া রাখিতে হইবে পরে; যখন থিতাইয়া যাইবে, তখন এই গঁদের জল ঐ কালির উপর ঢালিয়া দিতে হইবে। কালি ঘন হইলে উহাতে কিঞ্চিৎ পরিশ্রুত জল মিলান উচিত।

কালি প্রস্তুতের অপর প্রক্রিয়া।

(১)

মাজুফলের গুঁড়া	৪২ আউন্স
গঁদ সিনিগেল গুঁড়া	১৫ "
পরিশ্রুত বা বৃষ্টির জল	১৮ বোতল
লাইকার এমোনিয়া	৩ ড্রাম
স্পিরিট অব ওয়াইন	২৪ আউন্স

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি কোন পাত্রে গুলিয়া, নাড়িতে নাড়িতে ক্রমে ঘন কৃষ্ণ

বর্ণ হইয়া আসিবে। হীরাকস না থাকায় এই কালি ষ্টীল পেনকে নষ্ট করে না ও সহজে কলমের মুখ দিয়া নির্গত হয়।

(২)

মাজুফল চূর্ণ	১ সের
হিরাকস	৩ পোয়া
আরবি গঁদ	১০ তোলা
ভিনিগার বা সির্‌কা	২ বোতল (বড়)

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি ১৬ সের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ৮।১০ দিন পরে ছাঁকিয়া লইলে উৎকৃষ্ট কালি হইবে।

(৩)

এক্‌ষ্ট্র্যাক্ট লগ্‌উড্‌	১০০ ভাগ
চূণের জল	৮০০ "
কার্বলিক এসিড	৩ "
হাইড্রোক্লোরিক এসিড (বাজারে)	২৫ "
পরিশ্রুত জল	৬০০ "
আরবি গঁদ	৩০ "
পটাস বাইক্রমেট	৩ "
পরিশ্রুত জল সর্ব্বসমেত	১৮০০ "

এক্‌ষ্ট্রাক্ট্‌ লগ্‌উড্‌ চূণের জলে গুলিয়া (পাথরের খোরায়) উত্তমরূপ নাড়িতে ও গরম করিতে হইবে।

ডি, এন, কর্ম্মকার।

ভারতের বহির্বাণিজ্য।

(১৯০৪—০৫ সাল)

বিগত বর্ষের ভারতের বহির্বাণিজ্য বিবরণী নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ঐ বৎসর (গবর্ণমেণ্টের আমদানি দ্রব্য, ও স্বর্ণ, রৌপ্য, অলঙ্কার প্রভৃতি বাদে) প্রায় ৯৬ কোটী টাকার দ্রব্য বিদেশ হইতে আনীত ও প্রায় ১৫৮ কোটী টাকার দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা, এই ক্রয়ের

পরিমাণ প্রায় ১২ কোটী টাকা ও বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৪ কোটী টাকা অধিক হইয়াছে।

গত বর্ষের সরকারী বাণিজ্য তালিকা দৃষ্টে প্রথমতঃ মনে হইবে যে, আমদানি বাদে রপ্তানির উদ্বৃত্ত প্রায় ৬২ কোটী টাকা আমাদের দেশের ধন বৃদ্ধি করিয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আফিম ও লবণের ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের, অনেকগুলি শিল্প ও কৃষি বিদেশীয়গণ পরিচালিত; এবং অধিকাংশ আমদানি ও রপ্তানি বিদেশীয়গণের হস্তে নিহিত। রপ্তানি দ্রব্যের লাভ তাঁহারা ভোগ করেন, এবং আমদানি দ্রব্য অনেক অধিক মূল্যে দেশীয়গণকে বিক্রয় করেন; সুতরাং "শাঁখের করাত" রূপ বিদেশীয়গণই "যেতে কাটেন, আস্‌তে কাটেন"; সেই হেতু, এই বাণিজ্য তালিকা দেশের ধনবৃদ্ধি সূচিত করে না।

উদ্বৃত্ত এই ৬২ কোটী টাকা মূল্যের রপ্তানী দ্রব্য হইতে, ৬২ কোটী টাকা মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, অলঙ্কার প্রভৃতি (রপ্তানি বাদে) আমদানি হইয়াছে; এবং অবশিষ্ট ৩৬ কোটী টাকা উপার্জ্জিত হইয়াছে।

প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বাণিজ্য দ্রব্যগুলিকে আমরা প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি।

অপ্রয়োজনীয় বা প্রায় অপ্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যের পরিবর্ত্তে, সেইরূপ কতকগুলি দ্রব্য আমদানি হইয়াছে; প্রয়োজনীয় দ্রব্য রপ্তানি করিয়া প্রায় তুল্যরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছে; কিন্তু আমাদের জীবন-ধারণোপযোগী অবশ্য-প্রয়োজনীয় তণ্ডুল গোধূমাদির বিনিময়ে সেইরূপ অবশ্য-প্রয়োজনীয় প্রায় কোন দ্রব্যই বিদেশ হইতে আসে নাই। ৭০ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকার অন্ন ও বস্ত্রোপকরণ বিদেশে পাঠাইয়া, তৎপরিবর্ত্তে প্রায় ৩৭ কোটী টাকার বস্ত্রোপকরণ ও ৭১ লক্ষ টাকার লবণ আমদানি করা হইয়াছে; অবশিষ্ট প্রায় ৩৩ কোটী টাকা মূল্যের জীবনোপায় বিক্রয় করিয়া, আমরা রাজকর প্রভৃতির ব্যয় সঙ্কুলান করিতে বাধ্য হইয়া, দেশ মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছি। লর্ড কর্জ্জন ও ভারত বগর্ণমেণ্ট, এই বাণিজ্য তালিকা দেখাইয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের দেশের ধন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তাহার উপযুক্ত-রূপ সাক্ষ্য প্রদান করে না।

এই বাণিজ্য তালিকা আমাদের অদূরদর্শিতা প্রতিপন্ন করিতেছে। পূর্ব্ব

পূর্ব্ব বৎসরের বাণিজ্য তালিকা দেখিলে জানা যায় যে, আমাদের জীবনোপায় বিক্রয়ের পরিমাণ যেমন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রয় পরিমাণও সেইরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে। যাহারা অন্নের কাঙ্গাল, তাহারা সেই অন্ন-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে বিলাসোপকরণ বা নিতান্ত অনাবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিতে লজ্জা বোধ করে না; প্রায় ২ কোটী টাকার মদ, ১ কোটী টাকার উপর কাচের দ্রব্য, ২৮ লক্ষ টাকার খেলানা, ২৭ লক্ষ টাকার সাবান, ৩৫ লক্ষ টাকার সিগারেট, ২৯ লক্ষ টাকার মাটীর জিনিস, ১৭ লক্ষ টাকার এনামেল বাসন প্রভৃতি নানাবিধ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসোপযোগী দ্রব্যের আমদানি এই অন্নক্লিষ্ট দেশে শোভা পায় না।

আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণ চিনি ও লবণ উৎপন্ন হয়; সুতরাং বিদেশ হইতে আমদানি করিবার কোন কারণ নাই। ইহাতে ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই নষ্ট হয়। দেশের লোক কার্য্যে এরূপ ব্যস্ত নহে যে, আপনাদের পরিধেয় প্রস্তুত করিবার সাবকাশ প্রাপ্ত হয় না; তবে ১৭॥০ কোটী টাকার তুলা, ২ কোটী টাকার পশম ও ৫০ লক্ষ টাকার রেশম বিক্রয় করিয়া প্রায় ৩৪ কোটী টাকার কার্পাস-বস্ত্র, ৩ কোটী টাকার পশম-বস্ত্র, ও ২ কোটী টাকার রেশম-বস্ত্র বিদেশ হইতে প্রস্তুত করাইয়া আনিবার কোন আবশ্যকতা নাই; এই সকল বস্ত্র উৎপাদনের পারিশ্রমিক ও লাভ, দেশের লোকের উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি নাই। ১৪ লক্ষ টাকার শিং রপ্তানি হইয়া, আমাদের জন্য বোতাম, চিরুণী, খেলানা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে; প্রায় দশ কোটী টাকার চর্ম্ম রপ্তানী হইয়া, আমাদের ও অপর নানা দেশের জন্য জুতা ও বিবিধ চর্ম্ম-দ্রব্য বিদেশে প্রস্তুত হইতেছে। প্রায় ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের খোল, হাড় ও নানারূপ রাসায়নিক জমীর সার (সোরা প্রভৃতি) প্রভৃতি রপ্তানী হইয়া দেশের জমীকে অনুর্ব্বর করিতেছে। তৈল-বীজ, পাট প্রভৃতি বিক্রয় লব্ধ অর্থে স্বর্ণ রৌপ্যাদি আমদানি করিয়া অস্থি-চর্ম্মসার শরীরকে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা হইতেছে ও খনিজ তৈল ব্যবহারে চক্ষুর ও দেহের স্বাস্থ্য-হানি উৎপাদিত হইতেছে। দেশে ধাতু-খনির অভাব নাই; তথাপি বিদেশ হইতে প্রায় ১০।১২ কোটী টাকা মূল্যের লৌহ, ইস্পাত, তাম্র, দস্তা প্রভৃতি ধাতু ও যন্ত্রাদি ক্রয় করা হইতেছে। প্রায় ৪॥০ কোটী টাকা মূল্যের লাক্ষা, নীল, হরীতকী প্রভৃতি বিদেশে নীত হইয়া, সেখানে আমাদের ও অপর নানা দেশের জন্য রং প্রস্তুত হইতেছে। আমরা এই

সকল দেখিয়া শুনিয়াও "হা চাকরী, হা অন্ন" করিয়া কুক্কুরের ন্যায় লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছি। দেশে লোকের অভাব নাই, উপাদানেরও অভাব নাই; তথাপি আমরা পরমুখাপেক্ষী। আপনাদের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দেশেই উৎপন্ন করিয়া ব্যবহার করিব, তাহাতেও আমাদেরই কুলাঙ্গারগণ বাধা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর। এরূপ হতভাগ্য দেশ কি পৃথিবীর অপর কুত্রাপি সম্ভবপর?

দেশের এই বাণিজ্য তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, কৃষিই আমাদের প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। ১৫৭ কোটী টাকার রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে প্রায় ১১০ কোটী টাকার কৃষি-জাত দ্রব্য; দেশীয় ও বিদেশীয়গণ চালিত, কতকগুলি বিদেশ-সৃষ্ট মিল হইতে প্রস্তুত, প্রায় ২৩ কোটী টাকার কার্পাস ও পাটের দ্রব্য প্রভৃতির উপাদান গুলি কৃষিজাত। সুতরাং লর্ড বেন্টিঙ্কের সময় গবর্ণমেণ্ট সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে তাহা প্রায় বর্ণে বর্ণেই কার্য্যে পরিণত হইয়া আসিতেছে। *

কিন্তু এই কৃষির উন্নতি সাধনেও আমরা সচেষ্ট নহি। কতকগুলি কৃষি বিদেশীয়গণ পরিচালিত এবং ক্রমশঃ আরও কতকগুলি কৃষি ইহারা অধিকার করিতে আসিতেছে। অতি স্বল্পকাল মধ্যেই, হলচালন ও ভারবহনই আমাদের অবলম্বনীয় হইবার উপক্রম হইয়া উঠিতেছে। তথাপি আমরা "থাই, না খাই, মজায় আছি," পেটে ভাত নাই, কিন্তু আদেশ মাত্র বিদেশীয় বণিকগণ, আমাদের অন্ন বিনিময়ে বিবিধ বিলাসোপকরণ আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। বাহিরের লোক দেখিলে মনে করে—ইহাদের আবার দুঃখ কি? কিন্তু আমাদের দেশের লোক বিলক্ষণ বুঝিতেছে, আমরা সব সুখেই আছি, কেবল "যে দুঃখ অন্ন ও বস্ত্রের"। এ অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইবে না? কৃষি ও অরণ্যজাত খনিজ এবং প্রাণীজ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি, আমাদের দেশের লোকদ্বারাই, ব্যবহারোপযোগী শিল্প-জাতে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষায়, এই বাণিজ্য তালিকা প্রদর্শিত হইতেছে। আমাদের আশা কি কিয়ৎ পরিমাণেও সুফল হইবে না?

* প্রথম সংখ্যা ১৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

রপ্তানি		আমদানি	
দ্রব্য	মূল্য (টাকা)	দ্রব্য	মূল্য (টাকা)
তুলা	১৭৪৩ লক্ষ	তুলা	৬৪ লক্ষ
সূতা	৯৮২ "	সূতা	২৪৯ "
কার্পাস-বস্ত্র	১৮২ "	কর্পাস-বস্ত্র	৩৩৭৪ "
ঘৃত	২৭ "	লবণ	৭১ "
তণ্ডুল	১৯৬১ "		
গোধূম	১৮৬০ "		
ছোলা, মটর, কলাই প্রভৃতি	২৯০ "		
মোট	৭০৪৫ "	মোট	৩৭৫৮ "

প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

রপ্তানি		আমদানি।	
দ্রব্য	মূল্য (টাকা)	দ্রব্য	মূল্য (টাকা)
কাষ্ঠ	৭৮ লক্ষ	কাষ্ঠ	৫৮ লক্ষ
কয়লা	৪৭ "	কয়লা	৪৫ "
পশম	১৮৯ "	পশম বস্ত্র	৩০৮ "
ঐ বস্ত্র	২৩ "	ছত্র	১৯ "
চর্ম্ম	৯৯১ "	চর্ম্মদ্রব্য	২৫ "
আঁশ	১৮ "	কাগজ	৬৪ "
পাট	১১৯৭ "	পুস্তক প্রভৃতি	৩২ "
ঐ দ্রব্য	৯৯৪ "	লিখনোপকরণ	৩৭ "
নারিকেল কাতা-দ্রব্য	৫২ "	চিনি	৬৯০ "
নারিকেল তৈল	২৯ "	কৃষিযন্ত্র (কোদাল প্রভৃতি)	৮ "
রেড়ী তৈল	১৩ "	ছুরী, কাঁচি, চামচ প্রভৃতি	১৬ "
অপর উদ্ভিজ্জ তৈল	১৭ "	সেলাই কল	১০ "
মোম	১১ "	অপর যন্ত্রাদি	১১ "

রপ্তানি

দ্রব্য	মূল্য (টাকা)
রাসায়নিক (জমির সার-সোরা প্রভৃতি)	৩৭ লক্ষ
হাড়	৩৮ "
খোল	৪৩ "
ফল ও সব্জী	৩১ "
লাক্ষা	৩০৮ "
গালা	৯ "
নীল	৮৩ "
হরীতকী	৪৩ "
হরিদ্রা	৩ "
অপর রংএর দ্রব্য	১০ "
ধাতু (প্রধানতঃ মৃদঙ্গার)	২৪ "
রৌপ্য	৪২৮ "
স্বর্ণ	৩৭০ "
বিবিধ	২৪৬ "
মোট	৬৭৭৩ "

আমদানি

দ্রব্য	মূল্য (টাকা)
রেলের দ্রব্য	১৪১ লক্ষ
কল মিল প্রভৃতি	৪০৩ "
জাহাজ (খণ্ডাকারে)	২৫ "
হর্ম্মদ্রব্য	৩৫ "
রাসায়নিক (কাগজের উপকরণ)	৮ "
কর্পূর	১৬ "
কুইনাইন	৭ "
অপর ভৈষজ্য দ্রব্য	৪৮ "
রংএর দ্রব্য	১১৮ "
বন্দুক প্রভৃতি	২৮ "
খড়ি	১৯ "
রাং	৩৯ "
দস্তা	১৫ "
লৌহ ও ইস্পাত	৬১৫ "
তাম্র	২১১ "
রৌপ্য	১১২২ "
স্বর্ণ	২১৮১ "
অলঙ্কার ও স্বর্ণ রৌপ্যের বাসন	১৭ "
মণিমুক্তাদি	৮৮ "
বিবিধ	২৪ "
মোট	৬৪৮৩

অপ্রয়োজনীয় বা প্রায় অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য।

রপ্তানি

দ্রব্য	মূল্য (টাকা)
আফিম	১০৬২ লক্ষ
তামাক	২১ "
চা	৮৪৭ "
কাফি	১৬৬ "
খনিজ তৈল	২১ "
খনিজ তৈলের বাতী	৯ "
রেশম	৫০ "
ঐ বস্ত্র	৭ "
বিলাসসজ্জা ও জুতা	১৯ "
লোণা মাছ	২৩ "
অপর খাদ্য দ্রব্য	১৭ "
লঙ্কা	১১ "
আদা	১৯ "
মরীচ	৩৬ "
খদির	৯ "
অপরমশলা	৩ "
অভ্র	১৫ "
শিং	১৪ "
ভূষি, তুষ	৪৪ "
মোট	২৩৯৩ "

আমদানি

দ্রব্য	মূল্য (টাকা)
মদ্য	১৮৭ লক্ষ
তামাক	২১ "
চা	১৯ "
চা-বাক্স	২১ "
সীসা (চাবাক্সের জন্য প্রধানতঃ)	১৮ "
কাচ ও কাচ-দ্রব্য	১১৩ "
মাটী ও চীনামাটী দ্রব্য	২৯ "
এনামেল বাসন	১৭ "
খেলানা	২৮ "
সাবান	২৭ "
খনিজ তৈল	৩২৮ "
বিবিধ লৌহ দ্রব্য	১৭৮ "
রাসায়নিক (কার্বাইড-দুর্গন্ধনাশক প্রভৃতি)	৫৩ "
ঘোড়া ও অন্যপশু	৫৯ "
রেশম	৭৩ "
ঐ বস্ত্র	৭ "
বিলাসসজ্জা ও জুতা	২২৪ "
মোজা,রুমাল,তোয়ালে প্রভৃতি	১৮২ "
লোণামাছ	২৫ "
খেজুর	৬১ "
শুষ্কফল (প্রধানতঃ বাদাম)	২৩ "
বিস্কুট	১৭ "
জমাটদুগ্ধ	১৩ "
ভিনিগার জেলি ও অপর বিলাতি খাদ্য	৭৮ "
সুপারি	৭১ "
লবঙ্গ	১৯ "
বাদ্য যন্ত্রাদি	৭৪ "
অপর মশলা	১৩ "
শকট	৫৫ "
দিয়াশলাই	৪৯ "
বিবিধ	৭১ "
মোট	২৩৯৩ "

তুলা।

কার্পাস, শিমুল (শাল্মলী) ও আকন্দ (অর্ক) এই তিন জাতীয় তুলাই আমরা ব্যবহার করি। কার্পাস তুলাই বস্ত্র বয়নের জন্য, শিমুল তুলা তোষক গদি বালিষ প্রভৃতির জন্য ও আকন্দ তুলা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।

কার্পাস এদেশে স্বভাবজ; ইহার ফল আপনা হইতেই ফাটিয়া যায়, ও উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের তুলা আপনা হইতেই বাহির হইয়া থাকে। এই তুলা কোমল ও মসৃণ এবং পশমের ন্যায় অল্পায়াসেই ইহাতে সূতা পাকান যায়। সুতরাং আর্য্যগণ সহজেই যে ইহা বস্ত্রবয়নের উপযোগী করিয়া লইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? পাট শণ প্রভৃতি বস্ত্রোপকরণগুলি উদ্ভিজ্জ ত্বকের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে; কিন্তু মেষশাবকের জন্ম হইতেই যেমন তাহার লোম মানবের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ তুলাও পরিপক্ক হইলেই দৃষ্টি সমক্ষে স্থাপিত হইয়া, ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাইয়া দেয়। বহু প্রাচীনকাল হইতে কার্পাস তুলার ব্যবহার এদেশে প্রচলিত; আর্য্যগণের অভ্যুদয় কাল হইতেই যে, ইহা ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের সভ্যতা বহু প্রাচীন। প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ সকলে তুলার উল্লেখ অনেক স্থলেই আছে। ইউরোপীয়গণ ঋগ্বেদের কাল প্রায় চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৮ম, ১০৫ সূ, ১অ, ৭অধ্যায়ে ঋষি বলিতেছেন "মূষোন শিশ্না ব্যদংতি মাধ্যঃ স্তোতারংতে শতক্রতো"।

"হে শতক্রতো! মূষিক যেমন সূত্র দংশন করে, সেইরূপ তোমার এই স্তাবককে দুঃখ দংশন করিতেছে"; এইরূপ আরও অনেক উল্লেখ আছে। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের কাল তাঁহারা প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইহাতে কার্পাস, কার্পাসসূত্র ও বস্ত্রের বিষয়ে এরূপ বহুল উল্লেখ আছে যে, ইহা প্রণয়নের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে যে উহাদের ব্যবহার প্রচলিত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের জন্য ত্রিতন্ত্রী কার্পাসসূত্র, ক্ষত্রিয়ের জন্য শণসূত্র ও বৈশ্যের জন্য পশুলোমসূত্র নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীতের বিধান মনুই দিয়াছেন।

হিব্রু, গ্রীক ও রোমানদিগের প্রাচীন গ্রন্থে কার্পাস বস্ত্রের জন্য "কার্পাস" শব্দেরই প্রয়োগ আছে; ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস বস্ত্র মিশর, আরব ও

এসিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইবার বিবরণও ঐ সকল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অতি আধুনিক কাল পর্য্যন্ত, এদেশের কার্পাস বস্ত্র ঐ সকল দেশে বহুল পরিমাণে রপ্তানী হইত। ভারতে প্রচলিত হইবার বহুকাল পরে, তুলার ব্যবহার ও তুলার চাষ অন্যান্য দেশে আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রীসদেশীয় প্রাচীন পর্য্যটক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস্ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৫০ অব্দে, অর্থাৎ প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষের বৃক্ষে পশম ফল উৎপন্ন হয়; এই বৃক্ষজাত পশম, মেষজাত পশম অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। আলেক্‌জাণ্ডার পারস্য বিজয়ের পর যখন সিন্ধুনদী দিয়া সমুদ্রে বহির্গত হন, সেই সময়ে তাঁহার নৌসেনাপতিও ঠিক ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। কোন কোন পর্য্যটক আবার বলিয়াছেন—ভারতবর্ষে একরূপ বৃক্ষ আছে তাহাতে ফলের পরিবর্ত্তে মেষশাবক উৎপন্ন হয়; ঐ মেষশাবকের গায়ের লোম লইয়া হিন্দুগণ বস্ত্র বয়ন করে। একজন পর্য্যটক বলিয়াছেন—এই বৃক্ষের ফল ফাটিয়া গেলে, তাহার ভিতর হইতে লোমযুক্ত মেষশিশু বহির্গত হয়; কেহ আবার বলিয়াছেন—ঐ মেষশাবক বাস্তবিক রক্ত-মাংস-বিশিষ্ট এবং ঐ বৃক্ষের কাণ্ড এত নরম যে, বৃক্ষজাত মেষশিশুগণ তাহা হইতে ঝুলিয়া ভূমি হইতে তৃণ আহার করে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, ইংলণ্ডীয় পর্য্যটক সার্ জন্ মাণ্ডেভিল দেশে গিয়া প্রচার করেন যে, তিনি ঐ বৃক্ষজাত মেষশাবক দেখিয়াছেন এবং তাহার মাংস খাইয়াছেন; ছয় শত বর্ষ পূর্ব্বে, ইংলণ্ডীয় আধুনিক সভ্যগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ ইহা নির্ব্বিবাদে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১২০৩ সাল পর্য্যন্ত, মিশরীয়গণ কার্পাস বৃক্ষ উদ্যানের শোভা বর্দ্ধনের জন্যই রোপণ করিত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত, ভারতীয় কার্পাসই তাহারা আমদানী করিত, এবং কার্পাসের চাষ সে সময় পর্য্যন্ত তাহাদের দেশে ছিল না। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতেই মিসরে তুলার চাষ রীতিমত আরম্ভ হইয়া, অধুনা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

আমেরিকায় রীতিমত তুলার চাষ, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, একণে আমেরিকার তুলা বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আমেরিকার তুলা, ভারতীয় তুলা হইতে, অনেকটা স্বতন্ত্রজাতীয়। এখানকার আদিম অধিবাসীগণ তুলার ব্যবহার জানিত; কলম্বস ও তাঁহার পরবর্ত্তীগণ আমেরিকায় গিয়া, কার্পাস বৃক্ষ ও কার্পাস বস্ত্রের

বহুল ব্যবহার দেখিয়াছিলেন। উহারা ভারতীয়গণের নিকট ইহা শিক্ষা করিয়াছিল কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কলম্বসের বহু পূর্ব্ব হইতেই, ভারতবর্ষের বণিকগণ অর্ণবযান লইয়া নানাদেশে বাণিজ্য করিতেন। তাঁহারা বাণিজ্য পোত লইয়া আমেরিকায় যাইতেন কিনা ও কার্পাসের ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। আমেরিকাজাত কার্পাসের বিভিন্ন জাতীয়তা নিবন্ধন, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে না। কারণ মিসরীয় কার্পাস যে, ভারতবর্ষ হইতেই আনীত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এই একশত বৎসর মধ্যে ভূমি ও জল বায়ুর গুণে এবং উৎসাহের প্রভাবে, মিসরীয় তুলা এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে, উহাকে ভারতীয় তুলার জাতীয় বলিয়া বুঝিতে পারা সুকঠিন। বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রাইট ও ভারতীয় ও আমেরিকাজাত প্রভৃতি কার্পাসকে একই জাতীয় বলিয়াছেন।

ভারতীয় কার্পাস এদেশ হইতে পারস্যে, পারস্য হইতে ক্রমশঃ আরব, এসিয়া মাইনর ও মিসর দেশে এবং তথা হইতে ইউরোপের দক্ষিণাংশে নীত হইয়াছিল।

চীনদেশেও বোধ হয় ভারতের কার্পাসই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; কারণ, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, চীনদেশে কার্পাস বস্ত্রের প্রচলন ছিল না। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, দুইজন আরবদেশীয় ভ্রমণকারী চীনদেশ দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—চীনদেশীয়গণ রেশম বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহারা আরবীয়গণের ন্যায় কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার জানে না।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের অনেকগুলি দ্বীপে কার্পাস বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

মানবসমাজের সুখসচ্ছন্দ বিধানের জন্য, শস্যের ন্যায় তুলাও সমান প্রয়োজনীয়। পরিধেয় বসন, শয্যা, গামছা, চাঁদোয়া, নৌকার পাইল, তাঁবু, দড়ি, শতরঞ্জি, আসন, পরদা প্রভৃতি আরও অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কার্পাস হইতে প্রস্তুত হয়। বিশেষ গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতের প্রত্যেক মনুষ্য গড়ে প্রতি বৎসর প্রায় ৴২৷৹ সের কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করে। সুতরাং ২৮ কোটী ভারতবাসীর জন্য প্রতি বৎসর ১॥ কোটী মণ তুলার আবশ্যক। ১৮৪১ সালের সরকারী হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, দেশের এই আবশ্যকীয় তুলা বাদে, ২০ লক্ষ মণ তুলা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল।

বিগত বৎসর (১৯০৪-০৫ সালে) এদেশ হইতে রপ্তানী—

তুলা		৮০ লক্ষ মণ
সূতা ৩১ লক্ষ মণ	তুলা প্রায়	৪১ " "
বস্ত্র ৩ " " =	ঐ	৪ " "
মোট		১২৫ " "

ও বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী—

তুলা		৩ " "
সূতা ২ লক্ষ মণ	তুলা প্রায়	৩ " "
বস্ত্র ৬৭ " " =		৮৯ " "
মোট		৯৫ " "

সুতরাং গত বৎসর এদেশের প্রয়োজন বাদে, ৩০লক্ষ মণ তুলা উদ্‌বৃত্ত হইয়াছে; এবং ১৮৪১ সাল অপেক্ষা অন্ততঃ ১০লক্ষ মণ অধিক তুলা উপজাত হইয়াছে। লোক সংখ্যা ও সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত তুলার ব্যবহারও অবশ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের দেশে যে আরও অনেক পরিমাণ তুলা জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের অনেক তন্তুবায় ও অন্যান্য শিল্পী জাতি-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কৃষি-কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হওয়ায়, কাপাস ও অন্য দুই একটি কৃষি কার্য্যের প্রসার হইয়াছে। কিন্তু তুলার উন্নতি কিছুমাত্র না হইয়া ক্রমশঃ অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে।

ভারতের নানাদেশেই কার্পাসের চাষ আছে; এবং নানাপ্রকারের তুলাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। কতকগুলির আঁশ দীর্ঘ; কিন্তু অনেক গুলিরই আঁশ খর্ব্ব ও সেই জন্য কলে ব্যবহৃত হইবার অনুপযোগী। ভারতীয় তুলার বিশেষগুণ এই যে—১। ইহা মজবুত, ২। ইহার বর্ণ মাখনের ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল, ও ৩। ইহাকে সহজেই রঞ্জিত করা যায় ও ঐ রং অতি সুদৃশ্য হয়।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে

বিষাদ-সঙ্গীত।

বঙ্গের সন্তান, হিন্দু মুসলমান,
করোনা বিরোধে সময় যাপন ;
চাও মুখ তুলে, যাও ভেদ ভুলে,
'ভাই ভাই' বলে কর আলিঙ্গন।

১

এক দেশী, হ'ল ভিন্ন দেশ বাসী,
এক ভাষী, হবে ভিন্ন ভাষা ভাষী ;
হেন অবনতি, জাতীয় দুর্গতি,
আর কোন দেশে ঘটেনি কখন।

২

একতা অভাবে ঘটেছে সকল,
হারা'য়েছি মোরা চরিত্রের বল,
গেছে মহাযাগ—স্বদেশানুরাগ—
বিজাতীয় ভাব করিয়ে গ্রহণ।

৩

স্বদেশের অন্ন বিদেশে পাঠাই,
অন্নাভাবে মোরা প্রাণে ম'রে যাই,
আমোদ লভিতে, উপাধি কিনিতে
রাশি রাশি অর্থ করি বিতরণ।

৪

স্বদেশী বণিক্ অন্ন নাহি পায়,
বিদেশী বণিক্ ঘরে বসি খায়,
দেশ-হিতৈষিতা, স্বজাতি-প্রিয়তা,
নাহি আর হায়! এ দেশে এখন।

৫

মাতৃ ভাষা দেখি কর উপহাস,
বিজাতীয় ভাষা শিখিতে উল্লাস,
বল, কেন তবে দুর্গতি না হবে ?
মাতৃ অভিশাপে অবশ্য পতন।

৬

চাহ যদি ভাই! স্বদেশ কল্যাণ,
এখনো সকলে হও সাবধান ;
হও এক মত, ধর এক পথ,
তবে হ'তে পারে অভীষ্ট সাধন।

৭

স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যের তরে,
যার যাহা আছে দাও অকাতরে।
স্বার্থ, অভিমান, লজ্জা, অপমান,
বিস্মৃতি-সলিলে কর বিসর্জ্জন।

৮

বিজাতীয় ভাব বিদেশী আচার,
ভোগ-বিলাসিতা কর পরিহার,
স্বদেশের রীতি, স্বদেশের নীতি,
স্বদেশীরে কর সাদরে গ্রহণ।

৯

যে যেখানে থাক ডেকো 'মা' 'মা' বলে,
যেও না জাতীয় পুরাতত্ব ভুলে,
জাতীয় একতা, নৈতিক দৃঢ়তা,
জাতীয় চরিত্র করিবে গঠন।

১০

ভা'য়ে ভা'য়ে হ'লে বিচ্ছেদ গঠন,
হয় নাকি কভু পুনঃ সম্মিলন?
একতা আশ্রয়, কর এ সময়,
আজি হতে শিখ আত্মাবলম্বন।

১১

দেখিবে আবার শুভ দিনোদয়,
বাঙ্গালীর পুনঃ হবে অভ্যুদয়;
হিন্দু মুসলমান হয়ে এক প্রাণ
দেশ হিতব্রত করিবে সাধন।

১২

সাধনার পথে বহুল বিপদ্,
কিন্তু সিদ্ধ হলে সাগর—গোস্পদ,
রজ্জু পরিণত, ক্ষুদ্র তৃণ যত,
বাঁধিবারে পারে প্রমত্ত বারণ।

১৩

ক্ষুদ্র পিপীলিকা বালুকণা প্রায়,
শক্তি সাধ্য কাযে একা নাহি ধায়,
কিন্তু শত শত, হয়ে সমবেত,
করে দেখ কত অসাধ্য সাধন।

১৪

তেমতি আমরা একতায় বলে,
উন্নতির বাধা যাব পায়ে দ'লে;
যত ঘাত স'ব, তত দৃঢ় হব,
অগ্নিদগ্ধ-লৌহ আঘাতে যেমন।

১৫

পশ্চিমেতে যদি হয় সূর্য্যোদয়,
মরুভূমে হাসে কুসুম নিচয়,
প্রচণ্ড অনল হয় সুশীতল,
তবু না ছিঁড়িবে একতা বন্ধন।

১৬

ভাই, ভাই বলে, মনে যদি থাকে,
'ভাই' ব'লে ভাই, যদি ভা'য়ে ডাকে,
পরাণের টানে, সে মধুর তানে,
হয় প্রাণে প্রাণে সদা সম্মিলন।

১৭

সুদূর প্রদেশে সবে মোরা থাকি,
প্রাণে প্রাণে যদি সদা টান রাখি,
মনের উল্লাসে, জননীর পাশে
মিলিব সকলে যখন তখন।

১৮

রোগ-শোক-তাপ লুকা'য়ে মরমে,
এস থাকি বাঁধা এক ভ্রাতৃ-প্রেমে;
সুখ-দুঃখ-গাথা, মরমের কথা,
হৃদয়ে হৃদয়ে করিব জ্ঞাপন।

১৯

বৃথা আড়ম্বরে বল কিবা ফল,
কি করিবে আর বাক্যের কৌশল?
ত্যজ অশ্রুজল, ধর ঐক্যবল,
কর দেশহিত নীরবে সাধন।

২০

ঘুচিবে দেশের ঘোর হাহাকার,
দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য না রহিবে আর;
বিধাতার স্নেহে, দেব অনুগ্রহে
অচিরে ঘুচিবে জাতীয় পতন।

ভারতের লৌহবর্ত্ম বা রেলওয়ে।

প্রায় ৬০ বৎসর হইল, আমাদের দেশে রেলপথ প্রস্তুত হইয়া, প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া নামক রেলওয়ে কোম্পানীর গাড়ী হাওড়া হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত (৬৭ মাইল) যাতায়াত করিতে আরম্ভ করে। এখন ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে রেলের বিস্তৃতি হইয়াছে এবং এখন ইহার পরিমাণ প্রায় ২৮ হাজার মাইল। প্রতি বৎসর ইহার বিস্তার বৃদ্ধি পাইতেছে।

সর্ব্বসমেত ৩৩টী রেলওয়ের মধ্যে, ২৩টী বিদেশীয় বণিকগণের সম্পত্তি, ৫টী গবর্ণমেণ্ট খাসে করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ৫টী দেশীয় রাজ্যে চলিতেছে। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল নামক রেলওয়েটী বাঙ্গালী কোম্পানীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত; ইহা মগরা হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এ পর্য্যন্ত ভারতীয় রেলসমূহ নির্ম্মাণে ভারতের প্রায় ৩৬৪ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে; এই টাকার মধ্যে প্রায় ১০২ কোটী টাকা (প্রায়শঃ বিদেশ হইতে) ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। রেলপথ প্রতিপালনেও প্রতি বৎসর ভারতীয় রাজকোষের এবং ভারতবাসীর অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইতেছে; সুতরাং রেলপথ দ্বারা দেশের অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহাতে সুবিধা ও অসুবিধাই বা কি, তাহা পর্য্যালোচনা করা অসঙ্গত নহে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট রেলপথ বিস্তারের অত্যধিক পক্ষপাতী; ইহা রাজা ও প্রজা উভয়েরই সমূহ মঙ্গলনিদান বলিয়া গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস। রেল নির্ম্মাণ ও পোষণের জন্য রাজকোষের অর্থ অসংকুলান সত্ত্বেও ঋণগ্রহণ করিয়া, সরকারী কেনাল প্রভৃতি হইতে আয়ের সম্যক্ ক্ষতি স্বীকার করিয়া, রেল কোম্পানী গুলির লোকসান স্বীয় স্কন্ধে বহন করিবারও অঙ্গীকার করিয়া এবং বহুসংখ্যক অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য স্থগিত রাখিয়াও, রেলওয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আগ্রহ। সুতরাং রেলওয়ে দ্বারা গবর্ণমেণ্টেরই কি সুবিধা হইতেছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত।

রেলওয়ে সহায়ে রাজকর্ম্মচারীগণ অনায়াসে ও অল্প সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন দূরবর্ত্তী স্থান সকলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও সংবাদাদি সংগ্রহ করিতে পারেন; তাহাতে তাঁহাদের কার্য্যভার লাঘব হইবার, সুতরাং অল্পসংখ্যক কর্ম্মচারীর দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহ হইবার কথা। কোন স্থানে রাষ্ট্র বিপ্লবের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সৈন্য প্রেরণে তাহা নিবারিত হইতে পারে; ইহাতে দেশে

শান্তি বিরাজিত হইবার ও অল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা দেশ সুশাসিত হইবার সম্ভাবনা। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, শস্য প্রেরণ দ্বারা সহজে তাহার প্রতীকার করা যাইতে পারে; ইহাতে দেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ক্রমশঃ হ্রাস ও তাহার প্রতিবিধান সহজ-সাধ্য হওয়ায়, তাহার প্রাবল্যও হ্রাস হওয়াই উচিত।

কিন্তু সরকারের এই সুবিধা কয়েকটীই প্রায় কাল্পনিক; ইহার একটীও বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। রেলবিস্তার ও যানাদির সুবিধা হইয়া, রাজ-কর্ম্মচারীগণের পর্য্যবেক্ষণ ও শাসনকার্য্য যতই অল্পায়াস-সাধ্য হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন ততই তাঁহাদের কার্য্যভার গুরুতর হইয়া উঠিতেছে! রাশি রাশি অর্থ রেল নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়া, বহুজনসাধ্য শাসনকার্য্য যদি অল্পসংখ্যক কর্ম্মচারী দ্বারা সাধিত হইত, তাহা হইলেও রাজকোষের এই অর্থব্যয়ের সার্থকতা কতকটা বুঝিতে পারা যাইত; কিন্তু ভারতবাসীর ভাগ্যদোষে, এই অর্থব্যয়ের ফল, ইহার মূল উদ্দেশ্যের বিপরীতই হইতেছে। রাজকর্ম্মচারীগণের আয়াস-হ্রাসজনিত অধিকতর (?) গুরুকার্য্যভার লাঘবের অভিপ্রায়ে, দয়াবান সরকার বাহাদুর বঙ্গভঙ্গ করিয়া দুই খণ্ড করিলেন এবং কতকগুলি জেলাকেও এই অপরূপ যুক্তির আশ্রয়ে ভাঙ্গিয়া, খণ্ড খণ্ড করিবার মতলব স্থির করিয়াছেন; সুতরাং রেল বিস্তারে দেশের রাজকীয় সম্মিলিত ভাব (Solidarity) বর্দ্ধিত না হইয়া ভঙ্গপ্রবণতাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এদেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা, প্রায় আকাশ-কুসুম-সম অলীকত্বে পরিণত হইয়াছে, সুতরাং সেজন্য সৈন্য প্রেরণের আবশ্যকতাও, অন্ততঃ সুদীর্ঘকাল তদ্‌ভাবাপন্ন থাকিবে। রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা দেশের শান্তিরক্ষা সহজসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও, সৈন্য সংখ্যা পোষণজনিত অর্থব্যয়, হ্রাস না হইয়া, বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতেছে। রেল বিস্তারই এদেশে দুর্ভিক্ষের একটী প্রধান কারণ; সুতরাং রোগোৎপত্তির নিদানকেই রোগের প্রতীকার-স্থানীয় করিবার চেষ্টা হইতেছে; দুর্ভিক্ষের বৎসরও দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য বিদেশে প্রেরিত হইতেছে; দুর্ভিক্ষের আক্রমণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তজ্জনিত মৃত্যুসংখ্যাও হ্রাস হইতেছে না; বরং রেল বিস্তারে, দেশময় শস্যাদি সর্ব্বদাই দুর্ভিক্ষ সময়ের ন্যায় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের সুবিধা না থাকিলেও বিদেশীয়গণ এই রেল বিস্তারে যৎপরো-নাস্তি লাভবান হইয়াছে। বিলাতে টাকার সুদ শতকরা বার্ষিক ২॥০ টাকা হইতে ৩৲ টাকা; এদেশেও কোম্পানীর কাগজের সুদ শতকরা বার্ষিক

৩৲ টাকা হইতে ৩।০ টাকা। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অনেকগুলি বৈদেশিক রেল কোম্পানিকে বার্ষিক শতকরা অন্ততঃ ৫৲ টাকা সুদ পোষাইয়া দিতে অঙ্গীকৃত; ইহার অধিক যদি লাভ হয়, তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধেক রেল কোম্পানী পাইবে ও বাকি অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্ট পাইবেন। সুতরাং যখন ৫৲ টাকার কম লাভ হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা সমস্তই পূরণ করিয়া দেন এবং ৫৲ টাকার অধিক লাভ হইলে, সেই অতিরিক্ত লাভের অর্দ্ধেক অংশ গবর্ণমেণ্ট পাইতে পারেন। এই বিচিত্র বন্দোবস্তের নাম গ্যারাণ্টি পদ্ধতি (Guaranteed system)। (ক্রমশঃ)

তাঁত সংবাদ।

আমরা সেদিন বাবু জহরলাল ধর কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নূতন তাঁত দেখিতে গিয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমরা যত প্রকার তাঁত দেখিয়াছি, সকল গুলিতেই হাতে এবং পায়ে কার্য্য করিতে হয়; কিন্তু এই তাঁতে সেরূপ করিবার আবশ্যক হয় না। যে তাঁতটী দেখিলাম, তাহাতে একটী চাকা ঘুরাইলেই মাকু আপনা আপনি যাতায়াত করিতে থাকে এবং বয়ন কার্য্য সম্পাদন হইতে থাকে; তবে ছেঁড়া সূতা জুড়িয়া দিবার জন্য এবং অন্যান্য কার্য্যের জন্য আর একজন লোকের আবশ্যক। এই তাঁত ৪।৫ খানি এক সঙ্গে রাখিয়া একটী ঘোড়া অথবা বয়েলের দ্বারা চাকা ঘুরান কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। বিস্তৃত রকমের কার্য্য করিতে হইলে যদৃচ্ছা অনেকগুলি তাঁত এক সঙ্গে স্থাপন করিয়া তৈল চালিত ইঞ্জিন (Oil Engine) অথবা বাষ্পীয় ইঞ্জিন (Steam Engine) দ্বারা কার্য্য করান যাইতে পারে। ইহাঁরা বলিলেন, হাতে কার্য্য করিবার জন্য এই তাঁতের কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া বাজারে বাহির করিবেন। তাহাতে একটি লোকই চাকা ঘুরান কার্য্য এবং ছেঁড়া সূতা জুড়িয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারিবে।

এখনও ইহাঁরা বিক্রয়ার্থ যথেষ্ট পরিমাণ তাঁত প্রস্তুত করিতে পারেন নাই; এক খানি মাত্র, লোককে দেখাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। তবে শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ শুকুল মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া, ইহাঁরা বেঙ্গল-জহর-লুম ম্যানুফ্যাক্চারিং এবং উইভিং কোং নাম দিয়া শীঘ্রই বহুল পরিমাণে এই লুম প্রস্তুত করতঃ সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন। এজন্য

ইঁহারা কলিকাতার হোগল কুড়িয়া গলিতে বিস্তৃত জমি লইয়া বাটি প্রস্তুত করাইতেছেন ; ইঁহারা বলেন, এই লুমের দাম ২৫০৲ শত টাকার অধিক হইবে না। এ লুমের কার্য্যকারিতাও যথেষ্ঠ। ইহাতে অনায়াসে ৫ গজা ৪ খানি হইতে ৬ খানি ধুতি বয়ন হইতে পারে। এখন যে কেহ ইচ্ছা করিলে, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর, ম্যানেজারের নিকট ৬নং বৃন্দাবন বোসের লেন, হোগল কুড়িয়া, কলিকাতায় পত্র লিখিলে এই লুম সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। আমরা শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ শুকুল এবং ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ধর মহাশয়কে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি।

তাঁত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আগামী বারে প্রকাশিত হইবে। আমরা একরূপ ফ্লাই-সাট্‌ল্‌ লুম প্রস্তুত করিতেছি। তাহার সংবাদ পরে প্রকাশ করিব।

স্বদেশী শিল্প প্রসঙ্গ।

রেশমী কাপড়। শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ পাঠক এণ্ড কোং, পোঃ বরপেটা, কামরূপ, আসাম—ইঁহারা বিবিধ প্রকারের এণ্ডি ও মুগা প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ লাল দত্ত, মঙ্গলদই, আসাম—ইঁহারা অনেক প্রকার এণ্ডি ও মুগা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। আর, কে. স্বরস্বতী এণ্ড কোং, গৌহাটি, আসাম—ইঁহারা বিবিধ প্রকার এণ্ডি ও মুগা প্রস্তুত করাইয়া থাকেন; ইহারা উন্নত ধরণের তাঁতের সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, ইঁহাদের কারিকরগণের মধ্যে বিতরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। হরিদাস এণ্ড ব্রাদার্স, বরপেটা, আসাম—ইঁহারা নানা স্থান হইতে নানাপ্রকার এণ্ডি ও মুগা আনাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। ধনশ্যাম এণ্ড ব্রাদাস, পেটা, কামরূপ, আসাম—ইঁহারা বিবিধ প্রকার এণ্ডি ও মুগা প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। জেশরূপ দয়াচাঁদ বোথরা, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—ইঁহারা নানাবিধ বালচরী, বুটাদার সাড়ী, গরদের ধুতী, উড়ানি প্রভৃতি ও মুর্শিদাবাদী বালাপোষ প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। গোবিন্দ চন্দ্র ধর, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—সাহা ব্রাদার্স, সিল্ক ষ্টোর্, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—ইঁহারা নানা প্রকার রেশমী বস্ত্রাদি প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। গোপেশ্বর

রক্ষিত এণ্ড কোং, বাঙ্গালীটোলা, বেনারস সিটি—ইঁহারা এণ্ডি, তসর, মটকা, এবং চেলীর ধুতী, সাটি প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

নিব্ এবং হোল্ডার। রামচন্দ্র ব্রাদাস, এলাহাবাদ—ইঁহারা জর্ম্মান সিল্ভার্ ও পিতলের নানাবিধ নিব্ ও হোল্ডার প্রস্তুত করাইতেছেন। দরি ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, কাশ্মীরী বাজার, আগরা—ইঁহারা নানাবিধ হোল্ডার প্রস্তুত করাইতেছেন। অমিয়কুমার কর্ম্মকার, পাঁড়ের হাট—তামার ও পিত্তলের নিব্ ও হোল্ডার প্রস্তুত করেন; ইঁহার নিব্ মোটা হইয়া গেলে চাঁচিয়া সরু করিয়া লওয়া যায়। নবদ্বীপচন্দ্র কর্ম্মকার, পোঃ ভোলা, জেলা বরিশাল—জর্ম্মান সিল্ভারের নিব্ প্রস্তুত করিয়া থাকেন; একটি নিবে ২।৩ মাস লেখা চলে। মহিমচন্দ্র কর্ম্মকার, পোঃ ভোলা, জেলা বরিশাল—পিতল, তামা ও টিনের নিব্ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এস্, ইউ, কোম্পানী, গ্রাম চৌমুহানী, পোঃ দত্তপাড়া, জেলা নোয়াখালী; এবং গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পোঃ ভোলা, জেলা বরিশাল—হোল্ডার প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন।

জুতার কালী, ব্লক্কো ও ব্ল্যাঙ্কো। চন্দ্র এণ্ড কোং, ৬নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা—ইঁহারা জুতা এবং চামড়ার ব্যাগে লাগাইবার জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্রাউন পালিশ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এ, দাস গুপ্ত, পোঃ ভোলা, জেলা বরিশাল—ব্লক্কো প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। মেসার্স সেন এণ্ড গুপ্ত, ১০।৪ নং মুসলমানপাড়া, কলিকাতা—বেঙ্গল ক্রীম্ বা স্বদেশী ব্লক্কো প্রস্তুত করেন।

লিখিবার কালী। চন্দ্র এণ্ড কোং, ৬নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা—ইঁহারা লিখিবার নানাপ্রকার কালী প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সারমন ব্রাদার্স, গোকুলপুরা, আগরা—ইঁহারা নানাপ্রকার লিখিবার এবং কপিইং ইঙ্ক প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। ইঁহাদের অর্ডার দিলে আগরার বিখ্যাত সতরঞ্চ ও কার্পেট পাঠাইতে পারেন।

সাবান ও বাতি। দি ইণ্ডিয়ান্ কেণ্ডল ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, দাদার, বম্বে—ইঁহারা বাতি প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করেন। সোপ্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, গিরগেওন, ব্যাক্ রোড, বম্বে—ইঁহারা সাবান প্রস্তুত করেন। দি নর্থওয়েষ্ট সোপ্ কোং, ৩৩নং গার্ডেনরীচ্ রোড, কলিকাতা। ইঁহারা সাবান ও বাতি প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করেন।

দিয়াশলাই। দি অমৃত্ ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী, কোটা, জেলা বিলাসপুর। ইঁহারা সেফ্‌টি, সবুজ ও লাল রঙ্গের দিয়াশলাই প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

ছুরী, কাঁচি, খুর, সর্জ্জিক্যাল্ এণ্ড ভেটারিনারী যন্ত্রাদি। টি, সি, নন্দন এণ্ড সন্, ১৮নং কাঁসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা—ইঁহারা নানা প্রকার ছুরী, কাঁচি, এবং সর্জ্জিক্যাল্ যন্ত্রাদি ও নানাবিধ পিচকারী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

বোতাম ও ফিতা। দরি ম্যানুফ্যাক্‌চারিং এজেন্সী, কাশ্মীরী বাজার, আগরা—ইঁহারা সুতার নানাপ্রকার বোতাম, সার্টের জন্য পাথরের নানা রকমের বোতাম এবং চুল বাঁধিবার ফিতা প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

হস্তীদন্তের প্রস্তুত দ্রব্যাদি। মুরারীমোহন ভাস্কর, এনাতুনী বাগ, পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—হস্তীদন্তের নানাবিধ খেলনা, চেয়ার, টেবিল, বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। গনেশচন্দ্র ভাস্কর, এনাতুনীবাগ, পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—হস্তীদন্তের শীতলপাটি প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। ঘনশ্যাম এণ্ড ব্রাদার্স, বরপেটা, আসাম—হস্তীদন্তের কলম, বোতাম প্রভৃতি বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত করেন। হরিদাস এণ্ড ব্রাদার্স, বরপেটা, আসাম—হস্তীদন্তের নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করেন।

তালাচাবি। নিরঞ্জন কর্ম্মকার, পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—নানাপ্রকার কৌশলযুক্ত তালাচাবি প্রস্তুত করেন। বি, এল্, ঘোষ এণ্ড কোং, ১৪৬নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইহারা নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর তালাচাবি প্রস্তুত করেন।

ষ্টীলট্রাঙ্ক। রামচন্দ্র ব্রাদার্স, এলাহাবাদ—ব্রাঞ্চ অফিস ১১৫।৬ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—ইহারা কলের দ্বারা ষ্টীল্ ট্রাঙ্ক প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

দেশী চিনি—ডাঃ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়—গোদুগ্ধে ও গঙ্গাজলে চিনি পরিস্কৃত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন।

সিগারেট্। ইণ্ডিয়ান সিগারেট ম্যানুফ্যাক্‌চারীং কোং লিমিটেড, পোঃ জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—ইঁহাদের কারখানায় নানাপ্রকার সিগারেট প্রস্তুত হয়।

বিবিধ। কৃষ্ণলাল দত্ত, মঙ্গলদই, আসাম—নানাপ্রকার রুদ্রাক্ষ ও বনজ ঔষধের ব্যবসা করেন।

ল্যাভেণ্ডার। মেদিনীপুর বড় বাজারের ডাঃ শশধর দের কৃত ল্যাভেণ্ডার বেশ ভাল হইয়াছে; দরও সস্তা।

মুখার্জ্জির ম্যাজিক্ কালী। কলিকাতা—৩৫, হরিতকীবাগান হইতে

আমরা এক শিশি ম্যাজিক কালী উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কালীর বিশেষ গুণ এই যে, ইহার সাহায্যে কাগজে কিছু লিখিলে, তাহা কেহই দেখিতে পান না। কিন্তু কিঞ্চিৎ আগুনের উত্তাপ দিলেই, সবুজ অক্ষরে লেখা সুস্পষ্ট বাহির হয়। লেখাটি প্রায় দুই তিন মিনিট্ থাকে, তৎপরে অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার উত্তাপ দিলে, লেখা পুনর্ব্বার দেখিতে পাওয়া যায়। সৌখীন লেখকের পক্ষে যে ইহা ভারি মজার জিনিষ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মূল্য প্রতি শিশি।৵০ ছয় আনা।

—০—

মফঃস্বলস্থ শিল্পীগণ তাঁহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বহুল বিক্রয় উদ্দেশ্যে এজেণ্টের আবশ্যক বোধ করিলে আমরা কলিকাতায় বিশ্বাসী এজেণ্টের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।

আমাদের নিবেদন।

মফস্বলবাসী সহৃদয় পাঠকগণ কৃপা করিয়া, স্থানীয় শিল্প ও কৃষি বিষয়ের সংবাদ পাঠাইয়া, আমাদিগকে উপকৃত করিবেন। সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত, আমরা কিছুতেই সফল-মনোরথ হইতে পারিব না।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যথাসম্ভব বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব—

যে স্থানের সংবাদ প্রেরিত হইবে, সেই গ্রামের নাম, থানা, পোষ্টাফিস ও জেলা।

১। তাঁতির সংখ্যা—

(ক) প্রচলিত তাঁতের সংখ্যা ও উন্নত ধরণের তাঁত যদি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে একটু বিশেষ বিবরণ।

(খ) উৎপন্ন বস্ত্রাদির বিবরণ, যথা—

(১) কার্পাস সূত্রের বস্ত্র, ধুতি ও শাড়ী—মিহি ও মোটা।

(২) উড়ানী, গামছা, মশারির থান, বিছানার চাদর, লেপ, তোষক প্রভৃতির খোল ও ওয়াড়ের কাপড়, জামার কাপড় প্রভৃতি।

(৩) তসর ও গরদের বস্ত্র—ধুতি, চাদর, থান প্রভৃতি।

(৪) জরীর কাজ, পশমের বস্ত্রাদি।

২। কাঁসারির সংখ্যা—

(ক) উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ ও পরিমাণ।

(খ) স্থানীয় বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ।

৩। কামারের সংখ্যা—

(ক) উৎপন্ন দ্রব্যের বিবরণ।

(খ) স্থানীয় বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ।

৪। অপর বিশেষ শিল্প ও শিল্পীগণের বিবরণ, যথা—শৃঙ্গের কাজ, চিরুণী, শঙ্খ, মাদুর, হস্তীদন্তের কাজ, শীতলপাটি, মছলন্দি, পাথরের বাসন প্রভৃতি।

৫। কৃষি-জাত বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিবরণ, যথা—কার্পাস, ইক্ষু, আলু ইত্যাদি।

৬। অরণ্যজাত দ্রব্য, যথা—লাক্ষা, ধুনা, তার্পিণ, রেশম মধু প্রভৃতি।

৭। খনিজ দ্রব্য, যথা—কয়লা, লৌহ, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, চূণ প্রভৃতি।

৮। অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিবরণ।

স্বদেশী।

প্রথম খণ্ড।]   পৌষ, ১৩১২।   [তৃতীয় সংখ্যা।

বন্দে মাতরম্।

দুঃখ ও অনুতাপ।

বাঙ্মনঃ কায়জৈর্দুঃখৈর্নির্ব্বেদো জায়তে নৃণাম্।
নির্ব্বেদাজ্জায়তে তেষাং দুঃখ মোক্ষ বিচারণা॥
বিচারণাচ্চ বৈরাগ্যং বৈরাগ্যদ্দোষ-দর্শনম্।
দোষাণাং দর্শনাচ্চৈব দ্বাপরে জ্ঞান সম্ভবঃ॥

কূর্ম্মপুরাণ।

দ্বাপর যুগে, এক সময়ে লোকের বাচনিক, মানসিক এবং শারীরিক দুঃখ-জনিত অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইল। এই অনুতাপ নিবন্ধন, দুঃখ বিমোচনের উপায় বিবেচনা ও তৎসহ তাহাদের বিবেকের উদয় হইল; বিবেকোদয়ের সহিত স্বীয় দোষ দর্শন প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তি হইতেই সেই দ্বাপর যুগে লোকের জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কলিযুগে, ভারতবাসীর উক্ত ত্রিবিধ দুঃখের অসদ্ভাব নাই। মিথ্যাবাদী, অশিক্ষিত, অসভ্য এবং বহুবিধ অকথ্য কটূক্তির আস্বাদ; লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ঘৃণা, অবিশ্বাস প্রভৃতি পশুকুল সুলভ নিতান্ত ঘৃণিত ব্যবহার-জনিত চিত্তসংক্ষোভ; অবমাননা, লজ্জা, অত্যাচার প্রভৃতি ভয়জনিত মানসিক সংকোচ; অর্থচিন্তা, অন্নচিন্তা, অনাময়-চিন্তা প্রভৃতি আন্তরিক ব্যাধির আক্রমণ নিবন্ধন আত্মোন্নতি বিধায়িনী আধ্যাত্মিক-চিন্তার অনবসর; দুর্ভিক্ষ মহামারী, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি দেহক্ষয়কর দুর্ব্বিপাকের

আতিশয্য; তদুপরি, প্লীহা-বিদারণ, আগ্নেয়াস্ত্রের আকস্মিক গুলি-নিঃসরণ প্রভৃতি প্রতীকার-সম্ভাবনা-নিরপেক্ষ ঘটনা-পারম্পর্য্য; এবম্বিধ দুঃখ-নিচয় অধুনা ভারতে যেরূপ বহুল বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, কোন যুগে কোন দেশের লোক সেরূপ ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই দুঃখ-সম্ভূত অনুতাপ, দেশময় এখনও বিস্তৃতিলাভ করে নাই; কস্মিন্ কালে ইহার উপযুক্তরূপ অনুতাপ-বিস্তার হইবে কিনা সন্দেহ। দুঃখ যেন দেশবাসীগণের প্রায় চিরাভ্যস্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতি দিন দুঃখ ভার ক্রমশঃ যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছিল, দেশবাসীর অস্থি, মজ্জা এবং মানসিক গঠনও তদনুরূপ ভার-সহনক্ষম হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই দুঃখ ভার, পুরাতন ক্রমবর্দ্ধনশীল ভাব পরিত্যাগ করিয়া, সহসা কথঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বহনোপযোগী সুদৃঢ় অস্থি, মজ্জা ও মানসিক গঠন সম্পন্নগণ গুরুভারেও অকাতর, সুতরাং দ্বিরুক্তি বা ভ্রূক্ষেপমাত্র বিহীন। কিন্তু কতকগুলি দেশীয় ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এখনও প্রথমোক্তের ন্যায় পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। সেই জন্যই তাহারা এইরূপ আকস্মিক অধিক ভার বৃদ্ধিতে কাতরোক্তি-পরায়ণ ও দুঃখানুতপ্ত হইয়াছে।

দুঃখের অনুভূতিই অনুতাপের মুল। যে আপনার পতন অনুভব করিতে পারে না, তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্যবান্ ব্যক্তি জগতে আর নাই; যে দুঃখে অনুতাপ নাই, তাহাই মানবের সর্ব্বনাশকর।

অনুতাপ অনল-সমধর্ম্মী; এবং হৃদয়ই ইহার আধার। যেমন স্বর্ণকারের পুটস্থিত স্বর্ণ রৌপ্যাদি অনল সংযোগে বিশুদ্ধীকৃত হয়, সেইরূপ, অনুতাপ-বহ্নি সংস্পর্শে, হৃদয়াধারস্থিত বৃত্তি সমূহের বিশুদ্ধি সাধিত হয়। সুতরাং এই অনুতাপানল সংবর্দ্ধিত হইলেই, দুষ্প্রবৃত্তিরূপ মলরাশি ভস্মীভূত হইয়া, অন্তরের সদ্বৃত্তি নিচয় ও তৎসহ সদাসদ্ বিবেচনা শক্তিও বিকশিত হইবে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই অনুতাপ-বহ্নি সম্বর্দ্ধনের বিশিষ্ট প্রক্রিয়া কি। বায়ুর নাম অনলসখা; কেননা, বায়ু সহায়েই অগ্নি বিস্তৃতি লাভ করে। তবে, দেশের নিদারুণ দুঃখ জনিত এই অনুতাপাগ্নি বিস্তারের জন্য কিরূপ বায়ু সঞ্চালন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন? কবিতা, বক্তৃতা প্রভৃতি ফুৎকার বীজনাদি রূপ প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবলম্বিত হইয়াছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই; অবশেষে বোধ হয় প্রকৃত প্রক্রিয়াই আবিষ্কৃত হইয়াছে; এই প্রক্রিয়ার নাম "বন্দে মাতরং" মন্ত্রোচ্চারণ,

মন্ত্র শক্তির প্রভাব অতীব অদ্ভুত; মন্ত্র প্রভাবে মহাসর্পও মুগ্ধ হইয়া স্বীয় হিংস্র স্বভাব বিস্মৃত হয়; সুতরাং এই মহামন্ত্রের প্রভাব যে অতি বিস্ময়কর হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

এই নিতান্ত কল্যাণকর মন্ত্রের সাধন প্রক্রিয়া লইয়া, দেশমধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, মন্ত্রের সাধন প্রকাশ্যে না হইয়া আন্তরিক ও গোপনে হওয়াই উচিত। সকল মন্ত্রেরই যে গোপনে সাধনা করিতে হইবে, এরূপ কোন শাস্ত্র-বিধি নাই। দেশ-হিত-কামনাই যে মন্ত্রের লক্ষ্য, বিজন অরণ্য বা গিরিগহ্বর আশ্রয়ে সাধনায় যে তাহা অভীপ্সিত ফলপ্রদ হইতে পারে, ইহা কেহ কল্পনায়ও অনুভব করিতে পারে না। মুমূর্ষুর কর্ণকুহরে যেমন মুহুর্মুহু "গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" উচ্চরবে উচ্চারণ করিয়া, তাহার মর্ম্ম সন্নিধানে উপনীত করিতে হয়, মুমূর্ষু দশাপন্ন দেশবাসীগণের হৃদয়-সঞ্জাত অনুতাপ স্ফুলিঙ্গের সমৃদ্ধীকরণ জন্য, তাহাদের শ্রবণ বিবরে অনিবার এই সঞ্জীবনী মন্ত্রানিল সঞ্চালন নিতান্ত আবশ্যক। তাহাদের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবিষ্ট করাইয়া না দিলে, সে স্ফুলিঙ্গ উপযুক্তরূপ প্রভাব-সম্পন্ন অনলের আকার ধারণে সক্ষম হইবে না, বা অচিরেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিদেশীয়গণ এবং তদ্ভাবাপন্ন বিকৃত-মস্তিষ্ক দেশ-বাসীগণ, কোন কোন রাজপুরুষের নিকট, এই মহামন্ত্রের কদর্য্য ব্যাখ্যা উপস্থিত করিয়াছে; সেই জন্য তাঁহারা ইহার সাধনা প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দেশীয় নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক রাজপুরুষগণের এই ভ্রমাত্মক সংস্কার বিদূরীকরণ নিতান্ত বিধেয়।

ক্বচিৎ কোথাও এই মন্ত্রের অপব্যবহারও আরম্ভ হইয়াছে। দেশের এই দুর্দ্দিনে, ইহা যে অতীব অবিবেচনার কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে লোকের মন্ত্রের উপর আস্থা মন্দীভূত হইবে; সুতরাং এরূপ ব্যবহার পরিত্যজ্য।

যাঁহারা সত্যই ভারতমাতার সেবক, যাঁহারা মাতৃ প্রেমে সত্যই প্রেমিক, তাঁহারা যেন কিছুতেই হতাশ না হন। "অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি" বলিয়া রত্ন যেন হীনপ্রভ না হয়। যাঁহারা বাস্তবিক এই মহামন্ত্র অবশ্য সাধনীয় বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, দেশবাসীর হৃদয়ে স্বদেশ প্রীতি জাগরিত করা সুবিধেয় বলিয়া যাঁহাদের সত্যই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাঁহারা সামান্য বিপত্তিতে নিরুৎসাহিত হইবেন না। শুভানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন

হওয়া সম্ভবপর নহে; নিগৃহীত না হইলে মহতী কামনা সুসিদ্ধ হইতে পারে না; উৎপীড়নে ভগ্নোৎসাহ হইলে, নির্য্যাতন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে মন্ত্র-মহিমা অনুভূত হইবে না। যাহা সত্যই স্বভাবতঃ পবিত্র, যাহার সহিত পাপ চিন্তার লেশমাত্র নাই, স্বার্থ পরায়ণগণ তাহাকে রাজদ্রোহিতারূপ মহাপাপের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও, তাহাদের সে চেষ্টা পরিণামে কখনই ফলবতী হইবে না।

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন

(১)

অন্যূন ২৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমরা স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি স্বদেশীয়গণের অনুরাগ উৎপাদনের নিয়ত চেষ্টা করিতেছি। এত দিনে আমাদের সে চেষ্টা সফল হইয়াছে। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় এক্ষণে সকলেই দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কেবল বঙ্গবাসী নয় সমগ্র ভারতবাসী স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে ইহাকে রাজনৈতিক আন্দোলন মনে করিয়া ইহাতে যোগ দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। কিন্তু ইহা বাস্তবিক রাজনৈতিক আন্দোলন নহে। সত্য বটে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের আন্দোলন হইতেই এ আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছে। সত্য বটে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যতদিন বঙ্গচ্ছেদের আইন রহিত না হইবে ততদিন আমরা বিলাতী দ্রব্য গ্রহণ করিব না, এবং এ কথাও সত্য যে অনেকে মনে করেন আমরা বিলাতী ত্যাগ করিলে ম্যাঞ্চেষ্টারে বণিকগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন ও সেই ক্ষতি নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে আমাদের প্রার্থনা পূরণ করিতে বাধ্য করিবেন, সেই জন্য অনেকে বলিয়াছিলেন আবশ্যক হইলে অন্য দেশের দ্রব্য ক্রয় করিব, কিন্তু ইংলণ্ডের দ্রব্য কিছুতেই লইব না; কিন্তু এ ভাব দেশ সাধারণের নহে। যাঁহারা পাশ্চাত্য প্রণালীর আন্দোলনের পক্ষপাতী, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত সভা সমিতি ও কংগ্রেস প্রভৃতিতে রাজনৈতিক আন্দোলনমাত্র করিয়া আপনাদের উন্নতির আশা করিতেছেন, সেই সম্প্রদায়েরই কয়েকজনের মাত্র এইরূপ মত। তাঁহাদের মতে দেশের লোকে চলে না—তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ রহিয়াছে; কারণ এ পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায় যত রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়াছেন, কোন আন্দোলনেই,

সাধারণে যোগ দেন নাই; অধিক কি, যে কংগ্রেস দেশের সমূহ হিতকর, তাহা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থল বলিয়া, সে কংগ্রেসেও সাধারণে যোগ দেন, নাই; অনেক বিজ্ঞ লোকও তাহার বিরোধী ছিলেন। সকলেই জানেন, কেবল ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আন্দোলন করিলে, কোন ফল হয় না; কেবল দয়া-পরতন্ত্র হইয়া, বণিকপ্রবর ইংরাজ জাতি, আপনাদের উন্নতির অল্পতা করিয়া, আমাদের হিত সাধন করিবেন না। তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার শক্তি যে আমাদের নাই, তাহাও অনেকে বুঝেন; এই জন্যই এ পর্য্যন্ত সর্ব্ব সাধারণে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা রাজনৈতিক ব্যাপার নহে বলিয়া সকলেই একবাক্যে যোগ দিয়াছেন। স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া, আমাদের যে কি ক্ষতি হইতেছে, তাহার কিছু কিছু সকলেই বুঝিয়াছেন; তাই, আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে, সকলে এ পথের পথিক হইয়াছেন। যাঁহারা প্রথমে ইহাকে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এক্ষণে বুঝিয়া, তাঁহাদের পূর্ব্ব কথা প্রত্যাহার করিয়াছেন। যদি গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করেন ও তখন যদি আমরা পূর্ব্বের ন্যায় বিলাতী ব্যবহার আরম্ভ করি, তাহা হইলে পরে এরূপ করিয়া ভয় যে আর দেখান চলিবে না, এ কথাও অন্ততঃ তাঁহারা বুঝিয়াছেন। যদি দেশের লোকে বুঝিতে পারে যে, আমাদের এ চেষ্টা স্থায়ী নহে, তাহা হইলে শত শত ক্ষতি সহ্য করিয়া, পরে আবার ভয় দেখাইতে পারিবে কেন? এক্ষণে দেশী বস্ত্রের মূল্য অনেক বাড়িয়াছে; যে ব্যবসায়ী বহুতর টাকার মূল্যবান দ্রব্য মজুত করিবেন, যে সকল কলওয়ালা বহু ব্যয়ে কল স্থাপন বা তাঁত আদির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবেন, পুনরায় বিলাতী ব্যবহার করিলে তাঁহাদের যে প্রভূত ক্ষতি হইবে, তাহতে ত আর সন্দেহ নাই। সেই ক্ষতির কথা স্মরণ করিয়া, আর কখনও তাঁহারা আন্দোলন-কারীদিগের কথায় আস্থা রাখিতে পারিবেন না। সুতরাং অত্যধিক অত্যাচার হইলেও, আর কখনও যে এ ভয় দেখান সম্ভবপর হইবে না, এ কথা বুঝিয়াও, তাঁহারা আপনাদের কথা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; এক্ষণে সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন বঙ্গ ভঙ্গের সহিত এ আন্দোলনের কোন সম্বন্ধ নাই। সকলেই বলিতেছেন আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি-সাধন জন্য আমরা চিরকালই এই ব্রত পালন করিব। অতএব ইহা কোন মতেই রাজনৈতিক আন্দোলন নহে।

এ আন্দোলন আত্মরক্ষারই জন্য। যেরূপ ভাবে দিন দিন আমাদের

দেশের শিল্পের অবনতি হইতেছে, আর কিছুদিন এ ভাবে চলিলে আমাদের দেশের লোকেরা যে এককালে অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিবে, অন্ততঃ মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকের যে বিলোপ সাধন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "ধর্ম্মশাস্ত্র তত্ত্ব ও কর্ত্তব্য বিচার" নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে, সেই জন্য এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা হইল না। সকলকেই সেই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি, তাহা হইলে ইহার যে কত প্রয়োজনীয়তা তাহা বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ ইহাকে রাজনৈতিক আন্দোলন বা রাজবিদ্রোহিতা মনে করার কোন কারণই নাই। সুতরাং যাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলন মনে করিয়া ইহার প্রতিকূল পথে যাইতেছেন, বা ইহাতে যোগ দিতেছেন না, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? স্বর্গীয় মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যে প্রতিজ্ঞা পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে কি তিনি বলেন নাই যে, জাতি নির্ব্বিশেষে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সকল প্রজার সমান হিতসাধন করিবেন এবং সকলেরই শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতির দিকে সমান দৃষ্টি রাখিবেন? কর্ম্মচারীর দোষে যদি তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা পালিত না হয়, আমরা যদি চেষ্টা করিয়া তাহার প্রতিপালনের আয়োজন করি, তাহাতে আমাদের ত রাজভক্তিই প্রকাশ পাইবে, বিদ্রোহ কোথায়? এই যে বিদেশী দ্রব্যের অজস্র আমদানী হইতেছে, ইহাতে কি তাঁহার ভারতীয় প্রজার শিল্পোন্নতি হইতেছে? না য়ুরোপের ও ভারতীয় সকলের সমান অবস্থা হইতেছে? ইহা দ্বারা কি তাঁহার য়ুরোপীয় প্রজাগণ ধনকুবের ও ভারতীয় প্রজাগণ অন্নের ভিখারী হইতেছে না? তাহা যদি হয়, তবে বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার ত্যাগ করিলে তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ হইবে কি প্রকারে? আমরা রাজকার্য্যের ত কোন ক্ষতিই করিতেছি না, তাঁহার য়ুরোপীয় প্রজাগণ অযথা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, আমাদিগকে যে দিন দিন অন্নহীন করিতেছেন, সেই অযথা লোভেরই দমন চেষ্টা করিতেছি ও সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের রক্ষাবিধানের উপায় করিতেছি মাত্র। অতএব রাজার অসন্তোষ ভয়ে যাঁহারা এই আন্দোলনে যোগ না দিতেছেন, তাঁহারা কখনই রাজাকে ন্যায়পর মনে করেন না। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে করেন, ইংরাজরাজ মুখে যাহা বলেন, মনে তাহার বিপরীত। তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা, ভারত ধ্বংসই ইংরাজ রাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁহাদের রাজার প্রতি এরূপ নীচ ভাব, তাঁহারা রাজভক্ত, না যাঁহারা রাজ

বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহাদেরই প্রদর্শিত পথে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন, তাঁহারা রাজভক্ত? সকল সাধু ইংরাজই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া আসিতেছেন, আমাদের শিল্পোন্নতির বড়ই প্রয়োজন; লর্ড কর্জ্জন বলেন শিল্পাদির উন্নতি-বিধান জন্যই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ কণ্টকর করিয়াছেন—সকলেই চাকরির লোভে উচ্চ-শিক্ষালাভের চেষ্টা করে, শিল্পাদির উন্নতির দিকে কাহারই দৃষ্টি নাই, উচ্চশিক্ষা কষ্টসাধ্য হইলে, অনেকে শিল্প বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইবে। সে দিন বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর ফ্রেজার সাহেবও ভূপেন্দ্র বাবুর পত্রের উত্তরে বলিয়াছেন, এই স্বদেশীয় আন্দোলনে তাঁহার বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে। এ সকল কথা বিশ্বাস না করিয়া, যাঁহারা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, তাঁহারা মহারাজই হউন বা মহাপণ্ডিতই হউন, তাঁহারা যে আমাদের সম্রাট্‌কে ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীবর্গকে মিথ্যাবাদী মনে করেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং রাজা বা রাজজাতি তাঁহাদিগকে যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসিগণেরও শত্রুরূপে পরিগণিত হইবেন।

কেহ হয় ত বলিবেন আচ্ছা আচ্ছা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কর, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার জন্য এত সভা সমিতি কেন? এমন দলবদ্ধঃ হওয়া কেন? এমন জোর জবরদস্তি কেন? এত ছেলে মাতানই বা কেন? শান্ত ভাবে করিলেই ত হয়। কিন্তু সে শক্তি আমাদের কোথায়? ২৫ বৎসরের অধিক কাল হইতে দেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার জন্য কত বুঝান হইয়াছে, সস্তা করিয়া কাপড় আনাইয়া দেখান হইয়াছে তাহাতে কি ফল হইয়াছে? অনেকস্থলে হাস্যাস্পদই হইতে হইয়াছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গও আমাদের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। যদি আমাদের সকলের সে জ্ঞান ও সে শক্তি থাকিত, তাহা হইলে কি এদেশে বিলাতী দ্রব্যের এরূপ আমদানী হইতে পারিত? কখনই না। আমাদের কিসের অভাব যে, সেই অভাব নিবারণের জন্য আমরা বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি? চিরকাল আমাদের দেশের দ্রব্য দ্বারাই সর্ব্বদেশের লোকে অভাব মিটাইতেছেন। আমাদের কিসের অভাব হইয়াছিল যে, সেই অভাব মোচনের জন্য, আমাদের বিদেশীয় দ্রব্যের প্রতি আনুরক্তি জন্মিল? স্বর্ণপ্রসূ ভারতে আমাদের ত কিছুরই অভাব নাই; অশন,

বসন, জ্ঞান, ধর্ম্ম, চিকিৎসা, ঔষধ, কারুজ দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, যাহা মানবের প্রয়োজনীয়, সমস্তই যথেষ্ট পরিমাণে ভারতে চিরকাল হইতে আছে; কোন দ্রব্যেরই জন্য আমাদের বিদেশের সহায়তা গ্রহণের আবশ্যকতা হয় না; বোধ হয় সেই জন্যই আমাদের পুরাণকারেরা সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করিয়াছেন। সমুদ্র বাণিজ্যে আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়াই, সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করিয়াছেন। এক্ষণে কেবল শিক্ষার দোষে, বিলাসিতার দোষে ও অপরিণামদর্শিতার দোষে, আমরা বিদেশীয় দ্রব্যাদির প্রিয় হইয়াছি। এবং সেই শিক্ষা ও অভ্যাসের বশে আমরা এখন এককালে অকর্ম্মণ্য ও পদার্থশূন্য হইয়াছি। সামান্য উপদেশে এ দোষ কাটিবার নয়। দলবদ্ধ হইয়াছি বলিয়া, হুজুগপ্রিয় আমরা হুজুগে মাতিয়াছি বলিয়া, কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে; হুজুগ না হইলে কখনই এরূপ হইত না; শত গ্রন্থ লিখিয়া, শত উপদেশ দিয়াও এ কার্য্য হইত না। এই সকল বুঝাইবার জন্য যে সুবৃহৎ "ধর্ম্মশাস্ত্র তত্ত্ব ও কর্ত্তব্য বিচার" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সে গ্রন্থ কয়জন পড়িয়াছেন বা পড়িবেন? কিন্তু হুজুগে পড়িয়া, বক্তৃতা শুনিতে গিয়া অনেকে অনেক কথা শুনিতেছেন। সুতরাং হুজুগের নিতান্ত প্রয়োজন। সকল দেশেই ঐরূপ কার্য্যে হুজুগ হইয়া থাকে। য়ুরোপীয় যে যে দেশে যখনই ঐরূপ কোন প্রয়োজনীয় সাধারণ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তখনই মহাহুজুক হইয়াছে। যেমন তেমন হুজুক নহে, তাহাতে বিবাদ বিসম্বাদ নরশোণিতপাত প্রভৃতি অকার্য্য যে কত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনি মতের বিরোধী হয়েন বা দলভুক্ত না হয়েন, তিনি রাজাই হউন আর পণ্ডিতই হউন, সকলেই তাঁহার যথাসাধ্য অনিষ্ট করে। ভয়ানক পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় যে কত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের হুজুগ সেরূপ ভীষণ নহে, বলিতে গেলে ইহা স্থির গম্ভীর। উষ্ণশোণিত বালকও যুবকের এরূপ ধীরভাবে আন্দোলন পৃথিবীর আর কোনও দেশে কখনও হইয়াছে কি? ইহাকে যদি রাজনৈতিক আন্দোলন, বা বিদ্রোহ বলিতে হয়, তাহা হইলে কোন্ কার্য্য বিদ্রোহসূচক নয়? তাহা হইলে ইংরাজি সংবাদ পত্র প্রণেতা প্রভৃতিকে যে পদে পদে রাজবিদ্রোহী বলিতে হইবে। স্বজাতির হিতসাধন জন্য তাঁহারা কি না করিয়া থাকেন! আমাদের এ শিক্ষা ত তাঁহাদেরই আদর্শে। তাঁহারাই বুঝাইয়া দিয়াছেন, প্রজার স্বার্থরক্ষাই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য, সুতরাং সেই স্বার্থরক্ষার হানি হইলে, প্রজাগণের সর্ব্বপ্রকার

আন্দোলন করিবার অধিকার আছে। তাঁহাদের নিকট এ সকল শিখিয়াও এতদিন আমরা সে পথে পদার্পণ করি নাই। রাজভক্ত হিন্দু আমরা কেবল রাজার অনুগ্রহেরই আশা করিয়াছি; আমাদের চিরকালই বিশ্বাস, রাজা ও রাজ-জাতি'আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহা আমাদের হিতেরই জন্য। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সম্পূর্ণ ভাবেই তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহাই হিতকর ভাবিয়াছি—তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা, তাঁহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম, তাঁহাদের আচার ব্যবহার, সমস্তই উৎকৃষ্ট ও অবলম্বনীয় মনে করিয়াছি; তাঁহাদের স্বদেশী শিল্প ও অবাধ বাণিজ্যব্যবস্থা আমাদের প্রভূত মঙ্গলেরই হেতু মনে করিয়াছি। এবং তাঁহারা যাহা বলেন, তাহার যে অন্যথা করেন না, তাঁহারা আইন বিরুদ্ধ কিছুই করিতে পারেন না, এ ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হইয়াছিল। সেই ধারণার বশে, আমরা আত্মনির্ভর এককালে ত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়াছি। যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি; তাঁহাদের দয়াতেই আমরা বড় চাকরী পাইব, রাজনৈতিক শক্তি লাভ করিব, উচ্চ শিক্ষা পাইব, শিল্পবিজ্ঞানে পণ্ডিত হইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ ছিল—তাই আমাদের যাহা আবশ্যক সমস্তই তাঁহাদের কাছে চাহিতেছি। শিক্ষা দীক্ষা, পানীয় জল, জীবনোপায়, চিকিৎসা, সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার তাহাদের দ্বারাই সংসাধিত হইবে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। কোন বিষয়েরই জন্য আমরা স্বতঃ চেষ্টা করি না। এমন কি আমাদের ভাষার উন্নতি ও আমাদের ধর্ম্মজ্ঞানও তাঁহাদের উপর নির্ভর করে। বাস্তবিক আমাদের রাজা সকল বিষয়েরই আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষা লাভ করি, তাঁহাদের চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত হই, তাঁহাদের আনীত দ্রব্য ব্যবহার করি, তাঁহাদের নীতিশাস্ত্রকে ধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞান করি, তাঁহাদের আইন বলে দস্যু তস্কর বিতাড়িত হয়, প্রজা ভূস্বামীর অত্যাচার হইতে ও শ্রমজীবীরা যন্ত্রাধিকারীগণের অত্যাচার হইতে রক্ষিত হয়। নিজে নিজে আমরা কিছুই করি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজা ও রাজকর্ম্মচারীগণ এক প্রকৃতির লোক নহেন, যদিও রাজা আমাদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, রাজকর্ম্মচারী সকলের সেরূপ ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত ভয়ে, অনেক রাজকর্ম্মচারী আমাদের প্রকৃত হিতচেষ্টা করেন না। রাজা

আমাদের দূরতর প্রদেশে বাস করেন; তিনি ভারতের কোন সংবাদই রাখেন না; তিনি রাজতন্ত্রের রাজা নহেন,প্রজাতন্ত্রের রাজা; প্রজাগণ রাজ্যের সমস্ত হিতাহিত চিন্তা করে, রাজা সেই সকল সমর্থন করেন মাত্র; কাজেই প্রজাবর্গের দুঃখ হইতেছে কিনা, যথানিয়মে রাজকার্য্য চলিতেছে কিনা, কি করিলে প্রজাগণের মঙ্গল সাধিত হয়, সে বিষয়ে চিন্তা করা তাঁহার অভ্যাস নাই। প্রজাগণই সে মঙ্গল চিন্তা করেন ও সভাদি করিয়া রাজাকে জ্ঞাপন করেন। রাজা তদনুসারেই কার্য্য করেন। ভারতে প্রজাতন্ত্র না হইলেও,রাজাই ভারতের সম্রাট হইলেও, অভ্যাস বশতঃ রাজা সম্রাটের কার্য্য করেন না। তিনি হয়ত মনে করেন, ভারতের প্রজাবর্গ আপন আপন হিত চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু তাহা না হইয়া, শাসনভার যে স্বদেশ-হিতৈষী কতকগুলি কর্ম্মচারীর উপরই ন্যস্ত, তাঁহারা কেবল স্বদেশের হিত লইয়াই ব্যস্ত, ভারতীয় প্রজার নিরপেক্ষ হিত কথা মনেও করেন না, বুঝেনও না। তাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষী জাতি,স্বদেশের হিতসাধনই তাঁহাদের মুখ্য কার্য্য। এমন অনেক কার্য্য আছে যে, ভারতের অনিষ্ট না করিলে তাঁহাদের স্বদেশের উন্নতি হয় না, ও ভারতের উন্নতি করিতে হইলে স্বদেশের হিতসাধন করা হয় না। কোন্ প্রাণে, কোন্ ধর্ম্মে, কোন্ যুক্তিতে তাঁহারা তাহা করিবেন? তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে রাজা নহেন, চিরকালের কর্ম্মচারীও নহেন; কয়েক দিনের জন্য মাত্র ভারতের কর্ত্তা হয়েন; তাঁহাদের মনে স্বদেশের হিত চিন্তার বিরোধী রাজধর্ম্ম জাগিবে কেন? স্বজাতির প্রশংসাই তাঁহাদের প্রার্থনীয়। তাই প্রজাপরায়ণ হইলেও সম্রাটের দ্বারা আমাদের সকল অভাব মোচন হয় না। আমাদের অভাব অভিযোগ রাজার কর্ণে প্রবেশই করে না; তাই আমাদের শিক্ষিতগণ আমাদের দুঃখকাহিনী, আমাদের প্রার্থনা, রাজা ও ইংলণ্ডের বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের কর্ণে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বিলাতের অনুকরণে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন; বিলাতে সংবাদ পত্র প্রেরণ, প্রতিনিধি নিয়োগ, কংগ্রেসে সাহেব সভ্য ও সভাপতি বরণ ইত্যাদি নানা উপায়ে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই লাভ হইল না, আমাদের কোন প্রার্থনাই পূর্ণ হইল না। ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীরা যাহা করিবেন বলেন, আমাদের শত আবেদনেও তাহার অন্যথা হয় না; পরিশেষে বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে সমগ্র বঙ্গবাসী শত শত বিরাট সভা করিয়া, আমাদের একান্ত অনিচ্ছা জানান হইল, তাহাতেও কোন ফল ফলিল না, বরং তাঁহাদের জেদ বাড়িয়া গেল; প্রথমে

তিন চারিটা জেলামাত্র আসামের অন্তর্গত করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে সম্পূর্ণ দুইটী ডিবিসন আসামের অন্তর্গত হইল। প্রথমে ঢাকায় রাজধানী করিবেন বলিয়াছিলেন, আন্দোলনের ফলে বিপরীত হইল, সেই সিলংই রাজধানী রহিল; পরে বন্দর করিবার অভিপ্রায়ে চট্টগ্রামে রাজধানী হইবে শুনা যায়। বঙ্গবিভাগ না করিলে যে রাজ্যশাসনের বিশেষ কোন ব্যাঘাত হইত, এমন কথা বলা যায় না। ইহা দ্বারা ইংরাজজাতির কয়েকজন অতিরিক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিশেষ স্বার্থ সাধিত হইবার সম্ভাবনাও বুঝা যায় না। তথাপি যখন রাজপুরুষেরা আমাদের কাতরতা উপেক্ষা করিলেন, আমাদের কোন যুক্তিই তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইল না, তখন শিক্ষিতগণের সকল ভরসা ফুরাইল। আমাদের কোনরূপ দুঃখ যে তাঁহারা বুঝিবেন, আমাদের কোন ইচ্ছা, কোন আবদার যে রক্ষা করিবেন, সে আশা এককালে গেল। কাজেই এতকাল যে আশা করিয়াছিলাম, রাজা আমাদের সকল দুঃখ নিবারণের ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির উপায় করিবেন, সে আশা এককালে গেল। তখন আপনাদের পথ আপনারা দেখা ভিন্ন উপায় কি? তাই, যখন শুনা গেল, আমাদের এত আন্দোলন, এত চেষ্টা, এত আশা সমস্তই বৃথা হইল, তখন আত্মহারা ও জ্ঞানশূন্য হইয়া, আত্মরক্ষার উপায় স্থির করিতে হইয়াছিল। যে দৃঢ়বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল, এককালে সে বিশ্বাস নষ্ট হওয়ায়, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইতে হইয়াছিল। ক্রিয়া যেরূপ বেগে হয়, প্রতিক্রিয়াও সেইরূপ বেগে হয়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। বিশেষতঃ আমাদের সমস্ত শিক্ষা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান রাজজাতি হইতে প্রাপ্ত; তাঁহাদের মতে প্রত্যেকেরই আত্মনির্ভর কর্ত্তব্য, কোন বিষয়েই পরের গলগ্রহ হওয়া কর্ত্তব্য নয়, এবং তাঁহাদের মতে স্বদেশের হিতসাধন করাই মুখ্য কর্ত্তব্য। আমরা সর্ব্ববিষয়ে পরের মুখাপেক্ষী হইয়াছি বুঝিয়া, যাহাতে আর তাহা না করিতে হয়, আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা নিজে প্রস্তুত করিতে পারি, নিজের চেষ্টায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারি, তাঁহাদের উপদেশ মত সেইরূপ চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; সুতরাং ইহা অবৈধ রাজনৈতিক আন্দোলন নহে। ইহা দ্বারা বরং ইহাই বুঝাইতেছে যে, আর আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন করিব না; আমাদের শক্তির অনুরূপ আপনাপন উন্নতিরই চেষ্টা করিব। আমরা বুঝিয়াছি, ইংলণ্ডাদি দেশের ন্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনে আমাদের কোন ফল হইবে না। সে সকল দেশের প্রজাগণই রাজকর্ম্মচারী, সুতরাং

তথাকার প্রজার স্বার্থ ও রাজকর্ম্মচারীর স্বার্থ একই প্রকার, এবং তথাকার আইন কানুন প্রজার মতানুসারে হইয়া থাকে। এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে প্রজার স্বার্থ রাজকর্ম্মচারীর স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং এখানকার আইন কানুন প্রণয়নে প্রজার কোন ক্ষমতাই নাই। সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করিয়া, আপনাদের জীবন রক্ষার উপায় চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। দিন দিন যেরূপ আমরা বিলাতী দ্রব্যের পক্ষপাতী হইয়াছি, তাহাতে অচিরে আমাদের শিল্প সমূহের লোপ হইবে, তখন জীবিকার অভাবে আমাদের জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইবে। চাকরী দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, খাদ্য দ্রব্য দিন দিন মহার্ঘ হইতেছে, বিলাস পরায়ণ হওয়ায়, অভাবের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। স্বদেশের প্রতি ঘৃণা ও বিলাতি ভক্তিই যে, এ সকলের কারণ, তাহা বুঝিতে পারিয়া স্বদেশের প্রতি প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য, বিলাতী বর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছি, বিদ্বেষবশতঃ নহে। রাজার বা রাজকর্ম্মচারীর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ বাসনাতেও নহে। আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য তাঁহাদেরই উপদেশ ও শিক্ষার অনুমত কার্য্য হইতেছে।

কেহ কেহ ইহাকে বালকের—ছাত্রদলের হুজুগ বলেন। তাঁহারা বলেন, কাণ্ডজ্ঞানহীন বালকেরা রাজনীতিপ্রিয় কয়েক জনের কুহকে পড়িয়াই এই হুজুগ তুলিয়াছে, সুতরাং ইহাতে সারবত্তা কিছুই নাই। কিন্তু বাস্তবিক সে কথা ঠিক নহে। ছাত্রেরা এই মত প্রচারের প্রধান অঙ্গ হইলেও, যুবা বৃদ্ধ নর নারী সকলেই ইহাতে সম্পূর্ণ লিপ্ত আছেন; তবে যে, ছাত্রেরা আন্দোলন করিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছে, 'বন্দেমাতরম্' গান গাহিয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেছে তাহার কারণ যথেষ্ট আছে। অধ্যবসায় না থাকিলে মানুষ কোন কার্য্যই করিতে পারে না। দুশ্চিন্তাশূন্য না হইলে, অধ্যবসায় দূরে থাকুক, সামান্য চেষ্টাও করিতে পারে না। আমাদের গৃহের কর্ত্তৃপক্ষগণ নানা চিন্তায় ব্যাপৃত; অর্থ নাই, শক্তি নাই, তাহার উপর অভ্যাস দোষে বিলাসপ্রিয় ও উদ্যমহীন হইয়াছেন। নিয়তই তাঁহাদের ভাবনা-কিসে সংসার চলিবে, কিরূপে পুত্র কন্যার শিক্ষা বিধান করিবেন, কি উপায়ে সৎ-পাত্রে কন্যা সমর্পণ করিবেন, কিরূপে গৃহলক্ষ্মীদের পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদির সাধ মিটাইবেন, এই সকল চিন্তায় তাঁহারা নিয়ত জর্জ্জরিত; তাঁহাদের এমন সময় কোথায় যে, তাঁহারা দেশের হিতসাধনে মত্ত হইবেন? সাহসই বা কি? যদি কোন কুফল ফলে, যদি কোন দুষ্ট লোক তাঁহাকে রাজার কোপে পাতিত

করে, তাহা হইলে সংসারের উপায় কি হইবে? সহিয়া সহিয়া তাঁহাদের শোণিত শীতল হইয়া গিয়াছে; সুতরাং সেরূপ উৎসাহও তাঁহাদের জন্মিতে পারেনা। মরিয়া হইয়া তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। বালকদের কোন চিন্তাই নাই; তাহারা সরলচিত্ত, যাহা কর্ত্তব্য মনে করে তাহার অনুষ্ঠানে তাহাদের তখনই ইচ্ছা হয়; ভবিষ্যৎ কোন ভাবনাই তাহাদিগকে সে কর্ত্তব্য পথ হইতে বিতাড়িত করিতে পারে না। তাহারা বুঝিয়াছে, স্বদেশের শিল্প নষ্ট হইলে দেশের মহান্ অনিষ্ট হয়, তাই তাহারা কর্ত্তব্য বোধে এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে; ইহা তাহাদের বাল-চপলতা নহে; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে তাহাদের আভিভাবকগণ কখনই তাহাদিগকে এ আন্দোলনে যোগ দিতে দিতেন না; আপনারাও স্বদেশীয়দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ দেখাইতেন না। অভিভাবকগণ 'বন্দেমাতরম্' গান করেন না বটে, কিন্তু সভা সমিতিতে যোগদান, দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার, জাতীয়সমিতিতে অর্থদান প্রভৃতি সকল প্রকারেই ত এই আন্দোলনের সহায়তা করিতেছেন। অধিক কি, যে স্ত্রীজাতি এমন অপদার্থ হইয়াছেন যে, বেশভূষাই সর্ব্বস্ব মনে করেন, নিয়ত বেশ লইয়াই উন্মত্তা, সেই স্ত্রীজাতি এই আন্দোলনে যোগ দিয়া সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে মনোযোগী হইয়াছেন; মোটা কাপড় ও শাঁখা পরিয়া তুষ্ট হইতেছেন; ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন স্বদেশীয় পুরুষগণকে ভ্রাতা মনে করিয়া ফোঁটার অর্থ পাঠাইবার জন্য বিলক্ষণ আগ্রহ দেখাইয়াছেন। তবে কি প্রকারে বলা যাইবে ইহা ছেলেদের হুজুগমাত্র! এপর্য্যন্ত ছেলেদের কোনও হুজুকে কি সাধারণে যোগ দিয়াছেন? বস্তুতঃ ইহা বালকের হুজুগ নহে। বালকেরা অভিভাবকগণের অভিমত কার্য্যই করিতেছে। পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও যাহা অভিভাবকগণ করিতে পারেন না, তাহাই বালকেরা করিতেছে। ছাত্রদল এরূপ না করিলে কখনই আমাদের এ আন্দোলনে কিছু ফল হইত না। তবে কথা এই যে, বালকদিগের এরূপে সময় নষ্ট করা উচিত নহে। শিক্ষাই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; অন্য কার্য্যে মন দিলে শিক্ষার ব্যাঘাত হয়; এই জন্যই বালকদের এ সকলে যোগ দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু যখন আমাদের অভিভাবকগণ দ্বারা প্রচার কার্য্য চলে না; তখন ছাত্রগণ এ ক্ষতিটুকু স্বীকার না করিলে মহৎকার্য্য যে সাধিত হইতেই পারে না। অল্পদিন শিক্ষার ক্ষতিকে এক্ষণে

লোকে তত ক্ষতিও মনে করে না; কারণ এক্ষণে যে শিক্ষা হইতেছে, তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে, চাকরির উপায় মাত্র। সে চাকরির আশা এক্ষণে আর সেরূপ নাই। এক্ষণে উপাধি লাভও অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিতেছে। অনেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই পারে না; এই শিক্ষা বিভ্রাটে অনেকে চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন; শিক্ষিত দলের এক্ষণে যেরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া, কে আর এবংবিধ শিক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যের প্রতি তাচ্ছিল্য করিবার পক্ষপাতী হইবেন! এক্ষণে অনেকেরই মতে এ শিক্ষা ত্যাগ করিয়া, উদরান্নের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মাড়োয়ারি, সেঠি প্রভৃতি ব্যবসা-প্রিয় জাতিরা শিক্ষা না করিয়াও প্রভূত ধনসম্পন্ন ও সম্মানিত হইতেছেন; আর আমাদের শিক্ষিত বি এ, এম্ এ প্রভৃতি উপাধিধারীরা অতি হীন অবস্থায় বাস করিতেছেন দেখিয়া, আধুনিক শিক্ষার উপর লোকের আর সেরূপ আস্থা নাই। তাই, এই আন্দোলনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে উদরান্ন সংস্থানের উপায় হইবে মনে করিয়া, সামান্য শিক্ষার ক্ষতিকে তত ক্ষতি মনে করিতেছেন না। এক্ষণে যেরূপ অল্পসংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, কিয়ৎক্ষণ প্রচার কার্য্যে সময় নষ্ট করিলে, যে সংখ্যার অল্পতা হইবে বলিয়াও বোধ করেন না। বিশেষতঃ ছাত্রেরা যে সময়ে ক্রীড়া ও বৃথা গল্লাদিতে সময় নষ্ট করে, সেই সময়ে ক্রীড়াদি না করিয়া যদি এ কার্য্য করে, ও আর একটু পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষার উপযোগী পাঠ অভ্যাস করে, তাহা হইলে কিছুমাত্র অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই; হইলেও, এই আন্দোলনে যে ফলের সম্ভাবনা, তাহার তুলনায় সে ক্ষতি ক্ষতিই নহে; যেরূপ চাকরি মহার্ঘ হইয়াছে, তাহাতে এক বৎসর একজনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলেও ক্ষতি নাই। মধ্যে মধ্যে বালকদের অপরিণামদর্শিতার ফলে দুই একটি হাঙ্গামা হইতেছে, দেখিয়া কেহ কেহ বড়ই বিরক্ত হয়েন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় তাহাতে ছাত্রদলে অপেক্ষা রাজপুরুষগণের দোষই অধিক। রাজপুরুষগণ বিবেচনা না করিয়াই, তাহাদিগকে অপমানিত ও পীড়িত করাতেই এরূপ হইতেছে। এত বড় ব্যাপারে যে কিছুমাত্র গোলযোগ হইবে না, এরূপ আশা করা একান্তই অসম্ভব। সেই অসম্ভব ব্যাপার আমাদের দেশে হইতেছে; এরূপ ধীর ভাবে আন্দোলন কোন দেশেই দেখা যায় না। তথাপি আমাদের রাজপুরুষেরা তাহাদের প্রতি অযথা ব্যবহার করিতেছেন। সেই অযথা ব্যবহারের ফলেই দুই একটি হাঙ্গামা হইতেছে; যদি রাজপুরুষগণ ধীরভাবে আমাদের গতিবিধি

লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ হইতে পারে না। তাঁহারা কি বুঝিতে পারেন নাই, বিদেশীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত প্রচলনে আমাদের কি অনিষ্ট হইতেছে? তাঁহাদের দেশে এরূপ হইলে কি তাঁহারা আরও অধিকতর বেগে আন্দোলন করিতেন না? তবে, তাঁহারা কি দোষে বালকগণকে আন্দোলনে যোগ দিতে নিষেধ করেন? বালকেরা অনুনয় বিনয় করিয়াই লোককে বিলাতী বর্জ্জনের চেষ্টা করে। বল প্রয়োগে হিন্দুর ইচ্ছাই হয় না; তথাপি রাজপুরুষগণ বালকদের বিপক্ষতাচরণ করেন, সাংসারিক কুটিলতায় অনভিজ্ঞ, কর্ত্তব্যপরায়ণ সরলপ্রাণ বালকগণ, কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বাধা পাইয়া বিচলিত হয় ও পাশ্চাত্যগণের পথানুসরণে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে। পাশ্চাত্য-গণের প্রকৃতি যে এদেশে আসিয়া স্বার্থের তাড়নে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝে না, তাই তাহারা কুটিলতার আশ্রয় না লইয়া বিশ্বাসানুরূপ কর্ত্তব্যরই অনুষ্ঠান করে। কাযেই রাজপুরুষগণের সহিত সংঘর্ষ হয়। অভিভাবকগণ বুঝাইয়া দেওয়ায় তাহারা এক্ষণে শান্তও হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

রাজ প্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন

লর্ড কর্জ্জন ভারতবর্ষে ছয় বৎসরের অধিককাল রাজ প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করিয়া, ভারত সচিবের সহিত মনান্তর হওয়ায়, পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইনি যে একজন পণ্ডিত, পরিশ্রমী, কার্য্যদক্ষ, কর্ত্তব্যপ্রিয় ও প্রতিভাশালী লোক, তাহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। শাসন কার্য্যের সকল বিভাগেই ইঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইনি স্বায়ত্ত-শাসন, শিক্ষা, বিচার, রাজস্ব, পুলিশ, আবকারী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিভাগের অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনে আমাদের দেশের হিত কি অহিত সাধিত হইবে, তাহার সমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মহামতি লর্ড রিপণ আমাদের দেশে আত্ম-শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। তিনি একজন উচ্চমনা সুদূরদর্শী গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। রাজকর্ম্মচারীগণের দ্বারা দেশের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য আভ্যন্তরিক বিষয়ের কার্য্য

সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না, বিশেষতঃ ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেশীয়দের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হওয়ায় অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটে; এই সকল বিবেচনা করিয়া, তিনি দেশীয় যোগ্য লোকদিগকে অবৈতনিক রাজকর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিয়া, স্বায়ত্ব শাসন আইন প্রবর্ত্তিত করেন। ইহা তাঁহার উদারতা ও সূক্ষ্ম দর্শিতার পরিচায়ক। লর্ড কর্জ্জন ইংলণ্ডের অনুদার সম্প্রদায়ভুক্ত ও স্বায়ত্বশাসন বিরোধী। কাজেই তিনি রাজধানী কলিকাতা হইতে স্বায়ত্বশাসন প্রথা উঠাইয়া দিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্ব প্রচলিত মিউনিসিপাল আইন অনুসারে করদাতাগণের নির্ব্বাচিত কমিশনরদিগের সংখ্যা ও ক্ষমতা অধিক ছিল। লর্ড কর্জ্জন সে আইন রদ ও নূতন আইন প্রবর্ত্তিত করিয়া কমিশনর সংখ্যা হ্রাস ও তাঁহাদের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াছেন। নূতন আইন জারি হইলে, পুরাতন সম্ভ্রান্ত কমিশনরগণ পদ-ত্যাগ করেন; দেশীয় সংবাদপত্রে ও সভা সমিতিতে আইনের প্রতিবাদ হইল; কিন্তু তিনি সকলই অগ্রাহ্য করিলেন। দেশ হইতে স্বায়ত্বশাসন প্রণালী একবারে উঠাইয়া দেওয়াই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল বলিয়া বোধ হয়; এবং কলিকাতা হইতে ইহা উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে; এখন গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত ইংরাজ সভাপতিই সর্ব্বেসর্ব্বা। পল্লীগ্রামে সুযোগ্য লোকের অভাব হইতে পারে, কিন্তু কলিকাতায় সে অভাব নাই; সুতরাং আমাদের বিবেচনায় কলিকাতার মিউনিসিপাল আইন পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা ছিল না। দেশীয় লোকের প্রতি অবিশ্বাসই লর্ড কর্জ্জনের একটী মহৎ ভ্রম।

শিক্ষা বিভাগে লর্ড কর্জ্জন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় পূর্ব্বতন আইন রদ করিয়া এক নূতন আইন প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষা প্রণালী গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হইবে ও উচ্চ শিক্ষার পথ এক প্রকার বন্ধ হইবে। ইংলণ্ডের অনুকরণে এ দেশের শিক্ষা বিভাগের কার্য্য চলিবে, ইহাই লর্ড কর্জ্জনের উদ্দেশ্য। লর্ড কর্জ্জন কয়েক বৎসর এ দেশে থাকিয়াও দেশের অবস্থা অবগত হন নাই; নচেৎ শিক্ষা বিষয়ের এরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন করিতেন না। নূতন আইন কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের বে-সরকারী অনেক কলেজ উঠিয়া যাইবে; সুতরাং দরিদ্র ও মধ্যবিত্তগণের উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ হইবে। নিম্নশিক্ষা, কৃষি ও শিল্পশিক্ষার কতক সুবন্দোবস্ত হইলেও ফলে কি হইবে, এখন বলা যায় না। শিক্ষা বিভাগের অসুবিধাকর কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে এবং ঐ

বিভাগের আয় বৃদ্ধির উপায় করা হইয়াছে। আজ কাল সামান্য অপরাধে স্কুলের ছাত্রদিগের জরিমানা করিয়া তাহাদের অভিভাবকগণের ক্ষতি করা হয়। কোন্ ছাত্রকে স্কুলে ভর্ত্তি করিতে হইলে, তাহার অভিভাবককে দুইটী সাক্ষী লইয়া যাওয়া চাই; এ কি বিষম কথা! পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিতান্ত অযুক্তিকর প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগকে এত অধিক ও এরূপ দুরূহ পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করিতে হয় যে, অচিরে তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দেশীয় শিক্ষিতগণ এরূপ গুরুতর বিষয়ে প্রায়উদাসীন; এ সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন ও প্রতিবাদ আবশ্যক।

এ দেশের অধিকাংশ পুলিশ কর্ম্মচারী অকর্ম্মণ্য, অত্যাচারী ও অর্থলুব্ধ; গভর্ণমেণ্ট ইহা জানেন ও স্বীকার করেন। পুলিশ সংস্কার আবশ্যক স্থির করিয়া লর্ড কর্জ্জন একটা কমিশন বসাইলেন; ইহার ফলে কতকগুলি সাহেব পুলিশকর্ম্মচারীর বেতন বৃদ্ধির বন্দোবস্ত হইল। দেশীয় দারোগা ও কনষ্টেবলের সংখ্যা ও বেতন যৎসামান্য বৃদ্ধি করা হইল। সাহেব কর্ম্মচারীগণ প্রচুর বেতন পাইয়া থাকেন; তাঁহাদের বেতন আরও বৃদ্ধি করায় যে, কিরূপে পুলিশ সংস্কার হইবে, ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমাদের বিশ্বাস, সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ অধস্তন কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য যথারীতি পর্য্যবেক্ষণ করেন না, কিম্বা করিতে জানেন না; তাঁহাদের অসৎকার্য্যের প্রশ্রয় দেন কিম্বা এরূপ কার্য্যে বাধ্য করেন; সেই জন্য পুলিশ অত্যাচারী ও উৎকোচগ্রাহী। এই সকল নিবারণের কিছুমাত্র প্রতিবিধান হইল না।

গোরা সৈন্যদিগের পৈশাচিক অত্যাচারে সময়ে সময়ে অনেক গরিব বিনাপরাধে প্রাণ হারাইয়া থাকে। লর্ড কর্জ্জন তাহাদের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিয়া একটি সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

দিল্লী দরবার, তিব্বত মিশন, কাবুল মিশন ও পারস্য মিশন প্রভৃতি কয়েকটি কার্য্যই লর্ড কর্জ্জনের কু-অভিপ্রায় ও দুর্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক। এক দিকে দেশের লোক দুর্ভিক্ষ ও প্লেগে প্রাণ হারাইতেছে অপরদিকে লর্ড কর্জ্জন দিল্লী দরবার আয়োজনে প্রবৃত্ত। এই দরবারে রাজকোষের বিস্তর অর্থের অনর্থক ব্যয় ও দেশীয় রাজাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করা হইল। দরবারে দেশের যে কি ফললাভ হইল তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তিব্বতে সৈন্য পাঠাইয়া কতকগুলি শান্তস্বভাব পার্ব্বতীয় গরিব লোকের অকারণ প্রাণবধ করা হইয়াছে; লর্ড কর্জ্জনকে নিশ্চয়ই ইহার জন্য ভগবানের

দরবারে দণ্ডিত হইতে হইবে। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি কাবুল ও পারস্য মিশন দ্বারা বিশেষ কিছুই লাভ না হইলেও কতকগুলি সাহেবের উদরপূর্ত্তি হইয়াছে।

লর্ড কর্জ্জনের সময়ে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ কলিকাতায় একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে, ভিক্টোরিয়ার একটি স্মৃতি চিহ্ন আবশ্যক, কিন্তু সে জন্য লড কর্জ্জন যে প্রকারে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক। আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র; দেশের জমিদার এবং রাজাগণও ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা রাজভক্ত এবং ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিচিহ্নের জন্য সকলেই যথাসাধ্য চাঁদা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু লর্ড কর্জ্জন হুকুম জারি করিয়া অনেক রাজাকে মানের দায়ে ক্ষমতার অতিরিক্ত চাঁদা দিতে বাধ্য করিয়াছেন। তাঁহারা গরিব প্রজাদের রক্ত শোষণ করিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিবেন। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিমন্দির স্থাপনে বিপুল উৎসাহ দেখাইয়া তাঁহারা রাজভক্তির যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, মহারাণীর ঘোষণা পত্রের বিপরীত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া সেইরূপ দাম্ভিকতা অনুদারতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রদান ও দেশবাসীর হৃদয়ে রাজশক্তির প্রতি অনাস্থা উৎপাদন করিয়াছেন; এই স্মৃতি-মন্দিরের সহিত তাঁহার এই কদর্য্য ব্যাখ্যাও ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরস্মৃতি লাভ করিবে। (ক্রমশঃ)

ভারতের লৌহবর্ত্ম বা রেলওয়ে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইহার ফলে বিগত ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত সরকারী রাজকোষ হইতে প্রায় ৬০ কোটী টাকা বিদেশীয় বণিকগণের ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। বিদেশীয়গণের মুলধন নিয়োগ করিবার জন্য ভারতীয় রেলই উৎকৃষ্ট পন্থা; "হাজা শুকার" ভয় ত নাই, অধিকন্তু বাজার দরের প্রায় দ্বিগুণ সুদপ্রাপ্তি নিশ্চয়। ব্যয় সংক্ষেপের আবশ্যক নাই, প্রয়োজনের চতুর্গুণ ব্যয়েও আপত্তি নাই; যতই অধিক অর্থ ব্যয় হউক না কেন, শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা লাভ নিশ্চিত। এতদ্ব্যতীত সদাশয় গবর্ণমেণ্ট নানারূপে এই সকল কোম্পানিকে

সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। বিদেশীয়গণের নিকট হইতে যে টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার জন্য এ দেশ হইতে তাহারা বার্ষিক সুদ আদায় করিতেছে। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বিদেশীয় লোক রেল কার্য্যের বিবিধ উচ্চপদে বিরাজিত রহিয়াছে; তদ্ব্যতীত বিলাতে অবস্থিত রেলের ডিরেক্টর আফিস সমূহেও বিস্তর লোক এ দেশের অর্থে প্রতিপালিত হইতেছে। প্রায় ৬০ হাজার ফিরিঙ্গিও রেলের কার্য্যে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। রেল, রেলের গাড়ী, এঞ্জিন, কল কারখানা, যন্ত্রাদি ও গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী যত কিছু উপকরণের অধিকাংশই, বিদেশী শিল্পী কর্ত্তৃক প্রস্তুত, বিদেশী বণিক কর্ত্তৃক সরবরাহ ও বিদেশী কোম্পানীর জাহাজে এ দেশে আমদানি হইয়া তাহাদিগকে লাভবান করিতেছে। রেল বিস্তারে বহুবিধ বিদেশীয় পণ্য দেশ মধ্যে আমদানি হইয়া, বিদেশী শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণের উদর পূর্ত্তি করিতেছে। আবার দেশের বহুবিধ অন্তর্বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, খনি-কার্য্য প্রভৃতি বিদেশীয়গণের করায়ত্ত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের সুবিধা গুলি যেমন কাল্পনিক, বিদেশীয়গণের সুবিধা গুলি সেইরূপ কার্য্যকরী; তাহাদের সুবিধা সম্বন্ধে আর "কিন্তু" মাত্রও নাই।

এক্ষণে দেশবাসীগণের সুবিধা অসুবিধার বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাউক।

সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস; ইহাদের মধ্যে জাতীয়তা ও একতা স্থাপিত হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। রেলওয়ে বিস্তার দ্বারাই জাতীয়তা ও একতার সূত্রপাত হইয়াছে। দেশীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, প্রতি বৎসর কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর, প্রভৃতি দূরবর্ত্তী কোন একটি স্থানে এই সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে; এবং বিভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সম্মিলিত হইয়া, দেশের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা ও দেশের বিবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া থাকেন। ইহাতে দেশের যে বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আবার এই মহাসমিতি সহায়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরস্পর সৌহৃদ্য ও ভ্রাতৃভাব সংগঠিত হওয়ায়, জাতীয়তা ও সামাজিকতার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। রেল বিস্তারেই এইরূপ সমিতি সম্ভব হইয়াছে।

রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা দেশে সভ্যতা ও ধর্ম্মের বিস্তৃতি হয়। পূর্ব্বে তীর্থ

ভ্রমণের জন্য যে কত অর্থব্যয় ও কষ্টভোগ করিতে হইত তাহার ইয়ত্বা নাই। পথে হয়তঃ দস্যু কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বান্ত এমন কি জীবনান্ত হইতে হইত; পীড়িত হইলে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতে হইত। দূরতীর্থ হইতে নিরাপদে ফিরিয়া আসা অসম্ভব ভাবিয়া, অনেকে বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া তীর্থ-যাত্রা করিতেন! এখন অবস্থাহীন, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ পর্য্যন্ত অনায়াসে সকল তীর্থ পর্য্যটন করিতেছেন। ইহা কম সুবিধার কথা নহে। দেশভ্রমণ, তীর্থ-দর্শন ও অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যের মনোবৃত্তি পরিমার্জ্জিত ও উন্নত হয়, এবং শরীর ও মন প্রফুল্ল থাকে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

রেলপথে লোক অল্পব্যয়ে ও অল্প সময়ে নানা স্থানে যাতায়াত করিতে পারায়, অনেক স্থান ও বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে; ও বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া বিবিধ অবলম্বনে দিনাতিপাত করিতেছে। লোকের সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেক কুসংস্কার তিরোহিত হইয়াছে। রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা দেশের ও দেশবাসীগণের অবস্থার যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রেলওয়ে প্রভাবে দেশে দস্যুভয় নরহত্যা প্রভৃতি পাপাচার কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এদেশে ডাকাত, ঠগ ও বোম্বেটে দস্যুগণ বিলক্ষণ উপদ্রব করিত; কি স্থলপথে কি জলপথে সর্ব্বত্রই দস্যুভয় ছিল। রেল বিস্তারই দস্যুভয় নিবারণের প্রধান কারণ।

রেলবিভাগে প্রায় ৪ লক্ষ দেশীয় লোক জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে; এবং সময়ে সময়ে নূতন রেলওয়ে কার্য্যের নানারূপ মজুরী করিতে পাইতেছে। দেশের নানাবিধ অপ্রয়োজনীয় কৃষি ও অরণ্যজাত, খনিজ এবং প্রাণীজ দ্রব্য অর্থাৎ দেশের লোক যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার জানে না, এরূপ অনেক দ্রব্য রেলসহায়ে নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হওয়ায়, দেশের লোককে কিয়ৎপরিমাণে লাভবান করিতেছে।

রেলওয়ে সহায়ে দেশের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। ইহাতে কৃষিজাত প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের মূল্য প্রায় সর্ব্বত্র একরূপ হইয়াছে। রেলওয়ে বিস্তারের সহিত অনেক স্থানের ভূসম্পত্তির মূল্য ও যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

রেলওয়ের সহিত পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাফের বিশেষ সম্বন্ধ। রেলওয়ে হওয়াতেই পোষ্টাফিসের সুবন্দোবস্ত সহজসাধ্য হইয়াছে। এখন দূরদেশের

সংবাদও অল্পসময়ের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। টেলিগ্রাফও অনেক বিষয়ে সুবিধাজনক।

দেশীয়গণের উপরোক্ত সুবিধাগুলি "কিন্তু"—বিহীন নহে; বরং এই "কিন্তুর" সংখ্যা বিস্তর।

দেশে জাতীয়তা স্থাপনের সূত্রপাত হইলেও কতকগুলি হীনপ্রকৃতি ও স্বার্থপর বিদেশীয় ও ফিরিঙ্গীর দোষে, দেশীয়গণের ইহাদের উপর নিতান্ত অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতেছে; ইহা কোন ক্রমেই দেশের কল্যাণকর নহে। উহারা দেশীয়গণের সহিত মিশিতে চাহে না, সম্ভ্রান্ত দেশীয়গণও উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগে একান্ত ইচ্ছুক; সুতরাং রেল ভ্রমণের সময় এই দুই শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে অনেক সময়ে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। রেলওয়ের গার্ড, ড্রাইভার, টিকিট কলেক্টর প্রভৃতির অধিকাংশই অশিক্ষিত ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়-ভুক্ত হওয়ায়, তাহারা দেশীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষগণের উপর অশিষ্টাচার ও অত্যাচার প্রকাশ করিয়া থাকে। দেশে উপযুক্ত লোক সত্ত্বেও রেলকোম্পানি বা রেলের পরিচালকগণ উক্ত শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণকে এই সকল দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, দেশীয় বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইংরাজের ফিরিঙ্গী পালন প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল যে, কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা হইবে স্থির জানিয়াও, এবং এই অসুবিধাগুলি সংঘটিত হইলেও, তাঁহারা ইহা গ্রাহ্য করেন না। আমরা জানি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ইহার প্রধান আদর্শ স্থান। ইহার কার্য্য আরম্ভের সময়ই যে সকল বিদেশীয় ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত ছিল; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক ইঞ্জিনীয়ারিং কাহাকে বলে জানিত না, কোন শিক্ষালয় বা কার্য্য স্থানেও শিক্ষা করিয়া ইহাতে নিযুক্ত হয় নাই। আমরা ফিরিঙ্গী বা বিদেশীয় বিদ্বেষী নহি; কিন্তু দেশীয়গণের প্রদত্ত অর্থে প্রতিপালিত হইবার বাসনা হইতেই যে কার্য্যের অনুষ্ঠান, সেই কার্য্যেও, কেবল বিদ্বেষ বুদ্ধি বশে, সেই দেশীয়গণকে উপেক্ষা করা, তাহাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিহীন হওয়া এবং তাহাদের অসুবিধাজনক কার্য্যে ও তাহাদের প্রতি অত্যাচারে প্রশ্রয় দেওয়ায়, পরিচালকগণের সঙ্কীর্ণ হৃদয়তা ও হিতাহিত জ্ঞানের অভাবই সূচিত করে।

আধুনিক সভ্যতার সহিত রেল সহায়ে বিলাসিতা, সুরাপান, মোকর্দ্দমা প্রবৃত্তি প্রভৃতিও বিস্তৃতি লাভ করায়, দেশের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। চা, সোডা ওয়াটার, কাচেরদ্রব্য, খেলানা প্রভৃতি বিবিধ অপ্রয়োজনীয়

বিলাসোপকরণে দেশ পরিপূর্ণ হইতেছে। মদের প্রসার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; অল্পমূল্যের বিলাতী মদ বিষ হইতে প্রায় বিভিন্ন নহে; ইহাও অনেকের উপভোগ্য হইতেছে। আদালতে উপস্থিতি সহজ-সাধ্য হওয়ায়, মোকর্দ্দমার সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইতেছে। সুশিক্ষার বিস্তৃতির সহিত এই কুশিক্ষাগুলিও বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, এবং দেশের লোক অনেকে দরিদ্র ও দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া উঠিতেছে। বিদেশ ভ্রমণ ও বিদেশে বাস সহজসাধ্য হওয়ায়, দেশের সামাজিক বন্ধন শিথিল হইয়া আসিতেছে। যাতায়াত অল্প ব্যয়সাধ্য হওয়ায়, বৎসরে যেখানে একবার যাওয়া যাইত, সেখানে বহুবার যাতায়াতে তাহার অনেক অধিক অর্থব্যয় হইতেছে।

দস্যুভয় প্রভৃতি হ্রাস হইলেও, সময়ে সময়ে রেলের দুর্ঘটনা নিবন্ধন অনেক জীবন-নাশ হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের আড়ংঘাটা ষ্টেশনে, বিগত ১৯০০ সালে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বালেশ্বরের নিকট ও ১৯০৪ সালে নারাণগড়ের নিকট যে সকল ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়াছিল তাহা অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে। অশিক্ষিত ও সুরাপানাসক্ত গার্ড ও ড্রাইভার প্রভৃতির দোষেই অনেক সময়ে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে।

কতকগুলি দেশীয় লোক রেলের কার্য্যে প্রতিপালিত হইলেও, রেল বিস্তারে বিবিধ দেশীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। বিদেশীয় সুলভ সৌখিন কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ বা অল্পদিন স্থায়ী শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী হওয়ায়, দেশীয় শিল্প ধ্বংসপ্রায়, সুতরাং দেশের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। দেশের তাঁতিরা উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু দেশোৎপন্ন তুলা, পাট প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হওয়ায় ও সুলভ বিদেশীয় বস্ত্রের আমদানীতে, তাহারা অন্নাভাবে মরিতেছে। বিদেশ হইতে কাচ ও এনামেলের বাসন ও স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারাদির আমদানিতে, দেশের কাঁসারী ও স্বর্ণকারগণ অবস্থাহীন হইতেছে। কাচ ও এনামেল বাসন অতি অল্পদিন স্থায়ী এবং এগুলি পুরাতন হইলে বা ভাঙ্গিয়া গেলে, ইহাদের আর কিছুই মূল্য থাকেনা; সুতরাং পিত্তল, কাঁসা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ইহা ক্রয় করায়, দেশের অর্থের অপব্যবহার হইতেছে। বিদেশীয় লৌহ ও লৌহদ্রব্যের আমদানীতে, দেশের লৌহখনির কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে ও কর্ম্মকারগণ নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাম্র, পিত্তল, দস্তা প্রভৃতি বিবিধ ধাতু ও ধাতুদ্রব্যের আমদানীতে, এই সকল খনির কার্য্য ও শিল্পকার্য্যও প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গরুর গাড়ী, নৌকা, পাল্কী প্রভৃতির

সংখ্যা হ্রাস হেতু, মাঝি, মাল্লা, গাড়োয়ান, বেহারা প্রভৃতি অনেক লোকের অবলম্বন নষ্ট হওয়ায়,তাহারা জীবনোপায়-বিহীন হইয়াছে ; যেসকল শিল্পী এই যানাদির নির্ম্মাণ ও মেরামতে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের অনেকের জীবিকা সংগ্রহের পথ বন্ধ হইয়াছে। প্রধান প্রধান রাস্তার ধারে যে সকল পান্থনিবাস ছিল, তাহাতে অনেক সংখ্যক দোকানদার সামান্য মূলধনে দোকান পাট করিত ; তাহাদেরও জীবিকা লোপ পাইয়াছে। এইরূপ এক একটি সরাই বা চটীর আধুনিক দৃশ্য দেখিলে বাস্তবিক দুঃখিত হইতে হয়।

আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের উন্নতি হইলেও, এই সকল বাণিজ্য প্রায়শঃ বিদেশীয়গণের করায়ত্ত হইতেছে। পূর্ব্বে সামান্য মূলধনে ব্যবসা করিয়া, লোক প্রতিপালিত হইতেছিল, কিন্তু বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক বিস্তৃত কারখানা স্থাপনে, তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রেলওয়ে সহায়ে শিল্পোপ-যোগী দ্রব্য সকল লইয়া যাইবার সুবিধা হওয়ায়, এইরূপ বিস্তৃত কারখানা স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছে।

যদি দেশীয়গণ রেলের কার্য্যে অধিক পরিমাণে নিযুক্ত হইতে পাইত, রেলের গাড়ী, এঞ্জিন, রেল, লোহার পুল, গৃহাদির সরঞ্জাম প্রভৃতি এদেশেই প্রস্তুত হইত, এবং দেশীয়গণ পরিচালিত কয়লাখনি হইতে রেলে কয়লা সরবরাহ হইতে পারিত, তাহা হইলেও দেশের শিল্প ও ব্যবসার বিনাশজনিত ক্ষতি কিয়ৎপরিমাণে সহ্য হইত।

রেলের বাঁধগুলি সাধারণতঃ জমী হইতে অনেক উচ্চ এবং জমীর জল নিকাশের জন্য ইহাতে যে সকল পুল আছে তাহার পরিমাণ যথেষ্ট নহে ; এই জন্য অনেক স্থলে স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী সকল রুদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। এই কারণে দেশের, সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। বর্ষাকালে রেলওয়ের পার্শ্ববর্ত্তী জমীর সম্পূর্ণ জল নিকাশ না হওয়ায় অনেক দিন পর্য্যন্ত জমীগুলি জলমগ্ন থাকে ; গ্রামাদির দূষিত জল শীঘ্র প্রবাহিত হইয়া যাইতে পারে না ; ইহাতে দেশের লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের ইহা একটি প্রধান কারণ ; এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোক অল্পায়ুঃ এবং দেশের মৃত্যুসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা বহুবিধ সংক্রামক রোগের কারণ। নদী, খাল প্রভৃতির বিস্তার সঙ্কীর্ণ হওয়ার জন্য স্রোতের বেগ হ্রাস হওয়ায় অনেক স্থলে ভরাট হইয়া যাইতেছে। এই সকল কারণে জল নিকাশের অসুবিধা হওয়ায়, কৃষিকার্য্যেরও অনেক স্থলে অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

কতকগুলি নদী বা খালের উপরস্থ সেতু সঙ্কীর্ণায়তন হওয়ায়, নৌকা প্রভৃতির যাতায়াত বন্ধ হইয়া, দেশীয়গণ কর্ত্তৃক অন্তর্বাণিজ্যের অসুবিধা হইতেছে।

রেলওয়ের পরিচালকগণ বিদেশীয়, ডিরেক্টর আফিসগুলি ইংলণ্ডে অবস্থিত, সেখান হইতে দেশের প্রকৃত অবস্থা ঠিক জানিতে পারা যায় না; সেই জন্য রেলওয়ের কার্য্যে বিবিধ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। যদি দেশীয় সুযোগ্য লোকদিগকে রেলওয়ের উচ্চপদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে অনেক অভাব ও অসুবিধা দূর হইতে পারে।

দেশের প্রকৃত অবস্থাজ্ঞ সুযোগ্য ব্যক্তিগণকে রেল নির্ম্মাণের কার্য্য নিযুক্ত করিলে ও রেলপথ প্রতিষ্ঠার সময় দেশের সুবিজ্ঞ লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিলে, দেশের উপরোক্ত অনেক অভাব সংঘটিত হইতে পারে না; এবং রেলওয়ে নির্ম্মাণের ব্যয় সংক্ষেপও হইতে পারে। যাহাতে বহু লোকের জীবন পর্য্যন্ত নির্ভর করে, এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে কাণ্ডজ্ঞান ও চরিত্রবিহীন লোক নিযুক্ত না করিয়া সুযোগ্য দেশীয় লোককে. কিম্বা কিছু অধিক বেতন দিয়া সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র ইউরোপীয় ফিরিঙ্গিগণকে গার্ড ড্রাইভারও প্রধান প্রধান ষ্টেশনমাষ্টারেরপদে নিযুক্ত করিলে,রেলের দুর্ঘটনা,আরোহীগণের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি লোপ পাইয়া যাইবে। দেশীয়গণের জন্য স্বতন্ত্র দ্বিতীয়শ্রেণীর গাড়ী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, তাহারা সুরাপায়ী ও পশু-প্রকৃতিক ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিগণের সঙ্গ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। আমরা শুনিয়াছি আউধ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে। রেলঅভিধানে Gentleman—ভদ্রলোক অর্থে সাহেব; এদেশীয়গণ রেলের অধ্যক্ষগণের মতে ভদ্রলোক পদবাচ্য নহে। ইহাতে দেশীয় ভদ্রলোকগণ বিশেষ অপমানিত বোধ করেন ও রেলাধ্যক্ষগণকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখেন। এইরূপ প্রকাশ্য অপমানসূচক ব্যবহার বাস্তবিকই রেলের অধ্যক্ষগণের নীচাশয়তা ও কৃতঘ্নতার পরিচায়ক, কারণ তাঁহারা দেশীয়গণের অর্থেই উদরপূর্ত্তির আশা করিয়া থাকেন।

অল্প বেতনভোগী সুতরাং অশিক্ষিত দেশীয়গণও আরোহীগণের সহিত অনেক সময়ে অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। আলস্য-বশতঃ যথাসময়ে টিকিট না দেওয়ায় কিম্বা মাল ওজনাদির বন্দোবস্ত না করায় সাধারণের বিশেষ অসুবিধা ঘটে।

উপযুক্ত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত, স্ত্রীলোকগণের প্রতি অত্যাচারের সংখ্যা হ্রাস হইবে না।

রেলওয়ে প্রেরিত মাল প্রায় চুরি যায়; এইরূপ চুরির প্রতিকার না হওয়া নিতান্ত অন্যায়। রেলকর্ম্মচারীগণের মধ্যে অনেক চোর আছে; দণ্ড পাইবার আশঙ্কা সেরূপ না থাকায় ও চুরির সুবিধা থাকায়, ইহারা আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করে। কয়েক বৎসর হইল, একজন রেলওয়ে গার্ড কোন ভদ্রলোকের বাক্স হইতে স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়া ধরা পড়ে; তাহার নিকট বাক্স খুলিবার অনেক চাবি পাওয়া যায়। গার্ডের ব্রেক্‌ভান্ হইতে অনায়াসে চুরি হইতে পারে। রেলওয়ে কর্ম্মচারী ব্যতীত, অন্য চোর, গাঁটকাটা, জুয়াচোর প্রভৃতি সর্ব্বদা গাড়ীতে পরিভ্রমণ করে এবং সুবিধা পাইলেই আরোহীর সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে পুলিশের বন্দোবস্ত অনুপযুক্ত, অথবা পুলিশ কর্ম্মচারীগণ অকর্ম্মণ্য; নতুবা রেলওয়ের চুরি বন্ধ না হইবার কারণ কি?

অনেক ছোট ষ্টেশনে প্লাটফরম ও বিশ্রামাগার না থাকায়, আরোহীগণের বিশেষতঃ বৃদ্ধ, রুগ্ন ও স্ত্রীলোকগণের যৎপরোনাস্তি অসুবিধা হয় এবং অনেক সময়ে দুর্ঘটনাও ঘটিয়া থাকে। বিশ্রামাগারের অভাব সম্বন্ধে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে বোধ হয় অগ্রগণ্য। এই রেলওয়ের এমন অনেকগুলি ষ্টেশন আছে যেখানে দৈনিক আরোহী সংখ্যকের উপযুক্ত দাঁড়াইবারও স্থান নাই। আরোহীগণ ষ্টেশনে যাইয়া কিম্বা ট্রেণ হইতে নামিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে থাকে।

আরোহীগণকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার বন্দোবস্তও অনেক ষ্টেশনেই নাই। সকল আরোহী গাড়ীতে না উঠিলেও অনেক সময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কখন হয়ত স্বামী বা স্ত্রীর একজন গাড়ীতে উঠিয়াছে, এবং অপরজন উঠিতে পারিল না। আরোহীগণের যে ইহাতে বিশেষ অসুবিধা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদেরই অন্নে প্রতিপালিত কর্ম্মচারীদিগের নিকট তাহারা যেন কত অপরাধই না করিয়াছে। অর্থব্যয় করিয়া অপ্রতিভ ও অপমানিত হওয়া, কেবল আমাদের দেশেই সম্ভবপর। ষ্টেশনে গাড়ী কয়েক মিনিটের অধিক থামিবে না ও গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার উপযুক্ত কর্ম্মচারী বা পোর্টার ষ্টেশনে থাকে না তবে অধিক সংখ্যক আরোহীকে টিকিট বিক্রয় করাই বা কেন? যে ষ্টেশনে এরূপ টিকিট বিক্রয়ের সম্ভাবনা, সেখানে উপযুক্ত সংখ্যক কর্ম্মচারীই বা রাখা হয় না কেন? টিকিট ক্রয় করিবার

সময়, গাড়ীতে উঠিবার সময়, গাড়ী হইতে নামিবার সময় ও ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার সময়, আরোহীগণকে যেরূপ লাঞ্ছিত হইতে হয়, তাহা সকলেই জানেন। আমরা দেখিয়াছি, বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের মেদিনীপুর ষ্টেশনে, গাড়ী হইতে নামিয়া আরোহীগণকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিতে, অনেক সময় আধঘণ্টার উপর অপেক্ষা করিতে হয়।

অনেক রেলষ্টেশনে পোর্টারের (রেলওয়ে কুলি) সংখ্যা উপযুক্তরূপ না থাকায়, আরোহীগণের বিশেষ অসুবিধা হয়। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের অনেক ষ্টেশনেই পোর্টারের বন্দোবস্ত নাই। আরোহীগণের নিকট তাহাদের ও তাহাদের মালের মাশুল লইয়াই রেল কোম্পানী ক্ষান্ত হন না। তাহাদিগের নিকট হইতে আরও বিবিধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। রেলওয়ের পোর্টারের প্রথা ইহার মধ্যে একটী। ইহারা রেল কোম্পানীকে অর্থ দিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করায় আরোহীগণের নিকট অযথারূপ পারিশ্রমিক আদায় করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা রেলের কুলিদিগকে যে পারিশ্রমিক দিই, রেল কোম্পানী তাহার অংশভোগী; কিন্তু এই রেল কোম্পানির পরিচালক-গণের নিকটই আমরা কুলি ও নিগার, অথবা ভদ্রপদবাচ্য নহি।

ষ্টেশনে যাহারা জলখাবার বিক্রয় করে, তাহারাও রেল কোম্পানীর নিকট অর্থ দিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করে এবং আরোহীগণের নিকট হইতে সেই অর্থ তাহার মুনাফা সহিত পোষাইয়া লয়। তাহাদের আনীত খাদ্য গুলির প্রতি রেল কোম্পানির দৃষ্টি থাকিলেও, আরোহীগণ কতকটা উপকৃত বোধ করিত; কিন্তু দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ মূল্য লইয়াও, তাহারা অতি নিকৃষ্ট বা অখাদ্য আনিয়া উপস্থিত করে; এবং আরোহীগণকে বাধ্য হইয়া তাহাতেই উদর জ্বালা নিবৃত্ত করিতে হয়।

আরোহীগণকে বিনামূল্যে পানীয় জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও, অনেক সময় পানী পাঁড়ে মহাশয় পয়সা না লইয়া জল দিতে রাজী হন না। অনেক ষ্টেশনে অতি অপরিষ্কৃত পানীয় সরবরাহ হয় এবং অনেক ষ্টেশনে বহু চীৎকারেও এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না।

ইণ্টারমিডিয়েট ও থার্ড ক্লাসের সকল গাড়ীর সহিত মলমূত্র ত্যাগের বন্দোবস্ত না থাকায় আরোহীদের বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হয়। অনেক গাড়ীতে ইহার বন্দোবস্ত আছে, অবশিষ্ট গাড়ীতে শীঘ্র এই বন্দোবস্ত হইলে ভাল হয়।

রেলওয়ে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের এক আইন আছে, এবং বাইলও আছে। সাধারণের এই আইনের মর্ম্ম জানা আবশ্যক। গাড়ীতে যথেষ্ট স্থান থাকিলেও অন্য অন্য আরোহীকে উঠিবার বাধা দেওয়া আইন বিরুদ্ধ। টিকিট না লইয়া গাড়ীতে উঠা, নীচের ক্লাসের টিকিট লইয়া উপরের ক্লাসে উঠা, বিনা মাশুলে অতিরিক্ত মাল সঙ্গে লওয়া, গাড়ী ছাড়িয়া দিলে গাড়ীতে উঠা ও গাড়ী না থামিলে নামা এবং অন্য আরোহীর অসম্মতিতে ধূমপান করা নিষিদ্ধ।

তুলা।

(৮৬ পৃষ্ঠার পর)

যে তুলায় প্রস্তুত বস্ত্রাদির সূতা ধৌত করিলে ফুলিয়া উঠে, পূর্ব্বে সেইরূপ তুলারই দেশীয় তাঁতিদের নিকট আদর হইত। বিদেশীয় সূতার আমদানিতে এখন আর তুলার এই গুণ পরীক্ষা করা হয় না। আঁশ (fibre) দীর্ঘ হইলেই কলে ব্যবহৃত হইবার বিশেষ উপযোগী হয় বলিয়া, এখন দীর্ঘ-আঁশ তুলারই অধিক দর হইয়া থাকে। ভারতীয় তুলার অধিকাংশেরই আঁশ খর্ব্ব। এদেশের কৃষকগণ দরিদ্র এবং অশিক্ষিত, সেই জন্য তাহারা উৎপন্ন দ্রব্যের যত্ন করিতে পারেনা, এবং যত্ন করিয়া দ্রব্যগুলি পরিষ্কার রাখিতে পারিলে যে অধিক দরে বিক্রীত হইতে পারে ইহাও জানেনা। তাহারা সাধারণতঃ জমীর উপর, কখন বা চেটাইএর উপর উঠানে তুলা বিছাইয়া রাখে, কিম্বা বাহিরে কোন স্থানে জড় করিয়া রাখে। ইহাতে জমীর রস উঠিয়া, শিশির পড়িয়া ও ধূলা মাটী প্রভৃতি মিশিয়া যাওয়ায় তুলা অপরিষ্কৃত ও বিবর্ণ এবং ইহার আঁশ কম মজবুত হয়। পাইকারগণও ওজন বাড়াইবার জন্য, অনেক সময় বালি, মাটী, তুলার বীজ প্রভৃতি মিশাইয়া দেয়। সম্পূর্ণ পাকিবার পূর্ব্বেই গাছ হইতে সংগ্রহ করার জন্যও অনেক সময় তুলা অপকৃষ্ট হয়। কখন কখন তুলা পাকিয়া জমীতে পড়িয়া থাকিবার পর সংগ্রহ করায়, তুলার সহিত ধূলা মাটী মিশিয়া যায়। এই সকল কারণে ভারতীয় তুলার দর কম হইয়া থাকে।

এ দেশের তুলার কলে সাধারণতঃ বারছটাক ও আমেরিকান তুলায়

সাড়েতের ছটাক সূতা প্রস্তত হয়। দীর্ঘ-আঁশ তুলা হইতেই অধিক মিহি সূতা প্রস্তত হইতে পারে, কারণ এই জাতীয় তুলার আঁশ অতি সূক্ষ্ম।

সমুদ্রদ্বীপজাত (Sea Island) দীর্ঘ-আঁশ তুলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার আঁশ সূক্ষ্ম ও রেসমের ন্যায় কোমল। ইহা সকল দেশে উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহার আঁশগুলি প্রায় ১॥ ইঞ্চি লম্বা ও ১/২০০০ ইঞ্চি মোটা। এই তুলা অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট কলের সূতা এই তুলা হইতে প্রস্তত হয়।

মিসরীয় তুলাও প্রায় প্রথমোক্ত তুলার ন্যায়। ১৮২১ সালে মিসরের পাশা (রাজা) সমুদ্রদ্বীপ, ব্রেজিল প্রভৃতি স্থান হইতে বীজ আনাইয়া, তুলার চাষ আরম্ভ করান। বিভিন্ন জাতীয় বীজের মধ্যে সমুদ্রদ্বীপ জাত বীজের তুলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই তুলার আঁশও প্রথমোক্তের ন্যায় দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হইয়াছে।

জর্জ্জিয়ান তুলার আঁশ আপেক্ষাকৃত খর্ব্ব, ইহা ১ হইতে ১¼ ইঞ্চ লম্বা ও ১/১৪৮৮ ইঞ্চ মোটা হয়। বিলাতে এই তুলারও যথেষ্ট আদর আছে।

দক্ষিণ আমেরিকান তুলার আঁশও প্রায় সমুদ্রদ্বীপজাতীয়ের ন্যায় দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়।

ভারতীয় তুলার মধ্যে অধিকাংশেয় আঁশই খর্ব্ব ও ১/৬০০ হইতে ১/১৩০০ ইঞ্চ মোটা হয়। সমুদ্র-দ্বীপ জাত তুলার ন্যার উৎকৃষ্ট তুলাও এখানে কতক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানবিদ্গণ অনুবীক্ষণ সাহায্যে তুলার পরীক্ষা করেন, কিন্তু তুলার দালাল ও পাইকারগণ তুলা হাতে লইয়াই অন্ধকারেও তাহার গুণাগুণ বুঝিতে পারে। কিন্তু তুলার চাষের উন্নতি করিতে হইলে, নানারূপ জমীতে বিবিধ উপায়ে চাষ করিয়া কিরূপ তুলা উৎপন্ন হইতেছে, ইহার পরীক্ষার জন্য অনুবীক্ষণের সাহায্য আবশ্যক।

বাঙ্গালা, বেহার ও বেনারস বহুকাল হইতেই বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ হইলেও, এই সকল প্রদেশে অধিক তুলার চাষ ছিল না; অপর প্রদেশ হইতে তুলা আমদানী হইত। তখন এদেশে গৃহস্থের বাস্তুভূমির মধ্যেই কতকগুলি গাছ থাকিত, তদুৎপন্ন তুলা হইতে স্ত্রীলোকগণ সূতা পাকাইত ও তাঁতিরা সেই সূতায় কাপড় বুনিয়া দিত। কিন্তু ঐ সকল গাছে দেশের প্রয়োজনোপযোগী তুলাও জন্মিত না। তখন এটোয়া, ঝাঁসি, বুন্দেলখণ্ড,

জালোন, যমুনার পশ্চিম ভাগবর্ত্তী দেশ সকল, নাগপুরের হিঙ্গনঘাট, আরৃভি (উমরাবতী) প্রভৃতি স্থান হইতে তুলা আমদানী হইয়া এলাহাবাদ, মৃজাপুর প্রভৃতি স্থানের বাজারে বিক্রীত হইত এবং সেখান হইতে মুরশিদাবাদ, কলিকাতা ও ঢাকায় আমদানী হইত। সাধারণতঃ মুরশিদাবাদের নিকট ভগবানগোলার বাজার দর হইতেই মৃজাপুর বাজারের তুলার দর নিরূপিত হইত। বিদেশে রপ্তানীর জন্য কলিকাতা, কটক এবং সুরাটই প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। কটক ও সুরাট হইতেও কলিকাতায় তুলা আমদানী হইত। কলিকাতা হইতে চীনদেশে অনেক তুলা রপ্তানী হইত। ১৮৪০ সাল হইতে চীনদেশে তুলার রপ্তানী কম হইতে আরম্ভ করে। বিগত কয়েক বৎসর হইতে রপ্তানীর পরিমাণ আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

১৮৪৮ সালে মৃজাপুরের কলেক্টর মণি সাহেব লিখিয়াছেন,—"মৃজাপুরে তুলার বাণিজ্য অতি বিস্তৃত। উমরাবতী, নাগপুর, বুন্দেলখণ্ড, আগরা, ফরক্কাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক তুলা এখানে আসিয়া থাকে ও এখান হইতে গাজীপুর, পাটনা, মুরশিদাবাদ ও কলিকাতায় রপ্তানী হয়। ইহার পূর্ব্ব কয়েক বৎসর হইতে এই তুলার বাণিজ্য কমিয়া আসিতেছে এবং বাজারে অনেক তুলা অবিক্রীত রহিয়াছে। এখন উত্তম তুলা কলিকাতায় ৭৲ টাকা হইতে ১০৲ দশ টাকা মণ (=৪৮ সের) দরে পৌছাইয়া দেওয়া যায়। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই তুলার দর ১৬৲ টাকা মণ ছিল। চীনদেশে রপ্তানী কম হওয়ায় (এবং বিলাতী সূতা ও বস্ত্রের আমদানীতে) এইরূপ দর নামিয়া গিয়াছে। এখান হইতে কলিকাতায় পাঠাইবার খরচ মণকরা ১৷০ সিকা। দেশে বস্ত্র শিল্পী নাই সুতরাং তুলার খরচও নাই। ইহাতে তুলার ব্যবসায় মাটী হইয়া যাইতেছে।"

পূর্ব্বে তুলার মূল্যের অত্যন্ত হ্রাস বৃদ্ধি হইত। ১৭৮৯ সালে ঢাকায় তুলার দর ৫৷।০ টাকা হইতে ৬৷।০ টাকা মণ ছিল; ১৮৩১ সালে ৩৷।০ হইতে ৫৲ টাকা মণ হইয়াছিল। ১৮৩৮ সালে তুলার দর মৃজাপুরে ১৬৲ টাকা, ১৮৪৩ সালে মৃজাপুরে ৯৲ টাকা ও কলিকাতায় ১০।০ মণ ছিল। ১৮১৬ সালে সুরাটে তুলার দর ৫০৲ টাকা, ১৮২৩ সালে ১৫৲ টাকা, ১৮৩৮ সালে ২০৲ টাকা ও ১৮৪৫ সালে ৬৲ টাকা মণ হইয়াছিল।

বিগত কয়েক বৎসর হইতে তুলার দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকার তুলা ভারতীয় তুলার প্রায় দেড় গুণ, জর্জ্জিয়ান তুলা

প্রায় দ্বিগুণ ও সমুদ্র-দ্বীপজাত তুলা প্রায় তিন গুণ দরে বিক্রীত হইত। কিন্তু এখন দর সর্ব্বত্রই প্রায় সমান হইয়াছে।

বিগত ছয় বৎসরের এদেশে আমদানী ও রপ্তানী তুলার পরিমাণ ও মূল্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল,—

আমদানী।

১৮৯৯—১৯০০	সাল	২,৬০,০০০	মণ	= ৪৬,২৩,০০০৲	টাকা,	গড় মণকরা	১৭৸০	আনা
১৯০০—০১	"	৩,১০,০০০	"	= ৭০,০৮০০০৲	"	"	২২৷৵০	"
১৯০১—০২	"	১,০৮,০০০	"	= ২৫,৩৫,০০০৲	"	"	১৮৸৵০	"
১৯০২—০৩	"	৯৩,০০০	"	= ১৬,৯৫,০০০৲	"	"	[illegible]	"
১৯০৩—০৪	"	২৫,০০০	"	= ৫,০৩,০০০৲	"	"	২০৵০	"
১৯০৪—০৫	"	২,৬৪০০০	"	= ৬৩,৮৫,০০০৲	"	"	২৪।/০	"

রপ্তানী।

১৮৯৯-১৯০০	সাল	৬০,১৩,০০০	মণ	= ৯,৯২,৫১,০০০৲	টাকা,	গড় মণকরা	১৬৷০	আনা
১৯০০-০১	"	৪৯,১৬,০০০	"	— ১০,১২,৭৪,০০০	"	"	২০৷৵০	"
১৯০১-০২	"	৭৮,৩৭,০০০	"	= ১৪,৪২,৬১,০০০৲	"	"	১৮।৶০	"
১৯০২-০৩	"	৮৩,১০,০০০	"	= ১৪,৭৫,৭২০০০৲	"	"	১৭৸০	"
১৯০৩-০৪	"	১,০৯০৫,০০০	"	= ২৪,৩৭,৬১,০০০৲	"	"		
১৯০৪-১৫	"	৭৭,৮০,০০০	"	= ১৭,৪৩,৪৭,০০০৲	"	"	২২।৶০	"

উপরোক্ত ছয় বৎসরের অনুপাতে, এদেশে বাৎসরিক তুলার আমদানী পৌনে দুই লক্ষ মণ, ও এদেশ হইতে রপ্তানি ৭৬ লক্ষ মণ। গড়ে বিদেশীয় তুলার দর মণকরা ২০।/০ আনা ও দেশীয় তুলার দর ১৯৷৶ আনা। উক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, এদেশ হইতে তুলার রপ্তানীর পরিমাণ ও দর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং তুলার চাষ যে কাল ক্রমে অধিক লাভজনক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তুলা চাষের ও তুলার উন্নতির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৭৮৮ সাল হইতে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ বিবৃত হইল।

১৭৯০ সালে মাল্টা ও মরিসস্ দ্বীপের তুলা বীজ আনাইয়া কৃষকগণকে প্রদান করা হয়। ১৭৯৯ সালে শিবপুর কোম্পানি বাগানে তুলা চাষ পরীক্ষা হয় ও আট জাতীয় তুলাবীজ বিতরিত হয়। ১৮০১ সালে মালাবার উপকূলে বান্দাতারা নামক স্থানে ব্রাউন নামক একজন ইংরাজ প্লাণ্টার মরিসস্

ও নান্‌কিন্ বীজের তুলা চাষ করেন। ১৮১০ সালে আমেরিকা হইতে বিভিন্ন জাতীয় বীজ আনান হয় ও চাষের সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হয়। ১৮১১ সালে সুরাট ও বরোচের কলেক্টরের নিকট বোর্ব্বো দ্বীপের বীজ প্রেরিত হয়। ১৮১৬ সালে তুলার রপ্তানী মাশুল উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৮১৮ সালে টিনেভেলি, কইম্বাটোর, মসলিপাটম ও ভিজিগাপাটমে চারিটি পরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপিত হয়। ১৮২৩ সালে বারাকপুরের নিকট টিটেগড় নামক স্থানে লেডি হেষ্টিংস তুলার চাষ করেন। ১৮২৬ সালে সাহারাণপুর সরকারী বাগানে নানাজাতীয় বীজের চাষ হয়। ১৮২৯ সালে বোম্বাই প্রদেশে তিনটি স্থানে পরীক্ষা কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়। ১৮৩৪ সালে মিসর দেশীয় তুলার বীজ ও তুলা পরিষ্কার করিবার কল বিতরিত হয়। ১৮৪১ সালে আমেরিকা হইতে কয়েকজন কৃষিবিদ্ আনীত হয়। ১৮৫০ সালে তুলা পরিষ্কার করিবার উন্নত ধরণের কলের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৫ হাজার টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করেন।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানের নানারূপ বীজ আনাইয়া, তুলা পরিষ্কার করিবার কল আনাইয়া, পরীক্ষার কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া, কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ প্রভৃতি বিতরণ করিয়া ও পুরস্কার ঘোষণা করিয়া তুলা চাষের উন্নতির বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই সকল কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর অর্থব্যয়ও হইয়াছিল। কিন্তু ফল আশানুরূপ না হইলেও, সেই সময় হইতেই তুলার চাষ যে এদেশে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকগুলি পরীক্ষা ক্ষেত্র অল্পদিন মধ্যেই উঠিয়া যায়। বিভিন্ন জাতীয় বীজের মধ্যে বোর্ব্বো-দ্বীপ, সমুদ্র-দ্বীপ ও মিসরীয় বীজের চাষই ভাল হইয়াছে। ব্রেজিলের তুলাও কোন কোন স্থানে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; সেই সকল স্থানে ইহা দেব-কার্পাস নামে অভিহিত হইয়াছিল।

গুজরাট, কচ্ছ, সিন্ধুপ্রদেশ, খান্দেশ, সোলাপুর, বেরার; সালেম, কৈম্বাটুর, বরোচ, আমেদাবাদ ও নাগপুরে তুলার বিস্তৃত চাষ আছে। জব্বলপুরের নিকট নরসিংহপুরের তুলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অনেক স্থলে অরহর ও তুলার চাষ একই ক্ষেত্রে হইয়া থাকে।

ভারতের কৃষকগণ অশিক্ষিত, জমীদারগণ কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন। এই উভয়শ্রেণীর বিশেষ চেষ্টা না থাকায়, তুলার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ নিজের কর্ম্মচারী লইয়াই পরীক্ষা

করিয়াছিলেন। দেশীয়গণের ইহাতে বিশেষ আস্থা ছিল না। ভারতবর্ষে সকল প্রকার জমী আছে ও সকল ঋতুরই প্রভাব আছে; সুতরাং কোন কোন স্থান যে একরূপ বীজের উপযোগী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮৫১ সালের রিপোর্টে জানা যায় যে, আমেরিকায় প্রতি বিঘায় ১/০ এক মণ হইতে ১৮০ এক মণ ত্রিশ সের ও ভারতে।০ দশ সের হইতে।৭ সতর সের মাত্র তুলা উৎপন্ন হয়। বিদেশীয় বীজের আমদানী ও তুলা চাষের উন্নতির চেষ্টায় এখন কিছু অধিক পরিমাণ ফল হইলেও সন্তোষজনক হয় নাই।

সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, বিগত তিন বৎসরে তুলার চাষ বিশেষ বিস্তৃত হইয়াছে। ১৯০১ সালে ভারতবর্ষে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ বিঘা ও ১৯০৪ সালে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ বিঘা ভূমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। সুতরাং গত তিন বৎসরে তুলার চাষের পরিমাণ ১ কোটি ৩৫ লক্ষ বিঘা অধিক হইয়াছে।

নারিকেল-কাতা।

বঙ্গোপসাগরের উপকূল প্রদেশে, ভারত মহাসাগরের ও প্রশান্ত মহাসাগরের গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ ভাগের দ্বীপসমূহে প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই সকল স্থানের ভূমি এই বৃক্ষ উৎপাদনের উপযোগী শক্তিবিশিষ্ট। সমুদ্রোপকূল হইতে অধিক দূরবর্ত্তী প্রদেশে নারিকেল বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না; অনেক যত্নে বৃক্ষ উৎপাদন করিলেও তাহা হইতে ফলের প্রত্যাশা করা যায় না। উপকূল প্রদেশ-জাত নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর শোভা অতি মনোরম। এই দেশবাসীগণের নারিকেল অতি প্রয়োজনীয় বৃক্ষ; এই একমাত্র বৃক্ষ হইতে মনুষ্যের জীবন ধারণোপযোগী বহুবিধ অভাব মোচন হয়।

নারিকেলের ফুল সঙ্কোচক (Astringent); নারিকেল-শস্য (শাঁস) অম্লনাশক; ডাব নারিকেলের শাঁস বেশ পুষ্টিকর খাদ্য; ইহার জল স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, তৃষ্ণা-নিবারক ও অতি উপাদেয় পানীয়। নারিকেল শাঁস হইতে নানাবিধ খাদ্য ও ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। কোন কোন দ্বীপের অধিবাসীগণ চারিটী মাত্র নারিকেলের শস্য আহার ও জলপান করিয়া

অনায়াসে দিনপাত করে। নারিকেল তৈল রন্ধনের জন্য, প্রদীপে জ্বালাইবার জন্য ও স্ত্রীলোকদিগের কেশবর্দ্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সদ্যপ্রস্তুত নারিকেল তৈল বিশেষ পুষ্টিকর; এবং ঘৃত ও কড্‌লিভার অয়েলের (Cod liver oil) পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। নারিকেল তৈল হইতে বাতি ও সাবান প্রস্তুত হয়। নারিকেলের খইল জমীর উত্তম সার ও গো মহিষাদির পুষ্টিকর খাদ্য। তালের ন্যায় নারিকেলের মোচ (Blossom shoots) হইতে রস উৎপন্ন হয়। এই রস হইতে তাড়ি, গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেলের কাষ্ঠে ঘরের খুঁটি, চালের ঠাঁট (Frame) প্রভৃতি ও ইহার পাতায় ঘর ছাওয়া হইয়া থাকে। নারিকেলের পাতা জ্বালাইবার জন্যও ব্যবহৃত হয়; পাতার শির বা কাঠি হইতে ঝাঁটা নির্ম্মিত হয়। নারিকেল ফলের আঁশ (Fibre) হইতে কাতা (Coir) প্রস্তুত হয়। এই কাতা অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে বেশ মজবুত কাতা দড়ি ও কাছি, সুদৃশ্য পাপোষ (Door mat) ও গালিচা এবং নৌকার পাইল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা গদির (Mattress) জন্য তুলার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে সুন্দর সুন্দর টুপিও প্রস্তুত হয়। কাতা হইতে সাধারণ ব্যবহারোপযোগী নানাপ্রকার ব্রস (Brush) নির্ম্মিত হইতে পারে; শূকরকুঁচির প্রস্তুত ব্রসের ন্যায় ইহা উপযোগী কিন্তু সস্তা। ঝুনা নারিকেল দুই খণ্ডে কাটিয়াও ব্রসের ন্যায় ব্যবহৃত হয়; এইরূপ ব্রসে জাহাজের ডেকের তক্তা ও কাঠের আস্‌বাব্ পরিষ্কার করা হয়। নারিকেলের খোল (Shell) হইতে হুঁকা, পানপাত্র, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সমুদ্র-দ্বীপবাসীগণ নারিকেল খোল বা মালা পোড়াইয়া একপ্রকার তৈল প্রস্তুত করে ও এই তৈলে দন্ত রঞ্জিত করে; আমাদের দেশে ইহাকে নারিকেল মালার ঘাম বলে ও ইহাতে দাদ (Wring-worm) ভাল হয়। ইহার অঙ্গার উজ্জ্বল ও কোমল এবং রঙ্গের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। নারিকেল বৃক্ষের শিরোভাগে, পত্রকাণ্ডের মূল স্থানে, চটের (Gunny) ন্যায় যে একরূপ পদার্থ থাকে, তাহাতে ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ করা যায়। নারিকেলের মাথি (মস্তিষ্ক) বেশ স্নিগ্ধ ও সুখাদ্য।

নারিকেল এরূপ প্রয়োজনীয় বৃক্ষ হইলেও আমাদের দেশে ইহার উপযুক্ত আদর নাই। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিয়ে ১৯০৩-০৪ সালের নারিকেল জাত দ্রব্যের বাণিজ্য বিবরণ প্রদর্শিত হইল।

রপ্তানী।

নারিকেল	...	...	১৮,০৪২ টাকা
ঐ শুষ্কশস্য (Copra)		...	৪২,২৪,৬১৪ ”
ঐ তৈল	...	...	৪৮,৮১,৫৮৮ ”
ঐ কাতা	...	...	৫০,১৬,৭৩৬ ”
ঐ দড়ি (প্রায় *)		...	৩,০০,০০০ ”
		মোট—	১,৪৪,৪০,৯৮০ টাকা

আমদানী।

নারিকেল	৬,৪৭,৪৮৪৲ টাকা।
” শুষ্ক শাঁস	২৫৬০৲ ”
” তৈল	৩,৩৭,২৪১৲ ”
” কাতা	৫০,২৭৫৲ ”
” দড়ি (প্রায়)	৩,০০,০০০৲ ”
” বাতি ”	৫,০০,০০০৲ ”
” সাবান ”	১৩,০০, ০০০৲ ”
মোট	৩১,৬০৫৬০৲ ”

সুতরাং নারিকেলের ব্যবসায় নিতান্ত নগণ্য নহে। নারিকেল, শাঁস, কাতা, দড়ি ও তৈল মালদ্বীপ, নিকোবর ও সুমিত্রা প্রভৃতি দ্বীপ হইতেই অধিকাংশ আমদানী হইয়া থাকে এবং বাতি ও সাবান ইউরোপ হইতে আমদানী হয়। অপরাপর সকল দ্রব্যের ন্যায় আমরা এই প্রয়োজনীয় শিল্পোপযোগী দ্রব্যগুলি বিদেশে পাঠাইয়া শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বিদেশীয়গণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। নারিকেল বৃক্ষের আবাদও ইহা হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য না হইলেও বেশ লাভ-জনক।

নারিকেল হইতে বৃক্ষ প্রস্তুত করিবার জন্য একবৎসর মাত্র যত্ন করিতে হয়। বীজ বা ঝুনা (পরিপক্ক) নারিকেল বর্ষাকালে নরম বা জলসিক্ত ও ছায়াযুক্ত স্থানে বসাইয়া দিতে হয় ও গ্রীষ্মকালে প্রায় প্রত্যহই জল সেচন করিতে হয়। চারা একটু সতেজ হইলেই, নির্দ্দিষ্ট স্থানে ১০ হাত অন্তর রোপণ করিয়া, ২।৪ সপ্তাহ মধ্যে মধ্যে সামান্য পরিমাণ জল দিবার পর শিকড়

* নারিকেল কাতার দড়ি, নারিকেল তৈলের বাতি ও সাবান আমদানী স্বতন্ত্র হিসাব পাওয়া যায় নাই। মোট আমদানী রপ্তানী দৃষ্টে অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে।

লাগিয়া গেলে, আর নারিকেল চারার প্রায় কিছুই যত্ন করিতে হয় না। বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইবার পর, ইহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বৃত্তাকারে আইল বাঁধিয়া দিলে, ইহার ফলোৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে গোড়ার ঘাস ও জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ও ২।৪ বৎসর অন্তর গোড়ায় পাঁক মাটী বা পলিমাটি দিলে বৃক্ষগুলি বেশ সতেজ থাকে। নারিকেল বৃক্ষ সাধারণতঃ আট দশ বৎসরের মধ্যে ফলবান হইয়া থাকে। ফলোৎপাদনের সময়, প্রথম দুই বৎসর মোচ হইতে রস বাহির করিয়া লইলে, ইহার ফলোৎপাদিকা শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে এ পদ্ধতি নাই; কিন্তু দ্বীপপুঞ্জবাসী লোকে, এইরূপে রস বাহির করিয়া, তাহা হইতে গুড় চিনি প্রভৃতি প্রস্তুত করে। তাহারা এই রসকে "নীর" বলে। লাকেদ্বীপবাসীগণ তাড়ি কিম্বা কোন মাদকদ্রব্য সেবন করে না; সেই জন্য,রস টকিয়া যাইবার ভয়ে চূণ দিয়া রাখে। এক একটি বৃক্ষে প্রতিবৎসর ৫০হইতে একশত নারিকেল ফলিয়া থাকে ও ইহার মূল্য ১৲ হইতে ২৲ টাকা। একবিঘা জমীতে ৬০ সাইটটী নারিকেল বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং ইহা হইতে গড়ে প্রায় ১০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। ফলের প্রত্যাশায় প্রায় দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হয় বলিয়াই, অনেকে ইহার আবাদে উৎসাহ প্রকাশ করে না; কিন্তু এই দশবৎসর নারিকেল চারার প্রায় কিছুই যত্ন আবশ্যক করে না। নারিকেল বৃক্ষ প্রায় এক শত বৎসর জীবিত থাকে। বয়সের সহিত ফলোৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইলেও এক একটি নারিকেল বৃক্ষ হইতে মোট অন্ততঃ ২০০৲ টাকা আয় হইয়া থাকে। সেই জন্য আমাদের দেশে একটি নারিকেল বৃক্ষ নষ্ট করাকে মহা পাপ মনে করে। আমরা বাল্যকালে অনেককে আগ্রহের সহিত নারিকেলের আবাদ করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেশের লোকে এরূপ অলস, উৎসাহহীন ও অপরিণামদর্শী হইয়া উঠিয়াছে, যে, এখন আর এই মূল্যবান বৃক্ষের আবাদ প্রায় দেখা যায় না।

নারিকেল কাতা প্রস্তুত করিবার জন্য, ছোবড়া গুলিকে ৫।৬ মাস জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ঝুনা অপেক্ষা অপরিপক্ক নারিকেলের আঁশ অধিক মসৃণ ও কোমল হইয়া থাকে। জলে ভিজাইবার জন্য দ্বীপবাসীগণ ছোবড়াগুলি বালির ভিতর পুতিয়া, জলে ভাসিয়া যাইবার ভয়ে, পাথর চাপা দিয়া রাখে। সমুদ্রের লোণা জলে পচিলে আঁশ বেশ দৃঢ় হয় এবং জল অপরিষ্কৃত হইতে পায় না বলিয়া আঁশের রংও দারুচিনির রংএর ন্যায় সুদৃশ্য হয়। পুষ্করিণী,

ডোবা প্রভৃতির আবদ্ধজলে পচাইলে জল কালবর্ণ হইয়া যাওয়ায় আঁশে কষ লাগিয়া যায়। পচান হইলে জলের ভিতর হইতে উঠাইয়া, ছোবড়াগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, কাষ্ঠের মুদ্গর দিয়া পিটিয়া ও হাতে রগড়াইয়া গুঁড়াগুলি স্বতন্ত্র করিয়া দিলেই কাতা প্রস্তুত হইল। দশটি নারিকেল হইতে প্রায় ⁄১৷৷০সের কাতা পাওয়া যাইতে পারে। ⁄১ সের কাতার বাজার দর প্রায় ৵০ আনা।

দর্পণ

পূর্ব্বে পারা দিয়া কলাই করা আর্শির ব্যবহার ছিল। পারা অস্বাস্থ্যকর বলিয়া, যাহারা এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিত,তাহারা সময় সময় কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িত; দ্বিতীয়তঃ, পারার কলাই করিতে খরচও অনেক পড়িত; এবং পারার কলাই বহুদিন স্থায়ী হইত না বলিয়া, রূপার কলাই করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইহাতে কারিকরকে বিশেষ কোন রোগ ভোগ করিতেও হয় না। অল্প খরচ হয় এবং কলাইও বহুকাল স্থায়ী হয়।

দশ বর্গফুট পারা কলাই করিতে প্রায় তিন পোয়া পারাও সেই পরিমাণ রাং লাগিত, সময়ও অনেক লাগিত এমন কি ১০।১২ দিনের কম কলাই হইত না। এখন আর তত দেরী করিতে হয় না, ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়; খরচও অতি কম পড়ে। উক্ত পরিমাণ দর্পণ ৬০।৭০ গ্রেন রৌপ্য-লবণ দ্বারা সহজেই উৎকৃষ্ট কলাই হইয়া যায়। ৬০।৭০ গ্রেন লবণের দাম প্রায় চারি আনা মাত্র।

কলাই করিবার নিয়ম।

পুরু কাচের উপর কলাই ভাল হয়; কারণ যন্ত্র বিশেষ দ্বারা ইহার দুপিট ঘসিয়া সমান করা যায়। পাতলা কাচ ঠিক সমতল করিতে পারা যায় না বলিয়া দর্পণ ভাল হয় না; মুখ দেখিলে বাঁকা চুরা দেখায়; সুতরাং মোটা গেলাসের উপর কলাই করাই প্রশস্ত। কাচ খানিকে চুণ ও সাজির জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, পরিষ্কার জলে পাঁচ সাত বার ধুইয়া ফেলিতে হয়; পরে নাইট্রিকএসিড দিয়া বেশ করিয়া ধুইতে হয়; পুনরায় উহা যথেষ্ট জল দিয়া ধুইয়া এক ধারে দাঁড় করাইয়া দিতে হয়।

সাবধান যেন হাত না লাগে; গেলাসের যেখানে হাত লাগিবে সেখানে কলাই হইবে না; গেলাসখানি পরিস্কার যত ভাল হইবে দর্পণও তত ভাল হইবে, এ কথা যেন স্মরণ থাকে। এক ভাগ নাইট্রিক এসিডে ৮ ভাগ জল দিয়া একটি বোতলে রাখিয়া দিবে; সাজির জলে ধোয়া হইলে, অল্প নাইট্রিক এসিডের জল দিয়া একটী কাঠির গায় ন্যাকড়া জড়াইয়া, উহা দ্বারা গেলাস খানা ঘসিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়।

কলিকাতার বড় বাজারে, নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার নামক রৌপ্য লবণ পাওয়া যায়; একশিশির মূল্য ১॥০ টাকা; উহাতে ৪৩১¼ গ্রেণ লবণ থাকে, এবং সোডি-টার্ট এক বোতল (দাম ৸০ আনা) এবং এক বোতল লাইকার এমোনিয়া আনিবে; অল্প আবশ্যক হইলে অল্পও পাওয়া যায়, তবে কিছু বেশী দাম পড়ে। নিক্তি করিয়া ২০ গ্রেন পরিমাণ লবণ ওজন করিয়া লও; ৪০।৪৫ ফোঁটা পরিস্রুত জলে একটি শিশির মধ্যে গুলিয়া ফেল। পরিস্রুত জল এক বোতলের দাম ৵০ দোকানেই পাওয়া যায়; লবণ দ্রব হইয়া গেলে, উহাতে ফোঁটা করিয়া লাইকার এমোনিয়া যোগ কর; ২।৩ ফোঁটা দিলেই দেখিতে পাইবে, ইটের গুঁড়ারমত থিতুনি পড়িবে; শিশিটি এই সময় খুব নাড়িতে থাকিবে; নাড়িতে নাড়িতে থিতুনি বাড়িতে থাকিবে; পুনরায় উহাতে এমোনিয়া যোগ কর, তলার থিতুনি গুলিয়া যাইবে; সাবধান যেন সব থিতুনি গুলিয়া না যায়। যদি সমস্ত গুলিয়া যায়, তাহা হইলে আবার লবণ যোগ করিতে হইবে। দুই তিন ঘণ্টা শিশিটা এক ধারে রাখিয়া দাও। আর একটি শিশিতে ৪০।৪৫ ফোঁটা জল দিয়া (পরিস্রুত জল) তাহাতে ১৫গ্রেন সোডিটার্ট মিশাও; উত্তমরূপে মিশিয়া গেলে উহাও এক ধারে রাখিয়া দাও। এইবার গেলাস খানি মেজের উপর ঠিক সমতল ভাবে রাখিবে; যদি স্পিরিট লেভেল থাকে ভালই; না হয় জল ঢালিয়া দিয়া দেখিবে; যে দিকে জল গড়াইয়া যায়, সেই দিকে নীচে কাগজ দিয়া উঁচু করিয়া দিবে। আমরা যে জল তৈয়ারি করিতে বলিলাম, তাহাতে ১ ফুট লম্বা ও ১ ফুট চওড়া একখানি গেলাস কলাই হইতে পারে। হিসাব মত উহাতে আরও কিঞ্চিৎ রৌপ্য দেওয়া উচিত। কিন্তু ইহাতেই কার্য্য বেশ হয় বলিয়া আর দিতে বলিলাম না; ব্যবসাদারেরা ইহা অপেক্ষা অনেক কম রৌপ্য ব্যবহার করিয়া থাকে। বিলাতে ১ আউন্স জলে ২০।২৫ গ্রেন রূপা দিয়া

থাকে। গেলাসখানি সমান ভাবে রাখা হইলে পরিস্রুত জল দিয়া ধুইয়া ফেল।

যে শিশিতে রূপার জল আছে তাহাতে ১ আউন্স জল দিয়া নাড়িয়া মিশাও, পরে সোডি টার্টের জল মিশাইয়া খুব ভাল করিয়া নাড়। ভাল কথা, রূপার জলে যদি থিতুনি অধিক থাকে, তাহাতে ২।১ ফোঁটা এমোনিয়া দিয়া নাড়িয়া লইবে এবং থিতুনি তলায় পড়িয়া গেলে আস্তে আস্তে রূপার জল সোডার জলে মিশাইবে; সাবধান যেন একটুও থিতুনি না পড়ে।

দুইটি জল মিশিয়া গেলে গেলাসের উপর ঢালিয়া দাও, অবশ্য জলটি সমস্ত গেলাসের উপর সমান ভাবে চারি দিকে বিছাইয়া যাওয়া উচিত। যদি না যায়, তাহা হইলে পায়রার পালক দিয়া চারিদিকে চালিয়া দেওয়া উচিত। যেখানে জল না পড়িবে সেখানে রূপা ধরিবে না, সুতরাং সর্ব্বত্র রূপার জল পড়া উচিত।

ইহার একটি সহজ উপায় আছে; জল ঢালিবার পূর্ব্বে কত জল লাগিবে তাহা জল ঢালিয়া আন্দাজ করিয়া লওয়া উচিত, তাহা হইলে ভয় থাকে না। প্রথম প্রথম আমরা অনেক প্লেট নষ্ট করিয়াছি, হয় ত অর্দ্ধেক বই জল পাইল না। যাহারা ব্যবসা করে তাহারা একেবারে অনেক জল তৈয়ারি করে বলিয়া কথা নাই; কিন্তু সাধারণতঃ ২।১ খানা করিতে হইলে অনেক সময় এই দোষ ঘটে।

রূপার জল ঢালিয়া দিবার ৫।৭ মিনিট পরে গেলাসের উপর রূপা জমিতে থাকিবে। ২।৩ ঘণ্টা পরে উপরের জল ফেলিয়া দিয়া দেখিতে পাইবে, চমৎকার আয়না হইয়াছে। রূপা ৫।৬ ঘণ্টার পর বেশ শুখাইয়া যাইবে।

টিনের বাক্স-ওয়ালারা যে রং দিয়া বাক্স রং করে, তাহা মাখাইয়া দিলে সহজে রূপা খসিয়া যায় না।

রূপার জল ঢালিবার পূর্ব্বে গ্ল্যাসখানা গরম করিয়া লইলে কলাই মজবুত হয়; ও সমস্ত রূপা উত্তম রূপে কঠিন হইয়া লাগে; এ কারণ বিলাতে একটি লোহার টেবিলের উপর বনাত মুড়িয়া, নীচে গরম জল দিয়া কলাই করে, সুবিধা হইলে এইরূপ করাই উচিত।

এই হইল রূপার কলাই করিবার নিয়ম। আমরা রূপার সহিত আর দুইটা ধাতু মিশাইয়া, এক প্রকার কলাই করিয়াছি; উহা এত কঠিন যে ছুরি দিয়া চাঁচিয়া কলাই তোলা যায় না। তবে উহাতে সাজ সরঞ্জাম অনেক

লাগে বলিয়া, এখন উহার বর্ণনা করিলাম না; উপযুক্ত ধনী পাইলে কারবার করিবার ইচ্ছা আছে। বলিতে কি, এ উপায় এখনও বিলাত প্রভৃতিতে প্রচলিত হয় নাই। আমাদিগের কৃত এই দর্পণে রং করিবার আবশ্যক নাই।

আর এক কথা। রূপার কলাই করা দর্পণে সূর্য্যের কিরণ অধিক দিন লাগিলে কাল হইয়া যায়, বা যাইবার সম্ভাবনা, যদি সোডি টার্টের সহিত অতি অল্প পরিমাণ সোডা ক্লোরাইড (খাইবার লবণ) থাকে, তাহা হইলে কিছু দিন পরে এই দোষ হইবার খুব সম্ভাবনা; কিন্তু আমাদিগের কলাই দর্পণে সে দোষ হইবার কোন কারণ নাই। আর এক কথা, খালি রূপার কলাই হল্‌দে রং হয়; কিন্তু দুই তিনটি ধাতু মিশাইয়া কলাই করিলে তাহার ঘোর সাদা রং হয়। এ বিষয়ে আরও অনেক বলিবার রহিল।

ডি, এন, কর্ম্মকার।

স্বদেশী শিল্প প্রসঙ্গ।

হোল্‌ডার ও নিব্। মধুসূদন দাস, পোষ্ট রহমতপুর, পাংশা—নানাপ্রকার হোলডার ও নিব প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুঁই সুন্দর সুন্দর হোল্‌ডার ও নিব প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। সেন এণ্ড কোম্পানী, পূর্ব্ববঙ্গ, কমিল্লা—সুন্দর সুন্দর পেন হোল্‌ডার এবং নিব প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। বি, এল, বি, সি, শর্ম্মা, স্বদেশী ষ্টোর, হুসিয়ারপুর, পাঞ্জাব—ইঁহারা হোল্‌ডার, নিব, পেনসিল, সাবান, ছুরী, দোয়াত, কালী এবং কাগজাদি বিক্রয় করিয়া থাকেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন মিত্র, টাঙ্গাইল পোঃ, ময়মনসিংহ—ইনি গোপাল চন্দ্র দাসের দ্বারায় জর্ম্মাণ সিল্‌ভারে (রূপদস্তা) নির্ম্মিত নিব বিক্রয় করিয়া থাকেন। ফরিদপুর জেলার কোটালী পাড়ার ললনা মোহন রায় ব্রাদার্স নিব প্রস্তুত করিতেছেন। কলিকাতা, ৬নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের স্বদেশীয় শিল্প নিকেতন হইতে নিব প্রস্তুত হইতেছে।

রেশমী ও পশমী কাপড়। ঘনশ্যাম দাস এণ্ড ব্রাদার্স, বড়পেটা, কামরূপ, আসাম—ইঁহারা নানাপ্রকার এণ্ডি এবং মুগা কাপড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। দি মুইর মিল কোম্পানী লিমিটেড, কানপুর—ইহারা নানাপ্রকার পশমী গায়ের কাপড় প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করেন।

রসিকলাল ঘোষ এণ্ড কোম্পানী, মঙ্গলদই, আসাম—আসাম সিল্ক এবং মৃগনাভি বিক্রয় করিয়া থাকেন। সেখ ব্রাদার্স, গৌহাটি, আসাম—ইহারা নানাপ্রকার এণ্ডি, ও মুগা সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। বিষ্ণুরাম ওলা, বড়পেটা, আসাম—ইনি এণ্ডি, মুগা এবং স্থতার নানাপ্রকার ধুতি, চাদর, থান, হাতীর দাঁতের পেন, সার্টের বোতাম প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকেন।

কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য।আম্বালার আপার ইণ্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কস্ কোম্পানী (Upper India Glass works Company)—নানাপ্রকার শিশি, বোতল প্রস্তুত করিতেছেন। এই সকল শিশি ও বোতলের মূল্য বিদেশী শিশি ও বোতলের মূল্য অপেক্ষা অধিক নহে; অথচ কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লইলে তাঁহারা ঔষধ বিক্রেতার নাম শিশির গায়ে বিনামূল্যে মুদ্রিত করিয়া দিতে প্রস্তুত। আমরা দেশীয় ঔষধ ব্যবসায়ীগণকে একবার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। পাঞ্জাবের আম্বালা সহরে এ, সি, মুখার্জ্জি এণ্ড ব্রাদার্স তাঁহাদের কাচের কারখানায় নানাবিধ কাচের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। স্বদেশীয় মূলধনে এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত এবং দেশী লোকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ঔষধের শিশি এবং বোতলের মূল্য, বিদেশীয় শিশি এবং বোতলের মূল্য অপেক্ষা, অধিক নহে। আমরা এ বিষয়ে শিশি বোতল ক্রেতাও বিক্রেতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বাল্‌তা। বাল্‌তী, অভ্রের চিম্‌নী, নিব প্রস্তুতের মেসিন ও ডাইস প্রভৃতি প্রস্তুত কারক শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত, ৪নং পার্ব্বতীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ইনি বালতী প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ইহাকে নিব প্রস্তুতের মেসীনের অর্ডার দিলে ১৫ দিনের মধ্যে পাওয়া যায়।

স্বদেশী জমাট দুগ্ধ। এন্, এন্ ব্যানার্জি, ষ্টার মেডিকেল হল, রসারোড ভবানীপুর, কলিকাতা—ইনি জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন।

সাবান। অনঙ্গ বিলাস হিন্দু সোপ, প্রস্তুতকারক অনঙ্গ মোহন দে, ৫নং শত্রুঘ্ন ঘোষের লেন, কলিকাতা। বল্লভ কোম্পানীর সাবান ৯৪ নং বিডনষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। সাবানগুলি বেশ সুগন্ধযুক্ত এবং ব্যবহারোপযোগী।

জুতার কালি, ব্রঙ্কো, ব্লাঙ্কো। দত্ত ব্রাদার্স, ছোট বাজার, মেদিনীপুর—জুতার ব্রঙ্কো, ক্রিম এবং কালি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। চক্রবর্ত্তী

রাদার্স, কৃষ্ণনগর—ইঁহারা তরল জুতার কালি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন।

সেফটি ম্যাচ। পেষ্ট বোর্ড, কার্ড বোর্ড, ধঞ্চিকাটি, পাটের কাটি প্রভৃতি নানারূপ কাষ্ঠ হইতে দীপশলাকা প্রস্তুত হইতেছে। রিপন কলেজের একটি ছাত্র এক প্রকার সুন্দর দিয়াশালাই তৈয়ারি করিতেছেন। আমরা যতগুলি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে সরিষা গ্রামের "বঙ্গমাতা ফ্যাক্টরিতে" প্রস্তুত দীপশলাকাগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; প্রস্তুতকারী বাবু বাবুরাম কয়াল মহাশয় আমাদিগের সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। বাক্স প্রভৃতির বাহ্য শোভা তত ভাল হয় নাই বটে, কিন্তু গুণে ইহার মত বিলাতী শলাকাও অল্প দেখা যায়। জলে কাঠি ডুবাইয়া লইয়াও জ্বালা যায়। ডায়মণ্ড হারবারের অদূরে সরিষা পোষ্ট আফিসের অধীন আমীরাগ্রামে ইহা প্রস্তুত হইতেছে। কলিকাতায় ৭।১ নং মার্কুইস ষ্ট্রীটে বিক্রয় স্থান বলিয়া লেখা আছে; কিন্তু তথায় সন্ধান পাওয়া ক্লেশসাধ্য। এই দীপশলাকা বা সেফ্‌টিম্যাচ্ পাঁচ পয়সা ডজন হিসাবে বিক্রীত হইতেছে। কাঠিগুলি ধনিচা হইতে তৈয়ারি হইয়াছে।

অভয়া দীপশলাকা। ইহাও বেশ হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শলাকার মত হয় নাই। ৪ নং গোবিন্দ সরকারের লেন, বহুবাজারে প্রাপ্তব্য।

তাঁত সংবাদ।

বঙ্কিম তাঁত। ফরেশডাঙ্গা তন্তুবায় সমিতি হইতে প্রকাশিত। তন্তুবায় গেজেট নামক পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বঙ্কিম লাল দাস কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও ২৯।৩ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য। এই তাঁতে প্রত্যহ ৮।৯ ঘণ্টা পরিশ্রমে আড়াই খানা পাঁচগজা কাপড় প্রস্তুত হয়। ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহাতে কেবলমাত্র এক হাতে দক্তি টানিলে বস্ত্র বয়নের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমরা আশা করি বঙ্কিমবাবু কিছু সুলভ মূল্য ধার্য্য করিয়া এই তাঁত বাজারে বিক্রয়ার্থ বাহির করিবেন।

শ্রীহারাধন বাগ্দী, গড়বেতা, বাঁকুড়া। ইনি একপ্রকার নূতন তাঁত আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে এক ব্যক্তি চাকা ঘুরাইলে বয়নের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার নিকট হইতে তাঁত ক্রয় করিলে বয়ন কার্য্য শিখাইয়া

দেন। ইনি তাঁত আবিষ্কার করিয়াই নিশ্চিন্ত না থাকিয়া নিজে একটি বস্ত্র বয়নের কারখানা খুলিয়াছেন। মূল্য এবং অন্যান্য সংবাদ আবশ্যক হইলে উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২নং ব্রাহ্মসমাজ লেন, কলিকাতা—ইনি এক প্রকার নূতন তাঁত প্রস্তুত করিয়াছেন; ইহাতে দৈনিক পাঁচ গজা তিনখানা কাপড় বোনা যায়। মূল্য এবং অন্যান্য সংবাদাদি উপরোক্ত ঠিকানায় কাঙ্গালী বাবুর নিকট প্রাপ্তব্য।

সোফী তাঁত—অমৃত সহর, লুধিয়ানা, মহম্মদ সোফী কর্তৃক জাপানী তাঁতের অনুকরণে প্রস্তুত। ইহা কাষ্ঠ এবং লৌহ নির্ম্মিত এবং ইহাতে ৮ ঘণ্টায়, ২৫ গজ মোটা কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। মূল্য ৯৬৲ টাকা। কলিকাতা, জেসফ এণ্ড কোম্পানীর দোকানে প্রাপ্তব্য।

কুষ্টিয়ার তাঁত—এই তাঁতে ১২০ নম্বরের সূতা পর্য্যন্ত বুনানি হইয়াছে। ইহাতে প্রতি ঘণ্টায় ৩ ফুট ৪ ইঞ্চি কাপড় বুনা হইতেছে। ইহাতে বিছানার চাদর, ছিট, র‍্যাপার ও কাপড় সমস্তই বুনা চলে। মূল্য, সেগুণ কাষ্ঠের নির্ম্মিত তাঁত মায় সরঞ্জাম ৩০৲ টাকা এবং অন্য কাষ্ঠের ২৬৲ টাকা। ফ্রেম লইতে গেলে আরও সাড়ে পাঁচ টাকা দিতে হয়। অন্যান্য সংবাদ জানিতে হইলে, যে কেহ শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু, ম্যানেজার ঠাকুর এষ্টেট, শিলাইদহ, নদীয়া, এই ঠিকানায় পত্র লিখিয়া জানিতে পারেন।

আমরা উপরোক্ত সংবাদগুলি বয়ন শিক্ষক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের নিকট পাইয়াছি। স্বদেশীর কার্য্যে তাঁহার এই প্রকার সহানুভূতির জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

'হুগলীর তাঁত—এই তাঁত হুগলীর সর্ব্বত্র পাওয়া যায়; মূল্য ৩০৲ টাকা। ইহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং এক জন তাঁতি ১০ ঘণ্টা পরিশ্রমে, ৪০নং সূতার এক খানা ৫ গজা কাপড় প্রস্তুত করে।

বয়ন বিদ্যালয়।

জাতীয় ধন ভাণ্ডারের অধ্যক্ষগণ সঙ্গীত সমাজের কয়েকটি গৃহে বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। প্রায় ৫০টি ছাত্র আপাততঃ এই বিদ্যালয়ে বয়ন কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। সঙ্গীত সমাজের পশ্চাৎবর্ত্তী ভূখণ্ডে গৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে আরও বহু

ছাত্র লওয়া হইবে। আপাততঃ কয়েকখানি ঠকঠকি তাঁতে (Fly Shuttle Loom) এবং একখানি হেটাবৃসলী তাঁতে বয়ন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শিক্ষার্থীগণের নিকট ৫্ টাকা প্রবেশিকা ফি গ্রহণ করা হয়। মাসিক বেতন লওয়া হয় না।

আমরা সহরে ও মফস্বলে আরও কয়েকটি বয়ন বিদ্যালয়ের সংবাদ পাইয়াছি। আগামী বারে তাহার আলোচনা করিব।

জাতীয় মহাসমিতি

বিগত ২৭শে ডিসেম্বর, বুধবার, বেলা ১টার সময় পুণ্যধাম বারাণসীক্ষেত্রে, জাতীয় মহাসমিতির একবিংশ অধিবেশনের সময়, সভাপতি মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গোখেল প্রদত্ত সুন্দর ও সারগর্ভ বক্তৃতার কিয়দংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

* * * *

"প্রায় চারি মাস পূর্ব্বে, যখন আমি এই কংগ্রেসের সভাপতিত্বের জন্য প্রথম আহুত হই, সে সময়ে আমরা গগন-প্রান্তে মুষ্টি-পরিমেয় একখানি অতি ক্ষুদ্র মেঘ দেখিতে পাইয়াছিলাম; তাহার পর আকাশ মেঘজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং কিছুদিন হইতে প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইতেছে। এখন কংগ্রেস তরণীর পুরোভাগে পর্ব্বতশ্রেণী ও চতুর্দ্দিক দুরন্ত বীচিমালা পরিবেষ্টিত; এই অবস্থায় আমাকে কর্ণধার পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অতি নির্ভীক হৃদয়ও এ অবস্থায় বিচলিত হইবেন বলিয়া স্বীকার করিবেন। যাঁহার চরণ-প্রান্তে আমরা নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, এই পবিত্র বারাণসী ধামে সেই বিশ্বনাথের প্রসাদ লাভে যেন আমরা বঞ্চিত না হই, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা; সমবেত প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত জ্ঞান ও স্বদেশ প্রীতি সহায়ে এই মহাসমিতি যেন উপস্থিত সঙ্কট সময়ে অক্ষুণ্ণ বা শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন যশঃ ও দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারে।"

* * * *

"কিন্তু ভদ্র মহোদয়গণ! অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গলের কারণ নিহিত থাকে,

এই সুন্দরোক্তির ন্যায়, বঙ্গদেশ যে বিপদ-সঙ্কুল অন্ধকারময় পথ অতিক্রম করিয়াছে ও এখনও যে পথে উপনীত আছে, সেইস্থান হইতেও ভবিষ্য-গগনের আলোকময় আশার আশ্বাসবিহীন হয় নাই। প্রজাপুঞ্জের বঙ্গ-ভঙ্গ-জনিত গভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস, আমাদের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা-রূপে কীর্ত্তিত হইবে। বর্ণ বা জাতি নির্ব্বিশেষে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের লোক, বাহ্যিক উত্তেজনা ব্যতিরেকে, সাধারণ অমঙ্গলের প্রতিবিধান সঙ্কল্পে, একযোগে উত্তেজিত হওয়া, ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ কাল হইতে এই প্রথম। বঙ্গদেশে জাতীয়তার প্রকৃত জ্ঞান-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। এই তরঙ্গ সংঘাতে, অন্ততঃ এই সময়ের জন্য, পুরাতন বাধা বিপত্তি বিদূরিত হইয়াছে ; ব্যক্তিগত ঈর্ষা দ্বেষাদি অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং অপর আন্দোলন নিস্তব্ধ হইয়াছে। নির্দ্দয়, অসংযত, স্বেচ্ছাচার শাসন পদ্ধতির আচরিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, বঙ্গবাসী বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, সমগ্র ভারতবর্ষকে বিস্মিত ও চরিতার্থ করিয়াছে; বঙ্গবাসী যে নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে, তাহাতে ভারতের সমস্ত প্রদেশগুলির পরস্পর সহানুভূতি ও উন্নতি-ব্যাকুলতার বন্ধন দৃঢ়তর করিতে সমর্থ হওয়ায়, সে নির্য্যাতন-সহন নিরর্থক হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে সম্প্রতি যে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে স্থানে স্থানে কূল প্লাবিত হওয়াই সম্ভব। যখন সুবিস্তীর্ণ জনতাস্রোত একযোগে পরিচালিত হইতে থাকে, বিশেষতঃ যখন অন্ধকারময় স্থান হইতে আলোকের দিকে, অধীনতা হইতে স্বাধীনতার দিকে এই স্রোতের গতি হয়, তখন এরূপ উত্তেজনা অনিবার্য্য ; ইহাতে যেন আমরা বিশেষ বিচলিত না হই। এই বর্ত্তমান অবস্থার এক মাত্র নিগূঢ়ার্থ যে, এই মহাদেশের জাতীয় জীবনীশক্তি নিতান্ত প্রয়োজনীয় পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে ; এই মহোপকারের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ বঙ্গদেশের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ থাকিবে। বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্যপথে অসংখ্য বিপত্তি; এ সকল বিপত্তির এই মাত্র সূত্রপাত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের কাহারও যে উপস্থিত একটি মাত্র দায়িত্ব হইতেও বিচলিত হইবার বাসনা নাই, তাহা আমি জানি ; এবং যে কোন স্বার্থ বিসর্জ্জনের প্রয়োজন হইবে, তাহার জন্য তাঁহারা যে আনন্দিত চিত্তে প্রস্তুত হইবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। সমগ্র ভারত তাঁহাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ; তাঁহাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য সাধনের জন্য, অপর প্রদেশসমূহের আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদের অসম্মান বা অখ্যাতি উপস্থিত হইতে দিলে, আমাদের

সকলকেই তাহার অংশ-ভাগী হইতে হইবে। এ সময়ে সমগ্র ভারতের সম্মান যে তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহারাও যেন এ কথা বিস্মৃত না হন।"

* * * * *

"ভদ্র মহোদয়গণ! প্রকৃত স্বদেশী আন্দোলন, স্বদেশ-প্রেম এবং স্বদেশের অর্থোন্নতি-বিধায়ক। যে সকল উৎকৃষ্ট অনুস্মৃতি মানবজাতির হৃদয়ে উত্তেজনা উৎপাদন করিয়া থাকে, স্বদেশ বা নিজ জন্মভূমির জ্ঞান তাহাদেরই অন্তর্ভূত। কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

নির্জীব হৃদয় হেন কেবা ধরাতলে,
কভু যে আপন মনে কহে না বিরলে;
এই মম মাতৃভূমি এই মম দেশ?

উন্নত স্বদেশী-জ্ঞান-মন্দিরে যে স্বদেশানুরাগময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার প্রভাব এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ ও উন্মাদকর যে, সেই অনুরাগের অনুভূতি মাত্রেই মানবের হৃদয় আবেগ-পূর্ণ ও আত্মজ্ঞান প্রবোধিত হয়। মাতৃভূমির সেবাপ্রবৃত্তি জাপানে যেরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে, আমাদেরও এই প্রবৃত্তি যত দিন সেইরূপ হৃদয়োন্মাদকারী ভাবে পরিণত না হয়, তত দিন অপর কর্ত্তব্য মাত্রই পশ্চাতে রাখিয়া, ভারতভূমির উচ্চ ও নীচ, রাজা ও কৃষক, নগর ও গ্রাম মধ্যে সেই অনুরাগময় মূর্ত্তির স্বর্গীয় বার্ত্তা প্রচার করাই প্রয়োজন। স্বদেশী আন্দোলন সাধারণতঃ যে ভাবে বুঝা যায়, তাহাতে এই স্বর্গীয় বার্ত্তার একাংশ আমাদের জন সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করে এবং এই অংশ তাহাদের ধারণার উপযোগী আকারে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে দেশের প্রতি তাহাদের মতি ফিরিয়াছে, দেশের জন্য স্বেচ্ছায় কতক স্বার্থ ত্যাগে অভ্যস্ত হইয়াছে, দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য আন্তরিক আগ্রহ সম্পন্ন হইয়াছে এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষতা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ অনুষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটিই মূল্যবান এবং যাঁহাদের উপর এই অনুষ্ঠানের ভার তাঁহারা যে দেশহিতকর ব্রতে দীক্ষিত তাহা উপলব্ধি করিবার অধিকারী। কিন্তু (জ্ঞানময় ভাবের পর) অর্থই এই আন্দোলনের কার্য্যকর ভাবের উপাদান; স্বার্থত্যাগ বা আত্ম-নিগ্রহ ব্রতে অনেকেই দীক্ষিত হইলে, দেশোৎপন্ন দ্রব্যজাত অবিলম্বে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং দেশীয় দ্রব্যের উৎপন্ন পরিমাণের অতিরিক্ত প্রয়োজন হেতু, দ্রব্যোৎপাদন চেষ্টা অনবরত উৎসাহ প্রাপ্ত হওয়ায়, যদিও দেশের

প্রকৃত অর্থোন্নতির উদ্দেশ্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে, তথাপি, এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয় অর্থ সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে, সমস্যা এরূপ দুরূহ বোধ হয় যে, অর্থাগমের উপযোগী প্রত্যেক অবলম্বনের সাহায্য ব্যতিরেকে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে না। সমস্যা বাস্তবিকই প্রথম শ্রেণীর। দ্বাদশ বৎসর হইল পুণার শিল্পসমিতিতে মহামতি রাণাড়ে বলিয়াছিলেন "এক দেশের উপর অন্য দেশের রাজকীয় প্রভুত্ব বিস্তারে লোকের দৃষ্টি যেরূপ অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হয়, এক দেশের মূলধন, উৎসাহ এবং নৈপুণ্য অন্য দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিলে, তাহাতে লোকের দৃষ্টি তত দূর আকৃষ্ট না হইলেও, এই শেষোক্তের শক্তি অতি ভয়াবহ; ইহার প্রভাব বিশ্বাস-হনন শক্তি-সম্পন্ন; জাতীয় জীবনের জন্য যে সকল বিভিন্ন ক্রিয়া-শীলতার প্রয়োজন, ইহাতে সেই সকল ক্রিয়ার উৎসগুলি রোধ করে।" দ্রব্যোৎপাদন, মূলধন, সাহস ও নৈপুণ্য-সাপেক্ষ; এক্ষণে আমাদের এই সকল উপাদানেরই নিতান্ত অভাব। সুতরাং যে কেহ ইহার কোন বিষয়েই আমাদের সাহায্য করিবেন, তিনিই স্বদেশীর প্রকৃত কার্য্যকারক, এবং তাঁহাকেই আমরা সাদরে এই আখ্যা প্রদান করিব। ত্যাগের পরিবর্ত্তে গ্রহণনীতি অবলম্বনে, একই ক্ষেত্রের একাংশেই কার্য্য করিবার উপরোধের পরিবর্ত্তে প্রত্যেককেই তাহার অভিমত স্থান নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা প্রদানে, যাহারা ইতিমধ্যেই আমাদের পক্ষভুক্ত তাহাদের একজনেরও সম্পর্ক ত্যাগের পরিবর্ত্তে যাহাদেরই নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা তাহাদের সকলকেই দলভুক্ত করিলে তবে এই সমস্যায় উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা। সর্ব্বাগ্রেই দেখিতে হইবে যেন স্বদেশপ্রেম নামে আমরা দেশে নূতন আত্মবিচ্ছেদের অভিনয় করিয়া না বসি। ইহার অপেক্ষা স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত তত্ত্বের আর অধিকতর অপব্যবহার হইতে পারে না।"

প্রাপ্তি স্বীকার ও সমালোচনা।

ধর্ম্মতত্ত্ব ও কর্ত্তব্য বিচার।—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত, এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য, মূল্য ১।৹ টাকা। বীরেশ্বর বাবু সাহিত্য জগতে সুপরিচিত, কাজেই তাঁহার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এই পুস্তকে বীরেশ্বর বাবু আমাদের

এখন কি করা কর্ত্তব্য তাহা বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানি বড়ই সময়োপযোগী। এপ্রকার পুস্তকের যতই প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল।

ঠাকুর মহাশয়ের দপ্তর।—শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রণীত এবং সরশুনা, রক্ষিতপাড়া বেহালা পোষ্ট—তাঁহারই নিকট প্রাপ্তব্য, মূল্য প্রতি খণ্ড ৵১০ আনা মাত্র। আমরা এই পুস্তকের আটখণ্ড মাত্র পাইয়াছি; অক্ষয় বাবু ইহাতে আমাদের দেশের চলিত সমস্ত গল্পগুলি একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইলে গল্প শিক্ষার্থীগণকে আর গল্পের জন্য অপরের তোষামোদ করিতে হইবে না।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

প্রিয় দর্শন যুবরাজ সস্ত্রীক এখন কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থান করিতেছেন। আমরা চিরকালই রাজভক্ত; রাজপুত্রের সম্বর্দ্ধনার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। দরিদ্র প্রজার এই আন্তরিক যত্নে যুবরাজ এবং যুবরাজ মহিষী সন্তোষ প্রকাশ করিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

আমরা অবগত হইলাম কলিকাতার কতিপয় ধনী বণিক ২৫ লক্ষ টাকা মূলধনে এক কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন।

চন্দন নগরের বাবু বটকৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার কাপড়ের কলের কার্য্য বৃদ্ধির জন্য এক কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। এই কোম্পানীর অনেক অংশীদার জুটিতেছে।

কলিকাতায় যুবকগণ প্রায় প্রতিদিন সহরের নানা স্থানে গমন করিয়া সাধারণকে বিলাতী বস্ত্র ক্রয় করিতে নিষেধ করিতেছেন। ছাত্রগণ প্রায় জাতীয় সঙ্কীর্ত্তনের দল লইয়া রাস্তায় রাস্তায় কীর্ত্তন করিতেছেন।

কিছুদিন হইল উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বিলাতী বস্ত্রের চালান যাইতেছিল। সকলে শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, চালানকারী মহাজনগণ প্রায় সকলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, বিলাতী বস্ত্রের চালান বন্ধ করিবেন।

কলিকাতায় সূক্ষ্ম ও মোটা, হাতের তাঁতের ও বোম্বাই কলের কাপড়ের প্রচুর আমদানি হইতেছে। মূল্যও কিছু কমিয়াছে। দেশীয় কাপড় বিক্রয়ের জন্য বহু দোকান প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

হাতের তাঁতের কাপড়, সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী, পুরা ৫ গজ লম্বা, চৌড়া

২॥ হাত, মূল্য ২৲ টাকা হইতে ২॥০ টাকা। এ সকল কাপড় বেশ মজবুৎ সর্ব্ব বিষয়ে তুলনা করিলে দর কিছুতেই অধিক বলা যায় না।

সাবানের কারখানা। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, সন্তোষের প্রসিদ্ধ জমিদার সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় অতি শীঘ্র একটী সাবানের কারখানা খুলিবেন। প্রমথ বাবুর এই চেষ্টা নিশ্চয় সফল হইবে; আমরা ভগবানের নিকট এই কারখানার উন্নতি কামনা করি।

জীবনবীমা করিতে হইলে স্বদেশীয় কোম্পানীতেই করা উচিত। কারণ ইহাতে দেশের টাকা দেশেই খাটিবে এবং থাকিবে। আমাদের দেশে তিনটী দেশীয় জীবনবীমা কোম্পানী আছে। তন্মধ্যে এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়াই (Empire of India Life Insurance Co) উৎকৃষ্ট। এই কোম্পানীর আসাম ও বঙ্গদেশীয় এজেন্সি, পরলোকগত সুবিখ্যাত উকীল বাবু দুর্গামোহন দাসের যোগ্যপুত্রদিগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

ব্রতি-সমিতি। সে দিন পটলডাঙ্গা মল্লিক বাড়ীতে ব্রতি সমিতির প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার এস, এম, হোসেন, মৌলবী লিয়াকত হোসেন, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, প্রমথনাথ মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, মনোরঞ্জন গুহ, মাদারিপুর স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, ডাক্তার হারাধন দত্ত প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ব্রতি সমিতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে বন্যা আসিলে কৃষকেরা যেমন গর্ত্ত করিয়া জল ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, তেমনি আজ বাঙ্গালা দেশে নবজীবনের যে বন্যা আসিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এই ব্রতিসমিতি সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাতে মনুষ্যত্ববিকাশিত হয় এবং দেশের প্রতি ভক্তি জন্মে এমন কতকগুলি ব্রত প্রত্যেক ব্রতীকে গ্রহণ করিতে হয়। বাংলা দেশের অনেক স্থানে এইরূপ ব্রতিসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক খ্যাতনামা বক্তা সমিতির সাধু উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন।

মফঃস্বলস্থ শিল্পীগণ তাঁহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বহুল বিক্রয় উদ্দেশ্যে এজেন্টের আবশ্যক বোধ করিলে আমরা কলিকাতায় বিশ্বাসী এজেন্টের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।

স্বদেশী।

প্রথম খণ্ড।] মাঘ, ১৩১২। [চতুর্থ সংখ্যা।

বন্দে মাতরম্।

দোষ কোথায়?

যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যাইবে, সেই দিকেই দেখা যাইবে যে, আমরা অতি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এরূপ অবস্থা আর কোন সভ্যদেশে সম্ভব নহে; এরূপ অধঃপাত যেন আর কাহারও ভাগ্যে না ঘটে। এই অবস্থার প্রকৃত কারণ কি, অর্থাৎ কাহার দোষে ইহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা সকলেরই অনুসন্ধান করা উচিত; কারণ আত্মদোষ দর্শন ব্যতীত তাহা সংশোধনের সম্ভাবনা নাই। কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে, তাহাও সকলের অবশ্য-চিন্তনীয়।

কিন্তু আমরা যাহাকে 'আমরা' বা 'সকলে' বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, তাহারা কে, তাহাদের অস্তিত্বই বা কোথায়, ইহাই প্রথমে বিশেষরূপে জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিজন অরণ্যের মধ্যস্থলে, কিম্বা অন্ধকূপ মধ্যে থাকিয়া, উচ্চ চীৎকারে কোন ফল নাই। আমরা কে, তাহা কি আমরা বুঝি? — অতি পূর্ব্বকালে এ দেশে 'আমরা' এই শব্দের প্রকৃত অর্থ ছিল। মহাপুরুষগণ জগতের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করিতেন, নৃপতিগণ

প্রজাবৃন্দের কুশলার্থে সর্ব্বস্ব পণ করিতেন, ভূম্যধিকারিগণ অধীনস্থগণের উপকার চিন্তাতেই নিরত থাকিতেন, সমাজের মঙ্গলানুষ্ঠানে অগ্রণী হওয়াই অবস্থাপন্নগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল, পরস্পরের সুখ সচ্ছন্দ বৃদ্ধিতেই প্রতিবেশ-বাসিগণের বিপুল আনন্দ ছিল। তখনই 'আমরা' অর্থের সার্থকতা ছিল। ক্রমশঃ এই 'আমরা' শব্দের অর্থ সংকীর্ণ হইয়া, 'আমি' ও স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-আত্মীয়-স্বজন-মাত্রে পরিণত হইল। তখনও সম্পন্নাবস্থগণ কুটুম্বপোষণশীল ছিলেন; অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয়গণও উন্নতাবস্থগণের আশ্রিত মধ্যে গণ্য হইতেন। এক্ষণে এই 'আমরা' আরও সংকীর্ণ-ভাবাপন্ন হইয়া 'আমি'ও স্ত্রী-পুত্র-কণ্যা-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; কোথাও বা কেবল 'আমি' মাত্র-বোধক হইয়া, পূর্ব্বতন 'আমরা' শব্দের বিদ্রূপাত্মক হইয়া উঠিয়াছে; এবং দেশ মধ্যে সর্ব্বনাশ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

মহান্ অনর্থের মূল এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থ কোথা হইতে আসিল? যে দেশে স্বয়ং ভগবান নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অধিবাসিগণ সমক্ষে স্বার্থত্যাগের কত মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় করিয়াছিলেন, যে অভিনয়ে পরার্থ-বৃত্তিরূপ অপরূপ তরু রোপিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তস্তর পর্য্যন্ত মূল বিস্তার করিয়াছিল, যে দেশের লোক পরোপকারকেই একমাত্র প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির জানিতেন, এই কর্ত্তব্য বোধে যাঁহারা আপনাদের সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও, কত মহতী কীর্ত্তি দেশময় সাধারণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া যাইতেন, সে দেশের লোক এই সুশিক্ষা কিরূপে বিস্মৃত হইল? সে বিশাল বিচিত্র তরুর কিরূপে মূলোৎপাটিত হইল? সে সুদৃঢ় মূল সহ তাহাদের হৃদয় পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইল না কেন?

সত্যই তাহাই হইয়াছে; দেশবাসীর হৃদয়ও বিনষ্ট হইয়াছে; স্বার্থ সংস্পর্শে হৃদয়ের বিনাশ-সাধনই হইয়া থাকে।

কেন এমন হইল? দেশবাসী এমন হৃদয়হীন, নরাধম, পশুপ্রকৃতিক কিরূপে হইল? কে এই অরণ্যচারী-পশুগণপ্রিয় স্বার্থরূপ বিষলতা বীজ আনয়ন করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়োদ্যানে বপন করিল? হায়! এ বিষলতা বিনিময়ে, সে উদ্যান কেন মরুভূমিসম তৃণমাত্রশূন্য রহিল না?

ভাই! অনুসন্ধান করিতে হইবে, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে,—দেশের এই বিষম শত্রু কে? কোথায় তাহার বসতি? কে এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল, দেশবাসিগণের সুকোমল প্রবৃত্তি নিচয় দূরীভূত করিয়া,

দেশবাসিগণকে নরাধম বা পশুসম করিয়া তুলিল? শত্রুর সন্ধান না হইলে তাহার মূলোচ্ছেদ হইবে না; তাই বলি, ভাই! অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কে সেই মহাশত্রু, কোথায় তাহার নিবাস?

যদি দেখিতে পাই, সে শত্রু আমরাই; এই দেশই সে শত্রুর আবাসভূমি; যদি দেখি,——

"আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ",

যদি দেখি, সত্যই আমরা "স্বখাদ সলিলে" জীবন বিসর্জ্জন দিতেছি, তাহা হইলে কর্ত্তব্য কি?

আত্মদোষ যদি সত্যই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা হইলেই কর্ত্তব্য-নির্ণয় অতি সুসাধ্য হইবে; কর্ত্তব্যপথ তখন আপনিই আমাদের নয়ন সমক্ষে উপনীত হইবে। কিন্তু কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের পর যদি আবার, সে পথে পাদবিক্ষেপে প্রবৃত্তি না হয়, পথ দুর্গম বলিয়া যদি ইতস্ততঃ করিতে হয়? তাহা হইলে, তখন সর্ব্বনাশের সুবিস্তীর্ণ সুগমপথে একটু দ্রুত ধাবিত হইয়া,তাহার চরম সীমাস্থিত সেই মহা গহ্বরে ঝম্ফ প্রদান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হইবে। সেখানে, আমাদেরই উপযুক্ত, পূতিগন্ধময় মহা নরকের দ্বার আমাদের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিবে। আমাদের স্বোপার্জ্জিত সেই পরিণাম আবাস ভবনের দ্বার চিনিয়া লইতে, তখন আর বিন্দুমাত্র আয়াসের আবশ্যক হইবে না। সে দ্বারের উপরিভাগে আমাদের জন্য সুবৃহৎ অক্ষরে খোদিত থাকিবে——

"Welcome, O Traitors to the Mother land."

"স্বাগতরে দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার কুসন্তানগণ।"

বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা

আজকাল সকল সভ্য ও শিক্ষিত দেশে বিজ্ঞান ও শিল্প-বিদ্যা শিক্ষার বিস্তার হইতেছে। ভারতবর্ষও এক সময়ে বিজ্ঞান এবং শিল্প বিষয়ে বিশেষ উন্নত হইয়াছিল; কিন্তু বিদেশীয় রাজশাসনাধীনে ও আমাদের দোষে, সে সকলেরই প্রায় লোপ হইয়াছে বলিলে হয়। সম্প্রতি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান কয়েকজন লোকের উৎসাহ ও যত্নে, বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার উন্নতির জন্য একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই

সভার প্রথম অধিবেশন হয়। এই এক বৎসর মধ্যে ঐ সভাটি দ্বারা কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বলিয়া নিম্নে বিবৃত হইল।

বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের প্রায় সকল জেলা ও মহাকুমাতে বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার উন্নতির জন্য এক একটি শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশীয় অনেক লোকেই চাঁদা দিতেছেন ও ধনী লোকেরা ছাত্র-বৃত্তি দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বাৎসরিক প্রতিশ্রুত ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ ২৭,১০০৲ টাকা হইয়াছে। বৎসরে চারি আনা মাত্র চাঁদা দিলে গ্রহণ করা যায়; অনেক সামান্য কর্ম্মচারী ও স্কুল কলেজের ছাত্রগণ চাঁদা দিতেছেন।

গত বৎসর কেবল মাত্র ২৫,৩৪১৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে; তাহার মধ্যে ১২,০৫৮৲ টাকা মাত্র মজুত আছে, বাকি খরচ হইয়াছে। দেশে অনেক ধনী লোক আছেন এবং লোক সংখ্যাও অনেক; সকলেরই এই মঙ্গলকর কার্য্যে যোগদান ও সাহায্য করা অতীব কর্ত্তব্য। কেবল বঙ্গের কেন, ভারতবর্ষের সকল দেশের লোকের এই সভার কার্য্যে যোগদান করা উচিত। সভা হইতে দুটি ছাত্রকে আমেরিকায়, পাঁচটিকে ইংলণ্ডে এবং এগারটিকে জাপান দেশে পাঠান হইয়াছে। তাঁহারা ঐ সকল দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন ও শিল্পকার্য্যও শিক্ষা করিবেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশীয় লোককে শিক্ষা দিবেন; আবশ্যকীয় কল স্থাপন করিয়া শিল্পজাত কাপড়, সাবান, কাচ প্রভৃতি দ্রব্য সকল প্রস্তুত করাইবেন। আগামী বৎসরে এইরূপ আরও ছাত্র বিদেশে পাঠান হইবে।

ফরাসি, জার্ম্মান ও জাপান ভাষা শিক্ষার জন্য কলিকাতার এলবার্ট হলে একটি ভাষা শিক্ষার শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ক্রমশঃ এখানে অন্যান্য ভাষারও শিক্ষা দেওয়া হইবে।

দেওঘর বৈদ্যনাথে ৪৫,০০০/ বিঘা জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। ঐ জমি আবাদ করিবার জন্য দেওয়া হইবে। অনেকে ঐ জমির জন্য দরখাস্ত করিয়াছে।

অল্প সুদে কৃষক ও শিল্পিদিগকে টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য একটি ব্যাঙ্ক খুলিবার চেষ্টা হইতেছে এবং শীঘ্র খোলা হইবে বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেক জেলায় এক একটি ব্যাঙ্ক হইলে ভাল হয়।

বিলাতী দিয়াশলাই, ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি লোহার জিনিষ, সাবান, বোতাম, চিরুণী, চুড়ি, কাচের বাসনাদি, চীনের মাটির বাসনাদি, চামড়া, রং প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুতের জন্য কলের আবশ্যক। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কাশিম বাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ এবং চন্দননগরের বিখ্যাত ধনী বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু এক একটি জিনিষের কল স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই সময়ে স্বদেশজাত জিনিষ ব্যবহার করিবার জন্য সকলেই ইচ্ছুক কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ দেশীয় অনেক জিনিষেরই অভাব। সুতরাং যত শীঘ্র তাঁহারা আপনাপন সংকল্প কার্য্যে পরিণত করেন, ততই দেশের মঙ্গল।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন যেন কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনরূপ মহাকল্যাণকর মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে ও নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্য নিতান্ত ভ্রান্ত; কিন্তু আমরা যদি নিজেই বিঘ্ন আনিয়া উপস্থিত করিতে থাকি, মহাযজ্ঞের সঙ্কল্প করিয়া "অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ" না বলিয়া যদি "আগচ্ছন্তু তে ভূতাঃ" বলিয়া বসি, তাহা হইলে সে ক্ষোভ রাখিবার আর স্থান থাকে না। বাহির হইতে যত বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ততই তাহা নিবারণের প্রয়াস ও সেই প্রয়াসের সহিত ততই উৎসাহের আবির্ভাব হইবে; কিন্তু গৃহস্বামী যদি স্বেচ্ছায় কার্য্যের বিঘ্ন সৃজনে তৎপর হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার অনুচরগণ যে নিরুৎসাহিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন-কল্পনা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় অনেকে বিশেষ নিরুৎসাহিত হইয়াছেন। ভগবান করুন, এই নিরুৎসাহ যেন স্থায়ী বা দেশব্যাপী না হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে—এখন আমাদের জাতীয়তা কোথায় ও এই জাতীয়তারই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কিনা। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয়তা, আমাদের মতে ঠিক Vulcanic conglomerate অথবা "ডাল খিচুড়ি"। এ অবস্থায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মতামত গ্রহণ

করিতে গেলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিবেন—সংস্কৃত চর্চ্চা হউক, মৌলবি সাহেব বলিবেন—আরবি শিক্ষা হউক, দাস মহাশয় বলিবেন—আইন শিক্ষা হউক, মিষ্টার মহাপাত্র বলিবেন—কৃষিশিক্ষা হউক, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে এই অবস্থা হইতেই যে আমাদের জাতীয়তার সূত্রপাত হইতেছে, একথা বলা যাইতে পারে। এই জাতীয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এরূপ একটি বহুব্যয়সাধ্য মহদনুষ্ঠান কতদূর সম্ভবপর, তাহা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, এই জাতীয়তা সৃষ্টির সূত্রপাত কোথা হইতে হইল ও ইহার মূলভিত্তি কি? স্বদেশ-হিতৈষিতা হইতেই যে এই জাতীয় জীবনের সূত্রপাত ও দেশের শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতিই যে ইহার মূলভিত্তি, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং এই মূলভিত্তি যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সর্ব্বাগ্রে তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে সুবিধেয়। এখন সমগ্র দেশবাসীর, বিশেষতঃ নেতৃগণের দৃষ্টি এই মূল সঙ্কল্প হইতে অপসারিত হইলে, সুফলের প্রত্যাশা সুদূর পরাহত হইবে।

কেহ কেহ বলিতেছেন, স্বদেশী আন্দোলনে যে সকল ছাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় না হইলে তাহাদের উপায় কি? দেশের নেতৃগণ চেষ্টা করিলে উপায় অবশ্য যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—দেশের শিল্প বাণিজ্য রক্ষার কামনাই কি এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ নহে? উপস্থিত এই স্বদেশী আন্দোলনের আর কি উদ্দেশ্য আছে তাহা আমরা বুঝি নাই। যদি আমাদের ধারণাই সত্য হয়, তাহা হইলে এই মহদনুষ্ঠানে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি বলিয়া কি, ইহারই মূলে কুঠারাঘাতের বন্দোবস্ত করিতে হইবে? আরও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, ইহা নিশ্চিত জানিয়াই এরূপ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল না কি? অপর দেশ হইলে, এরূপ আন্দোলনে কত নরহত্যা, কত রক্তপাত ও কত অর্থব্যয় যে হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা নিতান্ত রাজভক্ত ও আমাদের নেতৃগণ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও কোমল-প্রকৃতিক; সেই জন্যই সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই এতদিন আমরা এই আন্দোলন লইয়া জীবিত আছি। তাঁহাদের উপর দেশবাসীর অটল বিশ্বাস; সেই বিশ্বাসবশে তাঁহাদের উপদেশের অনুবর্ত্তী হওয়ায়, এখনও আমাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় নাই। কোন কোন সংবাদ পত্রে তাঁহাদের কাহারও কাহারও কুৎসা কিম্বা কার্য্যদক্ষতার উপর সন্দেহ প্রকাশিত হইলেও, তাঁহারা কর্ত্তব্যসাধনে যেরূপ স্থির নিশ্চয়, তাঁহাদের

অনুসরণকারিগণের তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাও প্রায় সেইরূপ অচল; সেই জন্যই দেশের মঙ্গলের আশা, এখনও অনেকেরই কাল্পনিক বলিয়া অনুভূত হয় নাই। যেদেশে এতদিন একটি যৌথ কারবারের কল্পনা প্রায় কল্পনামাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া আসিতেছিল, সেদেশের লোক যে অযাচিতভাবে, অসন্দিগ্ধচিত্তে জাতীয় ধনভাণ্ডারে অর্থদান করিতে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইবে, এরূপ অবস্থা পূর্ব্বে আমরা স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। আমরাও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে সামান্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম; কিন্তু সেই অর্থ আমরা পাঠাইয়াছি কিনা,তাহাও এ পর্য্যন্ত একজন লোকও আমাদের জিজ্ঞাসা করেন নাই। দেশের নেতৃগণ জাতীয় ধনভাণ্ডারের অর্থ কি কার্য্যে ব্যয় করিবেন, অনেকেই এখনও তাহার অনুসন্ধানমাত্র রাখেন না। পরস্পর এইরূপ বিশ্বাস এদেশে সম্ভবপর হইবে বলিয়া জানিতাম না। বিশ্বাসই একতার মূলমন্ত্র; সুতরাং আমরা যে, একতার পথে অগ্রসর হইতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন, আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধী। কিন্তু তাঁহারা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও অবশ্য কল্যাণকর তাহা আমরা জানি। আধুনিক শিক্ষা প্রণালী যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। আমাদের মতেও এই শিক্ষাপ্রণালী কেবল "চাকুরে তৈয়ারির কল" মাত্র। বাস্তবিক শিক্ষার এখন প্রায় কিছুই হয় না; সুতরাং আমাদেরও আন্তরিক বিশ্বাস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যত শীঘ্র স্থাপিত হইতে পারে, ততই দেশের মঙ্গল। কিন্তু, উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে যেমন বালককে বিদ্যাভ্যাস দিতে নাই, ব্যাধিপীড়িতকেও যেমন উপযুক্ত পথ্য দিয়া একটু সবল করিবার পর পুনঃ পাঠাভ্যাস দিতে হয়, সেইরূপ, আমাদের এই প্রায় সদ্যজাত নূতন জাতি, বা সদ্যরোগমুক্ত জাতিকে, জাতীয় জীবন গঠনের মূল উপাদান শিল্প-পণ্যরূপ দুগ্ধ বা সুপথ্য কিছুদিন সেবন করাইবার পর, তাহাদের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সুবিহিত হইবে। একটু সুস্থ হইলে, যখন বর্দ্ধিত প্লীহা স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায়, পাদুকা প্রহারে সহসা বিদীর্ণ হইবার ভয় থাকিবে না, তখনই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত সময় হইবে।

বিষয়ের গুরুত্ববোধ যাহাদের নাই, কিম্বা বোধ থাকিলেও অপর

উদ্দেশ্যেরই যাহারা বশবর্ত্তী, অথবা 'হাম্‌বড়াই' যাহাদের অভ্যাস, তাহারাই আত্মশক্তির অবস্থা না বুঝিয়া এককালে বিবিধ গুরুতর বিষয়ে হস্ত প্রসারণ করে, এবং স্বল্পকাল মধ্যে 'ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইয়া 'কিম্ভূত-কিমাকার' অবস্থায় উপনীত হয়। যে মূল উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি, তাহারই সাধনে এ পর্য্যন্ত কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সে উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী আয়োজনেই বা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, এবং তাহার সম্পূর্ণ আয়োজন যে কিরূপ গুরুতর ব্যাপার, এ জ্ঞান যাহাদের নাই, তাঁহারাই আবার ইতিমধ্যে দ্বিতীয় একটী গুরুতর অনুষ্ঠানে উদ্‌যোগী হইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আমরা স্বল্পবুদ্ধি এবং আমাদের বুদ্ধির অনুরূপই পরামর্শ দিতে পারি। দেশের নেতৃগণ সম্মিলিত হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক, এখনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা যদি যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন, তাহা হইলে ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না, এবং আপত্তি থাকিলেও তাহা কার্য্যকর হইবে না।

কেহ কেহ বলিবেন, তাঁহারা সম্মিলিতও হইবেন না, বিবেচনাও করিবেন না; ইহাতে বুঝা যায় যে, এই অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁহাদের মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এ সময়ে এরূপ মতভেদ যে দেশের সর্ব্বনাশকর, তাহা কি তাঁহারা বুঝিতেছেন না? এখন সম্মিলিত শক্তিই যে একমাত্র পরিত্রাণের উপায়, তাঁহাদের আবার ইহা বুঝাইতে হইবে কেন? যদি অতর্কিতভাবে কেহ কোন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সরল ভাবে অনায়াসে তাহার সংশোধন করা যাইতে পারে। আত্মস্বার্থ এ সময়ের লক্ষ্য নহে; যশোলিপ্সা স্বার্থেরই রূপান্তর মাত্র; অনুচিত বুঝিয়াও জিদ্ বজায় রাখিতে যাওয়া, অন্ততঃ এ সময়ের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। যুক্তি যাহা সঙ্গত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়, অকপট চিত্তে যিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই এই দেশহিতরূপ পবিত্র যজ্ঞের অধিকারী। মান অভিমান প্রভৃতি অকাতরে বলি প্রদান করিতে না পারিলে, এ যজ্ঞ কিছুতেই সম্পূর্ণ হইবে না। সত্যই যাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বুঝি, তাহা শিক্ষিতগণকে বুঝাইয়া দিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। ছাত্রগণ সহজে না পারিয়া, পায়ে ধরিয়াও দেশের লোককে বুঝাইয়াছে; এইরূপ অভিমানত্যাগ না হইলে, দেশের কার্য্যে অধিকারী হওয়া যায় না।

আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয়, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অতি গুরুতর ব্যাপার. এবং মূল উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া, প্রায় অসম্ভবপর। নিম্ন শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া, আর্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, আইন প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কাজ নহে। ইহার একটী অঙ্গও ত্যাগ করিলে, সে বিশ্ববিদ্যালয় ইহার প্রকৃত নামের অযোগ্য হইবে। একটি মেডিক্যাল কলেজ বা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনে ও প্রতিপালনে কত অর্থব্যয় হয়, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। আইনের কলেজ গবর্ণমেণ্ট অনুমোদিত না হইলে তাহার কিছুই মূল্য নাই। যদি বলেন, আমরা এই তিনটি ত্যাগ করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিব ও অপর ছাত্রের অভাবে, গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া, আমাদেরই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই তিন কলেজের জন্য ছাত্র লইতে হইবে; তাহার উত্তর যে, অপর ছাত্রের অভাব হইবে না। দেশের কুলাঙ্গারসংখ্যা বিলুপ্ত হইলেও, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজের জন্য ফিরিঙ্গী ছাত্রের অভাব হইবে না। এবং দেশে উকীলের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, অন্ততঃ দশবৎসর নূতন উকীলের অভাবে বিচারের কার্য্যে অসুবিধা হইবে না। সুতরাং এই তিনটি কলেজের জন্য অন্ততঃ আপাততঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্র লইবার প্রয়োজন হইবে না। তবে এইরূপ বিশ্ব বিদ্যালয়ে কতকগুলি বি, এ, এম, এ বা তদনুরূপ উপাধিধারীর সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু আধুনিক উপাধিধারিগণের দুরবস্থা দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় নাই যে, এই অকিঞ্চিৎকর উপাধির জন্যই আমাদিগকে লালায়িত হইতে হইবে? এবং এই জন্যই কি আমাদের জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এরূপ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত না হওয়াই সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

তবে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? যাহাতে বাস্তবিক শিক্ষালাভ হইতে পারে, এইরূপ প্রণালীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা দ্বিবিধ; ঐহিক ও পারত্রিক। একের উদ্দেশ্য অর্থ, যশঃ, ভোগ, ও অপরের উদ্দেশ্য পরমৈশ্বর্য্য। শেষোক্ত শিক্ষার পথ কেহই কখন রোধ করিতে পারে না; কিন্তু প্রথম পথে চালিত করিয়াই মোহ উপস্থিত করে। এই প্রথম পথ হইতে বিতাড়িত হইয়া, যদি কাহারও মোহ অপনোদিত হয়, তবে সেই ভাগ্যবান পুরুষ, ক্ষতিগ্রস্তের পরিবর্ত্তে, আপনাকে পরম লাভবান মনে করিবে। কিন্তু এই শ্রেণীর পথিক সংখ্যায়

নগণ্য; সুতরাং ঐহিক শিক্ষার্থীর জন্যই বিশেষ বন্দোবস্তের প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অর্থই এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইলেও, আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষিতগণের শতকরা প্রায় একজনও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না; সুতরাং এ শিক্ষা বাঞ্ছনীয় কিসে? এবং ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় বিশেষ ক্ষোভের কারণ কি? যদি দেশের নেতৃগণ তাহাদের অর্থোপার্জ্জনের উপযুক্ত শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্যই বাস্তবিক সমুৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, ইউনিভার্সিটি, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শ্রুতিসুখকর শব্দবিন্যাসশূন্য, প্রকৃত অর্থাগমের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। এইরূপ শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ও প্রকৃত কার্য্যকর হইবে ও ইহাতে এই স্বদেশী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইবে।

অতর্কিতভাবে উত্থাপিত প্রস্তাবও কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে যে বিশেষ অনুতপ্ত হইতে হইবে, এ যুক্তি সমীচীন নহে; বরং তাহার অনুষ্ঠানে কতকটা অগ্রসর হইয়া যে মনস্তাপ পাইতে হয় নাই, ইহাতেই আনন্দিত হওয়া উচিত। প্রস্তাব মাত্রেই কার্য্যে পরিণত হইলে, ২১ বৎসর-ব্যাপী কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিতে দেশের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইতে পারিত। যাহা আমাদের অসাধ্য, তাহার অননুষ্ঠানে ক্ষোভের বা নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সহিত যদি দেশের শিল্প বাণিজ্যাদি রক্ষার সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় দেশের উন্নতির পথ এতদিনে সুগম হইয়া আসিত।

কেহ কেহ বলিবেন, অসাধ্য কেন? সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৯ কোটি। এই লোকসমষ্টির কিম্বা ইহার অর্দ্ধেক বা তৃতীয়াংশের সম্মিলিত শক্তি পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু কে তাহাদিগকে এই মহাশক্তির সার্থকতায় অণুপ্রাণিত করিবে? উচ্চ শিক্ষিত হইতে নিরক্ষর মূর্খ পর্য্যন্ত, সম্পন্নাবস্থ হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত যে একতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব, ৩০শে আশ্বিনের কলিকাতার দৃশ্য তাহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ; কেবল কলিকাতায় কেন? বঙ্গদেশের সুদূর পল্লিগ্রামেরও অনেক স্থানে এই অপরূপ দৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণে এই মহাভাব উদ্দীপিত রাখা নিতান্ত সহজসাধ্য নহে। অসংকোচে স্বার্থত্যাগ ও অকাতর আত্মনিগ্রহই ইহার মূলমন্ত্র; কিন্তু সেরূপ স্বার্থত্যাগ বা আত্ম-

নিগ্রহের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তাহা না হইলে, যে দেশের লোক, দেশোৎপন্ন বাদে, বিদেশী সুপারীতে ৭১ লক্ষ টাকা, সিগারেটে ৩৫ লক্ষ টাকা, ও এইরূপ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে প্রতি বৎসর কয়েক কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতে পারে, তাহাদের জাতীয় ধনভাণ্ডারে আজ পর্য্যন্ত লক্ষাধিক মুদ্রা সংগৃহীত হইল না! দারিদ্র্য নিবন্ধনই যে আমাদের দেশে কোনরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার সম্ভবপর নহে, উক্ত অপব্যয় তো তাহার উপযুক্তরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না। আমাদের দেশে কার্য্যের উপযুক্ত লোকেরই যে অভাব, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। আমরা জানি, অনেক স্থানে লোকে জাতীয় ধনভাণ্ডারে অর্থ প্রদানের জন্য কতকটা ইচ্ছুক ছিলেন ও এখনও অনেকে ইচ্ছুক আছেন; কিন্তু সময় নষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কে তাহা সংগ্রহ করিবে? সুতরাং অর্থেরও অভাব নাই, লোকেরও অভাব নাই; কেবল কার্য্যক্ষম লোকেরই অভাব।

৩৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, গত বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সিগারেট বঙ্গ দেশেই আমদানী হইয়াছিল এবং যে তীব্রগতিতে ইহার আমদানী বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহাতে এবৎসর এই বঙ্গদেশেই অন্ততঃ ২৫ লক্ষ টাকার সিগারেট আমদানী হইবার সম্ভাবনা ছিল; স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইহার বাৎসরিক আমদানি যে অন্ততঃ অর্দ্ধেকও হ্রাস পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং এই পরিমাণ টাকা দেশেই থাকিয়া যাওয়া উচিত। একটিমাত্র সামান্য দফার ব্যয়-হ্রাসজনিত উদ্বৃত্ত টাকাও যে জাতীয় ধনভাণ্ডারে সংগৃহীত হইতে পারে না, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু আবার সেই মূল প্রশ্ন— সংগ্রহ করে কে? এই টাকা যে সত্যই দেশের উদ্বৃত্ত হইল, তাহাও বলিতে পারা যায় না। রেল কোম্পানি, ট্রাম কোম্পানি, পেপারমিল কোম্পানি প্রভৃতি বিবিধ কোম্পানি ইতিমধ্যে ইহার অধিকাংশই উদরসাৎ করিয়াছে।

অনেকে বলেন, বাঙ্গালার লোক বিশেষ বুদ্ধিমান; একথা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও, বাঙ্গালী যে কোন ক্রমেই বুদ্ধিজীবী নহে, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। বিদেশজাত যে সকল নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই এই বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতেরও বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ীগণ এই প্রদেশে আসিয়া বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। বঙ্গবাসী আপাতঃ-সুলভ খয়রাতি লাভেই সাধারণতঃ চরিতার্থ; অধুনা এই খয়রাতির পথ কষ্টসাধ্য হওয়াতেই, এই

বুদ্ধিমান্ জাতি উদরান্নের জন্য নূতন পথ অনুসন্ধানে সচেষ্ট। অপর প্রদেশের লোক প্রকৃত কর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া এই স্বদেশী আন্দোলনে লাভবান হইতেছেন, আর আমরা ইহারই উদ্দেশ্যের অনুকূল কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই বিবিধ অপর গুরুতর বিষয়ের বাক্ বিতণ্ডা লইয়া উন্মত্ত আছি। যদিই কোন দিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার সূত্রপাত হয়, তখন হয়ত আবার জাতীয় অর্ণবযান শ্রেণী নির্ম্মাণের জন্য নূতন এক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইব। এই সকল অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও, এককালে বহুবিধ গুরুতর অনুষ্ঠানের সংকল্প প্রশংসনীয় হইতে পারে না। প্রথমানুষ্ঠানে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবার পর তদনুরূপ একটি গুরুতর বিষয়ের অবতারণাই যুক্তি সঙ্গত।

কেহ কেহ বলিতেছেন, এখন আন্দোলনের তরঙ্গ প্রশমিত হইয়া, প্রশান্তভাবে দেশময় প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে এই অল্প দিনে যে কার্য্য সাধিত হইয়াছে, বঙ্গদেশে তাহার শতাংশের একাংশ পরিমিত, বা প্রয়োজনের সহস্রাংশের একাংশ পরিমিত কার্য্যও যে আরম্ভ হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপ একান্ত অভীপ্সিত, নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও অতীব বিচিত্র বিষয়ের কল্পনা হৃদয়ে আনন্দ তরঙ্গ উত্থাপিত করে সত্য; কিন্তু অগ্র, পশ্চাৎ ও অবস্থিতি স্থান সম্বন্ধে বিচার করিয়া এরূপ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

যুক্তপ্রদেশে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ও ইহাতে এক কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। চেষ্টা করিলে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে এক কোটি টাকা অল্প সময়েই সংগৃহীত হইতে পারে; কিন্তু এই টাকায় অনুষ্ঠান পত্রোল্লিখিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত দুরূহ। উদ্যোক্তাগণ যদি দেশের অন্ততঃ অর্দ্ধেক সংখ্যক লোকের প্রত্যেকের নিকট হইতে গড়ে এক টাকা করিয়াও সংগ্রহের সঙ্কল্প করিতে পারিতেন, তাহা হইলেই আমরা তাঁহাদের উৎসাহে আন্তরিক শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইতে পারিতাম। তবে প্রস্তাবগুলির কিয়দংশ কার্য্যে পরিণত হইলেও দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ই যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, আপাততঃ সেই জন্যই আমাদের যথোচিত সাহায্য করা উচিত। তাহা হইলে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত ছাত্রগণের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইতে হইবে না।

বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য যে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও যাহাতে বিশেষ কার্য্যকরী শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, সে জন্যও আমাদের সচেষ্ট হইতে হইবে। বিতাড়িত ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে উপযুক্ত ছাত্রকে এই সমিতি হইতে বিশেষ সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এই সকল ছাত্রের নিম্নশিক্ষা যাহাতে উপযুক্তরূপ হয়, এখন হইতে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অর্থাভাবে যদি এই সামান্যসংখ্যক ছাত্রের একজনেরও শিক্ষা স্থগিত হয়, তাহা হইলে আমাদের দ্বারা যে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের আশা নিতান্ত কাল্পনিক মাত্র, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত।

বহুধা বিভক্ত শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, সফলকাম হওয়া সুকঠিন। যাহাতে অনুষ্ঠিত কার্য্যগুলির শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবার পর, অপর বিষয়ে মনঃসংযোগ হয়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। বিদেশীয় বসন পরিধানে বাধ্য হইয়া যদি এই বঙ্গদেশের ছাত্রগণকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহার অপেক্ষা লজ্জাকর আর কি হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝি না।

রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দুর্ভিক্ষের সময় সুবন্দোবস্ত করিয়া লর্ড কর্জ্জন সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন ; কিন্তু প্লেগ সম্বন্ধে তিনি একবারে উদাসীন ছিলেন। প্লেগে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইলেও গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতীকারের কোন উপায় করেন না বলিলে হয়। প্রায় দশ বৎসর যাবৎ প্লেগে লোকসংখ্যার হ্রাস হইতেছে। কি কারণে এই রোগের উৎপত্তি এবং কি উপায়ে ইহার নিবৃত্তি হয়, তাহার অনুসন্ধানের জন্য কতকগুলি সুযোগ্য ডাক্তার নিযুক্ত করা নিতান্ত আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য দায়ী ; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অহঙ্কার করিয়া বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের রাজত্বে দেশীয়দের প্রাণ ও ধন নিরাপদে রক্ষিত আছে ; কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে যে দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি নাই। প্লেগের কারণ উদ্ভাবনের নিমিত্ত, সম্প্রতি দুই তিনটী ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন ; তাঁহাদিগকে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে হইবে। এরূপ অল্পসংখ্যক ডাক্তার যে কিছুই

করিয়া উঠিতে পারিবেনা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আরও অনেক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে এই গুরুতর বিষয়ের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করা উচিত এবং যাহাতে ইহার আশু প্রতীকার হয় তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষরূপ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয়, প্লেগ ও ম্যালেরিয়া জ্বরে ইংরাজ মরেনা বলিয়াই, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে অমনোযোগী; দেশীয় লোকের মৃত্যুতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি কি?

রেলওয়ে বিষয়ে লর্ড কর্জ্জন মনোযোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে মলমূত্র ত্যাগের ঘর করিবার জন্য হুকুম দিয়া গিয়াছেন। রেলওয়ে কার্য্যপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধান জন্য একটী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। রেলওয়ে বিস্তার হইলে দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয় বিবেচনায়, লর্ড কর্জ্জন তদ্বিষয়ে সহানুভূতি দেখাইয়া গিয়াছেন।

এদেশের শিক্ষিত লোকদিগের প্রতি লর্ড কর্জ্জনের সেরূপ সহানুভূতি ছিল না। যদিও মুখে বলিতেন যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর সমালোচনা ভাল বাসেন, কিন্তু সংবাদ পত্রে সমালোচনা দেখিলেই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন ও সমালোচকদিগকে অযথা গালি দিতেও ক্রটি করিতেন না। এমন কি, তাঁহার কাউন্সিলের দেশীয় মেম্বরগণের সহিত কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে তাঁহাদিগকে, ও দেশীয় শিক্ষিত লোককে সেই সভাতেই দুর্ব্বাক্য বলিতেন। এইরূপ ব্যবহার তাঁহার মহা দাম্ভিকতার পরিচায়ক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন্ বক্তৃতায় লর্ড কর্জ্জন এদেশীয়দিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহার অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এদেশীয়গণ সত্যনিষ্ঠ বলিয়া জগৎ বিখ্যাত; হিন্দুশাস্ত্রে সত্যকেই ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে উপদেশ দিয়াছেন। সত্যের যথার্থ সজ্ঞা তাঁহার অপেক্ষা ভারতবাসী ভালরূপ জানে। বিশেষতঃ তাঁহার উক্তি ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য দেখিয়া তাঁহার সত্যনিষ্ঠার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তবে এদেশে যে মিথ্যাবাদী নাই, এমন কথা বলা যায় না; কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাই যে এদেশীয়দিগকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও শঠ করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরাজী বিচারপ্রণালী কুচরিত্রতার মূল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

লর্ড কর্জ্জন যে এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরোধী, তাহার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর জাতীয় মহাসভার (Congress) প্রস্তাব-

গুলি সভাপতি কটন সাহেব তাঁহাকে দিবার জন্য বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসেন, কিন্তু লর্ড কর্জ্জন তাহা লইতে অস্বীকার করেন। তিনি জাতীয় মহাসমিতি-দ্বেষী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

কটন সাহেব আসামের চিফ্ কমিশনর ছিলেন। তিনি একজন সহৃদয় ও উদারচেতা শাসন কর্ত্তা ছিলেন। আসামের চা বাগানের কুলীদের উপর অত্যাচার ও তাহাদের দুরবস্থায় কটন সাহেব বিচলিত হন এবং তাহাদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। লর্ড কর্জ্জন পাকতঃ সে প্রস্তাব না-মঞ্জুর করিয়া দেন। কেবল ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই; কটন সাহেব বাঙ্গালার ছোট লাট হইবার উপযুক্ত লোক ছিলেন; কৌশলে লর্ড কর্জ্জন তাঁহাকে সেই পদে নিযুক্ত না করিয়া, বাঙ্গালার অবস্থাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ফ্রেজার সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন।

গবর্ণমেণ্ট আফিসের কোন সংবাদ প্রকাশ করা আইন বিরুদ্ধ; তবে কোন কোন বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ করা যাইতে পারিত ও পারে। লর্ড কর্জ্জন সেই আইন আরও কঠোর করিয়া দেশীয় লোকের অপ্রিয় হইয়াছেন।

পূর্ব্বে যোগ্যতার পরীক্ষায় বড় বড় সরকারী কর্ম্মে লোক নিযুক্ত হইত। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদপ্রার্থীগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী ও যোগ্যদিগকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইত। লর্ড-কর্জ্জন সে নিয়ম রদ করিলেন। এখন তোষামোদ ও অন্যান্য উপায় দ্বারা অযোগ্য ব্যক্তিগণ বড় বড় চাকরী পাইবে। কোন দরিদ্র যোগ্য লোক মুরুব্বি না থাকিলে কিম্বা তোষামোদে অপটু হইলে সরকারী চাকরী পাইবে না। যাহাতে ফিরিঙ্গীগণ অধিক পরিমাণে সরকারী চাকরী পায়, লর্ড কর্জ্জন তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

সরকারী কর্ম্মচারীগণের ছুটি ও পেন্‌সন সম্বন্ধে লর্ড কর্জ্জন কিছু সুনিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে সামান্য সামান্য দোষের জন্য কেরাণীদিগের জরিমানা হইত; লর্ড কর্জ্জন সেই কুপ্রথাটি নিবারণ করিয়াছেন। তবে সকল সাহেবকর্ত্তা তাঁহার হুকুম মানিয়া চলিবেনা। আমরা শুনিয়াছি, এখনও অনেক আফিসে জরিমানা দণ্ড জারি আছে। যাহা হউক ইহা স্থগিত করিবার হুকুম দিয়া লর্ড কর্জ্জন তাঁহার সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন।

রাজস্ব সম্বন্ধে লর্ড-কর্জ্জন দেশের কতকটা সুবিধা করিয়াছেন। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির জন্য শস্য নষ্ট হইলে ও দুর্ভিক্ষ হইলে রাজস্ব আদায় স্থগিত করিবার এবং আবশ্যক হইলে মাপ করিবার নিয়ম করা হইয়াছে। পূর্ব্বে

৫০০৲ টাকা আয়ের উপর ইন্‌কম ট্যাক্স আদায় হইত; লর্ড কর্জ্জন ১০০০৲ টাকা আয়ের উপর ইন্‌কম ট্যাক্‌স আদায়ের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। লবণের উপর শত্তকরা ২॥০ টাকা শুল্ক লাগিত, তাহা কমাইয়া ১॥০ টাকা করিয়াছেন। ডাকের চিঠির ও টেলিগ্রাফের মাশুলও কিছু কিছু কম করা হইয়াছে। এগুলিকে লর্ড কর্জ্জনের সৎকার্য্যের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। আমাদের দেশ নানাবিধ কর-ভারাক্রান্ত; সেই ভার কতক পরিমাণেও লাঘবের ব্যবস্থায় আমরা কর্জ্জনের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। ভারতবর্ষের পুরাতন সৌধ মন্দিরাদির সংস্কারের ব্যবস্থা করিয়াও তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

বাঙ্গালা বিভাগই লর্ড কর্জ্জনের শাসন কালের শেষ কীর্ত্তি। প্রায় ৫০ বৎসর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন ছিল। এতদিন পরে সিদ্ধান্ত হইল যে, একজনের দ্বারা এই বিশাল রাজ্য শাসিত হওয়া অসম্ভব। ছোট লাট ফ্রেজার সাহেবও বড়লাটের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। ফ্রেজার সাহেব একজন বৃদ্ধ সিভিলিয়ান ও বাঙ্গালায় কখন কাজ করেন নাই। তিনি দেখিলেন, তাঁহার কাজ কমিয়া যাইবে অথচ পূর্ব্বের মত মোটা বেতন ও ভাতা বাহাল থাকিবে; কাজেই তিনি বঙ্গ-বিভাগে সম্মত হইলেন। লর্ড কর্জ্জনের আর বিলম্ব সহিল না, তিনি ১৬ই অক্টোবর তারিখেই বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিলেন। পাছে তাঁহার উত্তরাধিকারী লর্ড মিণ্টো এই প্রস্তাব রদ করেন, সেই ভয়ে, বৎসর শেষ না হইতেই, বঙ্গ বিভাগ করিয়া গেলেন; ইহাতে যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব বঙ্গে আফিষাদির জন্য বড় বড় ইমারত প্রস্তুত করিতে কত ক্রোর টাকা ব্যয় হইবে। আবার, একজন লাট সাহেব ও তাঁহার সেক্রেটারিদের মোটা মোটা বেতন দিতে হইবে। সাহেবদের পেট মোটা হইবে বটে, কিন্তু গরিব প্রজাদের সর্ব্বনাশ।

বঙ্গবিভাগের প্রধান যুক্তি এই যে, বাঙ্গালার লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে এবং একা লাটসাহেব সকল কাজ দেখা শুনা ও সকল স্থানে যাতায়াত করিতে পারেন না। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ছোটলাটের কাজ যে কেন বাড়িয়াছে, ইহা বুঝা যায় না। এখন অধস্তন রাজকর্ম্মচারীদিগের কাজ যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, রেলওয়ে ও যানাদির সুবিধা হওয়ায়, পরিদর্শন সেইরূপ সহজসাধ্য হইয়াছে। লাটসাহেবকে সকল কাজ দেখিতে হয় না। বিভাগীয় সেক্রেটারি ও কেরাণীগণ অধিকাংশ হুকুম তাঁহার নামে

জারি করেন এবং লাটসাহেব অনায়াসে যদৃচ্ছা ভ্রমণ এবং আমোদ আহ্লাদ ও তামাসা দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। লাটসাহেবের দেশভ্রমণে প্রজাদের কিছু উপকার হয় বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি না। মহারাজা, রাজা ও জমিদারগণ কর্তৃক অভ্যর্থনা এবং উত্তম খানা ও নাচ তামাসা উপভোগ করিয়া "Thank you", "I am glad to see you" প্রভৃতি অর্থশূন্য ইংরাজী কথা উচ্চারণ করিয়া ও ইংরাজী কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া চলিয়া যান; ইহাই আমরা বরাবর দেখিতেছি। ইহাতে যে তিনি দেশের অবস্থা কি বুঝিবেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বঙ্গবিভাগের সমর্থনকারীগণ বলেন, ইহাতে দেশের প্রভূত ইষ্ট সাধিত হইবে। কিন্তু এই ইষ্ট কি, তাহা কেহই এ পর্য্যন্ত স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালী জাতির বিচ্ছেদ সাধনই লর্ড কর্জ্জনের অভিপ্রেত ছিল এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহার জেদ বজায় করিয়াছেন, কোন প্রতিবাদই গ্রাহ্য করেন নাই। বাঙ্গালীরা শিক্ষিত ও তাহারা রাজনৈতিক বিষয় লইয়া আন্দোলন করে; পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার শিক্ষিতগণ যাহাতে একত্রিত হইতে না পারেন, সেই জন্য এই বঙ্গবিভাগ। বঙ্গবিভাগ আমাদের নিতান্ত অনিষ্টকর হইবে। যে সকল জমিদারের উভয় বাঙ্গালায় জমিদারী আছে, তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা ও সরকারী দেশীয় কর্ম্মচারীগণের সমূহ ক্ষতি হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার মধ্যে যে সামাজিক সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও ক্রমশঃ লোপ পাইবে। ব্যবসা বাণিজ্যেরও বিশৃঙ্খলা ঘটিবে এবং সকল বিষয়ে কলিকাতার অবস্থা হীন হইবে। বলিতে কি, বঙ্গবিভাগে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইল, লর্ড কর্জ্জনেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল।

আমরা যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ ভাবে লর্ড কর্জ্জনের কার্য্যপ্রণালীর সমালোচনা করিলাম। তিনি প্রথম প্রথম যেরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের প্রাণে অনেক আশার সঞ্চার হইয়াছিল; মনে করিয়াছিলাম ইনি একজন হিতৈষী বন্ধু এবং আমাদের দেশের উন্নতিকামী। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ, কার্য্যতঃ সকলই বিপরীত ঘটিল। ইনি প্রচণ্ড দাম্ভিক ও ক্ষমতাপ্রিয় এবং আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, দেশের অবনতিপথ পরিস্কার ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে লোকের অপ্রিয় করিয়া গেলেন। আমরা স্বাভাবিক রাজভক্ত ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্বের জন্য ইচ্ছুক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজকর্ম্মচারীদের দোষে গবর্ণমেণ্টের প্রতি

দেশীয়গণের শ্রদ্ধার হ্রাস হওয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। লর্ড মিণ্টো একজন বহুদর্শী প্রাচীন লোক; ইনি লর্ড কর্জ্জনের অহিতকর নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া, অচিরে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

বিদায়ের প্রাক্কালে বোম্বাইয়ের ইংরাজ-বণিক সমিতিতে লর্ড কর্জ্জন একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাটিও দাম্ভিকতাপূর্ণ। তিনি আমাদের দেশের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া ছিলেন, তাহা দেখিলে বোধ হয়, এ দেশে আর দরিদ্রতা নাই; যেন সকলেই সুখ সচ্ছন্দে ভোগ বিলাসে আছে; দেশে রেলওয়ে বিস্তারের সঙ্গে বাণিজ্য বিস্তার হওয়ায় সকলেই ধনবান ও সুখী হইয়াছে; পোষ্ট আফিস সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে টাকার পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, কোম্পানীর কাগজের টাকাও বাড়িয়াছে; দেশের লোকে বিলাসীয় দ্রব্য ব্যবহার করে; কাজেই দেশ সমৃদ্ধিশালী! লর্ড কর্জ্জনের ইতিহাস জ্ঞানও যেমন, দেশের অবস্থা জ্ঞানও তেমনি। সকলে অবগত আছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন ভারতের প্রজাগণ বিশিষ্টরূপ সুখী ছিল। প্রাচীন ভারতে যে চুরি ডাকাতী, রোগ অন্নকষ্ট ছিল না, তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এখন দেশে চির দুর্ভিক্ষ বিরাজমান; নানারূপ রোগে লোকসংখ্যার হ্রাস হইতেছে, চুরি ডাকাতিরও নিবৃত্তি নাই; এই সব কি সমৃদ্ধি ও সুখসচ্ছন্দতার লক্ষণ? পূর্ব্বে লোকে সঞ্চিত অর্থ নিজ নিজ গৃহেই রাখিত, এখন চোর দস্যুর ভয়ে ও কিছু সুদের লোভে (দারিদ্র্যই এই লোভের কারণ) সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দেয়, কিম্বা কোম্পানীর কাগজ করে। সহরের কোন কোন দরিদ্র অভ্যাস বশতঃ একটু চার জল পান করে দেখিয়া, আমাদের রাজপুরুষদের চক্ষু টাটাইয়া উঠে। লর্ড কর্জ্জন যদি পল্লীগ্রামের লোকের দুরবস্থা দেখিতেন ও জানিতেন, তাহা হইলে, তিনি স্বীকার করুন আর না করুন, তাঁহার মত অন্যরূপ হইত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তিনি ছয় সাত বৎসর এদেশে থাকিয়াও কোন পল্লীগ্রাম কি কোন দরিদ্রের কুটির দেখেন নাই। মাটির বাসন দরিদ্রের সম্পত্তি, অর্দ্ধাশন তাহার দৈনিক উপভোগ, জীর্ণবস্ত্র পরিধান এবং খেজুর কি তালপাতার চেটাই তাহার শয্যা। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, এদেশের লোকের গড়পড়তায় মাসিক আয় ১৷৷০ টাকা, ঊর্দ্ধসংখ্যা ১৸০ টাকা; তাহাতে কি একজনের গ্রাসাচ্ছাদন চলে? লর্ড কর্জ্জন মাসে ২৫০০০৲ টাকা বেতন পাইয়াও বোধ হয় সন্তুষ্ট ছিলেন না, বোধ হয় তাহাতে তাঁহার খরচ

কুলাইত না; আর আমাদের দেড় টাকাতেই আমরা ধনী, বিলাসী ও সুখী। কি সহৃদয়তা! রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা ইংরাজ ব্যবসায়ীদের যেরূপ সুবিধা হইয়াছে আমাদের সেরূপ সুবিধা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। লর্ড কর্জ্জন বলেন, গত দশ বৎসরে এদেশে কৃষি বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে; আমরা ত তাহা দেখিতে পাই না। তিনি একটা বাণিজ্য বিভাগ স্থাপন করিয়া, একটি সাহেব কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া গেলেন; সেটি বেশ মোটা বেতন পাইবেন; তাহাতে দেশের কি উন্নতি হইল বুঝিতে পারা সুকঠিন। বিদেশীয় চিনির উপর কিছু শুল্ক বসাইয়া আমাদের দেশের কতক উপকার হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। স্থানে স্থানে কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃষি বিষয়ের উন্নতি হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়। কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে লর্ড কর্জ্জন মনোযোগ দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। এক গুণ কাজ করিয়া, নিজমুখে সেইটিকে দশগুণ বাড়াইয়া, আত্মগরিমা প্রকাশ করা পাশ্চাত্য শিক্ষার উপদেশ হইতে পারে; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এরূপ দাম্ভিক লোককে নিরয়গামী হইতে হয় বলিয়া লিখিত আছে। সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের দাম্ভিকতা ও আত্মপ্রশংসা দেখিয়া আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি।

জুতার কালি

জুতার কালিতে সাধাণতঃ কাল রং এর কোন জিনিষ—যেমন হাড়ের কয়লা (Bone charcoal), এবং অপর কতকগুলি জিনিষ থাকে যাহা ঘষিলে উজ্জ্বল হয়—যেমন চিনি ও তৈল। সাধারণ প্রক্রিয়ায় হাড়ের কয়লা তিমি তৈলে (Sperm oil) মিশাইতে হয়; ইহাতে চিনি ও গুড় একটু সিরকার (ভিনিগার-Vinegar) সহিত মিশাইয়া খুব নাড়িতে হয়। তাহার পর অল্প পরিমাণে তীব্র (Strong) গন্ধদ্রাবক (Sulphuric acid) ক্রমশঃ মিশাইয়া লইতে হয়। এই দ্রাবক সংযোগে দুইটি যৌগিক পদার্থ (Sulphate of lime ও acid phosphate of lime) উৎপন্ন হয়; এই দুইটি পদার্থ দ্রবণশীল অর্থাৎ ইহারা গলিয়া যাইতে পারে। এই উপাদান গুলিতে একরূপ আটা বা চিটের ন্যায় পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহা সমভাবে বিস্তৃত করা

যাইতে পারে। চামড়া নরম করিবার জন্য তৈল ব্যবহৃত হয়। চিট কালিতে (ডিবার কালি) তরল কালি অপেক্ষা অল্প ভিনিগার দেওয়া হয়। আজকাল বাজারে যে সকল কালি বিক্রয় হয় তাহার অধিকাংশেই কাঠের কয়লা ব্যবহৃত হওয়ায় কাজ ভাল হয় না।

বিশেষ প্রক্রিয়া। (বিলাতী)

(১) তরল কালি।

৵৹ এক ছটাক রবার (Caoutchouc) ৵৷৹ আধ সের গরম রাইসরিষার তৈলে (Rape oil) গালাও; ইহাতে ৵৩৷৹ সাড়ে তিন সের উৎকৃষ্ট হাড়ের কয়লা ও ৵২৷৹ আড়াই সের মাতগুড় মিশাও; তাহার পর ৵৹ এক ছটাক আরবী গঁদের মিহি গুঁড়া ।৹ দশ সের ভিনিগারে (২৪নং Strength) গলাইয়া উহাদের সহিত মিলাও। এই গুলি রংমাড়া কলে কিম্বা শিলে এরূপ মাড়িয়া লইতে হইবে যেন একটুও খাঁকৃরি না থাকে। পরে ইহার সহিত ৷৶৹ এগার ছটাক গন্ধদ্রাবক অল্প, অল্প করিয়া ক্রমশঃ মিশাইবে ও অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া নাড়িতে হইবে। ইহাকে ১৪ দিন রাখিয়া দাও, কিন্তু প্রতিদিনই আধঘণ্টা করিয়া নাড়িতে হইবে। তাহার পর আবার ৶৹ তিন ছটাক আরবী গঁদের মিহি গুঁড়া মিশাইতে হইবে ও আরও ১৪ দিন প্রত্যহ আধঘণ্টা করিয়া নাড়িতে হইবে। এইরূপে জুতার তরল কালি প্রস্তুত হইবে।

(২) ডিবার (Paste) কালি।

ইহাতে উপরোক্ত পরিমাণের সমস্ত উপকরণ ও প্রক্রিয়া আবশ্যক, কেবল ভিনিগারের পরিমাণ ৷৶৹ এগার ছটাক মাত্র। গন্ধ দ্রাবকও ঐরূপ করিয়া মিশাইয়া ৭ সাত দিন রাখিয়া দিতে হয়। তাহার পর ইহা ব্যবহারোপযোগী হইবে।

(৩) অপর প্রক্রিয়া (আমেরিকান)।

৵৷৹ আধসের হাড়ের কয়লা, ৵১৷৹ দেড় সের মাতগুড়, ।১৹ সাড়ে চারি ছটাক গরম তিমি তৈল, আধছটাক আরবী গঁদ ও ।৶৹ দেড় পোয়া ভিনিগার একত্রে মিশ্রিত কর এবং ৬ দিন খুব নাড়িতে থাক, তাহা হইলেই ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে।

(৪) অপর প্রক্রিয়া (জর্ম্মান)।

/১ একসের হাড়ের কয়লা, /।৹ আধসের মাতগুড়. ৵৹ দুইছটাক লবণ দ্রাবক (Hydrochloric acid), /৹ এক পোয়া তীব্র গন্ধদ্রাবক ও সামান্য পরিমাণ জল একত্রে মিশাও; ইহাতে চিট (paste) কালি হইবে।

হাড়ের কয়লা।

(Bone black, animal charcoal)

বন্ধপাত্রে (অর্থাৎ যাহার ভিতর অগ্নিশিখা ও বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে) জন্তু ও মৎস্যের (তিমি বাদে) হাড় পুড়াইলে হাড়ের কয়লা প্রস্তুত হয়। বায়ু লাগিলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় বলিয়া বন্ধ পাত্রের প্রয়োজন। সাধারণতঃ চীনালোহার (Cast iron) বন্ধ পাত্রই এজন্য ব্যবহৃত হয়। হাড়ের কয়লা সাধারণতঃ দুই প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, সরবত (Syrup) বা এইরূপ পদার্থ ও চিনি প্রভৃতির রং নষ্ট করিয়া তাহাকে শ্বেতবর্ণে পরিণত করা ও কাল রং প্রস্তুত করা। খৃষ্টীয় ১৮১২ সাল হইতে চিনি প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। ঐ সালে ডিরনিস (M. Derosnes) নামক একজন ফরাসী সাহেব সরবত ও চিনি পরিষ্কার করিবার জন্য হাড়ের কয়লা ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করায়, পরীক্ষা করিয়া ইহাতে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে পুরাতন প্রক্রিয়া অপেক্ষা শতকরা দশ ভাগ অধিক চিনি পাওয়া যায় ও দানা, গুড়, মাত প্রভৃতিও পরিষ্কার হয়।

বস্ত্র-শিল্প

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বস্ত্র-শিল্পের প্রথম প্রবন্ধে আমরা তিনটী প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলাম। তাঁতের কাপড় কলের কাপড় অপেক্ষা সস্তা কিনা, ইহা ঐ প্রবন্ধেই আলোচনা করিয়াছি; কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার দরের নানা কারণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; সুতরাং সাময়িক মূল্য সম্বন্ধেই সে সময়ে আলোচনা করা হইয়াছিল। ভারতের প্রয়োজনীয় বস্ত্র হাতের তাঁতে যোগান সম্ভব কি না,

তাহা কল কারখানার আবশ্যকতা বিষয়ক প্রবন্ধে বিশদ ভাবে পর্য্যালোচিত হইয়াছে; প্রয়োজনীয় বস্ত্রের অর্থে বস্ত্রের বর্ত্তমান ব্যবহারের পরিমাণ মাত্রই সূচিত হইয়াছিল; বস্ত্রের প্রয়োজনের নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই; দেশ বিদেশে এখন যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে, তাহার দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ উৎপন্ন হইলেও যাবতীয় লোকের বস্ত্রাভাব দূর বা ইহার অনাদর হইবে না; একজন দরিদ্র যদি বৎসরে দশ গজ কাপড় ব্যবহার করে, একজন ধনী দুই শত গজেরও অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। অন্নের ক্ষুধার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে, কিন্তু বস্ত্রের ক্ষুধার এরূপ পরিমাণ নাই; সুতরাং বস্ত্রাকাঙ্ক্ষা বোধ হয় চিরদিনই অপরিতৃপ্ত থাকিবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বস্ত্র-শিল্পের কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত; এরূপ অপরিসীম কার্য্যক্ষেত্র অপর আর কোন শিল্প বা বৃত্তিরই নাই।

দেশে দুইশত সূতা ও কাপড়ের মিল আছে; মিলাধ্যক্ষগণ ইহার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন; কয়েকটী নূতন মিল স্থাপনেরও চেষ্টা হইতেছে; নূতন ও উন্নত ধরণের তাঁতের আবিষ্কারও ব্যবহার হইতেছে; সকল জেলাতেই কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি বস্ত্র বয়নে প্রবৃত্ত বা উৎসুক হইয়াছেন; ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ একটু অসুবিধা ভোগ করিয়াই নিরুৎসাহিত হইতেছেন, কারণ সকলের অধ্যবসায় সমতুল্য হইতে পারে না; যাঁহাদের এই গুণের অভাব, তাঁহারা কস্মিন্ কালে কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না; ইহাই সাধারণ নিয়ম; সুতরাং তাঁহাদের অসাফল্যে ক্ষোভের বিষয় কিছুই নাই। বয়নকার্য্য অতি সহজসাধ্য, তথাপি শিক্ষা ও অধ্যবসায় ভিন্ন কোন কার্য্যেই সুদক্ষ হওয়া যায় না। কিন্তু তাঁতের বহুল বিস্তৃতির বিশেষ প্রয়োজন। আমরা "কল কারখানার আবশ্যকতা" প্রবন্ধে বলিয়াছি, বস্ত্র বয়নের জন্য মিলের প্রয়োজন নাই, এবং মিলের বহুল বিস্তৃতিতে দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত না হইয়া বরং অনিষ্ট সাধিত হইবে। যাঁহারা তাঁত প্রতিষ্ঠায় উৎসুক, মিল স্থাপিত হইতেছে বলিয়া তাঁহারা যেন আশ্বস্ত বা নিরুৎসাহিত না হন।

বিদেশ হইতে যে ২২৯ কোটী গজ কাপড় আমদানী হয়, তাহাতেই যে দেশের সমস্ত বস্ত্রাভাব মিটিয়া যায়, ইহা কেহই স্বীকার করিবেন না। গত বৎসর ধুতি, উড়ানি, শাড়ী, পাগ্ড়ী, গামছা, জামার কাপড়, বিছানার চাদর, লেপের খোল প্রভৃতিতে যে ৪১৫ কোটী গজ কার্পাস বস্ত্র ব্যবহৃত

হইয়াছিল (২৬ পৃষ্ঠা দেখুন), তাহাতে দেশের ২২ কোটী লোকের প্রত্যেকে (শিশুর সংখ্যা বাদে) গড়ে ১৯ গজ মাত্র বস্ত্র ব্যবহার করিতে পাইয়াছিল। শিশুদিগেরও শয্যা প্রভৃতির জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন ; অবস্থাপন্নগণও অধিক পরিমাণে বস্ত্র ব্যবহার করে ; সুতরাং দেশের দরিদ্রগণ গড়ে দশ গজের অধিক বস্ত্র ব্যবহার করিতে পায়নাই। বৎসরে দশ গজ মাত্র বস্ত্রে একজনের সকল রূপ বস্ত্র-প্রয়োজন যে নিতান্ত অপরিতৃপ্ত থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। দরিদ্র শ্রেণীর অনেকেই এখনও বস্ত্রের জন্য বিশেষ লালায়িত। আমাদের দেশে দরিদ্রের সংখ্যাই অধিক সুতরাং আমাদের বস্ত্রাভাবও প্রচুর।

মাননীয় গোখেল মহোদয় অভিজ্ঞ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া জানিয়াছেন, বিদেশীয় আমদানী ২২৯ কোটী গজ বস্ত্র এদেশে মিল স্থাপন করিয়া উৎপন্ন করিতে হইলে এখনও ত্রিশ কোটি টাকা মূল্যের মিল স্থাপনের প্রয়োজন। মিলের বিস্তৃতির জন্য বিগত দশ বৎসরে এদেশে তিন কোটি টাকা মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে। এই পরিমাণে মিলের বিস্তৃতি হইলে মিল সহায়ে এই ২২৯ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন করিতে এখনও একশত বৎসর, কিম্বা চতুর্গুণ উৎসাহে মিলের বিস্তারেও ইহাতে এখনও ২৫ বৎসর লাগিবে। মিলের এইরূপ বিস্তার হইলেও দেশের বস্ত্রাভাব মিটিয়া যাইবে না। সুতরাং দেশে এখনও ২০।৩০ লক্ষ নূতন তাঁতের প্রতিষ্ঠাতেও স্বদেশজাত বস্ত্রে দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজনীয় অভাব বিদূরিত হইবে না।

অনেকে বাজারে দেশীয় বস্ত্রের বহুল আমদানীর অভাবে ইতিমধ্যেই প্রমাদ গণিতেছেন, এবং এই স্বদেশী আন্দোলন বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইল ভাবিয়া বাস্তবিক দুঃখিত হইতেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের অবস্থা এখনও উপস্থিত হয় নাই। বিদেশীয় আমদানীর পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য যে ত্রিশ কোটি টাকা মূল্যের মিল স্থাপন আবশ্যক, তাহার শতাংশের বা সহস্রাংশের একাংশ পরিমিত অর্থ এখনও মিল বা তাঁতের উন্নতির জন্য প্রযুক্ত হয় নাই ; সুতরাং দেশীয় বস্ত্রের অভাব হওয়া বিচিত্র নহে। ব্যবহারাধিক্য হওয়ায়, এখন দেশীয় বস্ত্র প্রায় প্রস্তুতমাত্রেই বিক্রীত হইয়া যাইতেছে। দেশীয় যে সকল তন্তুবায় এতদিন সূক্ষ্মবস্ত্র মাত্র প্রস্তুত করিয়া আসিতেছিল, তাহাদের অনেকে এখনও সেইরূপ বস্ত্রই প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত আছে ; তাহারা সকলেই যে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন পরিত্যাগ করিবে, ইহাও অবশ্য বাঞ্ছনীয় নহে। যাহারা তাঁতের কার্য্যে নূতন নিযুক্ত বা এই কার্য্যে বহুদিন পরে পুনঃ

প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা এখনও সুদক্ষ হইয়া উঠে নাই। সুতার মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে, নিত্য-ব্যবহার্য্য দেশী কাপড় প্রয়োজনানুরূপ প্রস্তত হইতে এখনও কালবিলম্ব হইবে।

ভারতের হস্তচালিত বয়ন শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা অতি বিষম,সমস্যাপূর্ণ। এই শিল্পের ঠিক এইরূপ অবস্থা পূর্ব্বে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। এই অবস্থা অতিক্রান্ত না হইলে ইহার জীবন বা মরণের সুচনা করা নিতান্ত সহজ-সাধ্য নহে। স্বদেশী আন্দোলনে ভারতের বস্ত্র-শিল্প পুনর্জীবন লাভ করিবে ভাবিয়া অনেকে আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছেন; কিন্তু আন্দোলন-কারিগণের কার্য্যকারিত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দিহান, তাঁহারা এই আন্দোলনেই বস্ত্র-শিল্পের বিনাশ আশঙ্কা করিয়া নিতান্ত ভয়াকুল হইয়াছেন। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের অনেকে ভাবিতেছেন, এইবার সত্য সত্যই আকাশে পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হইবে; কর্ষণের আবশ্যক নাই, সেচনেরও আবশ্যক নাই; বিনা পরিশ্রমে, বিনা অর্থ ব্যয়ে, নয়ন সমক্ষে রাশি রাশি পুষ্পগুচ্ছ সজ্জিত থাকিয়া, দর্শনের প্রীতি সম্পাদন করিবে ও সমীরণ বিনাহ্বানেই সেই পুষ্প সম্ভার হইতে সুরভি অপহরণ করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় সন্নিধানে উপনীত করিবে; কি বিচিত্র কল্পনা! শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ ভাবিতেছেন, একশত বৎসর-ব্যাপী অন্যায় সমরেও ম্যান্‌চেষ্টর যাহাতে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলেও সম্পূর্ণ সক্ষম হয় নাই, ভারতবর্ষে মিল স্থাপিত হওয়ায়, যাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্রগতিতে সাধিত হইতেছিল, বর্ত্তমান আন্দোলনে বহু প্রাচীন বস্ত্র-শিল্পের সেই নিদারুণ সর্ব্বনাশ অতি তীব্র গতিতে সম্পন্ন হইবে; বর্ব্বর-প্রধান দেশে যাহা স্বাভাবিক তাহারই অনুষ্ঠান হইতেছে।

উপরোক্ত উভয় শ্রেণীই ভারতের হস্তচালিত বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকামী। এক্ষণে প্রকৃত অবস্থার সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে, শেষোক্ত সম্প্রদায়ের আতঙ্ক নিতান্ত অকারণ নহে; কারণ,আমাদের দেশে বাক্যবাগীশের সংখ্যাই অধিক। উন্নতিকামী হইলেও, অনেকেই প্রথমোক্তরূপ কল্পনা-রাজ্যের অধিবাসী; কর্ম্মক্ষেত্রে লোক-সংখ্যা অতি বিরল। "বাজারে কাপড় পাওয়া যায় না," "নেতৃগণ কিছুই উপায় করিতেছেন না," "আমরা দরিদ্র সুতরাং অধিক মূল্যে দেশী কাপড় ক্রয় করিতে পারি না" ইত্যাকার কাতরোক্তি পরায়ণ ব্যক্তির সংখ্যাই এদেশে প্রচুর। যাহারা কেবল পরমুখা-পেক্ষী, তাহাদের দুর্দ্দশা চিরদিনই সমভাবেই থাকিবে, অথবা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি

প্রাপ্তই হইবে।' যদি কাপড় না পাওয়াই যায়, তাহা হইলে নিজে চেষ্টা করিয়া প্রস্তুত করাইবার ব্যবস্থা করা ইহাদের সকলের পক্ষেই যেন কি একটা বহু ব্যয় বা বহু কষ্ট-সাধ্য কিম্বা যেন নিতান্ত অসাধ্য ব্যাপার, অথবা যেন একান্ত গর্হিত কার্য্য। ম্যাঞ্চেষ্টর স্বেচ্ছায় যদি কাপড় রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেয়, কিম্বা কোন দৈব বা রাজনৈতিক কারণেই যদি বিদেশী আমদানী বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলেই এই শ্রেণীর কতকাংশ লোকের কিয়ৎ পরিমাণে চৈতন্যোদয় হইতে পারে। আমার শক্তি বা সময়ের অভাব নাই, কিন্তু পাচকঠাকুর অনুপস্থিত, সুতরাং আহার বন্ধ রহিল, কিম্বা ২।৪ দিন দোকানের মিষ্টান্নেই উদরপূর্ত্তি করিতে হইল,—এরূপ অপদার্থ লোকেরও এদেশে অসদ্ভাব নাই; বিশেষতঃ,' শিক্ষিত, সভ্য বা দেশের ভদ্রনামধেয়গণের অধিকাংশই এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইহাদের স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি নাম-মাত্র; কোন গতিকে একটু অসুবিধা দেখিয়া, কিম্বা লোকের নিকট এই অসুবিধা প্রদর্শন করাইয়া, নিজে 'খাঁটি সোণা' বা সম্পূর্ণ স্বদেশহিতৈষণা প্রবৃত্তি সম্পন্ন, ইহাই প্রতিপাদন করা ইহাদের উদ্দেশ্য। বস্ত্র উৎপাদনের কোন চেষ্টাই করিব না, অথচ বিলাতী বস্ত্র দগ্ধ করিয়া বাহাদুরী দেখাইব; মাড়োয়ারিগণ কবে বিলাতী বস্ত্রের অর্ডার দেয়, সেই সংবাদটির অনুসন্ধানে সোৎসুক থাকিয়া, তাহা সর্ব্বাগ্রে দেশময় প্রচার করিয়া, তৎসহ ক্রোধ, ক্ষোভ বা আক্ষেপ প্রকাশ করিবার অবসর প্রতীক্ষা করাই ইহাদের আন্তরিক লক্ষ্য। এই 'গুম্ফ খর্জ্জুর' দলভুক্তের সংখ্যাই এ দেশে বিস্তর। যত দিন দেশের এই অকর্ম্মণ্য দলের একটু আন্তরিক উন্নতি সাধিত না হয়, যতদিন ইহাদের হৃদয় একটু শক্তি-সম্পন্ন না হয়, ততদিন দেশের কোন শুভানুষ্ঠানই সম্ভবপর নহে। স্বাবলম্বন শিক্ষারই এখন এ দেশে প্রধান অভাব। স্বীয় পরিধেয়-মাত্রও প্রস্তুত করাইবার যাঁহারা কোন ব্যবস্থা করেন নাই, চিরদিন তাঁহাদের পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্রের অধিকারী দরিদ্রগণের লজ্জা নিবারণের উপায় স্থির করিতে পারেন নাই, নূতন বা পুরাতন বিলাতী বস্ত্র দগ্ধ করিয়া তাঁহারা বিদেশী-বর্জ্জন প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদানেও সমাজের বিন্দুমাত্র প্রকৃত হিত সাধনে সমর্থ হয়েন নাই। এতদিন তন্তুবায়-কুলের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান থাকিয়া, এখন সেই হতাবশিষ্ট গণের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যথেষ্ট নহে। বর্ত্তমান সংখ্যক দেশীয় মিলে আমাদের প্রয়োজনের ষষ্ঠাংশ পরিমাণ বস্ত্রও উৎপন্ন হয় না; সুতরাং দেশী মিলের

কাপড় বিক্রয় বা ব্যবহারেও বিশেষ কোন ফললাভ নাই। যন্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থাই এ সময়ের উপযুক্ত প্রকৃত অনুষ্ঠান।

বয়নকার্য্য শিক্ষা করায় ভারতবর্ষে যেরূপ সুবিধা এমন আর কোন দেশেই নাই। এখনও এদেশের সুনিপুণ তন্তুবায় সংখ্যা ২৭ লক্ষ ও অল্পশিক্ষিতগণের সংখ্যা ২৮ লক্ষ। এই বহুসংখ্যক শিল্পীসত্বেও যদি এদেশের লোক এই শিল্প শিক্ষায় অসুবিধা বোধ করে, তাহা হইলে তাহারা যে শিল্পমাত্র শিক্ষায় অক্ষম, ইহাতে আর সন্দেহ নাই এবং জন কয়েক মাত্র ছাত্রকে জাপান ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে শিল্পবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া আনাইয়া দেশের কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। তবে "গেঁয়ো যুগী ভিখ্ পায় না" ও আমরাও অনুকরণ বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত; সুতরাং দেশের "তাঁতি" ১০৲ টাকা মাহিনারও উপযুক্ত নহে এবং সাহেবের দেশে শিক্ষিত শিল্পী "প্রফেসার" পাঁচ শত মুদ্রা বেতনের কমে রাখা যায় না। সাবান প্রস্তুত বিদ্যা শিক্ষার জন্য লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপনে প্রস্তুত, কিন্তু বয়ন শিক্ষার জন্য সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়ে কুণ্ঠিত; আমাদের এই বিপরীত বুদ্ধিই সর্ব্বনাশের মূল কারণ। সম্প্রতি কয়েকটী বয়ন বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এগুলির সংখ্যা ও আয়তন নগণ্য।

যাহারা সত্যই কার্য্যক্ষম, তাহারাই এই স্বদেশী আন্দোলনের সুফল উপভোগ করিতে অগ্রসর হইতেছে, এবং যেখানে এই আন্দোলনের উৎপত্তি সে দেশের লোক এখনও জল্পনা, কল্পনা, নৈরাশ্য, বিভীষিকা ও আতঙ্ক লইয়াই ব্যস্ত আছে। বোম্বাই আহম্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানের মিলাধ্যক্ষগণ ইতিমধ্যে উচ্চদরে বস্ত্র বিক্রয় করিয়া লাভবান হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মিলের বিস্তৃতির জন্য ১২ হাজার কলের তাঁতের অর্ডার পাঠাইয়াছেন। আমরা বস্ত্র শিল্পের জন্য কল কারখানার পক্ষপাতী নহি; কিন্তু বঙ্গদেশে এপর্য্যন্ত হাতের তাঁতের জন্যই কত লক্ষ বা কত সহস্র টাকাই বা ব্যয়িত হইয়াছে? সূতার দর বিস্তর চড়িতেছে; সূতা উৎপন্ন করিবার জন্যও দেশে কোন বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে না। সূতার মূল্য বৃদ্ধিতে হাতের তাঁত যে উৎসন্ন যাইবে, তাহা বোধ হয় কেহই চিন্তা করিতেছেন না। স্বার্থ সাধনে সকলেই সচেষ্ট; মিলের কাপড় বিক্রয় করিয়া বোম্বাই প্রভৃতি দেশের লোক বিশেষ লাভ পাইতেছে; সুতরাং লাভের এই বিশেষ সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা আমাদের জন্য সুবিধা দরে সূতা বিক্রয় করিবে কেন?

মাননীয় গোখেল মহোদয় কংগ্রেস সভায় বলিয়াছিলেন—সমগ্র ভারতবর্ষ বঙ্গদেশের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে মিলের সূতার দর এত বৃদ্ধি করা হইল কেন? এইরূপে সাহায্য করিলে আমাদের সে সাহায্য যে নিতান্ত অনাবশ্যক ছিল। বঙ্গদেশ বস্ত্র ও সূতা উভয়ের জন্যই তাঁহাদের মুখাপেক্ষী। যদি সত্যই তাঁহারা আমাদের সাহায্যে অগ্রসর, তবে তাঁহারা যে আপনাদের কলের তাঁতের জন্য অর্ডার পাঠাইলেন, তাহার সহিত বহুল পরিমাণে কলের চরকার অর্ডারও দিলেন না কেন? তাহা হইলে বুঝিতে পারিতাম, আমাদের সূতার বিশেষ অভাব হইবে না। দেশের নেতৃগণ এখনও এই মিলাধ্যক্ষগণকে এবিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিলে ও যাহাতে তাঁহারা সূতার দর অকারণ বা ইচ্ছামত বৃদ্ধি করিতে না পারেন তাহার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। যদি এই দুইটী অনুরোধ রক্ষা হয়; তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ভারতের অপর প্রদেশ বঙ্গদেশের সাহায্যের জন্য সত্যই সচেষ্ট; নচেৎ অত্যধিক মূল্যে সূতা বিক্রয় করিয়া আমাদের বস্ত্রশিল্পের বিনাশেই সমুৎসুক ও আপনাদের বস্ত্র বিক্রয়েরই পথ প্রশস্ত করিয়া স্বার্থ সাধনেই যত্নবান বলিয়া স্থির বুঝিতে হইবে।

হাতের তাঁত কলের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম কিনা এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই প্রশ্নের মীমাংসা বাস্তবিকই অতি দুরূহ। মহামতি হ্যাভেল, চর্চ্চিল ও চ্যাটার্টন সাহেব হাতের তাঁতই ভারতের প্রধান উপযোগী, ইহা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বণিক সমিতির সভাপতি মহানুভব জন্‌সন্ সাহেব কাশির শিল্প সমিতিতে তাঁহাদের ধারণার ভ্রম প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই যে ভারতের নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাহা তাঁহাদের বিশেষ পরিশ্রমজনিত গবেষণাময় তথ্য সকল হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাঁহারা বিদেশীয়, সেইজন্য তাঁহাদের আবিষ্কৃত তথ্য সকল নিতান্ত অসম্পূর্ণই রহিয়াছে। প্রকৃত কথা এপর্য্যন্ত কেহই বুঝিতে পারেন নাই, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

সূতা-পাকান ও বস্ত্র-বয়ন, বস্ত্র শিল্পের এই দুইটি প্রধান বিভাগ। প্রথমাংশ এখন এদেশে লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেমন লৌহখনির কার্য্য লোপ পাওয়ায় এদেশের লৌহশিল্পও ঐকরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে, দেশীয় সূতার অভাবে বয়ন শিল্পেরও সেইরূপ অধোগতি হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার

হইতে সূতার আমদানী হওয়ায় সূতা পাকান প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছিল; দেশীয় মিলের সূতাই এদেশের হাতের সূতা কাটা প্রথা প্রায় বন্ধ করিয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় হাতের তাঁত সূতার জন্য প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই কলের মুখাপেক্ষী। দেশীয় চরকায় যে সূতা উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশই অত্যন্ত মোটা। চরকা ও টাকুর উৎপন্ন মিহি সূতার পরিমাণ অতি যৎসামান্য। এখন কলের সূতাই বহুল পরিমাণে হাতের তাঁতে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, অন্নদাতার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা যদি সম্ভব হয়, তবেই হাতের তাঁত কলের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইবে। আবার, অন্নদাতারও প্রভু যদি অন্নাপেক্ষীর প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার সঙ্কল্প করেন, তাহা হইলেও তাহার নৈরাশ্যের কারণ থাকে না। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে পালামেণ্ট তাঁহাকে নাস্তানাবুদ করিয়াছিলেন; উপরিতন কর্ম্মচারী ও পার্লামেণ্টের অনুগ্রহেই এখনও অনেক অত্যাচার-পরায়ণ, অর্থ-লুব্ধ, নীচাশয় রাজকর্ম্মচারী ভারতবাসিগণকে নিগৃহীত করিতে সম্যক্ সমর্থ হয় না।

দেশবাসিগণ মিল ও তাঁত উভয়েরই প্রভু; দেশের বস্ত্রশিল্প রক্ষায় যদি দেশীয়গণের আন্তরিক আস্থা থাকে, এই শিল্পসহায়ে দেশের অনেক-সংখ্যক লোকের একমুষ্টি অন্নেরও সংস্থান হইতে পারে, ইহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, অপর কোন শিল্পই দেশের সাধারণ লোকের এরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে এবং এই শিল্প দরিদ্রগণের অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য সুতরাং অন্ন সংস্থানের বিশেষ উপযোগী, ইহা যদি আমাদের শিক্ষিতগণের বাস্তবিক হৃদয়ঙ্গম হয় এবং এই ধারণার বশে যদি তাঁহারা প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হয়েন, তবেই হাতের তাঁত কলের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইতে পারে, নচেৎ ইহার বিনাশ কাল অতি সন্নিকটবর্ত্তী। এক কথায়, দেশের লোক ইহার রক্ষায় আন্তরিক চেষ্টা-সম্পন্ন না হইলে, এ শিল্পের আর রক্ষা নাই। সূতা উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টা কিম্বা সূতার মূল্যের অযথা বৃদ্ধি নিবারিত না হইলে, হাতের তাঁতে বস্ত্রবয়ন প্রথা লোপ পাইতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না।

মিল হইতে সূতা উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই বস্ত্রও প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশেও পূর্ব্বে হাতের চরকায় উৎপন্ন সূতায় বস্ত্র প্রস্তুত হইত। পুনর্ব্বার যদি আমরা পূর্ব্বের ন্যায় চরকায় সূতা প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলেই মিল ও

হাতের তাঁতে প্রতিযোগিতার সমরূপ কার্য্যক্ষেত্র হইতে পারে, নচেৎ তোমার নিকট ভিক্ষালব্ধ সূতা লইয়া তোমারই সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইব, তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যে যাহার মুখাপেক্ষী, সে চির-দিনই তাহার অধীন হইয়া থাকিবে।

মনে করুন,—

১ পাউণ্ড তুলার দর	।/০ আনা
সূতা কাটিতে মিলের খরচ	।/০ „
সূতা বিক্রয়ে লাভের সঙ্কল্প শতকরা ৫০৲ হিঃ	।/০ „
সূতার দর হইল	৸৶০ „
বস্ত্র বয়নে মিলের খরচ	⁄১০ „
বয়নের খরচার উপর লাভ শতকরা ৮৲ হিঃ	৲২॥ পয়সা
মিলের কাপড়ের দর হইল	টাকা ১ ৲১২॥ পয়সা

অথবা—

১ পাউণ্ড তুলার দর	।/০ আনা
সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে মিলের খরচা	।৶১০ „
লাভ শতকরা ৪৪॥০ হিঃ	।/২॥ পয়সা
মিলের কাপড়ের দর	টাকা ১ ৲১২॥ পয়সা

এই কাল্পনিক হিসাবে দেখা গেল যে, যদিও বয়ন কার্য্যের জন্য মিলের শতকরা ৮৲ টাকা মাত্র আয় হইল, তথাপি উৎপন্ন কাপড়ে মিলে মোট শতকরা ৪৪॥০ টাকা লাভ হইতেছে; কিন্তু উপরোক্ত দরে পাইকারগণ সূতা খরিদ করিয়া, তাহার উপর যদি শতকরা ৮৲ টাকা লাভে তাঁতিকে বিক্রয় করে, তাহা হইলে, বয়নের মজুরী কলের সহিত সমান হইলেও, তাঁতির আর বস্ত্র বিক্রয়ে লাভের কি প্রত্যাশা থাকিতে পারে? ইহার উপর, পাইকারগণ মিলের কাপড় অল্প পরিশ্রমে ও অল্পব্যয়ে বহুল পরিমাণ একত্রে পাইয়া থাকে; তাঁতের কাপড় সংগ্রহ করিবার তাহাদের সেরূপ সুবিধা নাই;

সুতরাং মিলের কাপড়ের খরিদ মূল্যের উপর তাহারা যেরূপ অল্পলাভ লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে. তাঁতের কাপড়ের সংগ্রহ খরচা অধিক হওয়ায় খরিদ মূল্যের উপর সেরূপ অল্পলাভে বিক্রয় করা সম্ভব হয় না। কেহ কেহ বলিবেন মিলাধ্যক্ষ সূতা বিক্রয়ে লাভের সঙ্কল্প ৫০৲ টাকার স্থলে ৫৲ টাকা করিলেও, উপরোক্ত অসুবিধার কোন প্রতিকার হইতে পারে না। তাহার উত্তর এই যে, সূতায় অধিক লাভের সম্ভাবনা থাকিলে, বয়নে যৎসামান্য যাহা লাভ হয়, তাহা "পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা" অর্থাৎ সে লাভের প্রতি বিশেষ আস্থা না থাকিতে পারে। নিজের মিলেই সূতা উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সহিত কতকগুলি তাঁত যোগ করিয়া দিলে, যা কিছু লাভ হয় তাহা মন্দ কি, এরূপ ভাবিয়াও মিলে বস্ত্রবয়ন কার্য্য চলিতে পারে। মিলে যে দরে সূতা উৎপন্ন হয়, তাহার উপর সামান্য লাভ লইয়া বিক্রয় করিতে হইলে, বয়ন কার্য্যও লাভজনক হওয়া উচিত বোধ হইবে। ক্ষেত্রোৎপন্ন শাক ঝোড়া দরে বিক্রয় করিলে যে মূল্য পাওয়া যায়, আধ পয়সা খরচ করিয়া আঁটি বাঁধিয়া দিলে, তাহার অপেক্ষা যদি এক পয়সা অধিক দরে বিক্রীত হইতে পারে, বুদ্ধিমান্ চাষী তাহা আঁটি বাঁধিয়াই বিক্রয় করে। এক্ষেত্রেও প্রায় সেইরূপ ব্যবস্থা। কিন্তু উৎপন্ন শাকের লাভ ও আঁটি বাঁধিবার মজুরীর উপর লাভ যদি দুইটীই একরূপ হয়, তাহা হইলে চাষী আঁটি বাঁধিয়া না দিলেও পাইকার তাহা আঁটি বাঁধিয়া বিক্রয় করিয়া চাষীর ন্যায় লাভবান হইতে পারে।

সূতা প্রস্তুত ও বয়ন কার্য্যের জন্য খরচের বিভিন্ন দফায় যদি সমতুল্য লাভ লইবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলেই মিলের সহিত তাঁতের প্রকৃত প্রতি-যোগিতা কতক পরিমাণে সম্ভব হইতে পারে নচেৎ এরূপ প্রতিযোগিতা অসম্ভব ; এবং যদি মিলের এইরূপ দরের সূতা তাঁতিরা পাইবার ব্যবস্থা ও তাহাদের প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়েরও মিলের ন্যায় সুবিধা হয়, তবেই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র উভয়ের তুল্যরূপ হইল ; এরূপ ক্ষেত্রে যে কোন ধরণের তাঁত কস্মিন্ কালেও মিলের নিকট পরাজিত হইবে না।

হাতের তাঁতে কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা, ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া, জন্‌সন্ সাহেব দেখাইয়াছেন, হাতের তাঁতে এক পাউণ্ড সূতা বুনিতে ২১ পাই মজুরী পড়ে, ও কলের তাঁতে বিলাতে ১৪ পাই ও দেশী মিলে ১৭ পাই মজুরী পড়ে। তিনি বলেন, উন্নত ধরণের হাতের তাঁতে সপ্তাহে উর্দ্ধসংখ্যা ৬০ পাউণ্ড অর্থাৎ দৈনিক প্রায় ৮ পাউণ্ড

সূতা বয়ন করা যায়। যদি জন্‌সন্‌ সাহেবের উক্তি সত্য হয়, তাহা হইলে হাতের তাঁতে দেশের যে সমূহ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। পাউণ্ড প্রতি ২১ পাই হিঃ দৈনিক ৮ পাউণ্ড সূতা বয়নে তাঁতির ৸৵০ আনা মজুরী পড়ে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ধরণের তাঁতে দৈনিক ৬ পাউণ্ড হিসাবে ও পাঁউণ্ড প্রতি ১২ পাই মজুরী ধরিলেও একজনের দৈনিক ।৶০ আনা আয় হইতে পারে। অবলম্বন-বিহীন বা যাহাদের দৈনিক ৴০ আনা রোজগারেরও কোন পথ নাই, তাহারা এই ।৶০ আনার অর্দ্ধেক মজুরী পাইলেও যে চরিতার্থ হইতে পারে, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন নাই; এবং মজুরী অল্প পোষায় বলিয়া, হাতের তাঁত কলের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম ইহাই স্থির করিয়াছেন। যে সকল কৃষক বৎসরের ছয় মাস মাত্র চাষের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, বাৎসরিক অর্দ্ধাশনেরও উপায় করিতে পারে না, তাহাদের অবশিষ্ট ছয় মাসের জন্য যদি দৈনিক ৴০ আনা মজুরীরও ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কি দেশের সমূহ উপকার সাধিত হয় না? দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে তাহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিবার জন্য, ইহাই কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা নহে? দেশের লোক মজুরীর সন্ধান পাইলে তখন আর নিশ্চেষ্ট থাকে না। কোন স্থানে রেলের বাঁধ, খাল কিম্বা পুষ্করিণীর জন্য মাটী কাটার আবশ্যক হইলে, দলে দলে কৃষকগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়; এই মজুরিতে অনেক স্থানেই দুই তিন আনার অধিক পোষায় না; সুতরাং অবলম্বন বিহীন লোকের আমাদের অভাব নাই। এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য সূতার বিশেষ ব্যবস্থা করা; যতদূর সম্ভব চরকার প্রবর্ত্তন অর্থাৎ যাহারা কার্য্যের অভাবে আলস্যে দিনপাত করে তাহাদের নিকট চরকা ও তুলা উপস্থিত করা। চরকায় সূতা কাটান সম্ভব নহে বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কা করেন, তাঁহাদের আশঙ্কাও ভ্রমাত্মক। দিন দুই চারি পয়সা রোজগারেরও সম্ভাবনা থাকিলে লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তবে যদি বলেন—সূতা কাটার প্রথা উঠিয়া গেল কেন? ইহার উত্তর যে, অনেক স্থলে সূতার অভাব বা তুলা সংগ্রহের অর্থাভাব অথবা সূতার খরিদদারের অভাব। যাহারা ঋণজালে জড়িত, তাহারা মজুরিলব্ধ অর্থে নূতন ঋণের সুদ মাত্র যোগাইতে স্বীকৃত বা যত্নবান হইতে পারে না। দেশে যে মাদুর ও মছলন্দী বিক্রীত হয় তাহাতে একজনের দৈনিক পারিশ্রমিক দুই আনা মাত্রই যথেষ্ট, বা দুই আনা মজুরী পোষাইলেই তাহারা প্রচুর মনে করে; সেই জন্যই

দেশে মাদুর ও মছলন্দী পাওয়া যাইতেছে। বিবিধ ক্ষুদ্র শিল্পেরই বর্ত্তমান অবস্থা এখন প্রায় এইরূপ।

বরোদা রাজ্যের কৃষি ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত রাওজী পেটেল কাশীর শিল্প সমিতিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁতের উন্নতিই এক্ষণে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁতের উন্নতি অবশ্য বিহিত; কিন্তু কেবল ইহার উন্নতিই এ শিল্প পুনর্জীবিত করিতে কিম্বা দেশের মঙ্গল সাধন করিতে যথেষ্ট হইবে না। তাঁতের বহুল বিস্তৃতি ও তাঁতিদিগকে উচিত মূল্যে সূতা সরবরাহের ব্যবস্থা করা এক্ষণে আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য।

চরকায় সূতা কাটিবার ব্যবস্থা নিতান্ত অসাধ্য বোধ হইলে, "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধন্তজতি পণ্ডিতঃ" এই যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া, দেশে সূতার কল স্থাপন ও "বঙ্গদেশের সাহায্যের জন্য সমুৎসুক" অপর প্রদেশের মিলাধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করিয়া উচিত মূল্যে সূতা আনাইবার ও যোগাইবার ব্যবস্থা করিলেই তাঁতের পুনর্জীবন সম্ভবপর হইবে। সূতার দর অযথা রূপ অধিক হইলে, তাঁতের বস্ত্র কিছুতেই কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে না। সূতার মূল্য এক্ষণে অধিক হওয়ায় তন্তুবায়গণ প্রমাদ গণিতেছে এবং স্বদেশী আন্দোলনেই তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল বলিয়া কপালে করাঘাত করিতেছে।

বঙ্গদেশের খনিজ দ্রব্য।

বাঙ্গালা প্রদেশে বহুবিধ খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, যেমন লৌহ, তাম্র, অভ্র, পাথুরিয়া কয়লা। ছোটনাগপুরের রাচি জেলায় সোনাপেট পাহাড়ে স্বর্ণ পাওয়া যায়। সেই স্বর্ণ আহরণ করিবার জন্য একটী কোম্পানি অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। হাজারিবাগ জেলায় লৌহ, তাম্র, অভ্র ও পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়। এবং বর্দ্ধমান জেলায়ও লৌহ এবং পাথুরিয়া কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

অভ্র প্রস্তরের সহিত স্তরে স্তরে থাকে। বারুদ ও ডিনামাইট দ্বারা পাথরকে ভঙ্গ করিয়া অভ্র বাহির করা হয়। উত্তম অভ্র দুই শত টাকা

পর্য্যন্ত দরে বিক্রীত হয় ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। অভ্র কাচের ন্যায় স্বচ্ছ অথচ ভঙ্গপ্রবণ নহে; সেই জন্য অনেক প্রকার ব্যবহারে লাগে। লৌহও প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলায় বরাকর গ্রামের নিকটে কেন্দুয়া নামক স্থানে লৌহ প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা আছে। বেঙ্গল আইরণ ও ষ্টীল কোম্পানি (Bengal Iron & Steel Co). নামে একটি ইংরাজ ঐ কারখানাটি খুলিয়াছেন। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে লৌহ মিশ্রিত প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করিয়া কেন্দুয়া কারখানায় গলাইয়া লৌহ প্রস্তুত করেন। বর্দ্ধমান জেলায় রাণীগঞ্জ মহকুমায় এবং হাজারিবাগ ও পালামো জেলায় পাথুরিয়া কয়লার অনেক গুলি খনি আছে। পূর্ব্বে এ দেশীয়েরা ঐ সকল খনি হইতে পাথুরিয়া কয়লা বাহির করিয়া বিদেশীয়দিগকে বিক্রয় করিত। এখন অনেক ইংরাজ কোম্পানি পাথুরিয়া কয়লার খনি লইয়াছে; তাহাদের মধ্যে বেঙ্গল কোল কোম্পানি (Bengal Coal Co.) সর্ব্বপ্রধান। এই কোম্পানির অনেক জমীদারী আছে, এবং জমিদারীর অনেক গ্রামে কয়লার খনি আছে। বরাকর, কালিপাহাড়ী, সীতারামপুর, সিয়ারসোল, প্রভৃতি রাণীগঞ্জের গ্রাম সকলে কয়লার খনি। দেড়শত কি দুইশত ফুট খনন করিলে কয়লার স্তর পাওয়া যায়। খনির ভিতরে প্রচুর বায়ু ও আলোক প্রবেশের ব্যবস্থা আছে; সেইজন্য কুলিগণ অক্লেশে সমস্ত দিন নীচে থাকিয়া কয়লা কাটিতে সক্ষম হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা পাথুরিয়া কয়লার দর কম হওয়াতে কয়লার ব্যবসা আর ততদূর লাভজনক নাই। অনেক দেশীয় লোক কয়লার ব্যবসায় বিস্তর লোকসান হওয়াতে খনির কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। যে কয়লা পূর্ব্বে ৪৲ টাকা টন দরে বিক্রীত হইত, এখন তাহা ২৲ টাকারও কম দরে পাওয়া যায়। জাপান ও ইংলণ্ড হইতে এদেশে কয়লার আমদানী হওয়াতেও দেশীয় কয়লার দর কমিয়াছে।

খনির কার্য্য বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের এক আইন আছে এবং একজন ইন্‌স্পেক্টর আছেন। তিনি সর্ব্বদা খনিগুলি দেখিয়া বেড়ান। খনিগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে কিনা, ভিতরে বাতাস ও আলো যাইবার বন্দোবস্ত আছে কি না ও কুলিদিগকে কিরূপ ভাবে রাখা হয় ও খাটান হয়, এই সকল তদন্ত করাই ইনস্পেক্টরের কর্ত্তব্য কার্য্য। খনি হইতে কয়লা উঠাইবারজন্য কল আছে, সেই সকল কল দেখিবার জন্যও গভর্ণমেণ্টের আর একজন কর্ম্মচারী আছেন।

পাথুরিয়া কয়লার ব্যবসায়টি ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় ও কয়লার দর

কম হওয়াতে দেশীয় কয়লা-ব্যবসাদারগণ একবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন। আবার, ইংরাজের এমন একতা যে, কোন ইংরাজের কয়লার প্রয়োজন হইলে তিনি ইংরাজ কোম্পানির কয়লা খরিদ করিয়া থাকেন, এ দেশীয় কোন কোম্পানি সেইরূপ কয়লা অপেক্ষাকৃত অল্পদরে দিলেও তিনি গ্রহণ করিবেন না। রেলওয়ে প্রভৃতির জন্যই কয়লার আবশ্যক এবং ইংরাজই কয়লার সর্ব্বপ্রধান গ্রাহক; কাজেই দেশীয় ব্যবসাদারগণ কয়লার কারবারে ক্ষতি হওয়ায় ইহা ত্যাগ করিতেছেন। ইহা দেশের একটি অমঙ্গলের বিষয়। বাস্তবিক দেখা যাইতেছে যে, এ দেশীয়দিগের সকল ব্যবসা ক্রমশঃ বিদেশীয়দের হস্তগত হইতেছে। ইংরাজেরা এখন খুব ধনী এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, সুস্থশরীর, পরিশ্রমী, চতুর ও কার্য্যপটু। দেশীয়েরা কিছুতেই তাহাদের সমকক্ষ নহে। রাণীগঞ্জের সাদা মাটি, কাঁকর ও পাথর দ্বারা বরণ এণ্ড কোং নামক ইংরাজ কোম্পানি পাথরের ইট, নল, বাসনাদি প্রস্তুত করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। তাঁহারা চুণ তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের কোন বিষয়ে উৎসাহ না থাকায়, আমাদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের সুবিখ্যাত দেশহিতৈষী বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাকরের পাথুরিয়া কয়লার খনি দেখিতে গিয়াছিলেন। বরাকরে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কয়লার খনি আছে। তাঁহার ম্যানেজার বাবু মন্মথনাথ রায় সুরেন্দ্র বাবুকে খনি দেখাইয়া ছিলেন ও কয়লার ব্যবসার হীনাবস্থার কথা বলেন। সুরেন্দ্রবাবু তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ দিয়া ছিলেন। দেশের প্রধান প্রধান লোক যদি মধ্যে মধ্যে ব্যবসাদারগণের সহিত মিলিত হন ও তাঁহাদের অবস্থা শুনিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ ও আবশ্যক মত ঋণদান দ্বারা সহানুভূতি দেখান, তাহা হইলে দেশীয় ব্যবসার উন্নতি হইতে পারে। কেন্দুয়াতে ইংরাজ কোম্পানী যেমন লোহার কারখানা করিয়াছেন, আমাদেরও একটী কোম্পানি করিয়া ঐরূপ একটী কারখানা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি রাণীগঞ্জ ও ছোট নাগপুরের পার্ব্বতীয় স্থানে বিস্তর লৌহ মিশ্রিত প্রস্তর আছে; জমীদারদিগকে কিছু কিছু রয়ালটী (Royalty) কি খাজানা দিলেই সেই সকল প্রস্তর সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

জলপাইগুড়ি জেলায় ভুটান পাহাড়ে তাম্রের খনি আছে বলিয়া জানা

গিয়াছে। বাঙ্গালার অনেক পার্ব্বতীয় স্থানে গন্ধকের খনি আছে বলিয়া বোধহয়, কারণ সেই সকল স্থানের কূপ কিম্বা নদীর জলে গন্ধকের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। খনিজ দ্রব্য বাহির করিবার চেষ্টার জন্য কতকগুলি দেশীয় লোকের উদ্‌যোগী হওয়া ভাল। আমাদের দেশের জঙ্গলের কাঠ ও পাহাড়ের পাথর প্রভৃতি হইতে বিদেশীয়গণ ধনী হইতেছে; আর আমরা অন্ধ হইয়া বসিয়া আছি ও উদরান্নের জন্য কেবল চাকরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। যতদিন আমরা দেশীয় শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ না দিব, ততদিন আমাদের দুরবস্থা ঘুচিবে না।

তাঁত সংবাদ।

বিগত বারাণসী শিল্প প্রদর্শনীতে যে সকল উন্নত ধরণের তাঁত ও বয়নোপযোগী যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। যে সকল মহোদয় এই স্বদেশী আন্দোলনরূপ শুভ সুযোগে দেশের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মঙ্গলের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সেগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

(১)

ডবল ফ্লাইসাটল লুম--ইহাতে দুই খানি কাপড় এক সঙ্গে বয়ন হয়। একখানি দক্তির নিম্নে আর একখানি দক্তি থাকাতে এবং দুইটি রোলার ঠিক টেরচা ভাবে স্থাপিত হওয়াতে দুইখানি দক্তিতে মাকু এক সঙ্গে চলিতে থাকে। মাকু অতি আস্তে চালাইতে হয়। উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ দৈনিক ১০ গজের অধিক হয় বলিয়া বোধ হয় না। প্রাপ্তি স্থান শ্রীশশীভূষণ সোম, চুঁচড়া।

(২)

বি, কে, ঘোষের পেডেল লুম—এ তাঁতটী বেশ উন্নত ধরণের। কল বিশেষ জটিল নহে। হাতের দ্বারা দক্তি টানিলেই বয়নের সমস্ত কার্য্য একসঙ্গে সম্পন্ন হয়। দৈনিক নয় ঘণ্টা পরিশ্রমে ৪০নং সূতার ৪ খানি কাপড় হইতে পারে। ষ্টিম অথবা ইলেকট্রিক পাওয়ারে কার্য্য করিলে আরও বেশী কাজ হইবার সম্ভাবনা। বোধ হয়, যাঁহারা কিছু অধিক টাকা লইয়া

কার্য্য আরম্ভ করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে বটুবাবুর তাঁতই সুবিধাজনক। মূল্য ১২৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান বি, কে, ঘোষ, লুম ম্যানুফ্যাকচারার, চন্দননগর।

(৩)

পঞ্জাব হইতে নির্ম্মিত তাঁত—এ তাঁতটীও মন্দ নহে। আমি ইহাতে ধূতি বয়ন দেখি নাই, চৌখুপী ও ছিট বয়িত হইতে দেখিয়াছি, বয়নও বেশ হইতেছিল। এসকলের সূতা মোটা, কাপড়ের সূতা সরু, কাজেই বস্ত্র বয়ন কতদুর সুবিধাজনক হইবে বলা যায় না। বস্ত্রের বহর অনুসারে মূল্য ৯৯৲ টাকা হইতে ১৫৬৲ টাকা। প্রাপ্তি স্থান এম, কিষণ সিংহ, ম্যানেজার, দি, পাঞ্জাব হ্যাণ্ডলুম ম্যানুফ্যাকচারার লাহোর (Manager, The Punjab Hand Loom Manufacturer, Lahore) ইঁহার প্রস্তুত টানা দিবার কলের দাম ৭০৲ টাকা।

(৪)

সয়েজ কটেজ লুম (The Sayage Cottage Loom) আমার বোধ হয় প্রদর্শনীতে যতপ্রকার তাঁত প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাকে প্রশংসা করিবার কারণ (১) মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা কম (২) কাজ বেশী আদায় হয় (৩) কলটী অত্যন্ত মজবুত অথচ আদৌ জটিল নহে। বলিতে গেলে ইহাকে শ্রীরামপুরের তঁতের উন্নত সংস্করণ বলা যায়। দৈনিক ইহাতে ৪০ নং সূতার ৪খানি ৫ গজা কাপড় হইতে পারে। হাতে কাজ করিবার পক্ষে ইহা বেশ সুবিধাজনক। মূল্য ৩০৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান মিষ্টার সেয়জী, বি, পেটেল ডাইরেক্টার অব এগ্রিকালচারাল ইনডাসট্রি, বরদা (Mr. Raoji B. Petel, Director of agricultural industries, Baroda) ইহার নির্ম্মিত টানা দিবার কলের মূল্য ৭৫৲ টাকা।

(৫)

ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী নির্ম্মিত তাঁতও মন্দ হয় নাই। বোধ হয় এই তাঁত ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে চলিবে।

প্রাপ্তিস্থান—ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কালীকচ্ছ ত্রিপুরা।

(৬)

মায়াচক্র বা টানা দিবার যন্ত্র—এই যন্ত্রটি গাড়ীর চাকার ন্যায় গোল, পরিধি ২০ ফিট ৫ ইঞ্চি। ইচ্ছা করিলে এই যন্ত্র ১০০ হাতের কম যত হাত

হউক না কেন, টানা দেওয়া যাইতে পারে। মূল্য এখন ঠিক হয় নাই, ৪০৲ ৫০৲ টাকা হইতে পারে।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুর ষ্টেট, সিলাইদহ, নদীয়া।

(৭)

উন্নত ধরণের চরকা—চক্র ঘুরাইলে ১৬টী টাকুতে ১৬ গাছি সূতা হইতে পারে বলিয়া আবিষ্কারক বলেন।

ঠিকানা—শ্রীবিজয়ভূষণ রাহা, নলধা জেলা খুলনা।

(৮)

কে, সি, চক্রবর্ত্তীর ওয়াণ্ডিং মেসিন। ইহাতে নলী ইত্যাদি একবারে যত ইচ্ছা পাকান যায়। মূল্য ২০৲ টাকা মাত্র। এই কলটি বেশ কার্য্যকর হইবে বলিয়া বোধ হয়। ইনি এক প্রকার টানা দিবার কলও প্রস্তুত করিয়াছেন।

প্রাপ্তিস্থান—কে, সি, চক্রবর্ত্তী, ৪নং বালাখানা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সিংহ।

স্বদেশী শিল্প-প্রসঙ্গ।

কালী।—দে, কোম্পানী, ৩৬।১ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। ইঁহারা ব্লুব্ল্যাক ও লাল কালী প্রস্তুত করিতেছেন। ডি, ডুরায়াস্বামী আয়ার, ৩০৭নং থম্বুচেটি ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ; গুজরাট ষ্টোরস আহামেদাবাদ; পি, ঘোষ, ১নং হ্যারিসন রোড; ইঁহারা কালী প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন।

নিব ও হোল্‌ডার।—গুপ্ত কোম্পানী উজিরপুর বরিশাল। ইহারা নিব ও হোল্‌ডারের কারখানা খুলিয়াছেন। সিংহ ও বসু কোম্পানী, ১নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, ৪।৫ রকম পেন হোল্‌ডার বাহির করিয়াছেন। রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সরিষা, ২৪ পরগণা; প্রবোধ চন্দ্র বসু, সরিষা, ২৪ পরগণা; শশিভূষণ পাল, দৌলতপুর বিদ্যালয়; গোষ্ঠবিহারী কর্ম্মকার, নাগর পুর ময়মনসিংহ ইহারা নিব প্রস্তুত করিয়াছেন। আশুতোষ ঘোষাল, রহমত পুর, বরিশাল; নিব ও হোলডার প্রস্তুত করিয়ছেন। স্বদেশী ভাণ্ডার, পুরুলিয়া, এখানে নিব প্রস্তুত হইয়াছে। বৈদ্যপাড়া, কর্ম্ম সমিতি, উজিরপুর এখানেও নিব প্রস্তুত হইতেছে।

চিঠির কাগজ—জে, রায়, পাতালেশ্বর বেনারস সিটি, চিঠির কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন। এ, সি, দত্ত এণ্ড কোং, ২২।১ ঝামাপুকুর লেন নোট পেপার প্রস্তুত করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি শ্রীযুক্ত মহাম্মদ হাফিজল হক্ সাহেবের নিকট পোষ্টাফিস বেগুসরাই, জেলা মুঙ্গের, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাইবেন।

তালকাঁড়ির উৎকৃষ্ট ছড়ি।০ আনা হইতে ১৲ টাকা।

ঐ কামিজের বোতাম ৵০ সেট।

আবলুস কাষ্ঠে, হস্তী-দন্তের কারুকর্য্যে খচিত সুন্দর ছড়ি॥০ আনা হইতে ৩৲ তিন টাকা।

আবলুসের রুল।০ আনা হইতে ২৲ টাকা। হস্তীদন্তের কার্য্য ও লতা পাতা বিশিষ্ট আবলুসের নানারকম বাক্স, ফরমাস দিলে তৈয়ারি করাইয়া দেওয়া হয়। মূল্য সাইজ অনুসারে ২৲ টাকা হইতি ৩৲ তিন টাকা।

বাঁশের ও বেনার পাখা, ফুলের সাজি, পেপার বা লকেট্ ইত্যাদি অতি উত্তম তৈয়ারি হয়; এমন কুত্রাপি পাওয়া যায় না। মূল্য।০ আনা হইতে ২৲ টাকা।

তাম্রনির্ম্মিত চাদর লতা পাতা বিশিষ্ট, ছিলিমের অগ্নি ঢাকিবার পাত্র অর্থাৎ সরপোষ মূল্য ১॥০ টাকা হইতে ২॥০ টাকা।

সুগন্ধ দ্রব্য—এস, বি, মুখার্জী, বৃন্দাবন, ইনি বুকেনামক রুমালে মাখাইবার এসেন্স প্রস্তুত করিয়াছেন।

আয়নার কারখানা—ব্যানার্জী ব্রাদার, ১০১নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, বহুবিধ সুন্দর সুন্দর দর্পণ প্রস্তুত করিতেছেন।

জুতার কালি—বংশধর বন্ধু, আলিপুরের আদালতের উকিল, ইনি জুতার কালি প্রস্তুত করিয়াছেন।

উডেন পেন্সিল—কাসি ভাই জভেস ভাই আয়ার, হাজিখানা বাজার, ব্রোচ, বম্বে গ্রেফাইটিস পেনসিল প্রস্তুত করেন। দেবী ম্যানুফ্যাচারিং কোম্পানী লিমিটেড, আগ্রা ইহারা পেন্‌সিল প্রস্তুত করেন।

স্লেট পেন্‌সিল—এম, সি, আমিন, অনিরুদ্ধ আর্টিফিসিয়াল আর্থ ওয়ার্কস ফ্যাক্‌টরি, আহামেদাবাদ ইনি স্লেট পেন্‌সিল প্রস্তুত করেন।

অঘোরকুমার মজুমদার, ময়মনসিং, ইনি বেনারস প্রদর্শনীতে কতকগুলি গ্রেফাইটিসের নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। সে গুলিতেও নাকি বেশ লেখা যায়।

বোতাম—দি ওয়েসটারন ম্যানুফ্যাকটরিং কোম্পানী লিমিটেড আংগ্রেস-ওয়াড়ি, গিরগাঁও, বোম্বাই (Angreswadi Gergaon, Bombey) কোটের ও ওয়েষ্ট কোটের বোতাম পাওয়া যায়।

কাঁসার বাসন—গোষ্ঠবিহারী দাস, হরিচরণ মণ্ডল ও বিজয়কৃষ্ণ ভদ্র, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ ইহারা খাগড়ার কাঁসার বাসন বিক্রয় করেন।

চর্ম্ম নির্ম্মিত দ্রব্য—আবদুল ওহায়েদ খাঁ, কানপুর, কানপুর লেদার ওয়ার্কস কোম্পানী, কানপুর ; মঙ্গলীপ্রসাদ এণ্ড কোং, কানপুর ; সেখ মহম্মদ আইসাবা, কানপুর, তেজারত আসাম ওয়ার্কস, কানপুর ইহাদের নিকট ঘোড়ার সাজ ও জুতার চামড়া পাওয়া যায়।

কাঁচনির্ম্মিত দ্রব্য—গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, সদর বাজার, পঞ্জাব ও বজওয়েভ গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী, আলোয়ার ষ্টেট, ইহাঁদের ওখানে বহুবিধ কাচের দ্রব্য পাওয়া যায়। হিমালয়ান গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড রাজপুর ডেরাডুন ইহারা নানাপ্রকার, চিমনি, শিশি, বোতল প্রস্তুত করিতেছেন।

পি, বি, এস সি (P. B. Sc.) ইনিষ্টিটিউট ওয়ার্কস, লাহোর ও এন্ মনেকজি পোওয়ালা (Pohwala) ইহাদের ওখানেও নানাপ্রকার শিশি, বোতল, চিমনি ইত্যাদি নানাপ্রকার কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

কলিকাতাতেও কাচের চুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। ১১৫ নং অপার চিৎপুর রোডে দেশীয় কাচের চুড়ি পাওয়া যায়।

সাবান—এম, এ, সফু, রেঙ্গুন, টার্কিস বাথ সোপ প্রস্তুত করিতেছেন।

সূতা—স্বনামপ্রসিদ্ধ টাটার নাগপুর কলে লাল ও কাল কাটিম ও তাসা সূতা প্রস্তুত হইতেছে।

বিস্কুট—বেঙ্গল ব্রেড ও বিস্কুট কোম্পানি এজেন্ট ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, ইহারা উত্তম বিস্কুট প্রস্তুত করিতেছেন।

আমরা ডি ব্রাদার্স, ব্রাহ্মনবেড়িয়া, কমিল্লা, ইহাদের নিকট হইতে লিখিবার কালী, কালির বটিকা, চূর্ণ, জুতার কালি, ব্রঙ্কো প্রভৃতি কয়েকটী দ্রব্য উপহার পাইয়াছি। যতদূর দেখা গেল জিনিষগুলি বেস ব্যবহারোপ-যোগী বলিয়া বোধ হয়। আমরা এই সকল দ্রব্যের বহুল প্রচার কামনা করি। দাস ব্রাদার্স, ঘাটশিলা, বর্দ্ধমান, ইহাদের নিকট হইতে এক শিশি জুতার তরল কালি পাইয়াছি। মূল্য প্রতি শিশি ।০ চারি আনা। জিনিষটী মন্দ নয়, কিন্তু দাম অধিক বলিয়া বোধ হয়।

ভ্রম সংশোধন—আমরা তৃতীয় সংখ্যার ১৩৬ পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত, ৪নং পার্ব্বতীচরণ দত্তের গলি, কলিকাতা, নিব প্রস্তুতের মেসিন্ অর্ডার দিলে ১০ দিনের মধ্যে পাওয়া যায় বলিয়া লিখিয়া ছিলাম। ঠিকানাটী ৪নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন হওয়া উচিত ছিল। অতএব আশা করি যাহারা উক্ত মেসিনের অর্ডার দিতে চান তাঁহারা ঐ ঠিকানায় লিখিবেন।

মফস্বলস্থ শিল্পীগণ তাঁহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বহুল বিক্রয় উদ্দেশ্যে এজেণ্টর আবশ্যক বোধ করিলে আমারা কলিকাতার বিশ্বাসী এজেণ্টের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।

জাতীয় শিল্প সমিতি।

বিগত বারানসী শিল্প সমিতির প্রথম অধিবেসনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বক্তৃতার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিংশ শতাব্দির এই প্রারম্ভকালে আমরা যাহাতে শিল্প সংগ্রামে পরাজিত না হই সেই জন্য সকলে বিশেষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। এই সভায় সমবেত ব্যক্তি মাত্রের মুখমণ্ডলেই এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে যে, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমরা স্বহস্তে যেন আমাদের উদ্ধারের পথ উম্মুক্ত করিতে পারি। ভারতে ইংরাজী স্কুল ও কলেজের শিক্ষিত এবং কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও ভারতবর্ষের শিল্পী ও বণিকগণের সহিত একত্রে এই কার্য্যের অংশভাগী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আজ ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে এই একমাত্র সংকল্প স্রোত প্রবাহিত হইতেছে যে, আইন সঙ্গত প্রত্যেক উপায়ে ও আইনসঙ্গত প্রত্যেকরূপ চেষ্টায়, আমরা এই মহাদেশের অসংখ্য অধিবাসিগণের ভিতর আমাদের নিজের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য প্রচারে যত্ন ও উৎসাহ সম্পন্ন হইব।

* * * * *

কোন কোন স্থানে অশান্তি উপস্থিত হইলেও, কোন কোন স্থানে অত্যাচার হইলেও, স্বদেশীর উদ্দেশ্যের সহিত এই অশান্তি বা অত্যাচারের কোন সংশ্রব নাই। প্রত্যেক আইন সঙ্গত উপায়ে দেশীয় শিল্পরক্ষা ও ইহাকে উৎসাহ

প্রদান এবং ভারতের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেশজাত শিল্প দ্রব্যের প্রচলনে আগ্রহ উৎপন্ন করাই এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর সকল জাতিই এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রথা অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

* * * * * *

শিল্প সম্বন্ধীয় আইনের উপর আমাদের কোন ক্ষমতা নাই; সুতরাং যতদূর সম্ভব আমাদের দেশ জাত দ্রব্য ব্যবহারের জন্য আমরা এই প্রকৃষ্টরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি; ইহাতে আমি পাপ বা অনিষ্টমূলক কিছুই দেখিতেছি না। আমি যাহা দেখিতেছি তাহা অতীব প্রশংসার্হ ও নিতান্ত কল্যাণপ্রদ। ভারত-গবর্ণমেণ্ট সকল সময়েই আমাদের শিল্পের উন্নতির জন্য যে আগ্রহ দেখাইয়াছেন, এই আন্দোলনও আমাদের শিল্প সম্বন্ধে সেইরূপ উৎসাহ ও যত্ন উৎপাদন করিবে, ইহাতে দেশের তন্তুবায় ও অপর বিবিধ শ্রেণীর শিল্পিগণকে অর্দ্ধাশন অবস্থা হইতে রক্ষা করিবে, তাহাদিগকে তাঁত ও অপর শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, এবং গবর্ণমেণ্ট যে দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা পরায়ণ হইয়া থাকেন দুর্ভিক্ষের সেই ভয়াবহ প্রভাবকে মন্দীভূত করিবে। আমাদের শিল্প সম্বন্ধে যে উৎসাহের অভাব হইয়াছে, ইহাতে সেই উৎসাহ উৎপন্ন করিবে, এবং দৈনিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য বিদেশীয় আমদানীর মুখাপেক্ষা না করিয়া, দেশোৎপন্ন দ্রব্যেই অভাব মোচিত হইবে। এক কথায়, আমাদের দেশীয় শিল্পকে ইহা নবজীবন প্রদান করিবে। ভারতবাসিগণ এবং ভারতগবর্ণমেণ্ট ভারতের শিল্প এবং শিল্পীগণের উন্নতি ভিন্ন অপর আর কোন বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ সম্পন্ন হইতে পারেন না।

সুতরাং আমি অন্তরের সহিত আশা করি যে, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ ও প্রত্যেক গ্রামে এই স্বদেশী আন্দোলন বিস্তৃত হইয়া জীবনীশক্তি বিশিষ্ট হইবে; প্রত্যেক জেলাতে, কেবল নগরেই নহে, সামান্য গ্রামে পর্য্যন্ত, এই আন্দোলনের বিস্তৃতি ও ইহার চির স্থায়িত্বেরজন্য এবং স্বদেশজাত বস্ত্র ও স্বদেশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য সমিতি স্থাপিত হওয়া উচিত; বিরুদ্ধবাদিগণের উপহাসে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া এবং শক্রগণের ক্রোধের সমক্ষে সাহস প্রদর্শন করিয়া, এই সকল সমিতি শান্ত ও ধীর ভাবে তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তারিত করিতে থাকিবেন। হুজুগ করিবার প্রয়োজন নাই; একজন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, হুজুগ না

করিয়া দৃঢ়চিত্তে ভার বহনই শক্তির কার্য্য। আমাদের দেশবাসিগণের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য মাত্রই সাধন করিতেছি, এই ধীর বিশ্বাসেই কার্য্য করিতে হইবে। যদি আমরা এই মহৎ উদ্যমে সফল কাম হই, তাহা হইলে আমরা পৃথিবী সমক্ষে এক অভিনব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব; রক্ষা শুল্কের সাহায্য ব্যতিরেকেই দেশীয় শিল্প ও শিল্পজাত দ্রব্য রক্ষা যে সম্ভবপর. এরূপ দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে অতুলনীয়। যদি আমরা এই উদ্যমে বিফল হই এবং আমরা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ও যে প্রতিজ্ঞার কথা সাধারণকে জানাইয়াছি সেই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হই; তাহা হইলে আমরা যে অপর জাতির শিল্পের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছি, তাহারই চিরদাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবার উপযুক্ত হইব।

হিন্দু ও মুসলমান

এদেশে হিন্দু ও মুসলমান প্রায় সহস্র বৎসর একত্রে বাস করিতেছে। এই দীর্ঘকালে তাহাদের পরস্পরের কিরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গজনবী মামুদ, মহম্মদ ঘোরী প্রভৃতি মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া দেশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যান। লুণ্ঠনই তাঁহাদেয় উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্পূর্ণ বৈরীভাব ছিল; মুসল বিজেতা হিন্দু বিজিত; আবার মুসলমানেরা হিন্দুধর্ম্ম দ্বেষী ও হিন্দুদের দেব দেবীর মূর্ত্তি বিনাশক ছিল; সুতরাং তাহাদের মধ্যে যে বৈরী ভাব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাহার পর, এদেশে যখন মুসলমান রাজত্ব সংস্থাপিত হইল ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ এখানে চিরস্থায়ীরূপে বাস করিতে লাগিলেন, তখন ক্রমশঃ হিন্দুদিগের সহিত তাঁহাদের সদ্ভাব হইতে লাগিল। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সেই সদ্ভাব এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান বিধর্ম্মী হইলেও, পরস্পর বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইত। পরাজিত রাজপুত রাজারা সম্রাটের সদ্‌গুণে এতদুর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সম্রাটের সহিত এক রাজকন্যার বিবাহ দেন, এবং সম্রাটের পুত্র সেলিমের সহিত আর এক রাজকন্যার বিবাহ হয়। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ

হইয়া, তাঁহারা যে একত্রে ভোজন করিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান এক সমাজ-ভুক্ত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম্ম দ্বেষী ছিলেন; তাঁহার সময়ে হিন্দুদেব দেবীর মূর্ত্তি বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। যাহারা কাশী গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া থাকিবেন ৺ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বেই একটি প্রকাণ্ড মুসলমান মস্‌জিদ আছে। কথিত আছে, সম্রাটের হুকুমে বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তিকে কূপে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। রোটসগড়েও একটি হিন্দুমর্ম্মভেদী দৃশ্য আছে। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, বিহার অঞ্চলে সাহাবাদ জেলায় সোণনদীর ধারে পাহাড়ের উপর রোটসগড় অবস্থিত। এখানে বিখ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের রাজধানী ও গড় ছিল, এবং একটি মন্দিরে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের মহাদেব মূর্ত্তি ও সম্মুখে একটি ষণ্ডের মূর্ত্তি ছিল। মুসলমানেরা সেই দুই মূর্ত্তিকে ভগ্ন করিয়া, মন্দিরের পার্শ্বে এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে মুসলমান সম্রাট বিলক্ষণ হিন্দুদ্বেষী ছিলেন ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব ছিল। মুসলমান রাজা যখন হিন্দুপ্রজার ধর্ম্মলোপের চেষ্টা করিতেন, তখন মুসলমান রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাগণও নিশ্চয়ই হিন্দু প্রজাদিগকে যৎ-পরোনাস্তি উৎপীড়ন করিত; সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বাস্তবিক মুসলমানদের অত্যাচারে অনেক হিন্দু বাধ্য হইয়া মুসলধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিল। বাঙ্গালার অনেক মুসলমান পূর্ব্বে হিন্দু ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে সে সময়েও যে, কোন হিন্দু কি কোন মুসলমান বন্ধু ভাবাপন্ন ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। প্রকৃতধর্ম্ম নিষ্ঠ হিন্দু যেরূপ উদারচরিত, উচ্চমনা ও জ্ঞানী, প্রকৃত মুসলমানও সেইরূপ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন। মুসলমান রাজত্বকালে এরূপ হিন্দু ও মুসলমানের অভাব ছিল না, এবং তাঁহাদের পরস্পর অপ্রণয় ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে দেশের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আর মুসলমানরাজত্ব নাই এবং অনেক দিন হইল হিন্দু রাজত্বের ধ্বংস হইয়াছে। এখনকার রাজা খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহারা প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না; যে প্রজা যে ধর্ম্মাবলম্বী, সে অবাধে সেই ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে সমর্থ। এখন আর হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম বিষয়ে বিবাদ করিতে সক্ষম নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বক্রিদ পর্ব্ব উপলক্ষে গোবধ লইয়া হিন্দু মুসলমানে সংঘর্ষণ ঘটিয়াছিল; সৌভাগ্যবশতঃ

তাহাও মিটিয়া গিয়াছে তবে এখন রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের অবস্থা কি সমান নহে? যে আইন কি শাসন প্রণালীর দ্বারা হিন্দুর অপকার হইবে, তদ্বারা মুসলমানেরও সমান অপকার হইবে। তবে কেন সে বিষয়ের প্রতিবাদে হিন্দু ও মুসলমান একযোগে আন্দোলন না করিবে? ধর্ম্ম ও সামাজিকতায় সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান একমত হইতে পারে না; কারণ হিন্দু যে গোজাতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, মুসলমান তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আহার করিয়া থাকে; এইরূপ কতকগুলি কার্য্যেই পরস্পরের বৈরীভাব হওয়ার সম্ভব। আমরা জানি অনেক ধার্ম্মিক সম্ভ্রান্ত মুসলমান গোমাংস ভক্ষণ করেন না। আবার আধুনিক হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ কেহ অখাদ্য খাইয়া থাকেন; অথচ সমাজচ্যুত নহেন।

খাদ্যাখাদ্যের উপর ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সংশ্রব থাকিলেও, রাজনৈতিক প্রভৃতি ব্যাপারে পরস্পর মিলিত হইবার আপত্তি দেখা যায় না। আজকাল কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান দেখা যায়, যাঁহারা রাজপুরুষদের তোষামদ করাই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করেন। তাঁহারা বলেন, রাজনৈতিক বিষয়ে বাধা দেওয়া ও আন্দোলন করা পাপকর্ম্ম; সেই সকল চাটুকার মুসলমান ও হিন্দু পরস্পর মিশিতে চান না ও আপনার ধর্ম্মাবলম্বীগণকে মিশিতে দেন না। দেশে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক থাকিলেও জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। জাতীয় মহা-সমিতিতে ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলন হয় না। তবে কেন মুসলমানগণ সেই সমিতিতে যোগদান না করিবেন? কোন কোন মুসলমান নেতার ভয় যে, জাতীয় সমিতিতে যোগ দিলে, গবর্ণমেণ্ট মুসলমানদের উপর নারাজ হইয়া, সরকারী কর্ম্ম দিবেন না। তাঁহাদের সে ভয় সম্পূর্ণ অমূলক। গবর্ণমেণ্টত স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানেরা যোগ্যতা না দেখাইতে পারিলে, রাজকীয় কোন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল মৌলবী সামসুল হুদা প্রকাশ্য বক্তৃতায় মুসলমানদিগের ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার বর্জ্জন ও স্বদেশী শিল্প-জাত দ্রব্যের ব্যবহার বিষয়ক আন্দোলনের সহিত ধর্ম্ম কি রাজনীতির সংশ্রব নাই। তবে বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষে এই আন্দোলনটির উৎপত্তি এবং হিন্দুরা ইহার মূল বলিয়া, অনেক মুসলমান ইহাতে যোগদান করিতে প্রস্তুত নহেন। দেশের শিল্প বাণিজ্য একবারে নষ্ট হইয়াছে এবং দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র ও সর্ব্ব বিষয়ে বিদেশীয়দের অধীনস্থ হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া দেশীয় লোক স্বদেশী

শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য যত্নবান হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই সমভাবে সংসৃষ্ট। মুসলমান জাতির মধ্যে অনেক শিল্পী আছে, যাহারা তাঁতি কাঁসারি ও স্বর্ণকারের ব্যবসাবলম্বী; তাহারাও অবস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে; স্বদেশী জিনিষের ব্যবহার যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই দেশের মঙ্গল; হিন্দু মুসলমান সমভাবে এই মঙ্গলের ফলভাগী হইবে। সেই জন্য আমরা মুসল নেতৃবর্গকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন কোন প্রকারে এই সর্ব্বজন হিতৈষী আন্দোলনটির রোধ কিংবা ধ্বংস করিতে চেষ্টা না করেন। ইংরাজ এদেশীয় শিল্প বিনাশের প্রধান কারণ হইলেও, গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করেন যে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি হওয়া প্রার্থনীয়। তবে কেন গবর্ণমেণ্ট এখন আমাদিগকে রাজদ্রোহী মনে করিবেন ?

আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি যে, স্বদেশী আন্দোলনে অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান যোগদান করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ঘনিষ্ঠ হয়, ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটীই প্রধান জাতি বলিলে হয়, এই দুই জাতির মিলন না হইলে জাতীয়তা সম্ভবপর নহে এবং এই জাতীয়তা ও একতা বদ্ধমূল না হইলে, কিছুতেই আমাদের জাতির উন্নতি হইতে পারে না। আমরা ইংরাজ রাজার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াও একতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারি, ইহাই আমাদের বিশ্বাস ?

হিন্দু ও মুসলমান একই গ্রামে বাস করিয়া ও একই জমীদার ও রাজার প্রজা হইয়া পরস্পর নির্ব্বিবাদে মিলিবে ইহা স্বভাব সিদ্ধ। আমরা জানি, বেহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব আছে, হিন্দুরা মহরমে যোগদান করিয়া থাকে। সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলে আমরা নিশ্চয়ই সফল মনোরথ হইব।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী—আগামী ৯ই ফাল্গুন মেদিনীপুর জেলায় কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। প্রদর্শনীর সভাপতি ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিঃ, ওয়েষ্টন বাহাদুর এই প্রদর্শনীর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রদর্শনীর আরম্ভ হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। এখন হইতে জেলার

সকলেরই প্রদর্শনোপযোগী কৃষি-শিল্প দ্রব্যাদির সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব সাধন করিতে যত্নবান্ হওয়া বিধেয়।

পোষ্ট ত্রিভেন্দ্রাম মান্দ্রাজ আর্ট স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে। ইহাদের নিকট কলার আঁশ বাহির করিবার কল পাওয়া যায়। মূল্য ৯৷৷০ নয় টাকা আট আনা। প্রত্যহ এই কলে অর্দ্ধসের হইতে ১ সের আঁশ বাহির হয়। এটো কলার গাছ হইতেই অধিক আঁশ বাহির হইয়া থাকে!

দেশী কাপড়ের হাট—মাণিকগঞ্জ হইতে জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন "মাণিকগঞ্জের নিকটবর্ত্তী ললিতগঞ্জে বহুকাল যাবং একটি দেশী কাপড়ের হাট বসিত; বিদেশীয় বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় উক্ত হাট প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। সংপ্রতি স্বদেশী আন্দোলনের ফলে পুনরায় উহার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সংঘটিত হইয়াছে। সপ্তাহে প্রতি সোমবার প্রাতে এই হাটে প্রচুর পরিমাণে দেশী কাপড়ের আমদানি হইয়া থাকে। যাহারা দেশী বস্ত্র পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা এই হাটে গমন করিলে ইচ্ছানুরূপ বস্ত্রাদি লাভ করিতে পারিবেন।

কাপড়ের কল—বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্বত্রই নানাপ্রকায় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সকলেই যত্নবান্ হইতেছেন। দেশে প্রচুর কলকারখানা স্থাপিত হইলেই ধনাগমের পথ সুপ্রশস্ত হইবে। সম্প্রতি কোহ্লারপুরের মহারাজ বাহাদুরের যত্নে ১০ লক্ষ টাকা মূলধনে তথায় একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ঐ রাজ্যে প্রতি বৎসর প্রচুর কার্পাস জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সমস্তই বিদেশে রপ্তানী হয়। স্থানীয় ঐ কার্পাস ব্যবহৃত হইলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। সোলাপুরেও সম্মিলিত মূলধন লইয়া একটি নূতন কাপড়ের কল নির্ম্মিত হইতেছে। কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, বঙ্গবাসীর স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আগ্রহে আশান্বিত হইয়াই তাঁহারা এই কল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলন জাগ্রত রাখিবার জন্যই সমগ্র ভারতবাসী যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন।

লবণে ক্ষতি—দেশের অধিকাংশ লোকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দ্রব্যের কাট্‌তিও কমিয়া যাইতেছে। এইরূপ প্রকাশ গত জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্গদেশের লবণের গোলা সমূহ হইতে মোট ২৫,৯২,৫৫৩ মণ লবণের কাট্‌তি হইয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসে

৩৪,২৯,৬৫৩ মণ এবং ১৯০৪ সালের উক্ত তিন মাসে ২৮,০৮,৫০৫ মণ লবণ কাটুতি হইয়াছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসের তুলনায় বিগত তিন মাসে লবণ শুল্ক বাবদে গবর্ণমেণ্টের ১০,৭২,৮৭২৲ টাকা লোকসান হইয়াছে।

নেতৃগণের মধ্যে মতান্তর—কলিকাতায় নেতৃগণের মধ্যে দলাদলির উপক্রম হইতেছে। কয়েকজন বঙ্গ ভঙ্গে প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছেন; অপর পক্ষে আর কয়েকজন ভিক্ষাতে কিছু হইবে না বলিয়া এই মতের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন। এই দুর্দ্দিনে এ প্রকার দলাদলি যে দেশের সমূহ অমঙ্গলকর তাহা সকলেই বুঝেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন সকলে এক মত হইয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধনে রত হন।

যুবরাজের সহৃদয়তা—যুবরাজ পত্নীসহ মোটর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া মহীশুর হইতে শ্রীরঙ্গপট্টন যাইতেছিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে কয়েকজন সিপাহী মোটর বাইসাইকেলে চড়িয়া যাইতেছিলেন। একজন সিপাহী বাইসাইকেল হইতে পড়িয়া যায় এবং তাহার একখানা পা দ্বিখণ্ড হয়। যুবরাজ পথিমধ্যে সিপাহীকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে অবতরণ করেন এবং সিপাহীর নিকট গমন করিয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন। তিনি অতি ত্বরায় জল আনিতে আদেশ করেন, এবং জলদ্বারা রক্তস্রোত বন্ধ করিতে অনুরোধ করেন। তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া অবশেষে তিনি গম্যস্থানাভিমুখে প্রস্থান করেন। সাধারণ ইংরেজেরা ভারতবাসীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা স্মরণ করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী বিস্মিত হইয়াছিল।

মেলায় বিলাতী বর্জ্জন।—মুন্সীগঞ্জের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, মুন্সীগঞ্জের নিকট বিখ্যাত কার্ত্তিক বারুণীর মেলা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক ধনী মহাজন বিলাতী কাপড় লইয়া মেলায় আসিয়া থাকেন। বিলাতী দ্রব্যের প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা দেখিয়া এ বৎসর একজনও বড় মহাজন মেলায় আসেন নাই। ছোট ছোট দোকানদারেরা অর্থ লোভে বিলাতী কাপড় লইয়া মেলায় আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কাপড় বিক্রয় হইতেছে না। সুতরাং তাহারা সমূহ লোকসানের ভয়ে দোকানপাট উঠাইয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। প্রতি বৎসর ঐ মেলায় প্রচুর পরিমাণ বিবিধ বিলাতী দ্রব্যের আমদানি হয়। এ বৎসর আমদানি খুব

কম হইয়াছে। যাহা আমদানি হইয়াছে, তাহার অতি অল্প পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে। আমরা জীবনে কখনও বিলাতী দ্রব্যের প্রতি এমন অনাদর দেখিতে পাই নাই।

তাঁতের কারখানা। মান্দ্রাজ গভরমেণ্ট মান্দ্রাজের সালেম জেলায় একটি তাঁতের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন; অবশ্য এখন এখানে কেবল পরীক্ষা কার্য্যই সম্পাদিত হইবে। মান্দ্রাজের শিল্পবিদ্যালয়ের মিঃ এন সুব্রহ্মণ্য আয়ার এই কারখানার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

বিদেশী চিনির বিদায়। ভোগে নৈবেদ্যে বিদেশী চিনির সম্পর্ক থাকিলে হরিদ্বারের পাণ্ডারা তাহা দিতে দেন না। কাজে কাজেই হালুইকরদিগকে বিদেশী চিনির ব্যবহার ছাড়িতে হইয়াছে। ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া চালাইলে সবদিকেই ভাল হয়।

কাজের কথা। আমরা অবগত হইলাম যে,৺রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মহারাজ বাহাদুর সিংহ মহাশয় যশোহর জেলার কোটচাঁদ-পুরের নিকট তারপুর নামক স্থানে একটী বিশুদ্ধ চিনির কারখানা খুলিয়াছেন। এই কারখানার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে পারিলে সুখী হইব। চিনি, খেজুরের না ইক্ষুর? কলিকাতায় সে চিনি আসিতেছে কি?

বিচিত্র কার্পেট। বোম্বাই বিভাগের সুরাটবন্দরে মহাজন সভার প্রতিষ্ঠিত একটি অনাথ আশ্রম আছে। আশ্রমে অনাথ বালক বালিকারা একখানি পরম সুন্দর কার্পেট বুনিয়াছে; কার্পেটখানির নামকরণ হইয়াছে, "শিল্পবিদ্যা জাগরণ কার্পেট।" এসিয়া দেশে জাপান, চীন ও ভারতের নষ্ট শিল্প বাণিজ্যের যে পুনরুদ্ধার হইতেছে,—ইহাই লক্ষ্য করিয়া এই কার্পেটের বুনন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। পূরব আকাশে বালসূর্য্য ধীরে ধীরে উঠিতেছে,—কার্পেটে এই চিত্র বুনিয়া এসিয়ার পুনরুত্থান চিত্র চিত্রিত করা হইয়াছে। চীন জাপান ও ভারতভূমির তিনখানি দেবীমূর্ত্তি; জাপানে সূর্য্য সমধিক প্রোজ্জ্বল চীনে অপেক্ষাকৃত ম্লান, আর ভারতে এই সবে সূর্য্য উদিত হইতেছে। ভারতের আকাশে সূর্য্যের চারিপাশে অসংখ্য গ্রহতারা, কখনও সূর্য্যালোকে ভারতের অন্ধকার দূর হয় নাই;—কার্পেটে এই সমস্ত সুন্দর চিত্র স্পষ্ট প্রকটিত।

১৭৫ পৃষ্ঠার ১৬ পংক্তির সূতার স্থানে তুলা পড়িতে হইবে

স্বদেশী।

প্রথম খণ্ড।] ফাল্গুন, ১৩১২। [পঞ্চম সংখ্যা।

বন্দে মাতরম্।

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলন।

(২)

কেহ কেহ বলেন, ভারতে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক, সুতরাং বিদেশী দ্রব্যের আমদানীতে আমাদের যে পরিমাণ ধন বিদেশে যাইতেছে, রপ্তানীতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ধন বিদেশ হইতে এদেশে আসিতেছে; অতএব ভারতবাসীর ধন ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধিই হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক কি এ কথা ঠিক? কখনই না। টাকাই কি সর্ব্বস্ব? টাকাই কি একমাত্র প্রার্থনীয়? যদি আহার না জুটে, তবে টাকা বা স্বর্ণ রৌপ্যের প্রয়োজন কি? সত্য বটে, আমরা স্বদেশী দ্রব্য বিদেশে দিয়া অনেক টাকা আনিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ কি ক্ষতি হইতেছে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন কি? নিতান্ত প্রয়োজনীয় তণ্ডুল ও গোধূমই আমাদের প্রধান রপ্তানীর দ্রব্য। সেই তণ্ডুলাদি অযথা পরিমাণে বিদেশে যাওয়ায়, সে সকলের মূল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, এক্ষণে চারি টাকার কমে প্রায়ই পাওয়া যায় না। কেবল চাউল নহে, আমাদের খাদ্য সমস্ত দ্রব্যেরই অতিশয় মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে; যে শাক সব্জী পূর্ব্বে পল্লীবাসীরা বিনা

মূল্যে পাইত, হাটে বাজারে যাহা আদৌ বিক্রয় হইত না, সে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, অনেকের উপকরণ অভাবে ভোজন হয় না। ঐ সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি না হইলেও, ভূমিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতেই সে সকলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের দেশ হইতে যে সকল দ্রব্য বিদেশে যায় তৎসমস্তই ভূমিজাত। নীল, পাট, তুলা, তিসি, চা, কফি প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়, তৎসমস্তই ভূমিজাত। বিদেশে রপ্তানী হওয়ায় ঐ সমস্ত দ্রব্যই মহার্ঘ হইয়াছে। সে সকলের লোভ ত্যাগ করিয়া লোকে শাক সব্জির চাষ করিতে চাহে না, করিলেও তাহার মূল্য অধিক হয়। এইরূপে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায়, দরিদ্রের কষ্ট অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় হওয়ায় কৃষকের লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু সকলে ত কৃষক নহে। কৃষিকার্য্যে সকলের চলিতে পারে না; যাহারা কৃষি বা মজুরি করিতে অক্ষম তাহাদের উপায় কি? তাহাদের কি আয় বাড়িয়াছে যে, তদ্দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ করিবে? শিল্পিগণের শিল্প নাই, যাহা আছে তাহার মূল্য নিতান্ত কম; ব্যবসা বাণিজ্যও প্রায় নাই; কি উপায়ে লোক এত ব্যয় করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবে? তাই বর্ষে বর্ষে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। যাঁহারা বড় বড় চাকরী করেন ও যাঁহারা প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী তাঁহাদেরও ধনসঞ্চয় হইতে পারে না। ভোজন ব্যাপারে ও বিদেশাগত অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্য অভ্যস্ত হইয়া সেই অভাবের নিরাকরণে সমস্ত ধন ব্যয় হইতেছে; সুতরাং রপ্তানীতে যে ধন আসিতেছে, তাহাতে আমাদের ধনবৃদ্ধি না হইয়া ক্ষয়ই হইতেছে।

কেবল যে বর্ত্তমান ধনক্ষয় হইতেছে তাহা নহে; ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছে। ভারতের ভূমি পূর্ব্বে অতিশয় উর্ব্বরা ছিল, বহুতর বন থাকায় কাষ্ঠ দ্বারা ভারত পরিপূর্ণ ছিল; তদ্ভিন্ন স্বর্ণ হীরকাদিতে ভারতের খনি ও বহুমূল্য মুক্তায় ভারতসাগর পরিপূর্ণ ছিল। সে সমস্তই দিন দিন হ্রাস হইতেছে; ভারত শূন্য-গর্ভ হইতেছে, ভূমিরও উর্ব্বরতা-শক্তি দিন দিন কমিতেছে। একই ভূমিতে প্রতি বৎসর শস্য বুনিলে সে ভূমির সেরূপ উর্ব্বরতা থাকে না; পূর্ব্বে কৃষকেরা কোন ভূমিতেই প্রতি বৎসর শস্য বপন করিত না, মধ্যে মধ্যে পতিত রাখিত, তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হইত। এক্ষণে আর সেরূপ থাকে না; অযথা লোভের বশবর্ত্তী

হইয়া অনেকেই কৃষি ব্যবসায়ী হইয়াছে, কোন ভূমিই কেহ ফেলিয়া রাখে না। কাজেই দিন দিন ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কমিতেছে। পূর্ব্বে এক বিঘা জমিতে যে শস্য হইত, এক্ষণে চারি বিঘাতেও তাহা জন্মে কি না সন্দেহ। তাই উৎপন্ন দ্রব্যের চতুর্গুণ মূল্য বৃদ্ধি হইলেও উৎপন্নের অল্পতা হেতু কৃষকের কিছুমাত্র লাভ হয় না—তণ্ডুলের এত মূল্যবৃদ্ধি হইলেও লোকে ধান্য বুনিতে চায় না, নিতান্ত ক্লেশকর ও রোগের নিদান পাট বপনই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে আমাদের দারিদ্র, পীড়া ও দুর্ভিক্ষ বাড়িতেছে। কেবল ইহাই নহে, আরও বহুতর অনিষ্ট হইতেছে; পূর্ব্বে ভূমি পতিত থাকায় সেই সকল পতিত ভূমি গো-চারণ স্থান হইত, তাই তখন দুগ্ধবতী গাভী ও বলবান বলীবর্দ্দ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, তজ্জন্য সুলভমূল্যে ঘৃত ও দুগ্ধ পাওয়া যাইত, এবং বলবান বলীবর্দ্দের সহায়তায় উত্তমরূপ ভূমিকর্ষণ হইত, সে কারণে বহু শস্য উৎপন্ন হইত। এক্ষণে বহুতর শস্য বিদেশে রপ্তানী হওয়ায় সমস্ত ভূমিই কর্ষিত হইতেছে, নিবিড় অরণ্য পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্র হইতেছে, তাহার ফলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি কমিতেছে, গো-মেষাদির অল্পতা ও দুরবস্থা হইতেছে এবং কাষ্ঠেরও দিন দিন অভাব হইতেছে; বাহাদুরি কাষ্ঠ আর নাই বলিলেই হয়। ভূমিও অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং চিরকালের জন্য ভারত অন্তঃসার শূন্য বা লক্ষীছাড়া হইতেছে—যে সকল ধনে ভারত চিরধনী, সে সকল ধনই নষ্ট হইতেছে। ভগবতীস্বরূপ গোধন ও লক্ষ্মীস্বরূপ ধান্যধনেই ভারতবাসী চিরকাল ধনী ছিলেন। এক্ষণে তাহা আমাদের আর নাই। বিদেশে রপ্তানী হওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কোনও রূপে কৃষকের চলিতেছে বটে, কিন্তু অপর সমগ্র দেশবাসীর নিরতিশয় কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে। আজ যদি রপ্তানী বন্ধ হয়, তাহা হইলে আবার আমাদের খাদ্য সামগ্রী সুলভ হইবে, ভূমি উর্ব্বরা হইবে, গো-জাতি হৃষ্টপুষ্টা ও দুগ্ধবতী হইবে, সর্ব্বপ্রকার রত্নে ভারত পূর্ণ হইবে। অর্থ অল্প হইলেও সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সুলভ হইবে। সুতরাং রপ্তানীর অর্থ আমাদের হিতকর নহে, সমূহ অনিষ্টেরই কারণ। অতএব যাঁহারা বলিতেছেন, রপ্তানী অধিক হওয়ায় আমাদের ধনবৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্তি।

আমাদের বোধ হয় আমদানী অপেক্ষাও রপ্তানীতে অধিক ক্ষতি হইতেছে। যদিও বিদেশী দ্রব্যের আমদানীতে আমাদের বিলাসিতা বৃদ্ধি হওয়ায় শিল্পের অবনতি হইয়া সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে ও রপ্তানী

বৃদ্ধিতে বিদেশ হইতে বহু ধন দেশে আসিতেছে, তাহা হইলেও আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী আমাদের অধিকতর অনিষ্টকর ও রপ্তানী বন্ধ হওয়া অগ্রে আবশ্যক। কারণ, রপ্তানী বন্ধ হইলে খাদ্যদ্রব্য সুলভ হইবে, অতি দরিদ্রও পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে। এবং এইরূপে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, তদ্দ্বারা দেশীয় মহার্ঘ দ্রব্য ক্রয় করিতে পারা যাইবে। এক্ষণে ইচ্ছা থাকিলেও অনেকে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিতেছে না। যাহাদের অন্নসংস্থান করা কঠিন, তাহারা কি প্রকারে অধিক মূল্যে বস্ত্রাদি কিনিবে? নিত্য একান্ত প্রয়োজনীয় আহারীয় দ্রব্যের মূল্য কমিলে যদি দৈনিক এক আনাও ব্যয় লাঘব হয়, তবে কেন লোক সাময়িক প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি বার্ষিক ২।১ টাকা বা দৈনিক সিকি পয়সা অধিক দিয়া দেশীয় ব্যবহার করিতে পারিবে না? এইরূপে সকলেই দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিলে বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী আপনিই উঠিয়া যাইবে। তখন আপনা আপনিই আমাদের শিল্পাদির উন্নতি হইতে থাকিবে। যদি বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী হয়, তাহাতে আমাদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশবাসীরা ত তণ্ডুলাদি বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার ত্যাগ করেন নাই, বিদেশীয় শিল্প প্রসূত বস্ত্রাদি ত্যাগেরই চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বিদেশীয় দ্রব্য মাত্রই 'বয়কট' করেন নাই, বিদেশীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর মূল্য দিয়াও গ্রহণ করিতেছেন। আমাদেরও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য; যে সকল দ্রব্য আমাদের কখনও ছিল না বা অল্প আছে, যে সকল দ্রব্য না লইলে আমাদের চলিবে না ও যে সকল দ্রব্যের সহায়তা ব্যতীত আমাদের উন্নতি হইবে না, সেই সকল বিদেশীয় দ্রব্য আমাদের গ্রহণ করা উচিত, আর সমস্তই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ভোজনের কোন দ্রব্যই আমাদের বিদেশ হইতে আনার প্রয়োজন হয় না, পরিচ্ছদেরও প্রয়োজন ছিল না, আমাদের বুদ্ধির দোষে এক্ষণে প্রয়োজন হইয়াছে; কিন্তু এমন অবস্থা এখনও ঘটে নাই যে, বিদেশীয় বস্ত্রাভাবে আমাদের চলিতেই পারে না। কিন্তু বিদেশীয় যন্ত্রাদির সাহায্য না লইলে অচিরে সকল অভাব পূর্ণ হইবে না বলিয়া, সে সকল লওয়া আবশ্যক। ফলতঃ শিল্পের অবনতি হওয়াতেই আমাদের কিছু কিছু বিদেশীয় দ্রব্যের আবশ্যক। কিছুদিন চেষ্টা করিলে আবার শিল্পের উন্নতি হইবে, তখন সুজলা সুফলা মাতৃভূমির কৃপায় আমাদের কোনও অভাবই থাকিবে না। যদি আমরা রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে খাদ্যদ্রব্য সুলভ হইবে কোম

অভাবই থাকিবে না, তখন সকলে ধ পরায়ণও হইবে। কোন গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ হইবে না, কোন গৃহস্থই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইবে না, সমস্ত ভারতবাসী সত্যযুগের ন্যায় সুখী হইবেন, অচিরে কলির শেষ ও সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। সুতরাং আমাদের কেবল বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করিলে হইবে না,—যে স্বদেশীয় দ্রব্য বিদেশে যাওয়ায় আমাদের কষ্ট বৃদ্ধি হইতেছে, সে সকল দ্রব্য যাহাতে দেশ বহিষ্কৃত না হয় তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই সকল বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, যাঁহারা রপ্তানী অধিক হওয়ায় আমাদের ধনবৃদ্ধি ও সুখবৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া আশ্বস্ত করিতেছেন, তাঁহাদের কথা ঠিক নহে। ইহাতে আমাদের অধঃপতন আরও নিকটবর্ত্তী হইতেছে। যদি ভারতের নাম রাখিতে হয়, যদি ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জীবন রক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রাণপণে যেমন স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ স্বদেশীয় তণ্ডুলাদির বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করার চেষ্টাও কর্ত্তব্য।

এতদিনে আমাদের যে এ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, ইহা আমাদের ভাগ্যের কথা, এবং ইংরাজজাতিরও গৌরবের কথা। আমরা জ্ঞান হারা হইয়া বিলাতী চাক্‌চিক্যে মোহিত হইয়া একান্ত বিলাতীপ্রিয় হইয়াছিলাম; তাঁহাদেরই প্রদত্ত শিক্ষা পাইয়া ও তাঁহাদের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়াই এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে সেই ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারীরা আমাদের এই উদ্যমে নানা বিঘ্ন উপস্থিত করিতেছেন। শিশুর মুখে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনিয়া তাঁহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইতেছেন ও নানা প্রকারে আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছেন। অনেকে সেই ভয়ে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। আমাদের বোধ হয় এরূপ ভয়ের কোন কারণ নাই; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংরাজরাজ স্বদেশের পক্ষপাতী হইলেও ন্যায়-বিবর্জ্জিত নহেন। নীতিবিরুদ্ধ, আইনবিরুদ্ধ কার্য্য কখনই তাঁহারা করিতে পারিবেন না। এক্ষণে যে অত্যাচার আদি হইতেছে তাহা হয় রাজকর্ম্মচারিগণের অবিমৃষ্যকারিতার দোষে অথবা অসংযত বালকগণেরই হঠকারিতার দোষে। যদি রাজকর্ম্মচারিগণের হঠকারিতার দোষে হয়, তাহা হইলে অচিরেই সে অত্যাচার নিবারিত হইবে, অচিরেই তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। যদি বালকগণের হঠকারিতার জন্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে সেরূপ আর না হয় তাহা করিলেই হইতে

পারে। যদি 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া প্রকাশ্যভাবে চীৎকার করিলে রাজকর্ম্মচারিরা বিরক্ত হয়েন, তাহা হইলে সেরূপ না করিলেই হইতে পারে।

কেহ কেহ বলিবেন যে, এরূপ চীৎকার না করিলে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিবে না; দেশের লোক যেরূপ মোহনিদ্রায় কুম্ভকর্ণের ন্যায় আচ্ছন্ন, এইরূপ নিয়ত চীৎকার না করিলে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না, হইলেও পুনরায় ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে; যদি নিয়ত সভা সমিতি না করা যায়, যদি বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের ইচ্ছাকে সংযত করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া বাজারাদিতে ভ্রমণ করা না যায়, তাহা হইলে মোহাচ্ছন্নগণের কখনই চৈতন্য হইবে না। এ কথা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু যখন রাজা তাহা বুঝিতেছেন না, যখন তাঁহারা বিপরীত ভাবে উহার অর্থ করিতেছেন, তখন তাহা করিলে ত সুফলের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত তাহাতে আমাদের সমুদয় চেষ্টা বিফল হইবে। সুতরাং সেরূপ না করিয়া যদি আমরা ধীর ভাবে আন্দোলন করি, চিরাবলম্বিত পথে লোকের শাসন করি, গৃহে গৃহে সভা করি, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। যিনি যে পল্লীতে বাস করেন তিনি সেই পল্লীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট যাইয়া উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিউন, প্রত্যেক পল্লীর প্রশস্ত গৃহ বিশেষে মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া বুঝাইয়া দিউন ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লউন। ব্রাহ্মণের সে সম্মান এক্ষণে না থাকিলেও তাঁহাদের শক্তি এককালে যায় নাই, অনেকস্থলে তাঁহারা যজমানদিগকে এ প্রবৃত্তি দিতে পারেন। জাতিভেদের এক্ষণে সেরূপ দৃঢ়তা না থাকিলেও এক কালে উহার বিলোপ সাধন হয় নাই, এখনও সমাজ-বিদ্রোহীর দণ্ড হইয়া থাকে; পল্লীসমাজের নিম্নশ্রেণী সমাজের শক্তি অদ্যাপি দৃঢ় আছে। সেই সমাজ শাসনের ভয়ে অনেক কার্য্য হইতে পারে। এইরূপ চেষ্টা করিলে রাজা বা রাজকর্ম্মচারিগণ আমাদের কোন দোষ দেখিতে পাইবেন না। অথচ তাহাতে প্রকৃত কার্য্য হইবে। যদি আমাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে কখনই আমাদের এই সাধু উদ্যমের বাধা হইবে না, আমরা যদি রাজকর্ম্মচারী বা রাজজাতির বিরোধাচরণ চেষ্টা না করিয়া সরল ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি, যদি লোকে বুঝিতে পারে যে, এ চেষ্টা ব্যতীত আমাদের ভবিষ্যৎ অতি ভয়ানক হইবে, তাহা হইলে এইরূপ চেষ্টাতেই আমাদের ফললাভ হইবে। যদি আমরা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সংযত হই, তাহা হইলে কোন বাধাই আমাদিগকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিবে না। অতএব যাহাতে সকলে প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারে,

ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান হয়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সে চেষ্টা বল প্রয়োগ অপেক্ষা ধীরভাবে করিলেই অধিক ফলপ্রদ হয়। সংবাদ পত্রাদিতে আলোচনা, সভা সমিতিতে বক্তৃতা, পরস্পরে মিলিত হইয়া আন্দোলন ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই মুখ্য উপায়।

যখনই যে কোনও উপলক্ষে দশজন মিলিত হইবেন, তখনই এই বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। নিমন্ত্রণাদিতে, ভোজের মজলিসে, বিবাহ সভায়, সর্ব্বত্রই ইহার আলোচনা করিতে হইবে; এবং সর্ব্ব প্রকারেই দেশীয় ভাবাপন্ন হইতে হইবে। দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধানে, দেশীয় ভাবে আহার বিহারে ও দেশীয়ধর্ম্মে অনুরাগবান এবং দেশীয় ভাবে শিক্ষা লাভ হওয়া আবশ্যক। যাহাতে হৃদয়ে স্বদেশ প্রীতি জন্মে, কার্য্যে সকলেরই তাহা করা কর্ত্তব্য। সেই উদাহরণ দেখিয়া সকলেই সেই পথাবলম্বী হইবেন। একদিনে না হয় কালে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। একদিনে সকল লোককে এক-মতাবলম্বী করা একান্ত অসম্ভব, রাজার দৃঢ় আইনেও তাহা হইতে পারে না; হইলেও তাহাতে সুফল ফলিবে না। যদি আজি প্রত্যেক ব্যক্তি স্বদেশীয় দ্রব্যভিন্ন অন্য দ্রব্য ব্যবহারে বিরত হয়, তাহা হইলে সে পরিমাণ দ্রব্য যোগাইবে কে? অর্দ্ধেক লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সঙ্কুলান হইবারই উপায় নাই। কিন্তু যদি ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সঙ্কুলান হইতে পারে। দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিব বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেই চলিবে না, যাহাতে দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথা সম্ভব সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় তাহার উপায় করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা একদিনে হইতে পারে কিন্তু দ্রব্য প্রস্তুতের উপায় করা সহজসাধ্য নহে। পরিমিত সময় ও চেষ্টা ব্যতীত তাহা হইতে পারে না। যেমন আমরা তাহার উপায় করিতে পারিব, প্রতিজ্ঞাকারীর সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ বৃদ্ধি হইবে। অতএব এককালে সকলকে এ পথের পথিক করিতে পারিলাম না বলিয়া একেবারে নিরাশ হইবার কোন কারণই নাই। এক্ষণে যদি ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়গণ, শিক্ষিতগণ, ধর্ম্মপরায়ণ ও সংযতগণ এবং তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনগণ এই পথের পথিক হয়েন ও নিয়ত দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের চেষ্টা করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই কালে সকল ব্যক্তিই তাঁহাদের পথাবলম্বী হইবেন। রাজকর্ম্মচারী-দিগের অযথা অত্যাচার তাহা কখনই নিবারিত করিতে পারিবে না। যদি আমরা স্থির থাকি, যদি আমরা আমাদের স্বার্থ বুঝিতে পারি, তাহা হইলে

আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। দুঃখের বিষয় অনেকে স্বার্থ বুঝেন না, আপাত সুখের জন্য ভবিষ্যৎ মহদ্দুঃখও চিন্তা করেন না।

কতক লোক এমনও আছেন তাঁহারা মনে করেন আমাদের দেশে কখনই সুলভে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য প্রস্তুত হইবে না, বিলাতের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার শক্তি আমাদের কখনই হইবে না; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারত পূর্ব্বে কখনই পরের দ্রব্য গ্রহণ করেন নাই, অন্য দেশীয়েরাই ভারতের শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যে সূতা ও যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহাতে সমগ্র ভারতবাসীর চলিত। বিলাতের অনেক বস্ত্র এইখান হইতে যাইত। তবে কেন আমাদের দেশে তুলা, সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুত হইবে না? চেষ্টা করিলে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যই আমাদের দেশে প্রস্তুত হইতে পারে। তবে বিলাতী কলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার শক্তি আমাদের এক্ষণে নাই বটে, কিন্তু কালে যে সে শক্তি লাভ হইবে না তাহার কোনও অর্থ নাই। কিন্তু আমাদের মতে কল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমাদের উচিত নহে; কল করিয়া যে উন্নতি সে উন্নতি উন্নতিই নহে। যন্ত্র শিল্পের উন্নতিতে সাধারণ জনগণের দুঃখ বৃদ্ধি হয়, কয়েকজন ধনীই লাভবান হয়েন মাত্র। স্বাধীনবৃত্তি এককালে লোপ হয়, মজুরের দলের বৃদ্ধি হয়, এবং মজুরেরা সুরা পায়ী ও নিতান্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া মনুষ্য নামের অযোগ্য হয়। হস্ত শিল্পের সাহায্যে কার্য্য হইলে সকলেরই অন্ন সংস্থান হয়, সকলেই স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে ও ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়া মনুষ্য নামের যোগ্য হয়। তাহাতে দ্রব্যের মূল্য তত অল্প হয় না বটে, কিন্তু তাহা কলের তৈয়ারী দ্রব্য অপেক্ষা অনেক গুণসম্পন্ন ও স্থায়ী হয়; সুতরাং সেরূপ মূল্যাধিক্যজনিত ক্ষতি ক্ষতির মধ্যেই গণ্য নয়। আমাদের বোধ হয়, হস্ত-যন্ত্রের উন্নতি করিতে পারিলে পরে সে দোষও থাকিবে না। সুতরাং আপাততঃ ব্যয় বাহুল্যের সম্ভাবনা থাকিলেও পরে সে কষ্ট থাকিবে না। ধর্ম্মশাস্ত্র তত্ত্ব ও কর্ত্তব্য বিচার নামক পুস্তকে এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, দেখিতে অনুরোধ করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

স্বদেশী আবশ্যকীয় দ্রব্য।

বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার ভারতবর্ষে এতদূর প্রচলিত হইয়াছে যে, এই সকল দ্রব্যের পরিবর্জ্জন সকলের পক্ষে সহসা সম্ভবপর নহে। তবে ক্রমশঃ আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন ও দেশবাসিগণ কিছুদিন ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে ইহা অসম্ভব হইবে না। বর্ত্তমান কালেই আমাদের আবশ্যকীয় অনেক জিনিষই দেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে; বিদেশীয় জিনিষ অপেক্ষা ইহার কতকগুলি কিছু অধিক মূল্যবান হইলেও, অধিক দিন স্থায়ী হয়; সুতরাং অনেকেই বিনা আপত্তিতে উহা ব্যবহার করিতে পারেন।

অন্নের পর পরিধেয় বস্ত্রই আমাদের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য। পূর্ব্বে এখানে প্রচুর সূতা ও বস্ত্র উৎপন্ন হইত। এখন আবার তুলার চাষ যাহাতে অধিক পরিমাণে হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। যদি জমিদারগণ আপন আপন প্রজাদিগকে তুলার চাষ করিবার জন্য উপদেশ ও আবশ্যক হইলে বীজ খরিদ করিয়া দেন, তাহা হইলে সত্বর তুলার চাষের বিস্তৃতি হইতে পারে। দেশের আবশ্যক মত সূতা পূর্ব্বের ন্যায় চরকায় প্রস্তুত হওয়া এখন সম্ভব নহে; কারণ এখন লোকসংখ্যা ও বিলাসিতার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ও আজকাল অনেক স্থানের স্ত্রীলোকেই চরকার কাজ জানে না। চরকায় সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে; এই চেষ্টা কতদিনে ও কিরূপে কার্য্যকর হইবে, তাহা বলা যায় না; সুতরাং সূতার জন্য কলেরও আবশ্যক। কলিকাতা ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে এক একটী সূতার কল স্থাপিত হইলে ভাল হয়। কাপড়ের কলের যে আবশ্যকতা নাই, প্রথম সংখ্যায় আমরা তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছি। আমাদের দেশে এখন অনেক তাঁতির বাস; কাপড়ের কল হইলে এই বহুসংখ্যক লোকের দুরবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। বিনষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পিগণের দুরবস্থার অপনোদনই স্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য; কাপড়ের কল স্থাপনে এ উদ্দেশ্য সফল হইবে না, ইহা যেন আমাদের নেতৃগণ সর্ব্বদা মনে রাখেন। বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল আছে; আপাততঃ আমরা সেই

কাপড়ও ব্যবহার করিতে পারি; পরে কেবল মাত্র তাঁতের কাপড়ই ব্যবহার করিতে হইবে ইহাই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। তাঁতে যাহাতে ব্যবহার্য্য জামার কাপড়ও প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। স্থানে স্থানে তাঁতিরা জামার কাপড় প্রস্তুত করিতেছে; সেগুলিও সুদৃশ্য ও মজবুত এবং মহার্ঘ নহে; সুতরাং বেশ ব্যবহার্য্য। তাঁতিরা যাহাতে নানাপ্রকার জামার কাপড় তৈয়ার করিতে পারে, সে বিষয়ের উপদেশ দিবার জন্য লোকের আবশ্যক। অমৃতসর, লুধিয়ানা, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে উত্তম উত্তম পশমী শীতবস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে; সে সকলই কলে প্রস্তুত হয়। তাঁতিরা যাহাতে তাঁতে শীতবস্ত্র তৈয়ার করিতে শিক্ষা পাইতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় জুতাও একটী আবশ্যকীয় দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে মুচির সংখ্যাও কম নহে এবং তাহারা উত্তম উত্তম জুতা প্রস্তুত করিতে জানে। কলিকাতায় সাহেবদের যে সকল জুতার দোকান আছে সেখানে দেশীয় মুচিরাই জুতা তৈয়ার করিয়া থাকে। তবে এদেশে চামড়া পাইট করিবার কারখানার আবশ্যক। কাণপুরে একটী মাত্র কারখানা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এক একটী ট্যানারি কারখানা হওয়া আবশ্যক। প্রতি বৎসর এখান হইতে কত জাহাজ চামড়া ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয় এবং সেই সকল স্থানের কলে আবশ্যক মত পরিস্কৃত হইয়া এখানে আমদানী হয়। দুইবার জাহাজ ভাড়ায় চামড়ার দর বাড়িয়া যায় ও জুতা দুর্ম্মূল্য হয়। এদেশের আবশ্যকীয় চামড়ার এখানে পাইট হইলে দেশের অনেক লোক কাজ পায় ও চামড়ার দর সস্তা হয়।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের জন্য ছাতা একটী অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। অধিকাংশ ছাতাই বিদেশ হইতে আমদানী হয়। এদেশে অনেক ছাতা প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু সেগুলি অপকৃষ্ট ও অল্পস্থায়ী। ছাতার শিক ও কাপড় প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এখানে ছাতার বাঁটের উপযোগী বাঁশ ও কাঠের অভাব নাই। ছাতার ব্যবসায়ের জন্য একটি কোম্পানী হইলে ভাল হয়।

আমাদের দেশে কাঁসারির সংখ্যা অল্প নহে। পূর্ব্বে তাহারা বেশ অবস্থাপন্ন ছিল কিন্তু বিদেশী কাচ ও এনামেল বাসনের প্রচলন অত্যধিক হওয়াতে কাঁসারিরা অবস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। কাচ ও এনামেলের বাসন

অল্পমূল্য বটে, কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ ও অল্প স্থায়ী। একটি পিত্তল বা কাঁসার বাসন পুত্র পৌত্রাদিও ভোগ করিতে পারে এবং ভাঙ্গিলেও অর্দ্ধমূল্যে বিক্রীত হয়। সেই জন্য যতদূর সম্ভব, কাচ ও এনামেলের বাসনের পরিবর্ত্তে পিত্তল কাঁসার বাসনের ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয় এবং কাঁসারিরা যাহাতে এই সকল দ্রব্য অল্পব্যয়ে প্রস্তুত ও অল্পলাভে বিক্রয় করিতে পারে সেইরূপ উপদেশ দিবার লোকের আবশ্যক। মান্দ্রাজে যে এলুমিনিয়মের বাসন প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলিও মূল্যবান; সাধারণ লোক তাহা ব্যবহার করিতে অসমর্থ। কোন কোন কাঁসারি আজকাল জার্ম্মান সিলভারের (রূপদস্তা) বাসন তৈয়ার করিতেছে; সেগুলি সুদৃশ্য ও বেশ ব্যবহার্য্য এবং অধিক মূল্যবান নহে।

ছুরী, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি আবশ্যকীয় অস্ত্র সকল এদেশে অনেক স্থানে প্রস্তুত হয়। বর্দ্ধমান জেলায় কাঞ্চন নগরের প্রসিদ্ধ কর্ম্মকার প্রেমচাঁদ এই সকল দ্রব্য যেরূপ সুন্দর তৈয়ার করে, সেগুলি বিলাতী অস্ত্র হইতে কিছুতেই অপকৃষ্ট নহে। কাঞ্চন নগরে আরও ভাল ভাল কারিকর আছে। মানভূম জেলায় ঝালদা গ্রামের কর্ম্মকারেরা কাটারি, গুপ্তি, বলুয়া, তলোয়ার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট হাতিয়ার তৈয়ার করে। মুঙ্গেরের ও আরা জেলার জগদীশপুর গ্রামের কামারেরা বন্দুক প্রস্তুত করিবার জন্য বিখ্যাত। ফলতঃ এদেশে আমাদের আবশ্যকীয় লৌহজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লোকের অভাব নাই। বিদেশীয় অস্ত্রাদির আমদানী হওয়ায় তাহাদের ব্যবসা ভালরূপ না চলাতে তাহারা অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছে।

স্বর্ণকারগণও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া অর্দ্ধাশনে আছে। প্রায় সকল জেলাতেই স্বর্ণকারের বাস। কটক ঢাকা প্রভৃতি স্থানের স্বর্ণকারের কারুকার্য্য চিরপ্রসিদ্ধ কিন্তু আমাদের ধনী মহাশয়েরা তাহাদের ত্যাগ করিয়া সাহেবদের দোকান হইতে অলঙ্কার খরিদ করিতে পসন্দ করেন।

লোহার পেরেক, কব্জা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য এখানে তৈয়ার হয়, কিন্তু স্ক্রুপ তৈয়ার হয় না। আজকাল স্ক্রুপ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে; ইহা তৈয়ার করিবার জন্য একটি কলের আবশ্যক। একটি কোম্পানী টাকা তুলিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে পেরেক, স্ক্রুপ প্রভৃতি লোহার জিনিষ তৈয়ার করিবার একটি কারখানা খুলিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। এ ব্যবসায়টি বিশেষ লাভজনক হইতে পারে।

ছোটনাগপুর পাহাড়ে ও বর্দ্ধমান জেলায় রাণীগঞ্জের স্থানে স্থানে ও

ময়ূরভঞ্জের পাহাড়ে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। বেঙ্গল আইরণ ষ্টীল কোম্পানি নামে একটি ইংরাজ কোম্পানী বরাকরের নিকট কেন্দুয়া নামক স্থানে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করাইতেছেন। আমাদেরও ঐরূপ একটি কারখানা করা নিতান্ত আবশ্যক।

এখানে দিয়াশলাই ও সাবানের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেগুলি যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহার জন্য সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ আমরা যদি দেশীয় কলের দেশালাই ও সাবান ব্যবহার করি তাহা হইলে ঐ সকল লাভজনক ও স্থায়ী হইতে পারে। কতকগুলি দেশী দেশালাই বিদেশী দেশালাই অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট হইলেও অনেকগুলিই বেশ ব্যবহার্য্য। বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরির সাবান অতি উৎকৃষ্ট ও বিলাতী সাবান হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; তবে কেন আমরা দেশী সাবান ব্যবহার না করিব? ভারতের গোলাপজল ও আতর জগতে বিখ্যাত; তবে বিদেশী সুগন্ধির ব্যবহার কেন? জামা, কোট, পেণ্টুলন প্রভৃতির জন্য কতক প্রকারের বোতাম এদেশে প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু সর্ব্ব প্রকারের প্রয়োজনীয় বোতাম এদেশে প্রস্তুত হয় না। যতদিন না হয়, ততদিন বিদেশীয় বোতামের ব্যবহার নিবারিত হইবে না। এদেশে হস্তিদন্ত, মহিষশৃঙ্গ, ঝিনুক প্রভৃতি বোতামের উপাদানের অভাব নাই এবং শিল্পীও যথেষ্ট আছে; তবে কেন স্থানে স্থানে বোতাম তৈয়ার করিবার বন্দোবস্ত না হইবে? দেশীয় শিল্পিগণ প্রায় সকলেই অর্থহীন; আমাদের স্বদেশী আন্দোলনকারিগণ তাহাদিগকে অর্থ সাহায্যে উৎসাহিত করিলে ভাল হয়।

সিগারেট খাওয়া বন্ধ হওয়াতে আমাদের দেশের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছিল। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরাও সিগারেটে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; যখন সকলেই বিদেশী জিনিষের ব্যবহার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল, ছেলেরাও সর্ব্বাগ্রে সিগারেটের ধূম পান অভ্যাস ত্যাগ করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে শীঘ্রই আবার কলিকাতায় ও বোম্বায়ে সিগারেট তৈয়ার আরম্ভ হইল ও সকলেই পরিত্যক্ত অভ্যাস আবার আরম্ভ করিতেছে। সিগারেট দেশ হইতে একবারে উঠিয়া গেলে যে বড়ই ভাল হইত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার ব্যবহারে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না।

পঞ্জাব সদর বাজার, লাহোর আম্বালা, আলোয়ার ষ্টেট, ও রাজপুর ডেরাডুনে বিবিধ কাচদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে এখনও কাচ

প্রস্তুতের কারখানা নাই। এদেশে যে সকল লণ্ঠন প্রভৃতি প্রস্তুত হয় সেগুলি বড় ভাল হয় না। শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যে যে উপায়ে সে গুলির উন্নতি হয় সে বিষয়ে শিল্পীদিগকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের অধিকাংশ ব্যবহার্য্য দ্রব্যই আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় ও হইতে পারে। নানাস্থানের প্রস্তুত বিবিধ দ্রব্যের সংবাদ আমরা প্রতি সংখ্যাতেই প্রকাশ করিতেছি; অতএব স্বদেশী জিনিষ পাওয়া যায় না বলিয়া আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নহে। যদি আমাদের প্রকৃত স্বদেশ প্রেম থাকে ও আমরা দেশীয় শিল্পকরগণের দুরবস্থা মোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হই তাহা হইলে যতদূর সম্ভব আমাদের দেশী জিনিষ ব্যবহার করা অতীব কর্ত্তব্য।

বস্ত্র-শিল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হাতের তাঁত কলের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম কিনা,এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে, প্রথমেই দেখা যায় যে, মিলের জন্য এঞ্জিন, তাঁত ও অপর সমস্ত যন্ত্রাদি বহুমূল্যে বিদেশ হইতে আনাইতে হয়; বহুব্যয়ে বিস্তৃত ভূমি ক্রয় ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইতে হয়; যন্ত্রাদির মেরামত বিশেষ অসুবিধা ও ব্যয়সাধ্য; মিল চালাইবার জন্য অধিক বেতনের বিশেষ অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন; আমাদের দেশে এরূপ লোকের বিশেষ অভাব। ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, কেশিয়ার, কেরাণী প্রভৃতি অধিক বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখিতে হয়; প্রতিদিন কয়লা, তৈল, পাট প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যও যোগাইতে হয়। মিলের জন্য নানা স্থান হইতে অধিক বেতন দিয়া মজুর সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়; তাহাদের মধ্যে সামান্যসংখ্যক লোকেও কোন কারণে কার্য্যে অনুপস্থিত কিম্বা ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিলে অথবা অপর কোন কারণে মিল চালাইতে না পারিলে মিলাধ্যক্ষের বিশেষ লোকসান হইয়া থাকে। কলের স্থায়িত্ব কালের অনুপাতে ইহার খরিদ মূল্যের দৈনিক হ্রাস জনিত ব্যয় ও উপরোক্ত নানাবিধ খরচ যোগাইয়া মিলজাত কাপড় প্রকৃত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হাতের তাঁতের কাপড়ের ন্যায় সস্তায় বিক্রীত হইতে পারে না।

হাতের তাঁত এদেশেই প্রস্তুত হয় সুতরাং ইহা খরিদ করিবার জন্য সমস্ত

অর্থ দেশেই থাকিয়া যায়; ইহা প্রস্তত করিয়া সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি দেশীয় বহুলোকেরও অর্থোপার্জ্জন হইয়া থাকে। ইহার মেরামত সামান্য ব্যয় ও সহজ সাধ্য। হাতের তাঁত চালাইতে না পারিলেও বিশেষ কোনরূপ লোকসানের সম্ভাবনা নাই। এ দেশে হাতের তাঁত চালাইবার জন্য সুদক্ষ শিল্পী ও মজুরের কোন স্থানেই প্রায় অসদ্ভাব নাই এবং স্থানীয় লোক লইয়া কার্য্য চালাইতে পারা যায় বলিয়া তাহাদের বেতনের হার অল্প হয়; ইহাতে অপর কোন খরচেরই আবশ্যক হয় না। স্থানীয় গৃহস্থগণ ধর্ম্মঘট কাহাকে বলে তাহা প্রায় জানে না। হাতের তাঁতের স্থায়িত্ব কালও অধিক।

শাকান্ন আহারেও গৃহস্থ অন্ততঃ কয়েকমাস পুরাদমে কার্য্য করিতে পারে; কিন্তু কলকারখানার কয়লা তৈল প্রভৃতির ব্যয় সঙ্কোচ বা কর্ম্মচারিগণের বেতনের হার কমাইলে কার্য্য চলে না। স্বাধীন গৃহস্থ ।০ চারি আনা মজুরী পোষাইলে দৈনিক ৮ ঘণ্টার স্থলে ১২ ঘণ্টা কাজ করিতে পারে; কিন্তু এই অধিক সময় কার্য্যের জন্য মিলওয়ালাগণকে দেড়গুণ হইতে দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয়। তন্তুবায় নিজেই তাহার ব্যবসার ম্যানেজার প্রভৃতির কার্য্য করে, সুতরাং তাহার বাজে খরচের বাব নাই। তাঁতের কাপড় কলের কাপড় অপেক্ষা সুদৃশ্য ও স্থায়ী হয়। এই সকল কারণেই বাষ্প চালিত তাঁতের সহিত হাতের তাঁত এতদিন নানা অসুবিধা সত্বেও প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইয়াছে। সাধারণ তাঁত যে ক্ষেত্রে পরাজিত হয় নাই, উন্নত ধরণের তাঁত সে ক্ষেত্রে জয়ী হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

বস্ত্রশিল্পের উন্নতি এখনও কোন দেশেই যথেষ্ট হয় নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের কল কারখানায় বহুল পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হইতেছে বটে, কিন্তু স্থায়িত্ব ও শিল্প নৈপুণ্যে ভারতের তাঁতের বস্ত্র এখনও তাহাদের শ্রেষ্ঠ। যে দেশের বস্ত্র অপর সকল দেশের অপেক্ষা সস্তা, সুদৃশ্যও স্থায়ী, সেই দেশেরই বস্ত্রশিল্পের প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু এখনও এরূপ উন্নতি কোন দেশেই হয় নাই।

বর্ত্তমানকালে অপর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ এইরূপ উন্নতির অধিক উপযোগী। দেশেই তুলা উৎপন্ন হয়, উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনোপযোগী ভূমিরও অভাব নাই; ভারতের বস্ত্র শিল্পও বহু প্রাচীন, এখনও এদেশের সুনিপুণ বস্ত্রশিল্পীর সংখ্যা ২৭ লক্ষ; ইহাদের দৈনিক মজুরী অপর দেশের তুলনায় যৎসামান্য। এত অধিক বস্ত্রশিল্পী আর কোন দেশেই নাই। উৎসাহের

অভাবে, অন্নাভাবে মুমূর্ষু দশাপন্ন হইয়াও, বাষ্পযন্ত্র চালিত মিলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখনও ইহারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। উৎসাহের অভাবই উন্নতির প্রধান অন্তরায়। এখন দেশমধ্যে যে উৎসাহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, ইহা স্থায়ী ও কার্য্যকর হইলে, মিলের কাপড়রূপ আবর্জ্জনা যে অতি অল্পকাল মধ্যেই ভস্মীভূত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ সত্যই বিলাতী বস্ত্র দগ্ধ করিয়া বৃথা আড়ম্বর প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই যে এদেশ হইতে ইহার তিরোধান সম্ভবপর, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এতদিন দেশী কাপড় চিনিয়া লওয়াই অনেকের পক্ষে একটী দুরূহ ব্যাপার ছিল। ধোপের পর কিরূপ দাঁড়ায়, অনেকে ইহা সহজে অনুমান করিতে পারিত না। বিলাতী "রেলীর উনপঞ্চাশ" বলিলেই যেমন সে কাপড়ের "জমী" বা ভিতর বাহির দেখিতে হয় না, দেশী কাপড় ক্রয় করায় সে সুবিধা ছিল না। অনেক দেশী কাপড়ের "মুখপাত" ও "মাঝারে" বিস্তর প্রভেদ থাকিত; "মাঝার খালি" বা "আঁতখালি" কাপড়ে সূতা এত অল্প পরিমাণ থাকিত যে, একবার ধোয়ান হইলেই সূতা সরিয়া কাপড় অব্যবহার্য্য হইত। বিলাসপ্রিয়গণ-কর্ত্তৃক স্বল্প মূল্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা ও দেশী কাপড়ের ব্যবহার অধিক না থাকায় সামান্যসংখ্যক কাপড় বিক্রয় করিয়া অধিক লাভের চেষ্টাই ইহার কারণ। উন্নত ধরণের তাঁত প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, শিক্ষিত লোক বয়ন কার্য্যে দৃষ্টি করায়, এবং দেশের লোক দেশীয় বস্ত্রে আস্থাবান হওয়ায়, এই অল্প কয়েকদিনেই দেশীয় বস্ত্র নির্ম্মাণের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ২।৩ মাসের মধ্যে যে উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাতে ২।১ বৎসরের মধ্যে যে দেশে বস্ত্র নির্ম্মাণের বিশেষ উন্নতি হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

হস্ত চালিত বয়ন শিল্পের উন্নতি ও বহু বিস্তৃতি যে আমাদের দেশের বিশেষ উপযোগী ও অশেষ কল্যাণকর, আমরা তাহা বিশদরূপে বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের যুক্তির সার মর্ম্ম এই যে, বস্ত্র সংগ্রহেই দেশের অনেক অর্থ বিদেশে চলিয়া যাওয়ায় দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে অর্থাৎ প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশ হইতে প্রায় ৫০ হাজার গাঁইট কাপড় বিদেশে রপ্তানি হইত। ইহার ২৫ বৎসরের মধ্যেই এই রপ্তানির পরিমাণ প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছিল। তাহার পর

প্রায় ২৫ বৎসর ভারতের কাপড় ভারতবর্ষেই ব্যবহৃত হইত। ১৮৫৮ সালে এদেশে ৫ কোটী টাকার কার্পাস বস্ত্র বিদেশ হইতে আমদানি হয়। এই আমদানির পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ১৮৭৭ সালে ১৬ কোটী টাকায় ও গত বৎসর ৩৪ কোটী টাকায় উঠিয়াছে। অপর সকল শিল্পাপেক্ষা ইহা যেমন অতীব প্রয়োজনীয়, এই শিল্প শিক্ষা করায় এদেশে সেইরূপ বিশেষ সুবিধা। আমাদের দেশের বহু প্রাচীন কত উৎকৃষ্ট শিল্প আমাদের দোষেই বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে; আমরা সে গুলির উন্নতি ও রক্ষার জন্য উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া বিদেশ হইতে নূতন শিল্প শিক্ষা করিবার জন্য ছাত্র পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছি। যাহা স্বল্প ব্যয়ে ও সহজে সম্পন্ন হইতে পারে ও যাহাতে দেশের অবশ্য মঙ্গল সাধিত হইবে, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা বহুব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অনিশ্চিত মঙ্গলের আশায় উন্মত্ত আছি। যে সকল দেশে সভ্যতার আরম্ভমাত্র হইয়াছে, সে দেশের লোক অপর প্রাচীন সভ্য দেশ হইতে বিবিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইবে ইহাই সাধারণ নিয়ম। ভারতবর্ষ হইতেই যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে; তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। আধুনিক সভ্যগণের নিকট আমরা যে কিছুই শিক্ষা করিতে পারি না তাহা নহে; তবে, আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয়, বিশেষ উপযোগী ও উৎকৃষ্ট পন্থা ত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র অনুকরণ প্রবৃত্তির বশে অকিঞ্চিৎকর বা অনিশ্চিত শিক্ষার জন্য উৎসাহান্বিত হওয়া কোন ক্রমেই সুবিহিত নহে। বস্ত্রশিল্পীর এদেশে অভাব নাই, তুলা প্রভৃতি উপাদানেরও অসদ্ভাব নাই এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও এদেশে প্রচুর। নিরন্ন দরিদ্রগণকে এই শিল্প শিক্ষায় সাহায্য করিতে পারিলে, তাহাদের অন্নকষ্ট বহুল পরিমাণে লাঘব হইতে পারে; দৈনিক অতি সামান্য মাত্র উপার্জ্জনেই তাহারা সন্তুষ্ট, সুতরাং তাহাদের সহিত কল কারখানা এ শিল্পে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে না। কাইরো ও ইয়ুরোপের অনেক স্থানে হাতের তাঁত কলের সহিত প্রতি-যোগিতায় সক্ষম হইয়াছে; সেখানে ইহাতে দিন ৪৮ গজ পর্য্যন্ত কাপড় বয়ন করা যায়; সুতরাং এদেশেও ইহা অসম্ভব হইবে না। হ্যাভেল সাহেব বলেন, বিদেশী আমদানীর পরিমাণ কাপড়ের অধিকাংশই হাতের তাঁতে প্রস্তুত করাইলে বেশ লাভ থাকিতে পারে। সূতার অভাবই এই শিল্পের প্রধান অন্তরায়; মিলওয়ালাগণ সূতার দর অযথা বৃদ্ধি করিলে ও পাইকারগণ অত্যাধিক লাভে তাঁতিদিগকে সূতা বিক্রয় করিলে, অর্থাৎ বস্ত্রের জন্য

প্রয়োজনীয় সূতা তন্তুবায়গণকে যদি প্রায় মিলের উৎপন্ন বস্ত্রের দরেই ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলেই বয়ন শিল্পের উন্নতির আশা নিতান্ত অসম্ভব। বিলাতের মিলে এক পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত করিতে যে খরচ হয়, এদেশের মিলে তাহার অর্দ্ধেক খরচ হইয়া থাকে; সুতরাং দেশীয় মিলের সূতা আমাদের দেশে বিশেষ সুলভ মূল্যেই বিক্রীত হওয়া উচিত। যাহাতে দেশের দরিদ্রগণ আপনারাই সূতা প্রস্তুত করিতে পারে, কিম্বা, সে ব্যবস্থায় অসমর্থ হইলে, যাহাতে তাহারা উচিত মূল্যে সূতা পাইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। হাতের তাঁতের বস্ত্রের জন্যই আমাদের আন্তরিক লালসা-সম্পন্ন হওয়া আবশ্য বিধেয়। এখন দেশোৎপন্ন সূতা প্রায়ই মোটা; সুতরাং আপাততঃ মোটা কাপড়েই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে; "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" ইত্যাদি স্বদেশানুরাগ-বর্দ্ধক সংগীত যেন সংগীত মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির অন্তঃসার-বিহীনতা প্রমাণিত না করে।

উন্নত ধরণের তাঁতের বহুল বিস্তৃতিও একান্ত আবশ্যক; তাহার অভাবে যে কোন ধরণের তাঁত ব্যবহারেও বিশেষ আপত্তি নাই; কারণ উন্নতির জন্য তাঁতের বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলির পরিবর্জ্জন আবশ্যক হয় না। সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জনেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কেননা, চেষ্টা করিলে ইহার অসংখ্য গ্রাহক প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষেও ইহা বিশেষ উপযোগী হইবে।

দেশ বিদেশে বস্ত্রের অভাব এখনও প্রচুর; সুতরাং হাতের তাঁত ও মিল উভয়ের সহায়ে দেশের বস্ত্রাভাব পরিপূর্ণ করিতে এখনও অনেক দিন লাগিবে। কিন্তু স্বার্থ সাধনোদ্দেশ্যেই কাপড়ের কল স্থাপিত হউক এবং প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষিগণ তাঁতের বহুল বিস্তারে সচেষ্ট থাকিয়া দরিদ্রগণের অন্ন সংস্থানের উপায় বিধান করিতে থাকুন।

আমাদের দেশে যে প্রাচীন কাল হইতে বস্ত্র শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের শিক্ষিতগণ এতদিন ইহার যন্ত্রাদির উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইলে, ইহার জন্য হ্যাটারস্‌লি ও জাপানী তাঁত প্রভৃতির অনুকরণে আমাদের প্রয়োজন হইত না।

কেহ কেহ অসুবিধা বোধ করিলেও, বস্ত্র শিল্পের উন্নতি-বিধায়ক সঙ্কল্প লইয়া যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নৈরাশ্যের কোন লক্ষণই দেখিতেছেন

না; বরং উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে।

কোন্ তাঁতটী ভাল কোন্টী মন্দ, তাহারই বিচার লইয়া এখনও অনেকে ব্যতিব্যস্ত আছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতেছেন না যে, আর তর্ক বিতর্কের সময় নাই; উপস্থিত যে কোন তাঁত লইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করাই এখন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কার্য্যারম্ভের পরও ইহার উন্নতি হইতে পারে; এবং সেই উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। পূর্ব্বে এক একজন দরিদ্র তাঁতির গৃহেও ২।৩ খানি তাঁত থাকিত, এখনও অনেকের নিকটএকটীর অধিক তাঁত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যাঁহারা একখানি তাঁত কিনিতেও ইতস্ততঃ করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যোপযোগী প্রবৃত্তিরই অসদ্ভাব। জলে নামিবার পূর্ব্বে সাঁতার শিখা যায় না; সেইরূপ, সকল কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য অবগত হইয়া তাহার পর তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার কল্পনা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বা অকর্ম্মণ্যের পূর্ণ লক্ষণ। তবে সাঁতার শিখিবার পূর্ব্বে অধিক জলে নামিতে নাই বলিয়াও আমরা অনভিজ্ঞ লোক-কর্তৃক বহুব্যয়-সাধ্য কল কারখানা স্থাপনের বিরোধী। যে কোন তাঁত লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেই তাহার অসুবিধাজনক অংশগুলি বুঝিতে পারা যাইবে ও তখন তাহার উন্নতিও নিজেই অনেকটা করিতে পারিবেন; এবং তাহাতে অক্ষম হইলে অপরের নিকট শিক্ষা করিবার প্রবৃত্ত ও ঔৎসুক্য উপস্থিত হইবে।

হাতের তাঁতের প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে প্রদর্শনের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি; সুতরাং আমাদের ভূমিকা অতি সুদীর্ঘ হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এ শিল্প সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানের পূর্ব্বে ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের বিস্তৃতিই নিতান্ত আবশ্যক। সুনিপুণ-বস্ত্র শিল্পীর সংখ্যা এদেশে এত অধিক যে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট ২।৪টী করিয়া ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেই, আমাদের আর অপর দেশের নিকট বস্ত্রের জন্য মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না; এবং তাহা হইলেই বার্ষিক প্রায় ৪০ কোটী টাকা আমাদের দেশেই থাকিতে পারে।

কৃষক ও কৃষি।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। এক্ষণে ভারতের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক কৃষিকার্য্য অবলম্বনে দিনপাত করে। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অধিকাংশই কৃষি হইতে সংগৃহীত হয়। কৃষিই দেশীয় ও বিদেশীয়গণের এদেশ হইতে অর্থোপার্জ্জনের প্রধান উপায়; যিনি যে অবস্থা হইতে অর্থ উপার্জ্জন করেন না কেন, তাহার অধিকাংশেরই মূল উৎপাদক কৃষক। শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়ই কৃষির উপর নির্ভর করে। শিল্পবাণিজ্যাদি সহায়ে অপর দেশের বিস্তর অর্থাগম হয়, কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যই এদেশের প্রায় একমাত্র সম্পত্তি। গত বৎসর এদেশ হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য বাদে যে ১৫৭ কোটী টাকা মূল্যের পণ্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রায় ১১০কোটী টাকা মূল্যের পণ্যই কৃষিজাত। গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত বিগত বর্ষের বাণিজ্য বিবরণীর ভূমিকায় রবার্টসন্ সাহেব লিখিয়াছেন,——

"That agriculture is the foundation on which rests the whole economic structure of India is nowhere so plainly revealed as in the export trade".

ভাবার্থঃ—"কৃষিই যে ভারতবর্ষের ধন সম্পদের একমাত্র মূলভিত্তি তাহা রপ্তানী বাণিজ্য বিবরণ ভিন্ন আর কিছুতেই এরূপ স্পষ্ট প্রকাশিত হয় না।"

কৃষিই ভারতের প্রধান সম্পদ এবং ইহার উন্নতি যে অবশ্য প্রার্থনীয় তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন।

ভারতের কৃষকগণ স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু, সরল, সত্যনিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম। ইলিয়ট জেমস্ নামক একজন সাহেব গ্রন্থকার বহুদিন এদেশে বাস করিয়া এখানকার কৃষকগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"কেহ কেহ বলেন,—ভারতের কৃষকগণ অত্যন্ত নির্ব্বোধ; কিন্তু এরূপ উক্তি কোনক্রমেই সত্য নহে। তাহারা বিশেষ বুদ্ধিমান, অধ্যবসায়-সম্পন্ন, মিতব্যয়ী, এবং প্রকৃতই কার্য্যদক্ষ। বিজ্ঞান বা শিক্ষার বিনা সাহায্যে, কেবল পরিশ্রম মাত্র সহায়েই তাহারা যে সুন্দর ভাবে কার্য্য করে, তাহা নিতান্ত বিস্ময়াবহ। প্রায় প্রত্যেক স্থানেই তাহাদের মূল ধনের অভাব, তাহাদের যন্ত্রাদিও সেই আদিম কালের; তথাপি তাহাদের ক্ষেত্র হইতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিলে, কেহই তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না।"

আমাদের দেশের অনেকেও কৃষকগণকে নির্ব্বোধ বলিয়া জানেন; অতিবুদ্ধি জনিত প্রবঞ্চনাদি বুদ্ধিমত্তার অসদ্ভাব দর্শনেই বোধ হয় তাঁহাদের এইরূপ ধারণা। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন, সুবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রগুলির তুলনায় এক একখানি ক্ষুদ্র বস্তির পরিমাণ কিরূপ যৎসামান্য। এই সকল সামান্য বস্তির মধ্যে সাধারণতঃ ২০।৩০ ঘর কৃষকের বাস; তাহারাই "মান্ধাতার আমলের" আদিম হাল (লাঙ্গল) ও অনশন-ক্লিষ্ট বলীবর্দ্দ লইয়া এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র কর্ষণ ও ইহাতে শস্য উৎপাদন করে। সংসারে তাহাদের সহায়মাত্র নাই; উপদেষ্টা নাই, উৎসাহ বা পরামর্শদাতা নাই, বিপদে সাহায্য বা সান্ত্বনা প্রদানের লোক নাই; অসঙ্কুলানে, বিনা অত্যধিক সুদে, ঋণদান করিয়া রক্ষা করিবার কেহ নাই; নৃশংস রাজ বা জমিদারী কর্ম্ম-চারীর বিরুদ্ধে একটা কথা বলিয়া উপকার করে, এরূপ কেহই নাই। কিন্তু ইহারাই চিরদিন আমাদেরই উদরান্ন সংস্থান করিয়া দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত; অর্দ্ধাশন স্বীকার করিয়াও আমাদের অসঙ্কুলানের ভয়ে বীজধান সযত্নে রক্ষা করিতে সচেষ্ট। স্থানে স্থানে অজন্মা বা দুর্ভিক্ষ-জনিত শস্যের মূল্য বৃদ্ধিতেই আমাদের চক্ষুস্থির হয়; কিন্তু অপরাপর দেশের ন্যায় আমাদের কৃষকগণ যদি ধর্ম্মঘট শিক্ষা করে, তাহা হইলে আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইতে পারে, তাহা আমরা ভাবিবারও প্রয়োজন বোধ করি না। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, আমাদের জন্যই সর্ব্বাগ্রে শস্য ছাড়িয়া দিয়া, এই হতভাগ্যগণই তাহার নিদারুণ প্রকোপ সহ্য করে; সুতরাং আমরা আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকি।

মহামতি হিউম সাহেব এদেশের কৃষকগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"আকাশের অবস্থা বুঝিয়া তাহারা কোন্ শস্যের কোন্ জাতি কোন্ দিন বপন করিতে হয়, তাহা ঠিক জানে; বেড়া বা বাঁধ দিলে তাহা যে সর্প মূষিকাদির অবাসস্থান হয় ও তাহার উভয় পার্শ্বের শস্য যে অল্প ফলবান হয় তাহা তাহারা জানে, সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করে। ইউরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষক যেমন ক্ষেত্রের সামান্যমাত্র প্রভেদ-জনিত শক্তি-তারতম্য বুঝিতে পারে, তাহাদের এ বিষয়ে সেইরূপ সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। প্রচুর সার প্রয়োগের ক্ষমতা বিহনেও তাহারা বিবিধ সারের প্রয়োজনীয়তা ও কোন্ ফসলে কি সার দিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানে। তাহাদের নিকৃষ্ট ধরণের লাঙ্গল ও দুর্ব্বল বলীবর্দ্দের যতদূর শক্তি, দূততর গভীর করিয়া প্রয়োজনানুরূপ ভূমিকর্ষণের ও মাটি ধূলার

ন্যায় চূর্ণ করিবার উপকারিতা তাহাদের অজ্ঞাত নহে। সারের অসদ্ভাব থাকিলে,হাতের তালু বা চাটুর ন্যায় জমী ভাঙ্গিয়া সমতল করা যে মূর্খতাসূচক, তাহাও তাহাদের অপরিজ্ঞাত নহে। আগাছা পরিষ্কার সম্বন্ধে তুলনা করিতে গেলে, তাহাদের গোধূম ক্ষেত্র সকল ইউরোপের শতকরা নিরানব্বই সংখ্যক ক্ষেত্রকে লজ্জা প্রদান করিবে।" সুতরাং আমাদের দেশের কৃষকগণ নিরক্ষর হইলেও, অপর দেশের তুলনায় যে নিতান্ত অজ্ঞ নহে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

জেম্‌স্‌ সাহেব বলিয়াছেন,—"এ দেশীয় কৃষকগণের প্রধান দোষ এই যে, তাহারা বহু প্রাচীন নিয়মাবলির একান্ত অনুরক্ত; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছে, তাহারাও সেই ভাবে কার্য্য করে; এবং যতক্ষণ না কোন নূতন প্রণালী সত্যই কার্য্যতঃ উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিতে পায়, ততক্ষণ কিছুতেই তাহার পরীক্ষা করিতে চাহে না।"

ইহাতে তাহাদের পক্ষে দোষাবহ যে কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বোধ হয় জানেন না যে, এই সকল কৃষক গৃহস্থ; লোটা কম্বলমাত্র সম্বল আমেরিকান বা অষ্ট্রেলিয়ান্‌ অভিযান-কারিগণের সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। পরিবারবর্গের অর্দ্ধাশনের উপযোগী অন্নসংস্থান করিতে না পারিলেও ভুমিকর, লবণকর, চৌকিদারী কর প্রভৃতি রাজস্ব হইতে তাহাদের অব্যাহতি নাই। অধিকন্তু তাহারা ঋণদায়গ্রস্ত, সুতরাং আবহমান কাল আচরিত, কতকাংশে নিশ্চিত প্রণালী পরিত্যাগে সহসা উৎসাহান্বিত হইতে পারে না; Speculation বা কাল্পনিক লাভের জন্য আগ্রহ-সম্পন্ন হইলেও নূতন প্রণালী যে বাস্তবিক হিতকর তাহা না বুঝিলে, সে প্রণালী অবলম্বনে সাহসী হইতে পারে না। নূতন কৃষিমাত্রই যে এদেশে অবলম্বিত হয় নাই একথা সত্য নহে; গোল আলুর চাষ, পূর্ব্বে এদেশে ছিল না, ইহার চাষ লাভজনক দেখিয়া অনেকস্থলে নানাপ্রকার গোল আলুর চাষ হইতেছে। পাটের চাষও এই জন্য বহুল বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। ফুলকপি ও বাঁধা কপির চাষও অনেক স্থানে বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

"পর্য্যায় রোপণ" বা এক জমীতে প্রতি বৎসর এক প্রকার ফসলের চাষ না করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ফসল চাষ করিবার উপকারিতা বিষয়ে যে এদেশের কৃষকগণ অজ্ঞ এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। আমরা যতদূর জানি, এদেশের কৃষকগণ এক ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর একজাতীয় ধান্য বপন করে না;

পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন জাতীয় ধান্যেরই আবাদ করিয়া থাকে। তবে নানারূপ অসুবিধা বশতঃ ভিন্ন জাতীয় শস্যের চাষ করিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বে কাজলা আখেরই অধিক চাষ ছিল; ইহার অবনতি দেখিয়া বোম্বাই আখের প্রচলন হয়; এক্ষণে বোম্বাইএর পরিবর্ত্তে শামশাড়া আখের অধিক চাষ হইতেছে। সুতরাং উপকারিতা বুঝিতে পারিলেই এদেশের কৃষকগণ যে নূতনরূপ চাষে আগ্রহ প্রকাশ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক বহুদর্শী লোকের মত এই যে, ইউরোপ প্রভৃতি দেশের কৃষকগণ যে পরিমাণ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার জন্য আপনাদিগকে বাস্তবিক গর্ব্বিত বোধ করিতে পারে, এদেশের কৃষকেরও সেইরূপ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অসদ্ভাব নাই।

এদেশের ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা। প্রায় সকল ফসলের উপযোগী ভূমিই এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চা, কফি, তামাক, গম এবং বিবিধ অপর যে সকল শস্য ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বহু পরিমাণে বিক্রীত হইতে পারে, সে সকল শস্য উৎপাদনের উপযোগী সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড অনেক স্থানে পতিত ও জঙ্গলময় হইয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, এদেশে আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট জাতীয় গোধূম তুলা প্রভৃতি চাযের উপযোগী জমী নাই; সেই জন্যই এদেশে এই সকল কৃষিজাত সে সকল দেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট হয় না। কিন্তু যমুনার তীরবর্ত্তী প্রদেশে যে গম উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সিন্ধু প্রদেশেও উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলার কয়েক বৎসর হইতে চাষ হইতেছে। এই সকল স্থানের ন্যায় উৎকৃষ্ট শস্যোৎপাদিকা ভূমি যে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই প্রচুর পরিমাণে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বহু শস্যোৎপাদিকা শক্তিশীলতা নিবন্ধনই ভারত মাতার নাম "স্বর্ণপ্রসূ"।

ভারতবর্ষ নাতিশীতোষ্ণ দেশ। সেই জন্য এখানে সকল প্রকার ঋতুরই সমাবেশ আছে। ইহার অনেক স্থানেই বর্ষাকালে যথেষ্ট বারিবর্ষণ হয়। অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপাদনের জন্য যেরূপ জলবায়ুর প্রয়োজন, এদেশের জলবায়ু সর্ব্বতোভাবে তদনুরূপ। ভারতের নৈসর্গিক অবস্থা দৃষ্টেই আর্য্যগণ এই দেশকেই তাঁহাদের চির আবাস স্থান রূপে নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন।

এদেশের সভ্যতা বহু প্রাচীন; সুতরাং বহুকাল হইতেই এদেশের লোক শিক্ষিত; বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের লোক পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ; এবং শিক্ষা ও সভ্যতায় ভারতবাসিগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

বলিয়া কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার বাঙ্গালীদিগকে "Athenians of the East" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

রাজা ও জমীদার প্রভৃতির সংখ্যাও এদেশে অনেক। ইহাঁদের মধ্যে শিক্ষিত ও হৃদয়বান ব্যক্তিও অনেক আছেন; কৃষিই যে ইহাঁদের প্রায় একমাত্র অর্থাগমের উপায়, তাহা ইহাঁরা বিশেষরূপ অবগত আছেন; সুতরাং কৃষির উন্নতি বিধানে যে তাঁহাদের সমূহ উপকার সম্ভব, ইহা তাঁহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না।

আমাদের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ দূরদর্শী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত বাণিজ্য বিবরণী হইতে আমরা যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তদ্দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কৃষির নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহাদের সন্দেহমাত্র নাই।

আমরা এতদূর পর্য্যন্ত যে চিত্র অঙ্কিত করিলাম, তাহা বাস্তবিকই অতীব বিচিত্র ও নিতান্ত আশাপ্রদ। এ চিত্র দর্শনে সহজেই অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে কৃষিই ভারতের প্রধান সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইলেও, এদেশে এরূপ অধিক সংখ্যক বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ কৃষক থাকিলেও, এদেশের ভূমি ও জলবায়ু কৃষির বিশেষ উপযোগী হইলেও, অধিবাসিগণ বহুকাল হইতে সভ্য ও শিক্ষিত হইলেও, এবং জমীদার, রাজা ও গবর্ণমেণ্ট কৃষির প্রয়োজনীয়তা সম্যক্ উপলব্ধি করিলেও, এতদিনে এদেশে কৃষির অবশ্য প্রার্থনীয় উন্নতির বিশেষ কিছুই সাধিত হয় নাই কেন? কৃষকগণের নিত্য ব্যবহৃত

"আছে গরু না বয় হাল,—তার দুঃখ জন্মকাল।"

এই আক্ষেপোক্তিই উক্ত প্রশ্নের একমাত্র উত্তর। কেহ বা অনাহারে শীর্ণ, সুতরাং কার্য্যে অক্ষম; এবং কেহ বা কেবল মাত্র অন্নধ্বংশ করিতেই মজবুত, কর্ত্তব্যপালনে অলস ও উৎসাহহীন। কৃষির অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সকলেই বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলেও, উন্নতির নিতান্ত আবশ্যকতা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিলেও এবং উন্নতি বিষয়ক সঙ্কল্প কোন কোন সময়ে কতক পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইলেও, ফলে এ পর্য্যন্ত প্রায় সেই "থোড়, বড়ি, খাড়া; আর খাড়া, বড়ি, থোড়"। উপরোক্ত বিবিধ সুবিধা সত্ত্বেও, দেশের এবং গবর্ণমেণ্টেরও নিঃসন্দেহে মঙ্গলবিধায়ক, কৃষির উন্নতি সম্পাদন যে এতদিন আমাদের অসাধ্য রহিল, ইহা যে আমাদেরই নিতান্ত দুর্ভাগ্যসূচক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

উন্নতির বিষয় চিন্তা করিবার পূর্ব্বে, দেশের আধুনিক কৃষির অবস্থা, বা প্রথমতঃ কৃষক প্রভৃতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। আর্থিক অবস্থাভেদে কৃষকগণকে অন্যান্য বৃত্ত্যবলম্বীর ন্যায় অবস্থাপন্ন, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অবস্থাপন্ন কৃষকের সংখ্যা অল্প, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কৃষকের সংখ্যাই অধিক এবং মধ্যবিত্ত অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা আরও অধিক।

বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকাতে জমিদার ও প্রজার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল; কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন বন্দোবস্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট খাজানা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; তজ্জন্য প্রজারা করভারাক্রান্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে অবস্থাহীন হইয়া পড়িতেছে। যে সকল দরিদ্র কৃষকের দুই চারি বিঘা জমি আছে, তাহারা অতি কষ্টে দৈনিক মজুরি দ্বারা কোন ক্রমে অর্দ্ধাশনে দিনপাত করে। অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টি বশতঃ এক বৎসর ফসল নষ্ট হইলে তাহাদের দুর্দ্দশার একশেষ হয় এবং অনেকেই অনাহারে কালগ্রাসে পতিত হয়। অধিকাংশ কৃষকই ঋণদায়গ্রস্ত; কোনরূপ দায় দফা উপস্থিত হইলেই তাহারা ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। নচেৎ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অর্থাৎ স্বীয় অবস্থার উন্নতির জন্য, বা কেবল মাত্র উদরান্নের জন্য তাহারা ঋণগ্রহণ করিতে প্রায় সহসা অগ্রসর হয় না, মহাজন ও জমিদারগণ যে হারে সুদ আদায় করেন, তাহাতে ঋণী কৃষকের আসল ঋণ কখনই শোধ হয় না; চিরকালই সুদ দিতে দিতে তাহার জীবনান্ত হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই সুদের হার আসলের অর্দ্ধেক, কোন কোন স্থানে চতুর্থাংশ, তাহার পর আবার জমীর খাজনা কিম্বা ফসলের অর্দ্ধেক ভাগ। মনে কর, একজন কৃষকের দুইবিঘা জমি আছে; ইহার খাজনা দুই টাকা হিসাবে চারি টাকা, আর যদি সে দুই মণ ধান কর্জ্জ লইয়া থাকে, তাহাকে সুদ সমেত তিন মণ দিতে হইবে। দুই বিঘার উৎপন্ন যদি বার মণ হয়, কৃষককে খাজনা ও ঋণ শোধে ইহার প্রায় সাত মণ ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং তাহার আর পাঁচ মণ মাত্র ধান্য অবশিষ্ট রহিল; ইহা হইতে বীজের দাম ও আবাদের খরচ বাদে যাহা থাকে, তাহাতে অতি কষ্টে একজনের মাত্র দুই মাস গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে, এরূপ হিসাবে, দশ বিঘা জমি থাকিলে তবে এক জন মাত্র কৃষকের এক বৎসর জীবন ধারণ হইতে পারে। যাহার তিন চারিটী পোষ্য, তাহার আরও জমির আবশ্যক; ২৫ কি ৩০ বিঘা জমি আবাদ করিতে না পারিলে, একটি মধ্যবিত্ত কৃষক গৃহস্থের

সচ্ছন্দে চলিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে দায় দফা জনিত ঋণ কিছুতেই পরিশোধ করিবার উপায় হয় না। ইহার পর, যদি অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি জনিত অল্প শস্যোৎপত্তি হয়, কিম্বা অসুস্থতাবশতঃ বা অন্য কোন কারণে জমির উপযুক্তরূপ আবাদ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে জমি বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে বাধ্য হইতে হয়। মহাজন অত্যধিক হারে সুদ আদায় করে, সুতরাং সুদ বন্ধ হইলেই জমি বিক্রয় করিয়া তাহার টাকা আদায় করে। এইরূপে অনেক মধ্যবিত্ত কৃষক তাহাদের জমি বিক্রয় করিয়া ক্রমশঃ ভাগচাষীরূপে জমি আবাদ করিতে বাধ্য হইতেছে। এইরূপ চাষে অনেকস্থলে তাহারা মজুরির অর্দ্ধেক পরিমাণে ফসলও পায় না; কিন্তু অপর মজুরির যেখানে কোন সম্ভাবনা নাই, সেখানে তাহাদের এই সামান্য মাত্র উপার্জ্জনেই সন্তুষ্ট না থাকিলে আর উপায় কি?

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশের সাধারণ কৃষকের অবস্থা অতি শোচনীয়। অন্নাভাবে ও নানাবিধ ব্যাধির আক্রমণে দরিদ্র কৃষক দুর্ব্বল ও কার্য্যে অপটু হইতেছে। পল্লীগ্রামের বস্তিগুলি একেবারে বাসের অযোগ্য বলিলেই হয়। চতুর্দ্দিক আবর্জ্জনা ও পূতিগন্ধময়; কোন স্থানেই পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দোবস্ত নাই। পানীয় জলের পুষ্করিণীগুলির জল দুর্গন্ধময় ও অব্যবহার্য্য; আবার পুষ্করিণীগুলিতে পানা ও অন্যান্য জলজ পদার্থ চির বিদ্যমান। কৃষকেরা বাধ্য হইয়া সেই জল পান ও তাহাতেই স্নান করে। ইহাতে যে তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত ও চিররুগ্ন হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? এই সকল পুষ্করিণীর অধিকাংশই জমিদারের খাস; সুতরাং কৃষকগণ তাহার পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতিতে মনোযোগী হয় না। কৃষকগণের বাসগৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া চির প্রসিদ্ধ ছিল; কিন্তু ইহারও অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। চালে খড় দিতেই অশক্ত হইলে, আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কোথা হইতে আসিবে! স্বাস্থ্যের অবনতিও ইহার অন্যতম কারণ ও পরিণাম। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে প্রচুর দুগ্ধ পাওয়া যাইত; কিন্তু গোচর ভূমির অভাবে গোপালন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হওয়ায় কৃষকগণ অনেকস্থলেই শিশু এবং রোগীর জন্যও দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে পারে না; আমরা অনেক গ্রাম দেখিয়াছি, সেখানে কৃষকশিশু মাতৃস্তন্য ব্যতীত অপর দুগ্ধ দেখিতেও পায় না। উপরোক্ত নানাকারণে মাতারও রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্যও তদনুরূপ হইয়া থাকে। দারিদ্র্য নিবন্ধন পরিধেয় ও শয্যার অসদ্ভাব বিচিত্র নহে; দরিদ্রগণের চিরদিনই এ গুলির

অসদ্ভাব, কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি হইলে বস্ত্রাদির অভাব বিশেষরূপই অনুভূত হয়। বিলাতী বস্ত্রের আমদানী দেশময় বিস্তৃতি লাভ করিবার পূর্ব্বে কৃষক নিজের ক্ষেত্রেই তুলা উৎপন্ন করিত ও কৃষক কন্যাগণ তাহা হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া দিত; ইহাতে তাহাদের বিস্তর অর্থ-সাশ্রয় হইত। এখন সে প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় বস্ত্র সংগ্রহে তাহাদের ব্যয়াধিক্য হইয়াছে। অথচ এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য অপর কোনরূপ পরিশ্রমসাধ্য উপার্জ্জনের পথ আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাহারা অলস হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে প্রচুর মৎস পাওয়া যাইত ও ইহা কৃষকগণের অনেকটা অনায়াসলভ্য ছিল; এক্ষণে পুষ্করিণীর সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় ও অনেক পুষ্করিণী মজিয়া যাওয়ায় এবং জমিদারের খাস পুষ্করিণী ও খাল বিল প্রভৃতি ইজারা বিলি হওয়ায়, তাহাদের এ সুবিধা ও লোপ পাইয়াছে। সেকালে কবির গান, যাত্রা, পার্ব্বণ প্রভৃতি অনেক নির্দ্দোষ আমাদেরও বাহুল্য ছিল; ক্রমশঃ ইহার হ্রাস হওয়ায় কৃষকগণের মনের স্ফূর্ত্তিও কমিয়া আসিয়াছে। এই সকল নানাবিধ কারণে কৃষকের স্বাস্থ্য দিন দিন অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে।

এলোপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষ প্রচলন হইবার পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক বর্দ্ধিষ্ঠ গ্রামেই অন্ততঃ এক একজন সুবিজ্ঞ কবিরাজ থাকিতেন; দরিদ্রকে বিনা ব্যয়ে ঔষধ দান, ও তাহাদিগের দ্বারা গাছ গাছড়া সংগ্রহ করিতেন এবং জনসাধারণকে সামান্য সামান্য পাচন ও মুষ্টিযোগ শিক্ষা দিতেন। ইহাতে তাহাদের চিকিৎসা অতি সহজসাধ্য ছিল। দরিদ্রগণের চিকিৎসার জন্য প্রায় অর্থব্যয় হইত না। এখন ডাক্তারির বহুল প্রচারে দেশীয় চিকিৎসা পল্লীগ্রামের অনেক স্থান হইতেই তিরোহিত হইয়াছে। কুইনাইন ও জোলাপ ব্যতীত ইহার অপর ঔষধাদি সাধারণের অজ্ঞাত ও সকলগুলিই ব্যয়সাধ্য। আবার ইহার পথ্যাদিও পল্লীগ্রামে অনায়াসলভ্য নহে; সুতরাং চিকিৎসার জন্য কৃষকদিগের অর্থব্যয় ভিন্ন প্রায় গত্যন্তর নাই। তাহাদের অর্থেরও অভাব; সুতরাং বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুই তাহাদের প্রায় একমাত্র ব্যবস্থা হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য পূর্ব্বে কথকতা, পুরাণ পাঠ প্রভৃতি যে সকল পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল এখন তাহা বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায়, কৃষক-গণের শিক্ষার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন অনেক গ্রামেই সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য টোল ছিল; সেই সকল টোলে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য প্রায়ই

অনেক লোক সন্ধ্যাকালে সমবেত হইত; এইরূপেও সাধারণে ধর্ম্ম শিক্ষার বিস্তার হইত। এখন এই সকল টোলও অনেক গ্রাম হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সামাজিক বন্ধন শিথিল হওয়ায় ও কুদৃষ্টান্তের বহু বিস্তৃতিতে কৃষকগণের মধ্যেও কুশিক্ষা প্রবেশ করিয়া তাহাদের ধর্ম্মভীরুতা, সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিলোপ সাধন করিতেছে। কৃষি সম্বন্ধে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অনেকস্থলেই তাহার অধিক শিক্ষালাভের সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। কোন কোন স্থানে সুযোগ সত্বেও অর্থাভাবে তাহার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই; সুতরাং চির পরিচিত প্রথা পরিত্যাগ করে নাই। তবে পুরুষানুক্রমিক এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় কৃষি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণ আছে।

কৃষির প্রধান সহায় গো-মহিষাদির অবস্থারও বিশেষ অবনতি এবং ইহাদের সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, বিশেষতঃ বিহার অঞ্চলে, এই সকল জন্তুর চরিবার স্থান নাই; অনেক স্থলেই পূর্ব্বাপর নির্দ্দিষ্ট গোচর, ভাগাড় ও শ্মশান পর্য্যন্ত আবাদ হইয়া গিয়াছে, তিলমাত্র পতিত জমিও নাই; বর্ষাকালে সর্ব্বত্র আবাদ ও শস্যপূর্ণ; গোচর অভাবে উপযুক্ত আহার না পাইয়া গো মহিষগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করে। মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী লোক গো ও মহিষ মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া প্রতিদিন সহস্র সহস্র পশুহত্যা হইয়া থাকে। আবার চর্ম্মকারেরা চামড়ার লোভে বিষ প্রয়োগেও অনেক গরু মহিষের প্রাণবধ করিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় যে, অনেক হিন্দু আমাদের মহাদেবী ৺ দুর্গা পূজার সময় হতভাগ্য মহিষ শাবকের প্রাণহত্যা দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য সিদ্ধ হইল ভাবিয়া ভগবানের নামে কলঙ্ক প্রয়োগ করেন। পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, প্রতি বৎসর ৺মহাপূজার সময় ছোটনাগপুরের ক্ষত্রিয় মহারাজা স্বহস্তে অনেকগুলি মহিষ শাবক সংহার করিয়া মহানন্দে পূজা সম্পাদন করিয়া থাকেন; প্রায় একশত মহিষকে জঙ্গলী মহারাজার রাতু নামক রাজধানীতে বলি দেওয়া হয়। হায়! এ কুপ্রথা কবে দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে! গরুকে যে হিন্দু পরম উপকারী বলিয়া দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, সেই হিন্দু যে সম-উপকারী মহিষকে কি প্রকারে অনায়াসে বধ করিয়া আনন্দোৎসবে মত্ত হয়, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মুসলমানেরাও ধর্ম্মকার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বক্রীদ প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে গোহত্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের

শাস্ত্রের বিধান আমরা অবগত নহি; কিন্তু আমরা অনেক শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক মুসলমানের নিকট শুনিয়াছি যে, হিন্দুশাস্ত্রে পশুবলির আদেশে যেমন ষড়রিপুর বলিমাত্রই সূচিত হয়, কোরবানও ঠিক সেই এক অর্থবোধক। আমরা সময় ক্রমে ইহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে এইমাত্র বলিতে পারি যে গো মহিষাদি হিন্দু ও মুসলমানের সমান উপকারী সুতরাং সযত্নে রক্ষণীয়।

কৃষকেরা গো মহিষগুলিকে অযত্নে রাখে বলিয়া তাহারা নানারূপ রোগাক্রান্ত হয়। হয়ত, সমস্ত বর্ষায় গরু ও মহিষগুলি অনাবৃত স্থানে কর্দ্দম ও মলমূত্র সিক্ত হইয়া বাঁধা থাকে। সামান্যসংখ্যক যে অবস্থাপন্ন কৃষক আছে তাহারা অবশ্যই আপনার গো মহিষগুলিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে; কিন্তু বহুসংখ্যক দরিদ্র কৃষকের নিজেরই একখানি বা দুইখানি মাত্র জীর্ণ কুটীর; আপনারই বাসগৃহের অভাব সুতরাং গো মহিষ রাখিবার উপযুক্ত গৃহের ব্যবস্থা করিতে পারে না। খড়ের অভাবে কৃষক নিজের বাসগৃহ মেরামত করিতে পারে না, কাজেই গো মহিষাদির উপযুক্ত আহার যোগা-ইতেও সক্ষম হয় না। পতিত ভূমি সকল আবাদে পরিণত হওয়ায় তৃণ সংগ্রহও তাহাদের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কোন কোন স্থানে নিকটের জঙ্গলে গো মহিষাদি অবাধে চরিয়া বেড়াইতে পারিত এখন সে সকল জঙ্গলেরও গোচর কর ধার্য্য হইয়াছে; জঙ্গল ভূমির পরিমাণ হ্রাস হওয়াতে জমিদারগণ অনেক রক্ষণী জঙ্গলেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেখানে গো মহিষাদির প্রবেশ নিষিদ্ধ। কৃষক যে অস্বাস্থ্যকর পানীয় জল ব্যবহার করে, তাহার গো মহিষাদিও সেই জল পান করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হয়। বাস্তবিক আজকাল কৃষকগণের গো-পালন প্রায় নিতান্ত অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আয় বৃদ্ধির জন্য যে পাউণ্ড বা খোঁয়াড় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কৃষককুলের উপর অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে; গো মহিষাদি খোঁয়াড়ে লইয়া যাইতে পারিলে তাহার জন্য পারিতোষিকের ব্যবস্থা থাকায় অনেক অর্থলুব্ধ লোক এই উপায়ে কৃষকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। পাউণ্ডগুলির অবস্থাও অতি জঘন্য; অতি সঙ্কীর্ণ ও অনাবৃত এবং খাদ্যের প্রায় কোন ব্যবস্থাই নাই; অথচ জরিমানার ও কল্পিত খাদ্য সরবরাহের চার্জ অত্যন্ত অধিক। যাহাদের ফসল রক্ষার কল্পনায় এই পাউণ্ড প্রথার সৃষ্টি তথাকথিত উপকারের পরিবর্ত্তে ইহাতে তাহাদের উপর অত্যাচারেরই বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

বলিষ্ঠ ষাঁড়ের অভাবেও গোজাতির বিশেষ অবনতি হইতেছে; পূর্ব্বে যে সকল দাগা ষাঁড় অবাধে চরিয়া বেড়াইয়া হৃষ্টপুষ্ট ও সবল হইত, এখন দেশে সভ্যতার সহিত মিউনিসিপালিটীর আবির্ভাব হওয়ায় সে সকল ষাঁড় ইহারই কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, গোজাতির অবনতিমূলক প্রত্যেক কারণই আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

দেশের মঙ্গলোপায়।

দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনই স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল দুই এক দিন কিম্বা দুই এক বৎসরের মধ্যে সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। ক্ষেত্র কর্ষণ, সার প্রয়োগ ও প্রয়োজনানুরূপ জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে তবে তাহাতে যথাসময়ে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বৃক্ষে পরিণত হইবে; কেবল বৃক্ষ হইলেই তাহাতে ফল উৎপন্ন হইবে না; বৃক্ষের সুফলের জন্য তৎপ্রতি যত্নশীল হইতে হইবে। কাজেই ফল সুদূরবর্ত্তী এবং আয়াসসাধ্য।

আমাদের অনেকে ইতিমধ্যেই স্বদেশী সামগ্রী সকল বিদেশীয়ের সহিত তুলনা করিয়া নানারূপ উপহাসের কথা বলিতে থাকেন; যদিও ঐ সকল শ্রেণীর লোককে আমরা যথার্থ দেশহিতৈষী বলিয়া গণ্য করিতে পারি না, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা দিন দিন যত কম হয় এবং দেশের প্রত্যেক লোক যাহাতে দেশের প্রতি যথার্থ অনুরক্ত হয়, সে জন্য সবিশেষ যত্নশীল হওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত আমরা এ বিষয়ে কৃতকার্য্য না হই, সে পর্য্যন্ত প্রত্যেক যথার্থ দেশহিতৈষীর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে।

জাতীয় মহাসমিতির উনবিংশ অধিবেশনের প্রাক্কালে ভারতহিতৈষী মাননীয় শ্রীযুক্ত হিউম সাহেব যে বক্তৃতাটি পাঠ করিয়াছিলেন, সকল শিক্ষিত স্বদেশবাসীর তাহা মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন—

"ভারতীয়গণ আন্দোলনে নিবৃত্ত হইলে কিম্বা অনাস্থা প্রদর্শন করিলে ভারতবর্ষ চির অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে।"* সুতরাং আন্দোলন যে দেশের অশেষ কল্যাণবিধায়ক তাহা জনসাধারণেরও হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত।

দেশের কি ভদ্র, কি ইতর, কি দরিদ্র, কি ধনী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকেরই যাহাতে বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের এখন যে অবস্থা, তাহাতে দেশময় স্বদেশানুরাগ প্রবৃত্ত উদ্দীপিত করা দুই এক দিন বা দুই এক বৎসরে অসম্ভব; তবে দেশের লোকের প্রতিজ্ঞা যেরূপ দৃঢ়তর হইবে, সেই পরিমাণেই ইহা ক্রমশঃ অভীষ্ট ফল প্রসব করিবে এবং ক্রমশঃ দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে। আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যেরূপ বিরল,তাহাতে ইহা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। শুদ্ধ খবরের কাগজে বা সভায় আন্দোলন করিয়া ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। প্রথমতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়গণকে দেশের ইতিহাস এবং দেশের প্রকৃত অবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ যাহাতে তাঁহাদের এই শিক্ষার ফল অশিক্ষিত লোকে লাভ করিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ইহা অনেক উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে।

১ম,—সভায় আন্দোলন; প্রতি জেলায়, প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে এরূপ সভার অধিবেশন করিতে হইবে; এবং যাহাতে সমাগত লোক ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে তৎপ্রতি যত্নশীল হইতে হইবে।
সভার সদস্যগণকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই যথার্থ দেশ হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে; কুটীলতা-পূর্ণ, স্বদেশদ্রোহী রাজ-অনুগ্রহ মাত্রাকাঙ্ক্ষী ও স্বার্থ-পরগণের কুটীল ভ্রূভঙ্গীতে ভীত হইলে, অভীষ্ট লাভের আশা সুদূর পরাহত হইবে। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" ইহাই মূল মন্ত্র করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে ভগবানের কৃপালাভে অধিকারী হওয়া যাইবে না।—২য়; যখন যেখানে ২।৪ জন একত্রিত হইবে, সেইখানেই দেশের প্রকৃত অবস্থা এবং প্রতীকারের উপায় আলোচনা করিতে হইবে; অশিক্ষিত দরিদ্রগণের সংসর্গ উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে স্বদেশবাসী বন্ধু বিবেচনা করিয়া এই সারতত্ত্ব, দেশের কথা এবং তাহাদের দ্বারা দেশের কিরূপ উপকার সাধিত হইতে পারে, ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে এরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিতে হইবে যে, যাহাতে তাহারা তাহাদের বন্ধু বান্ধব ও সমাজে এই অবস্থা ও প্রতীকার বিষয়ক জ্ঞান প্রচারে যত্নশীল হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা সমাজ শাসিত হয় সত্য, কিন্তু তাঁহারা অশিক্ষিতের সহায়তা ব্যতিরেকে

একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না ; সেইজন্য খবরের কাগজে প্রচার ও সভায় আন্দোলন আবশ্যক হইলেও, ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে অধিবাসিগণের কেবল এক পঞ্চমাংশ মাত্র লোক সামান্যরূপ শিক্ষিত এবং অবশিষ্টগণ নিরক্ষর, সেখানে শুদ্ধ ইহাতেই নিশ্চিন্ত থাকিলে,এ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না ; সেই জন্যই মৌখিক আন্দোলন ও ব ক্তিগত সাহায্য এতাদৃশ আবশ্যক। এইরূপ পরস্পরের সাহায্য এবং মৌখিক আন্দোলন ব্যতীত দেশব্যাপী জ্ঞান উদ্দীপনার আর কোনও প্রশস্ত উপায় আছে কিনা সন্দেহ। আরও ইহাতে কার্য্যের সুশৃঙ্খলা ও তৎপরতা হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ এ প্রকার অশিক্ষিত-প্রধান দেশে কোনও বিষয় শীঘ্র প্রচার করিতে হইলে এবং তাহার সার মর্ম্ম আপামর সকলের অনুধাবন-যোগ্য করিতে হইলে ইহাই প্রধান উপায়। যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ দেশব্যাপী জ্ঞানের অভ্যুত্থান না হয়, ততদিন সভা ও মৌখিক আন্দোলনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম হইতে নিরাশ হইলে কোন অনুষ্ঠানই সফল হয় না। উপরোক্তরূপেই ভবিষ্যতে দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে ; এমন কি, আমাদের শাসনকর্ত্তারাও ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের দেশকে তাচ্ছিল্য করিতে সাহসী হইবেন না। প্রজার উদ্যম যদি একাগ্র এবং সাধারণ হয়, বিদেশী রাজা যতই কেন হৃদয়হীন স্বার্থপর হউন না, তাহাদের অভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য হইবেন। সেই জন্যই এইরূপ সম্মিলনের কোনও সম্ভাবনা দেখিলে, শাসনকর্ত্তারা নানারূপ বাধা ও বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া শিক্ষিত লোকের সে চেষ্টা নিষ্ফল করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন ; সুতরাং প্রজাগণেরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং ন্যায়সংগ্রামে মনের সাহস একান্ত বাঞ্ছনীয়। মহৎ কার্য্যের জন্য অগ্রসর হইতে হইলে, মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার ও কায়মনে যত্ন নিতান্ত আবশ্যক। দেশের মঙ্গল সাধন—কোটী কোটী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্বদেশবাসীর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় উদ্ভাবন-অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য আর কি হইতে পারে ?

এইরূপে ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধিত হইলে, তবে রোপিত বীজ অনায়াসে বৃক্ষে পরিণত হইয়া সুফল প্রদান করিবে ; তখন লোক সাধারণে বিনা পরামর্শে ও বিনা বাক্যব্যয়ে দেশের মঙ্গল সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া দেশীয় সামগ্রীর ব্যবহার ও বিদেশীয় ত্যাগে কৃতসংকল্প হইবে।

৩য়ঃ—রাজার সহানুভূতি ব্যতীত দেশের মঙ্গল সাধনের উপায় উদ্ভাবন

বিশেষ কষ্টসাধ্য; আমাদের রাজা বিদেশী এবং দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিলেও অনেক সময়ে স্বার্থহানির ভয়ে কিম্বা অন্যান্য অনেক কারণে প্রজার হিত সাধনে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইতে পারেন। রাজা আপনার দেশীয় প্রজাবর্গের মত অবলম্বন করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন; ইংলণ্ডের প্রত্যেকেই নিতান্ত স্বার্থপর বা অনুদার-হৃদয় নহে; সুতরাং যাহাতে ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গের হৃদয় আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে জন্য উপায় অবলম্বনও আবশ্যক। আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা ও শাসন প্রণালী ইংলণ্ডের অনেকেই সম্যক্ অবগত নহেন।' এবং অল্পসংখ্যক যাঁহারা জানেন, তাঁহারাও উদাসীনতা দেখাইয়া থাকেন সুতরাং যথেচ্ছাচারী ক্ষমতাপ্রিয় কর্ম্মচারিগণ প্রজাপীড়নে স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ইহার প্রতীকারের জন্য ইংলণ্ডে নিয়মিতরূপে প্রতিনিধি পাঠান একান্ত আবশ্যক; তাঁহারা তথায় বক্তৃতা দ্বারা তদ্দেশবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিতে যত্নশীল হইবেন; ইংলণ্ডে সংবাদপত্র প্রেরণেও এই উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু দেশবাসীই যাহাতে দেশ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান-সম্পন্ন, দেশের প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন ও আপনাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আগ্রহ সম্পন্ন হয় সর্ব্বাগ্রে সে জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, বিদেশে আন্দোলন করিয়া সেখানকার অধিবাসিগণের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা প্রায় নিরর্থক হইবে।

অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতার সহিত কার্য্য আরম্ভ হইলে, অচিরে সুফল উৎপাদিত হইবে; দেশের শিল্প কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতির পুনরভ্যুত্থান দ্বারা সুনাম-ধন্যা ভারতের গৌরব ও উন্নতি প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ভারতে এই যে নূতন ভাব-প্রবাহ আবির্ভাবের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে, স্বদেশী দ্রব্যাদির প্রতি অনুরাগ ও স্বদেশহিতের স্রোত ক্ষীণ ধারে প্রবাহিত হইবার উপক্রম হইতেছে ইহা কেবল মুষ্টিমেয় বঙ্গবাসী নেতার অতি স্বল্পকালের আন্দোলনের ফল। অতএব এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীরই যোগদান নিতান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে এই দেশ-হিতকর প্রবৃত্তি সমগ্র ভারতব্যাপী হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ পরিকর হওয়া উচিত। যদি এই আন্দোলন উপরোক্ত উপায়ে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। এই মহা সুযোগ পরিত্যাগ করিলে ইহা আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

শ্রীকিশোরিমোহন ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্।

ফ্রেঞ্চ পালিস।

(FRENCH POLISH)

আজ কাল সিন্দুক, বাক্স দেরাজ, আলমারি, খাট, পালং প্রভৃতি সকল প্রকার কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যেই পালিস ব্যবহৃত হইতেছে। সুতরাং পালিস প্রস্তুত করিতে পারিলে অনায়াসেই দুপয়সা উপার্জ্জন হইতে পারে। তাহার উপর কিছু রকমারি প্রস্তুত করিতে পারিলে সোনায় সোহাগা।

ফ্রেঞ্চ পালিশ প্রস্তুতের নিয়ম।

পরিষ্কার গালা—	৫ আউন্স
গম্ স্যাণ্ডারাক (রুইমস্তরি) —	১ "
ম্যাষ্টিক (নবান)—	১ "
স্পিরিট (রেক্‌টিফাএড)—	১ পাইণ্ট

এক পাইণ্ট অর্থাৎ ২০ আউন্স স্পিরিট ২৪ আউন্স বোতলে রাখ। তাহার পর গালা, স্যাণ্ডার্যাক ও ম্যাষ্টিক উত্তমরূপ গুঁড়া করিয়া ঐ বোতলে পূর্ণ কর এবং রীতিমত বোতল নাড়িয়া ১২ ঘণ্টা কাল রাখিয়া দাও। শীঘ্র শীঘ্র আবশ্যক হইলে রৌদ্রে রাখিয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে বোতল নাড়; যখন দেখিবে বোতলের গুঁড়াগুলি সমস্ত গলিয়া গিয়াছে, তখন জানিবে পালিস প্রস্তুত হইল; তৎপরে একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া অন্য বোতলে রাখিয়া দাও। পালিশের সহিত খুনখারাপি দিলে লাল রং হয়; গাম্বুজ দিলে হরিদ্রা বর্ণ হয়; কেবল পালিস দিয়া পালিস করিলে কাষ্ঠের রং হয়। খুনখারাপি বা গাম্বুজের রং করিতে হইলে, এক আউন্স খুনখারাপি বা গাম্বুজ দুই আউন্স স্পিরিটের সহিত ভিজাইয়া রাখিবে। যখন দেখিবে ঐ খুনখারাপি বা গাম্বুজ স্পিরিটের সহিত রীতিমত গলিয়া গিয়াছে, তখন বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া অন্য পাত্রে রাখিয়া দাও। পালিস্ করিবার সময় অল্প করিয়া ঐ রং মিশাইয়া লইবে; যেমন রং করিবার প্রয়োজন হইবে, সেই মত মিশাইয়া লইবে।

পালিস্ করিবার নিয়ম।

অগ্রে সিরিষ কাগজ দ্বারা কাষ্ঠ ভালরূপ ঘসিয়া লইবে। প্রথম মোটা কাগজ তাহার পর সরু কাগজে ঘসিবে; যখন দেখিবে যে, কাষ্ঠ বেশ মসৃণ

হইয়াছে, তখন একটী বস্ত্রের পুটলি ভিজাইয়া কাষ্ঠে রীতিমত লাগাইবে। অল্প শুষ্ক হইলে পুনরায় ঘসিবে ও আবার লাগাইবে; এইরূপ দুইতিন বার লাগান হইলে শেষ বার পালিস্ লইবার সময় অল্প সরিষার তৈল পুটলির উপর লাগাইয়া পালিশ করিবে। তাহা হইলে উত্তম পালিশ হইবে।

টিন, পিতল ও রূপার উপর সোনালী রং সহজে ক'রবার নিয়ম।

ভাল স্পিরিট—	১২ আউন্স
চাঁচ গালার গুঁড়া—	২ "
হরিদ্রা গুঁড়া—	১ "

তিন দিবস ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া লইবে। যে দ্রব্যের উপর রং করিবার আবশ্যক হইবে, সেই দ্রব্য রৌদ্রতাপে কিম্বা অগ্নিতে অল্প গরম করিয়া তুলির দ্বারা রং লাগাইবে; তৎক্ষণাৎ রং শুষ্ক হইয়া যাইবে এবং উজ্জ্বল সোনালী রং হইবে।

অদ্ভুত সন্ন্যাসী।

("সময়" হইতে উদ্ধৃত।)

বিগত ৩১এ জানুয়ারী তারিখে টাউন হলের সভায় আমিও গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু যথোচিত সময়ে উপস্থিত হইতে না পারায়, আমি সভাস্থলে প্রবেশলাভ করিতে পারি নাই। অবশেষে নিরুপায় ও নিরাশ হইয়া টাউন হলের সম্মুখস্থ মাঠে পায়চারি করিতে লাগিলাম। আমার চিত্ত নানা চিন্তায় পূর্ণ ছিল। বোধ হয় স্বদেশী আন্দোলনের কথাই অধিকতর রূপে ভাবিতেছিলাম। আমার সঙ্গে ছাতা ছিল না। প্রখর রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া যেমন একটী বৃক্ষের ছায়ায় যাইব, অমনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আমি থম্‌কিয়া দাঁড়াইলাম। এমন দৃশ্য আমি কখনও দেখি নাই। দেখিলাম, এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া অজস্র ধারে অশ্রুপাত করিতেছেন। সন্ন্যাসীর হাতে ত্রিশূল, গলায় হাড়ের মালা, পরিধানে গৈরিক

বসন, কপালে রক্ত-চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক, গায়ে বন্দেমাতরং অঙ্কিত নামাবলী। সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি তেজস্বিতা ব্যঞ্জক, দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। আমি তাঁহাকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া মনে করিলাম—বোধ হয় সন্ন্যাসী ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। আমি তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম—"আপনি কি অনশনে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন? আমি কিছু পয়সা দিতেছি, আপনি নিকটবর্ত্তী কোন দোকান হইতে কিছু খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিয়া আহার করুন।" বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সম্মুখে—গঙ্গাতীরে যে অনেক দোকান আছে তাহাও আমি তাঁহাকে বলিলাম। কিন্তু সন্ন্যাসী আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রূপে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তরই করিলেন না। অবশেষে আমি নিরুপায় হইয়া তাঁহার মুখের দিকে নীরবে তাকাইয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে তিনি অশ্রুসম্বরণ করিলেন এবং আমার মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করি নাই। কিন্তু ক্ষুধাতুরের কষ্ট দেখিলে তুমি কি সত্যই কাতর হও?"

আমি।—ক্ষুধিত ব্যক্তির কষ্ট দেখিলে কাহার না কষ্ট হয়? ইহা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

সন্ন্যাসী।—হাঁ, মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে ত নহে।

আমি।—কেন, আমরা কি মানুষ নই?

সন্ন্যাসী। আমার ত তাই বোধ হয়। তোমরা যদি মানুষ হইতে, তবে দেশের কোটি কোটী লোকের অনাহারজনিত মৃত্যু দেখিয়াও তোমরা স্থির রহিয়াছ? তোমাদের আকৃতি মানুষের বটে, কিন্তু তোমরা মানুষ নহ। মানুষের ন্যায় আকৃতি হইলেই যদি মানুষ হওয়া যাইত, তবে গরিলা, শিম্পাঞ্জি এবং বানরবিশেষও মনুষ্য নামে অভিহিত হইত।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম, ইনি একজন সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন এবং ইনি কোন সাধারণ কারণে ক্রন্দন করেন নাই। তথাপি তাঁহার অভিজ্ঞতা কতদূর জানিবার জন্য আমি বলিলাম—"দেশের লোক অনাহারে মরিতেছে বলিয়া ত কখনও শুনি নাই। বিশেষতঃ ক্ষুধাতুর ভিখারীমাত্রেই হিন্দুর গৃহে ভিক্ষালাভ করিয়া থাকে। আর যে আর্য্যসন্তান পৃথিবীর মধ্যে

জ্ঞানগরিমায় সমুন্নত ও প্রথিত, আমরা তাঁহাদেরই বংশধর। আমরা মনুষ্য নামের অযোগ্য?"

সন্ন্যাসী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন-"তুমি একবারে অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়া ফেলিলে। একটি একটি করিয়া প্রশ্ন করিলেই ভাল হইত। যাহা হউক, আমি তোমার কথার উত্তর দিতেছি। দেশের লোক অনাহারে মরিতেছে বলিয়া তোমরা জান না! জানিবেই বা কিরূপে? কর্ণ থাকিতেও তোমরা বধির, চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, না জানিবারই কথা বটে! তোমাদের জ্ঞান এখন সংবাদপত্রেই সীমাবদ্ধ। যে স্থানে দুই চারিজন শিক্ষিত লোক আছে, সেই স্থানের সংবাদই সংবাদপত্রে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা যে স্থানে বাস করে, তাহার সংবাদ তোমরা কিছুই জান না। কারণ তাহারা সংবাদপত্রে কোন সংবাদ প্রেরণ করিতে জানে না। কিন্তু এই অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক, ইহারাই সমাজের মেরুদণ্ড, ইহাদের পরিশ্রমের ফলেই তোমরা বাবুগিরি কর। দেশের প্রাণস্বরূপ এই অশিক্ষিত লোকেরা নিয়ত নিপীড়িত হইতেছে, অর্থাভাবে ক্লেশ পাইতেছে, অবিশ্রান্ত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আগে দেশ ধন ধান্যে পূর্ণ ছিল। সহজে বড় একটা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত না। যদি কখনও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত, তবে দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। এখন দুর্ভিক্ষ নিত্য নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতি বৎসর, প্রতি মাস, প্রতিদিনই দুর্ভিক্ষ। দুঃখী লোকেরা তাই আর হাহাকার করে না। আর কত হাহাকার করিবে? যে দুঃখ প্রতিদিনই—প্রতি মুহূর্ত্তেই ঘটে, তাহার জন্য কে কত কাঁদিতে পারে! আর কাঁদিয়াও ত ফল নাই। তাহাদের দুঃখে রাজার চিত্ত দ্রব হয় না—তোমরাও তাহার উপশমের ব্যবস্থা কর না। রাজা তাঁহার কর আদায়ে--আত্মস্বার্থপূরণে নিয়ত ব্যস্ত। তোমরাও মোহান্ধ হইয়া তাহাতে প্রতিনিয়ত ইন্ধন যোগাইতেছ। দুঃখীর দুঃখের কথা শুনিবার লোক কোথায়? তাই তাহারা নীরবে কাঁদে— নীরবে সহ্য করে এবং নীরবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। আমি হিমাচল হইতে কন্যাকুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত ভারতের যাবতীয় স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি—প্রতিদিন অসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তাহারা অতি কষ্টে যাহা উপার্জ্জন করে—তাহা মহাজনের প্রাপ্য, জমিদারের খাজনা এবং বস্ত্রাদি ক্রয় করিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহারা যথোচিত খাদ্য সামগ্রী

না পাইয়া নানা পীড়ায় আক্রান্ত হয়। গ্রামের চৌকীদার থানায় গিয়া মৃত্যু রেজিষ্টারী করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যখন যে পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়—চৌকীদার তাহাই মৃত্যুর কারণ বলিয়া লিখাইয়া দেয়। কিন্তু অনাহারের জন্যই যে পরলোকগত ব্যক্তিরা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল—তাহা ত চৌকীদার বলে না। কাজেই রাজা মনে করেন দেশে দুর্ভিক্ষ নাই—তোমরাও মনে কর দেশের লোক বেশ পেট ভরিয়া খাইতেছে। কিন্তু অনাহারজনিত মৃত্যুতে যে প্রতিদিন কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে—তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর ভীষণ কবলে ভারতবাসীরা যে প্রকারে কবলিত হইতেছে, তাহা স্মরণ করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। আমার গলায় যে হাড়ের মালা দেখিতেছ—তাহা কিসের হাড় জান? যে সব লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, আমি তাহাদেরই অস্থি সংগ্রহ করিয়া এই মালা প্রস্তুত করিয়াছি। আমি যখনই যেখানে যাই—সেখানেই আমি এই মৃত ব্যক্তিদের হাহাকার শুনিতে পাই। শয়নে—স্বপনে—জাগ্রতে সকল অবস্থায় আমি যেন দেখিতে পাই, মা ভারতজননী ভিখারিণী বেশে এক মুষ্টি অন্নের জন্য দুয়ারে দুয়ারে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন।"

সন্ন্যাসী এই পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিলেন। আবার তাঁহার চক্ষু হইতে অজস্র ধারে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্রু বন্ধ করিয়া বলিলেন—"তুমি অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস কর?" আমি বলিলাম—"বুজরুকী বিশ্বাস করি না; কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারি।" তিনি আমার এই কথায় যেন কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন। তার পর কিছুক্ষণ ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন আকাশে কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তাঁহার শান্ত চক্ষু মুহূর্ত্ত মধ্যে রক্তাকার হইয়া গেল। আমি অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু কয়েক মিনিট পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। আমি দেখিলাম—চারি দিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। টাউন হলের এত নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিয়াও আমি আর টাউন হলটীকে দেখিতে পাইলাম না। পথ মাঠ বাড়ী ঘর গাছপালা ক্রমে ক্রমে সবই যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলাম—সন্ন্যাসীও সেই স্থানে নাই। আমি এক গভীর ধূমরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেলাম। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। আমি

কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম—এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী নারী-মূর্ত্তি আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, মস্তকে জটাবদ্ধ কেশভার, হস্ত পদ সুকঠিন শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, চক্ষু দুটী অশ্রুপূর্ণ। দেখিলেই যুগপৎ দুঃখ ও ভক্তির উদ্রেক হয়। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলাম—"কে তুমি মা ?"

রমণী বীণাবিনিন্দিত স্বরে উত্তর করিলেন—"তোমরা যাহার করুণায় অন্ন জল লাভ কর, যাহার কৃপায় তোমরা এখনও বাঁচিয়া আছ, যাহাকে তোমরা পরহস্তে বিক্রয় করিয়াছ, যে তোমদেরই জন্য অন্যের কাছে বন্দিনী, আমি সেই। তুমি দেশের অবস্থা দেখিতে চাহিয়াছ—একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ।" আমি তৎক্ষণাৎ দেখিলাম—হাজার হাজার কোটি কোটি নরাকার প্রেতমূর্ত্তি আমার চারি দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের চক্ষু কোঠরগত হস্তপদ কঙ্কালসার, দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ভয়ঙ্কর চীৎকার ও গর্জ্জনে চারিদিক কম্পিত করিতেছে। আমি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। আমার শরীর দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। আমি কি করিব ভাবিতেছি—এমন সময় উহাদের মধ্য হইতে একটা মূর্ত্তি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ভীত হইও না। নিষ্ঠুর কাপুরুষ—কর্ত্তব্যহীন, একবার আমাদের দশা দেখ। তোমাদের পাপে- তোমাদের অবহেলাতেই আমরা এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছি। আমরা অন্নাভাবের ফলে জ্বর, ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা, উদরাময় প্রভৃতি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পরলোকে আসিয়াছি। আমরা পেটের দায়ে স্ত্রী পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছি—তাহাদের হত্যা করিয়াছি—অবশেষে নিজেরা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের সমশ্রেণীর যে সব লোক এখনও পৃথিবীতে আছে, তাহারা এক দিন আমাদের দশা প্রাপ্ত হইবে। মনে করিও না, কেবল আমাদের শ্রেণীর লোকেরাই এই দশা প্রাপ্ত হইবে। যখন দেশের দরিদ্র লোকেরা নিঃশেষিত হইয়া যাইবে, তখন ক্রমে ক্রমে তোমরা এই দশা-গ্রস্ত হইবে। এবং কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবাসী নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।" তার পর সেই প্রেতমূর্ত্তি কতকগুলি ভীষণদর্শনা উলঙ্গিনী নারীমূর্ত্তির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"ইহাদের এই দশা কেন ঘটিয়াছে জান? জগতে ইহারা বারবনিতা বা কলঙ্কিনী নামে পরিচিত ছিল। পেটের দায়ে কুপথ অবলম্বন করিয়াছিল। আজ পরলোকে আসিয়া তোমাদিগকে অভি-সম্পাত করিতেছে"। এই বলিয়াই সেই প্রেতমূর্ত্তিগুলি 'দে অন্ন, অন্ন দে' বলিয়া

অতি ভীষণ রবে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহারা আমাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া আসিতে লাগিল। আমি ভয়ে অস্থির হইয়া গেলাম। আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

তাঁত সংবাদ

বামনঘাটির সহকারী সব্ ডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যা প্রসাদ বসু মহাশয় আদিষ্ট হইয়া কাশী প্রদর্শনীতে এবং কলিকাতায় কতকগুলি তাঁত দেখিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণের অবগতির জন্য, তাহার সারাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কাশী প্রদর্শনী যে প্রকার হওয়া উচিত সে প্রকার হয় নাই। এখানে কেবলমাত্র কয়েক খানি তাঁত প্রদর্শিত হইয়াছিল; সেজন্য কলিকাতাতেও আর কতকগুলি তাঁত আমি দেখি। নিম্নলিখিত তাঁত গুলি আমি কাশী প্রদর্শনীতে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। যথা (১) বরোদার সয়াজি কটেজ লুম, মূল্য ৩০৲ টাকা (২) পঞ্জাব হাণ্ড লুম মানুফ্যাক্‌টরীর তাঁত মূল্য ৯৮৲ হইতে ১০০৲ টাকা (৩) মাদ্রাজ আর্টস্কুলের লুম (৪) কলিকাতার পালি শিল্পশালার ঠকঠকি তাঁত (শ্রীরামপুরের তাঁতের উন্নত ধরণ) মূল্য ৪০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা (৫) চুঁচড়ার সোম এবং ব্যানার্জির ডবল ফ্লাই সাটল্ লুম, মূল্য ৭৫৲ টাকা। (৬) চন্দননগরের বি, কে, ঘোষের লুম। (৭) চুঁচুড়ার পি, এন্ দের ফ্লাই সাটল্ লুম। (৮) কলিকাতায় নিম্নলিখিত তাঁতগুলি পরীক্ষা করিয়াছি—(১) দীনবন্ধু লুম। (২) জাপানী লুম। (৩) রবার্টহল এণ্ড সন্‌স্ এর লুম। (৪) হাটারস বি, এণ্ড সন্‌স্ এর লুম। (৫) বঙ্কিম লুম। (৬) জহর লাল ধরের লুম। এই সমস্ত তাঁতের মধ্যে কার্য্যকারিতা, গঠন প্রণালীর সরলতা, এবং মূল্য বিবেচনা করিলে সয়াজি কটেজ লুমটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হয়। ইহা বাস্তবিকই কটেজলুম নাম ধারণ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই তাঁতের দুইটি বিভাগ আছে যথা (ক) অতিরিক্ত একটি অংশ, মূল্য ১৫৲ টাকা এই অংশটী যে কোন একটি সাধারণ তাঁতে যোগ করিয়া দিলে তাহার কার্য্যকারিতা শক্তি তিন চারি গুণ বৃদ্ধি পায়। (খ) ঐ অতিরিক্ত অংশটী সহ

সম্পূর্ণ লুম মূল্য ৩০৲ টাকা। এই লুমে এক জন সাধারণ তাঁতি এক মিনিটে এক ইঞ্চি সূক্ষ্ম সূতা বয়ন করিতে পারে। শ্রীরামপুর তাঁতের ন্যায় ইহাতে হাতের দ্বারা দড়ি টানিতে হয় না। আমার বিবেচনায়, এই তাঁত শীঘ্রই আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া উচিত।

গুণানুসারে লাহোরের পাঞ্জাব হ্যাণ্ডলুম ম্যানুফ্যাকটারীর তাঁত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারে। সয়াজি কটেজ লুম অপেক্ষা ইহার কারুকার্য্য অধিক কিন্তু ইহার মূল্য গরিব তন্তুবায়দিগের পক্ষে অত্যন্ত অধিক ; যাঁহারা ফ্যাকটরী করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী হইতে পারে।

মাদ্রাজ আর্টস্কুলের লুম, পি এন, দের লুম এবং পাণি শিল্পশালার লুম শ্রীরামপুরের তাঁতের রূপান্তর মাত্র।

চুঁচড়ার সোম এবং ব্যানার্জির ডবল ফ্লাইসাটল লুমের প্রস্তুত প্রণালীতে কিছু বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

চন্দন নগরের বি, কে, ঘোষের লুম জাপানী লুমের অনুরূপ। অত্যন্ত ভারী ; মূল্য দুই শত টাকার অধিক । দীনবন্ধু লুম এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এখন যাহা আছে তাহা পি, এন, দের লুমের মত ; মূল্য ৬০৲ টাকা, অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোধ হয়।

জাপানী লুমে মোটা সূতার কাজ মন্দ না হইলেও ১৫০৲ টাকা মূল্য সয়াজি কটেজ লুমের তুলনায় অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোধ হয়।

রবার্টহল এণ্ড সনস্, লাঙ্কাশায়ার, ফ্যাক্টরী কার্য্যের পক্ষে কতকটা উপযোগী হইতে পারে। মূল্য ১৫০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

জি হাটার্স বি এণ্ড সনস্, কেলি, ইয়র্কশায়ার, ইংলণ্ড, সকল বিষয়ে বিবেচনা করিলে ইহা আমাদের দেশের পক্ষে তত উপযোগী নহে। ইহাতে ১০ ১২ এবং ২০ নং সূতারই কার্য্য ভাল হয়। মূল্য প্রায় তিন শত টাকা।

বঙ্কিম তাঁত ইহার প্রস্তুত প্রণালী সয়াজি কটেজ লুমেরই মত, মূল্য ৫০৲ টাকা অধিক বলিয়া বোধ হয়।

জহর লাল ধরের লুম—জাপানী লুম অপেক্ষা ইহার কার্য্যকারিতা অধিক নহে ; ২৫০ টাকা মূল্যে এই লুমের প্রচলনের আশা ভরসা কম।

আমরা যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে উপরোক্ত মন্তব্যের সহিত এই সকল

লুম সম্বন্ধে অনেকাংশে আমাদের মতের ঐক্য আছে। আশা করি, "বন্দেমাতরং" সম্প্রদায়ের এবং জাতীয় ধন ভাণ্ডার হইতে প্রতিষ্ঠিত বয়ন বিদ্যালয়ে এই সকল উন্নত ধরণের তাঁতের কার্য্যকারিতা পরীক্ষিত এবং প্রদর্শিত হইবে।

স্বদেশী শিল্প প্রসঙ্গ

কলার সুতা ঃ—(Plantain Yarn) নানাবিধ রঙ্গের। শ্রীমূল রাম বর্ম্মা টেক্‌নিকেল ইনসষ্টিটিউট—(Sree Mul Ram Varma Technical Institute নগের কয়েল।

সলিতা ঃ—প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য এই সলিতা ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা পাকাইবার কষ্ট নাই। নদীয়ার মহাজনপুর হইতে বাবু সতীশচন্দ্র সাধু ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা এক প্রকার উদ্ভিজ্য দ্রব্য।

সাবান ঃ—হিন্দু সাবান, দে, সরকার কোং ৫ নং শত্রুঘ্ন ঘোষের লেন, কলিকাতা। ইহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিলাতির সহিত সর্ব্বাংশে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম।

সেল্‌ফ পালিস ঃ—ইহা কটা চামড়ায় লাগাইলে আর ঘসিতে হয় না। অন্য অন্য ব্রাউন পালিসের সহিত ইহাই ইহার পার্থক্য; প্রস্তুতকারী শ্রীযুক্ত অদ্বৈতনারায়ণ গুপ্ত, ১১ নং পদ্মনাথের লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

নিব ঃ—প্রস্তুত কারক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ কারকুন, ময়মনসিংহ এবং বরিশাল, উজিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ কর্ম্মকারের (আর) মার্কা নিব উত্তম হইয়াছে।

লেড পেন্সিল ঃ—গোঁসাই ব্রাদার কোং, বেনারস সিটি।

চুরুট ঃ—আর, পাল কোং, ব্রহ্মদেশে ৫২ নং ফ্রেজার ষ্ট্রীট, রেঙ্গুনে চুরুটের কারখানা খুলিয়াছেন। চুরুট নাকি উত্তম হইয়াছে।

স্বদেশী ফুড ঃ—বাবু ক্ষেত্র নাথ গুপ্ত ৪নং পার্ব্বতিচরণ ঘোষের লেন এবং এ, কে, চাটার্য্যি, বাঁড়ুয্যে পাড়া, নৈহাটি; শিশু এবং রোগীর ব্যবহারোপোযোগি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন।

বারুলি ঃ—এচ, সি, মুখার্য্যি, শ্যামবাজার, ইনি বিলাতী বারুলি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বারুলি প্রস্তুত করিয়াছেন।

পেষ্টবোর্ড ঃ—বসাক এণ্ড কোং মানিকতলা ব্রিজ. ইষ্ট কেনেল রোড, কলিকাতা, ইঁহাদের নিকট পেষ্টবোর্ড পাওয়া যায়।

জীবন প্রভাত কোং খাপরেল বাজার, মেদিনীপুর, ইঁহারা ব্লাকিং, ব্রঙ্কো, ব্ল্যাঙ্কো, হেয়ার পিন, টয়লেট পাউডার, বুরুস, কালি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন।

স্বদেশী প্রতিজ্ঞা।

বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিষ ব্যবহার করিব বলিয়া আমাদের দেশের অনেকেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বিগত ১৬ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় যে মহা সমিতির অধিষ্ঠান হয়, সেই সমিতিতে সর্ব্ব সাধারণ সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করা হয়। তাহার পর স্থানে স্থানে সভা সমিতিতেও অনেক লোক পুনঃ পুনঃ এই প্রতিজ্ঞাটি করিয়াছেন এবং অনেকে প্রতিজ্ঞা পত্রে সাক্ষরও করিয়াছেন। এই প্রতিজ্ঞাটি যে বিশেষ গুরুতর তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা রক্ষা করিতে পারিলেই আমাদের জাতীয় সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে এবং ইহার লঙ্ঘনেই আমাদের যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশায় থাকিতে হইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই অল্প দিনের মধ্যেই অনেকেই এই মহৎ প্রতিজ্ঞাটী লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্ববৎ বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি যে, যে সকল বাজার ও দোকানে বিদেশী বস্ত্র, চিনি, লবণ প্রভৃতির বিক্রয় একবারে বন্ধ হইয়াছিল সে সকল বাজার ও দোকানে আবার সেই সকল দ্রব্যের বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। ইহা বড়ই লজ্জা ও দুঃখের কথা। যে সকল কুলাঙ্গার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বিমুখ, তাহারা মনুষ্যনামের অযোগ্য, তাহারা পশু হইতে কোন প্রকারে উচ্চ শ্রেণীর জীব বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি কাল প্রতিজ্ঞা করিয়া আজ তাহা ভঙ্গ করে, তাহাকে সমাজ হইতে বহিস্কৃত করা অতীব কর্ত্তব্য। হিন্দু শাস্ত্র বলেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীকে নিরয়গামী হইতে হয়। সাধারণ লোকে বলে যে, যে মানুষের কথার ঠিক নাই, সে মানুষ মানুষই নহে;

অর্থাৎ সে মনুষ্য অপেক্ষা অধম। এরূপ লোক দেশ ও সমাজের কণ্টক স্বরূপ, সুতরাং সমাজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। আমরা এরূপ লোককে আর কোন আইন বিরুদ্ধ শাস্তি দিতে কিম্বা নিগ্রহ করিতে বলি না। হিন্দু ও ও মুসলমান সমাজে বহুবিধ সামাজিক শাস্তির বিধান আছে; সমাজ রক্ষার জন্য সেই সকল শাস্তির প্রয়োগ আবশ্যক। বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার, কোন পাপ কিম্বা সমাজ বিরুদ্ধ কর্ম্ম নহে বলিয়াই যদি বিবেচনা করা যায়, তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ নিশ্চয়ই একটি দুষ্কর্ম্ম। এই দুষ্কর্ম্মের জন্য আইনে কোন শাস্তির ব্যবস্থা নাই; কাজেই সমাজ হইতে শাস্তি প্রদান আবশ্যক।

যে সকল লোক স্বদেশী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, কিম্বা ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত, তাহারা আপন আপন দুষ্কর্ম্মের পোষকার্থে বলিয়া থাকে যে ব্যবহার্য্য দেশী জিনিষ দুষ্প্রাপ্য কিম্বা দুর্ম্মূল্য, সুতরাং তাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও পালনে অসমর্থ। আমরা প্রত্যুত্তরে বলি যে, তাহাদের একথা সম্পূর্ণ অলীক। ভারতবর্ষ এতদিন পৃথিবীর সকল দেশের ব্যবহার্য্য দ্রব্য যোগাইয়াছে, যেখানকার শিল্পজাত বস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্য জগতের সর্ব্বত্র বিখ্যাত সেই ভারতবর্ষে ব্যবহার্য্য শিল্প দ্রব্যের অভাব বলিলে নিশ্চয়ই মিথ্যাকথা বলা হয়। এদেশে ধনী, বিলাসী, নির্দ্ধন, সকল শ্রেণীর লোকের আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং এখনও হয়। বিদেশীয়গণের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের অবনতি হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এখানে সর্ব্বপ্রকার শিল্পজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেশী কলের ও তাঁতের কাপড় যথেষ্ট তৈয়ার হইতেছে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই আজকাল এদেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। একবার কলিকাতার বাজারে পরিভ্রমণ করিলেই আমাদের কথার সত্যাসত্য প্রমাণিত হইবে। কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে স্বদেশী জিনিষের দোকান ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং আবশ্যকীয় জিনিষের সংখ্যা ও পরিমাণও বর্দ্ধিত হইতেছে। যাহারা মনে করে যে, দেশী সকল দ্রব্যই বিদেশী দ্রব্য অপেক্ষা মূল্যবান, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। মানচেষ্টারের কাপড় দু চারি আনা অল্প দরে পাওয়া যায়, কিন্তু দেশী মিল কি তাঁতের কাপড় অপেক্ষা অল্প দিন স্থায়ী হয়। দশ টাকা মূল্যের একখানি দেশী আলোয়ান দশ বৎসর ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু সেই মূল্যের একখানা বিলাতী র‍্যাপার পাঁচ বৎসরেই নষ্ট হইয়া যায়। একটি আট আনা দামের এনামেলের গেলাস এক বৎসরের মধ্যেই অব্যবহার্য্য হইয়া যায়, কিন্তু সেই

দামের কাঁসার গেলাস দশ বৎসর অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে; আবার ভাঙ্গিয়া যাইলেও অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হয়। অন্যান্য সকল জিনিষ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে; তবে দ্রব্যাভাব ও মূল্যাধিক্যরূপ মিথ্যা ভান করিয়াই যে স্বদেশী প্রতিজ্ঞাটি ভঙ্গ করা হইতেছে, ইহাই আমরা বুঝি। আসল কথা, আমাদের স্বদেশানুরাগ একবারেই নাই।

আমরা স্বার্থপর, পাপিষ্ঠ ও নরাধম হইয়া উঠিয়াছি। দেশের শিল্প উৎসন্ন যাউক, দেশের লোক অনাহারে মরুক, বিদেশীয়েরা আমাদের রক্তশোষণ করুক, আমরা কিছুতেই বিদেশী দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিতে পারিব না। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও সভ্য, কাজেই পাশ্চাত্য শিল্পজাত সাজে সজ্জিত হইতে ভালবাসি, পাশ্চাত্য দ্রব্য ব্যবহার সভ্যতার লক্ষণ মনে করি। হায়! আমাদের কি অবনতি ঘটিয়াছে! নিষ্কাম ধর্ম্ম যে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ছিল, সেই ভারতসন্তানগণের এরূপ অধঃপতন অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারিগণের মধ্যে কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের ভয়ে কিম্বা অনুগ্রহ প্রত্যাশায় পশ্চাৎপদ হইয়াছে। কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী নহেন। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, শিল্পশিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে দিন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছেন যে, স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহারা সহানুভূতি আছে। তবে এই আন্দোলন লইয়া যে সকল আইন বিরুদ্ধ উপায় অবলম্বন করা হইতেছে, তিনি তাহার বিরোধী। গবর্ণমেণ্টকে অসরল মনে করা যাইতে পারে না। কোন কোন ইংরাজ কর্ম্মচারী জাতভায়ার ব্যবসার সুবিধার জন্য ঔৎসুক্য দেখাইতে পারেন; তাহা বলিয়া যে গবর্ণমেণ্ট দেশী জিনিষ ব্যবহার করিলে আমাদিগকে নির্য্যাতন করিবেন, ইহা কখন ভাবিতে পারা যায় না।

কেহ কেহ বলিবেন যে গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলন রোধ করিবার জন্য আন্দোলনকারী নেতৃগণকে যেরূপ নির্য্যাতন করিতেছেন, তাহা হইতেই গবর্ণমেণ্টের মনের ভাব স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। নূতন বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে গবর্ণমেণ্টের পরিচালক নিজের ভ্রম ও দুর্বুদ্ধি বশতঃ দু একটি গর্হিত কার্য্য করিতেছেন বলিয়া, আমরা সমগ্র ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে প্রস্তুত নহি। আর

ইহাও বক্তব্য যে, আমাদের কোন কোন নেতা কিম্বা তাঁহাদের শিষ্যগণও সময়ে সময়ে বেআইনী কার্য্য করিয়াও আদালতে দণ্ডিত হইতেছেন। মনে কর, কোন দোকানদার বিদেশী চিনি বিক্রয় করিয়া থাকে এবং গ্রামের লোকের নিবারণ স্বত্বেও সে সেই চিনির আমদানী করে, আর গ্রামের লোক বলপূর্ব্বক দোকানে প্রবেশ করিয়া চিনির বস্তা উঠাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে কি এই সকল লোক ফৌজদারী আদালতে দণ্ডনীয় হইবে না? গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই এইরূপ আইনবিরুদ্ধ কার্য্যের প্রশ্রয় দিয়া দেশে অরাজকতা ও অশান্তির স্থাপন করিতে পারেন না। এরূপ স্থলে গ্রামের লোকের কর্ত্তব্য যে, সকলে একমত হইয়া সেই দোকানদারের নিকট হইতে জিনিষ ক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে বাধ্য হইয়া দেশী চিনি বিক্রয় করিবে। তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ কদাচ যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত নহে।

স্বদেশী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া অনেক বাঙ্গালী বাবু আজকাল আবার বিদেশী সিগারেটের ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন। সিগারেটের ব্যবহার উঠিয়া যাওয়াতে দেশের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আবার সেই বিষ ভক্ষণ আরম্ভ হইল। এই সকল দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ। আমরা যখন অল্পদিনের মধ্যে এই সর্ব্বজন কল্যাণকর স্বদেশী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছি ও অন্যান্য সভ্যজাতির হাস্যাস্পদ হইতে লজ্জাবোধ করিতেছি না, তখন আমরা যে অসার ও মনুষ্য নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় যে, এখনও অনেকে এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষে কলুষিত হন নাই। ভগবান তাঁহাদের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার ও মঙ্গল বিধান করুন। স্বদেশী প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া যদি আমরা দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দ্বারা একটি মহৎ কার্য্য সাধিত হইবে, একথা যেন আমরা একবারও বিস্মৃত না হই। প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা করিতে হইলে মনের দৃঢ়তা আবশ্যক; এবং অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আমাদিগকে স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। দুই এক জন লোক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে দেখিয়া ভীত হইলে চলিবেনা। আইনের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া দেশের লোককে স্বদেশানুরাগী করিতে হইবে; এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিলে যে দেশের সমূহ উপকার হইবে, সকলকে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(প্রাপ্ত)

'স্বদেশী'র আমি একজন গ্রাহক। অদ্যাবধি ইহার চারিখণ্ড পাইয়াছি। পত্রিকা খানি যে নিতান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে তাহার আর ভুল নাই। এইরূপ একখানি পত্রিকার বহুদিন হইতে আমাদের বড়ই অভাব ছিল। ইহাতে যে সমস্ত দেশীয় শিল্পাদি বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাধারণের মন আকর্ষণ করিয়াছে। আশা করি ইহা ক্রমে সকল প্রকার পত্রিকায় শীর্ষস্থান গ্রহণ করিবে।

ইহার ভাষা স্থান বিশেষে সাধারণের জন্য একটু কঠিন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অতএব ইহার ভাষা আর একটু সহজ ও সরল হইলে ভাল হয়। *

আমি ডি, এন, কর্ম্মকার মহাশয়ের একটি কালি প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

স্বদেশী চতুর্থ ভাগের 'বস্ত্রশিল্প' প্রবন্ধটী সর্ব্বাপেক্ষা আমার মন আকর্ষণ করিয়াছে। যাঁহারা নানাপ্রকার তাঁতের উন্নতি করিতেছেন ও করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা তাঁহারা যেন এক্ষণে সূতা কাটিবার জন্য দেশীয় চরকার উন্নতি করিতে বিশেষ যত্নবান হয়েন। একটি চরকায় কতকগুলি টাকু লাগাইয়া যদি একটি লোকে একত্রে কতকগুলি সূতা কাটিতে পায় এইরূপ কোন চরকা যন্ত্র বাহির হয় তাহা হইলে সূতা অধিক পরিমাণে জন্মিবে এবং সেইমত ইহার মূল্যও নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। যাহাতে এইরূপ অল্প জোরের (Pwer) সাহায্যে অধিক পরিমাণে কার্য্য সমাধা হয় এইরূপ আলোচনা ও শিক্ষাই আমাদের উপস্থিত আবশ্যক।

শিবপুর ইনজিনিয়ারীং কলেজ হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র কাষ্ঠের ও লৌহের কার্য্য হাতেশিক্ষা করিয়া বাহির হইয়াছেন এবং শিক্ষাকালীন নানাবিধ কল

* দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অপেক্ষা মাসিক পত্রিকা পাঠের জন্য পাঠকগণ অধিক অবসর পাইয়া থাকেন বলিয়া ইহার ভাষা একটু কঠিন হওয়া আমরা দোষাবহ বিবেচনা করি না। প্রত্যেক লিখিত বিষয়ই সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত হইলে ভাষার উন্নতি সাধিত হয় না। আমাদের পত্রিকার গ্রাহকগণের অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত উচ্চশিক্ষিত; তথাপি, শিল্পাদি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি আমরা সরল ভাষাতেই প্রকাশিত করিতেছি। স্বঃ সং

কারখানা দেখিয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষাও উচ্চ। তাঁহাদের হইতে এই সকল বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা আমাদের আশা করা উচিত। তাঁহারা মিকেনিজম্ (mechanism) শিক্ষায় 'wheels in trains' পড়িয়াছেন এক্ষণে তাঁহারা নিজে 'Trains of wheels' হইয়া যথার্থ কার্য্যচক্র অবলম্বন করুন ইহাই তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—ইহার স্থাপন কল্পনা একটু দূরের কথা বলিয়া মনে হয়। ইহা অপেক্ষা রাসায়নিক বস্তু ও যন্ত্র ব্যবহার শিক্ষার জন্য 'school of arts & science' স্থাপন একবারে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ে কাগজ, রং, পেনসিল, কালি, সাবান প্রভৃতির গঠন প্রণালী শিক্ষা করিতে পাইলে দেশের বিশেষ উপকার আশা করা যাইতে পারে। অধুনা এই সকল কার্য্য যাহা কতক পরিমাণে আজ ভারতে আছে তাহা কেবল অশিক্ষিত লোকদিগের নিকটই আছে। আর যাহারা রসায়ন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা পান তাঁহাদের অনেকস্থলে বাধ্য হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কেবল দাসত্বে প্রবৃত্ত হইতে হয়। জগতে কোথায়ও কোন কালে কোন বৃহৎ কার্য্য অশিক্ষিত লোকদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। তবে যদি হঠাৎ কাহারও বুদ্ধি এবং উদ্যমশীলতাবশতঃ কোন কার্য্য হইয়াও পড়ে তবে তাহা কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না কারণ তাহার বিদ্যা অপরে শিক্ষা করিতে পায় না। অতএব যতদিন না এই সমস্ত শিল্পকার্য্য শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রকৃত ভাবে প্রবেশ করিতে পায়, ততদিন পর্য্যন্ত শিল্পোন্নতির আশা কমই আছে। ইনজিনিয়ারীং বা মেডিকাল কলেজের একটী পাস করা ছাত্র যে বিজ্ঞান ও রসায়নে উত্তমরূপ শিক্ষা পান নাই তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস সেই ছাত্র একখণ্ড পীয়ার্স (Pears) বা দেশী সাবান বিশ্লেষণ করিয়া ইহাতে কত পরিমাণে সোডা আছে তাহা বোধ হয় বলিতে পারেন না। অতএব তাঁহার পক্ষে ঐ সাবানের কোনরূপ রসায়নিক ব্যবহার কখন সম্ভবপর নহে।

কাগজ প্রস্তুত একটি বিশেষ বৃহৎ কার্য্য। ইহার প্রস্তুত প্রণালীর যে স্বতন্ত্র রসায়ন শাস্ত্র (manufactury chemistry) আছে তাহা না জানিলে এই কার্য্য কখন পারদর্শিতার সহিত শিক্ষা করা যাইতে পারে না। কারণ কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে ইহা যে যে দ্রব্যে প্রস্তুত হয় তাহাদের দ্রব্যগুণ

এবং সেই সমস্ত দ্রব্য (যথা ছেঁড়া নেকড়া পুরাতন কাগজ, আঁশ (Filre) ইত্যাদি) কি প্রণালীতে ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়, পরে ঐ ঘন ও কঠিন বস্তুকে (Solid matter) কিরূপে তরলাবস্থায় আনিতে হয় এবং সেই জলীয় পদার্থকে কি প্রণালীতে পুনরায় জমাইয়া (Solid matter) কাগজাকারে আনিতে হয় এই সমস্ত বিশেষরূপে জানিবার আবশ্যক এবং ইহার রসায়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষা ভিন্ন তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতও ইহার উপকরণগুলির দ্রব্যগুণ এবং তাহারা কি উপায়ে কিরূপ পাত্রে ও কি পরিমাণ উত্তাপে (Heat) শিক্ত হয়, পরে একটি অপরের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরে কিরূপ রসায়নিক কার্য্যকরে তাহা জানিবার জন্য বিশেষরূপে ইহার বিজ্ঞান শিক্ষা আবশ্যক।

সামান্য একখানি ছুরী বা বঁড়সীতে পান দিতে হইলে তাহাতেও উত্তাপের (Heat) সামঞ্জস্য বুঝিয়া তবে তাহাকে জলে ডুবাইতে হয়। অতএব তাহার জন্যও সেই বিষয়ের শিক্ষা আবশ্যক।

উপরোক্ত সামান্য বিষয়গুলি সাধারণের সমক্ষে উত্থাপিত করিয়া বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার আলোচনা যে আমাদের উপস্থিত প্রকৃত অভাব ও ইহা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহাই দেখাইলাম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিমানে রথচালন, সমুদ্রে সেতু বন্ধন প্রভৃতি যে সমস্ত বিচিত্র কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং অধুনা বিদেশীয়গণ বন্দুক কামান প্রভৃতি নির্ম্মাণে যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইতেছেন তাহা সকলই এই বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাব মাত্র।

জয়পুর এবং ইহার নিকটস্থ প্রদেশে অনেকানেক শিল্প কার্য্য আছে এবং তাহা হইতে অনেক শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। তাহার দুই একটি ক্রমে লিখিব।

বশম্বদ—

জয়পুর—
(রাজপুতানা)
১৮।২।৮৬

শ্রীকুলদানন্দন মুখোপাধ্যায়—
Assistant Enginiar Jaipur (Rajputana)

সম্পাদকের মন্তব্য—শ্রীযুক্ত কুলদা বাবুর সহিত আমরা উপরোক্ত বিষয়ে একমতাবলম্বী। আমাদের শিক্ষিতগণের অনেকেই উদরান্নের অনুসন্ধানে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য উপায় অবলম্বনেই ব্যাপৃত ; অবশিষ্ট সামান্য সংখকের প্রায় সকলই দেশের উন্নতি বিষয়ে প্রায় উদাসীন ; সুতরাং প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি বিরল। স্বঃ সং

স্বদেশী

প্রথম খণ্ড] চৈত্র, ১৩১২ [ষষ্ঠ সংখ্যা।

বন্দে মাতরম্।

জীবনোপায়।

অনেকের বিশ্বাস, এই স্বদেশী আন্দোলন কেবল একটী রাজনৈতিক আন্দোলন বা সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র; বঙ্গভঙ্গই ইহার জন্মদাতা; গভর্ণমেণ্ট কৃপা-পরবশ হইয়া ভঙ্গবঙ্গ জুড়িয়া দিলে এই আন্দোলনের অবসান হইবে। কিন্তু কথা কি বাস্তবিক তাহাই? এতাবৎ কাল আমাদের দেশের সুযোগ্য নেতৃবৃন্দ কতপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু কোন আন্দোলন তো এরূপ অল্পদিনে এ প্রকার দেশব্যাপী ভাব ধারণ করে নাই। কোন প্রকার আন্দোলনে দেশের ইতর, ভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী, নির্ধন প্রভৃতি আপামর সকলকে একযোগে অনুপ্রাণিত হইতে দেখিয়াছেন কি? তবে এই শুভ আন্দোলনের মূল ভিত্তি কি? কোথা হইতে এই আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, এ সকল বিষয় বাস্তবিক চিন্তা-সাপেক্ষ।

পলাশির যুদ্ধের পর, যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক বণিক সম্প্রদায় ভারত মাতাকে চিরদিনের জন্য দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন এদেশে অধিক সংখ্যক ইংরাজ ছিলেন না; ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ

এদেশবাসীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল। পলাশির যুদ্ধাবসানে মিরজাফর, মিরকাশিম প্রভৃতি নবাব থাকিলেও ইংরাজেরাই তৎকালে দেশের রাজা ছিলেন। যে সকল ইংরাজ সে সময়ে এদেশে বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপারে অধিক লাভের আশায় ঐ সকল কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। এদেশেও শিল্প বাণিজ্যাদি নানাপ্রকার স্বাধীন ব্যবসা উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত ছিল। বাস্তবিকই তখন বঙ্গদেশের শস্যক্ষেত্র "সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা" নাম ধারণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল। দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে, তখন এদেশের লোক জানিত না; সাধারণ লোকে নিশ্চেষ্ট ভাবে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য, নিজ নিজ গাভীদত্ত দুগ্ধ ও ঘৃত এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় হইতে সহজলব্ধ মৎস্যাদিতে উদর পূরণ পূর্ব্বক আহার করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। কাজেই তাহারা অন্য কার্য্যাদিতে ব্যাপৃত হইবার আবশ্যকতা বোধ করিত না। কোম্পানী বাহাদুর রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু রাজকার্য্য পরিচালনার উপযুক্ত লোকের অভাব বড়ই বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বাধ্য হইয়া, যাহাতে কি স্বদেশীয় আর কি এদেশীয় ব্যক্তিবর্গ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক হয়েন, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। ইংরাজী ভাষায় অৰ্দ্ধশিক্ষিত অথবা সামান্য শিক্ষিত এদেশীয়-গণকে বিশেষ লাভবান কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে নানাবিধ রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত করিতে লাগিলেন। চেষ্টা করিলেই সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। তাঁহাদের চেষ্টা কতক পরিমাণে সফল হইল; চাকরির দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

এদিকে তৎকালীন বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ অধিকতর লাভরূপ উৎকট বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, দেশীয় শিল্পিগণের উপর অল্প বিস্তর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। ফলে ক্রমশঃ দেশীয় শিল্পিগণের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতে লাগিল। কৃষক অথবা শিল্পী দেখিলেন, তাঁহার প্রতিবেশী যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া প্রভূত অর্থশালী হইতেছেন, আর তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণোপযোগী অর্থের সংস্থান করিতে পারিতেছেন না। আবার দেখিলেন, তাঁহার প্রতিবেশীর প্রতাপে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত, আর তিনি তাঁহারই সম্মুখে "হুজুর হুজুর" শব্দ উচ্চারণ করতঃ দণ্ডায়-মান। কাজেই দেশবাসীর দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে ইংরাজ রাজার অধীনস্থ রাজপ্রদত্ত চাকরি বৃত্তির উপর নিপতিত হইল।

মুসলমানদিগের শাসনকালে আমাদের সামাজিক বন্ধন কতকটা শৃঙ্খলা-হীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর, যখন ইংরাজেরা দেশের স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন; যখন সেই সকল স্কুলে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতি এক সঙ্গে পাঠাভ্যাস, এক সঙ্গে উপবেশন ভোজন ইত্যাদি করিতে লাগিলেন, তখন দেশের অধিকাংশ হিন্দুই এক প্রকার সাম্যবাদী হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বে যে খুড়াঠাকুর, দাদাঠাকুর, কামার দাদা, দাসের পো ইত্যাদি ভাব ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়া রামবাবু, শ্যামবাবু প্রভৃতি এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি হইয়া সাম্যবাদ দেশ মধ্যে আবির্ভূত হইল। ফলে, সমাজ বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল। তখন আর ব্রাহ্মণের জুতার ব্যবসা করিলে কিম্বা অখাদ্য ভক্ষণেও জাতিচ্যুত হইবার ভয় রহিল না। স্ববৃত্তি ত্যাগ করিবার এই এক নূতন সুযোগ উপস্থিত হইল। ইহাও আমাদের শিল্পিকুলের বিনাশের অন্যতর কারণ।

ইহার কিছুদিন গত হইলে পর, আমাদের আরও অবস্থান্তর উপস্থিত হইল। আমরা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইংরাজের উৎসাহ, অধ্যবসায় স্বজাতিপ্রেম প্রভৃতি গুণরাশির কোন অংশে অংশভাক্ হইতে পারিলাম না, কিন্তু বিলাতি সভ্যতায় গা ঢালিয়া দিলাম; ও তাঁহাদের অশেষ গুণরাশি বাদ দিয়া একেবারে আপনাদিগকে কেবল দোষ-পরিপূর্ণ বিলাতি ছাঁচে ঢালিয়া ফেলিলাম।

এদিকে বিদেশীয় ধনকুবের বণিকগণ, আমাদের যাহা কিছু শিল্প বাণিজ্য অবশিষ্ট ছিল, সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা পাবনা, শান্তিপুর, ফরেসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে কাপড় ও কাপড়ের পাড় লইয়া গিয়া আমাদের পরিধানোপযোগী কাপড় আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা শাঁখার পরিবর্ত্তে চাকচিক্যশালী কাচের চুড়ি আনিয়া দিলেন। আরও কত কি যে আনিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরাও অসভ্যতা জ্ঞানে আমাদের শিল্পি-গণের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়া বাহ্য চাকচিক্যশালী বিলাতি দ্রব্যে মজিয়া গেলাম।

একদিকে শিল্প বাণিজ্যাদির উচ্ছেদ নিবন্ধন নিরন্নতা, অন্যদিকে নানা শোভায় শোভিত "নৌকরি' বৃক্ষের সাদর আহ্বান। কাহার সাধ্য সে প্রলোভন ত্যাগ করে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলে আমরা শিক্ষিত হইতে লাগিলাম। আমরা "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" প্রভৃতি প্রবাদ ভুলিয়া গিয়া,

"যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাত" প্রভৃতি প্রবাদ কণ্ঠস্থ করিলাম। (এতদ্দ্বারা আমরা যে শিক্ষার বিরোধী ইহা যেন কেহ না বুঝেন। বাস্তবিকই আমরা সার্ব্বজনীন শিক্ষার পক্ষপাতী; তবে আজকালের চাকরি-শিক্ষার পক্ষপাতী নহি)। ক্রমে চাকরির সংখ্যা অপেক্ষা চাকরি-প্রার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিল। কোম্পানী যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সকলকে চাকরি দিতে পারিলেন না। ক্রমে আমরা চিকিৎসা আইন প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে লাগিলাম; কিন্তু ঐ সকল ব্যবসায়েও লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, উহাতেও লোকের অন্ন সংস্থান হওয়া ভার হইয়া উঠিল।

তখন দেশের মান্য গণ্য শিক্ষিত লোকেরা, কিসে দেশের লোকের এই দুরবস্থার নিরাকরণ হয়, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, আমরা আন্দোলন আবেদন করিয়া ইংরাজের সহিত সমান সত্ত্বে সত্ত্ববান হইয়া, এদেশীয় রাজসংক্রান্ত সমস্ত কাজকর্ম্মে লিপ্ত হইব। কোম্পানি বাহাদুরও প্রথম প্রথম তাঁহাদের আবেদন কতক পরিমাণে গ্রাহ্য করিয়া, কাহাকেও আহারী, কাহাকেও বা অনাহারী কর্ম্ম দিতে লাগিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা থাকিলে কি হইবে? ইংলণ্ড হইতে দলে দলে মধ্যবিত্ত ও ক্ষুধিত ইংরাজ ভারতীয় নবাবির লোভে শুভাগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অন্নের সংস্থান করিতে তো গবর্ণমেণ্ট বাধ্য, তাহার উপর এদেশীয় ফিরিঙ্গিগণ আছেন; তাঁহাদের সঙ্গেও ইংরাজের রক্ত সম্বন্ধ, কাজেই তাঁহাদেরও একটা উপায় না করিলে নয়।

মনে করুন, দূরদেশে আপনি একটা চাকরী পাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। সেখানে আপনার ক্ষমতাও যথেষ্ট; এক্ষণে আপনার যদি কোন বুভুক্ষু প্রতিবেশী তথায় গমন করে, তাহার একটা উপায় অগ্রে করেন, না সেই দেশবাসীর চিন্তা অগ্রে করেন? ক্রমে চাকরীর দর একেবারে কমিয়া গেল; বি,এ, পাশ করিয়াও নগদ ১৫৲ টাকা বেতনের চাকরী সংগ্রহ করা দুরূহ হইয়া উঠিল। এইখানে স্বদেশী আরম্ভ হইল। মুখ ফুটিয়া বলুন আর নাই বলুন, মনে মনে সকলেই বুঝিলেন, আর একটা কিছু না করিলে নয়। ঐ স্বদেশী ভাব এতদিন ধুঁয়াইতেছিল; বঙ্গভঙ্গ ব্যপদেশে দেশের নেতৃবর্গ অনন্যোপায় হইয়া যখন বলিলেন, স্বদেশীই আমাদের একমাত্র চিন্তাস্থল, তখন সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "স্বদেশী" "স্বদেশী"। এই স্বদেশী ভাব একটা আন্দোলন অথবা একটা নিষ্কর্ম্মার কর্ম্ম নহে। ইহাই এখন আমাদের জীবনোপায়। এখন

লোকের মতি গতি একরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশের কৃষক দোকানদার প্রভৃতি ঘৃণার পদার্থ নহে, একথা আমরা বুঝিয়াছি। এখন আমাদের মতি গতি ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু কি উপায়ে কার্য্য করিতে হয়, এখনও আমাদের সে দীক্ষা হয় নাই। এখন দেশের শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিবর্গ ইচ্ছা করিয়া দোকান পাট করিতেছেন বটে, কিন্তু কি করিয়া তাহা চালাইতে হইবে, তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি করিতে হইলে কি কি গুণের আবশ্যক, আমরা বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

তামাকের চাষ

গুড়ুক, চুরুট, নস্য, বার্ডসাই, ষ্টিক ইত্যাদি নানাপ্রকারে তামাক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সুতরাং উহার আবাদ ও বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভ হয়। তামাকের জমিতে অন্য ফসল না করিয়া ফাল্গুন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত, মাসে দুই তিনবার লাঙ্গল ও মই দেওয়া উচিত। রংপুর অঞ্চলে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের মধ্যেই ১০।১১ বার চাষ দিয়া থাকে। ফলতঃ পুনঃ পুনঃ চাষ দিয়া তামাকের জমির মৃত্তিকাকে ধূলিবৎ করা সকল দেশেই আবশ্যক। কৃষির প্রণালী সকল দেশে একরূপ নহে। এই বঙ্গদেশের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন জিলায় বিভিন্ন প্রকার কৃষি-প্রণালী; তবে পরস্পর নিকটবর্ত্তী জিলা সকলে প্রণালীগত ভিন্নতা বড় লক্ষিত হয় না, এবং সকল দেশেরই কৃষি-প্রণালীর মূলযুক্তি একরূপ। নদীয়া, ২৪ পরগণা, যশোহর, রংপুর, পাবনা, হুগলি, মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জিলা সকলের কৃষি-প্রণালীকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়া, এই প্রবন্ধ প্রণীত হইয়াছে। সুতরাং বহুদূরবর্ত্তী দেশস্থ কৃষিপ্রণালীর সহিত স্থলবিশেষে ইহার কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে।

এদেশে তামাক-ক্ষেত্রে গোবর ও তৃণ পচা সারই কৃষকেরা যথাসাধ্য দিয়া থাকে। উহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে ছাই এবং লবণ বা সোরা মিশাইলে তামাকের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইতে পারে। ব্রহ্মদেশের তামাক অতি উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত। সেখানে তামাকে ঐ সারই ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

নদীয়া জিলার অন্তর্গত কোন কোন স্থলের কৃষকেরা ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পলি-মাটি তুলিয়া উৎকৃষ্ট তামাক প্রস্তুত করে। নীলের হাউজ হইতে যে পচা নীলের গাছ ফেলিয়া দেয়,তাহা তামাকের জমিতে ফেলিয়া দিলে উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। ঐ সকল কাঠ যখন ক্ষেত্রে ফেলা যায় তখন উহার উপর মাটি দেওয়া উচিত।

তামাক নানাবিধ। পানমুটী, হরিণপালী, হাতিকানী, জটাভাং বা শিবজটা, কপি, শকুনকালী, কালীজিবে, ছোটনা, কৃষ্ণকলি, মান্ধাতী, সিন্দুর-খটুয়া, ভেলেঙ্গি, চামা, নয়োখাল ইত্যাদি। আরও অনেক প্রকার আছে। কেহ কেহ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তমাকের ভূমি আবাদ বিষয়ে কিছু কিছু ভিন্নতা আছে। থাকে,—থাকুকু। ফলতঃ একই প্রণালীতে সকল প্রকার তামাকের আবাদ করিলে ফলাংশে বড় তারতম্য হয় না; পানমুটি তামাকের আকার ঠিক পানের ন্যায়। হরিণপালি তামাকের পাতা অপ্রশস্ত ও সূচ্যগ্র। হরিণপালীর সহিত হরিণ শৃঙ্গের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। এইরূপ অন্যান্য তামাকের নামের দ্বারা যাহার সহিত সাদৃশ্যের বোধ হয় বাস্তবিকই তাহার সহিত ঐ সকল তামাকের সাদৃশ্য আছে। কালীজিবে তামাক ঠিক কালী-ঠাকুরাণীর জিভের ন্যায়।

মেটেঘরে পুরাতন পোঁতায় কিংবা সম্পূর্ণ সারভূমিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া ভাদ্রমাসে তামাকের বীজ বপন করিয়া পদাঘাতে ঐ ভূমি চাপিয়া দিবে। চারা বাহির হইয়া ৩।৪টি পাতা হইলেই তাহা ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। যতদিন চারাগুলি উত্তমরূপে না লাগে, ততদিন বিবেচনা পূর্ব্বক জল দিবে। পরে আর বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে জলের প্রয়োজন হইবে না।

এ দেশের মধ্যে যে সকল ভূমি সমতল এবং তাহার মধ্যে আবার যে গুলি দোআশলা, তাহাতেই সচরাচর তামাক জোর করিয়া থাকে। কিন্তু রংপুর অঞ্চলে উচ্চভূমির মধ্যে যেগুলি দোআশলা, তামাক তাহাতেই উত্তমরূপে এবং অধিক পরিমাণে জন্মে। শিলাবৃষ্টি তামাকের বিশেষ অনিষ্টকর।

তামাকের সারি দড়ি দিয়া বেশ সোজা করিয়া পুঁতিতে হয়। প্রত্যেক গাছের অন্তর দুই হাতের কম না হয়। নদীয়া ও চব্বিশ পরগণার নানাস্থানে উৎকৃষ্টরূপ হিঙ্গিলি তামাকের চাষ হইয়া থাকে। ঐ তামাক গাছের অন্তর পাঁচ পোয়ার অধিক করে না; কিন্তু আটাল ভূমির তামাক তিন পোয়া অন্তরেও রোপণ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে খনার উপদেশ এই;—

"তামাকের বনে গুড়িয়ে মাটি।
বীজ পুঁতো গুটি গুটি॥
ঘনরূপে পুঁতো না।
পৌষের অধিক রেখ না॥"

গাছগুলি ভূমিতে লাগিয়া গেলে অতিশয় সাবধানে ফাঁকে ফাঁকে লাঙ্গল দিবে। এই লাঙ্গল সোজা এড়ো ও কোণাকোণি সকল প্রকারেই দিবে। অতি সতর্কতার সহিত এরূপে বারম্বার নিড়াইয়া দিবে, যেন তামাকের ক্ষেত্রে মোটে ঘাস হইতে না পায়। যদি ভূমিতে অধিক রস থাকে তাহা হইলে ঐরূপ লাঙ্গল তিন চারি বার দিবে। তামাকের গাছে দশ বারটি পাতা হইলে গাছের অগ্রভাগটী এবং নীচের তিন চারিটী পাতা ভাঙ্গিয়া দিবে। প্রত্যেক পত্রকক্ষ হইতে যে কুঁড়ি বাহির হইবে তাহা সপ্তাহে সপ্তাহে ভাঙ্গিয়া দিবে। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত লাঙ্গলের দাগ সকল মিশাইয়া দিবে। পাতা বাড়িবার সম্ভাবনা থাকিতে থাকিতেই যদি ভূমি শুষ্ক হইয়া যায় এবং জল না হয়, তবে তামাকক্ষেত্রে জল সেচিয়া দিবে। পাতার রঙ্গ কাল হইলে এবং বাড়িবার সম্ভাবনা না থাকিলে আর জলের প্রয়োজন থাকে না। যখন বুঝিবে যে, পাতা পাকিয়া উঠিতেছে, তখন আর একবার এরূপে নিড়াইয়া দিবে যেন গাছের মূলশিকড় ভিন্ন আর অন্যান্য যাবতীয় শিকড়গুলি কাটিয়া যায়; তাহাতে তামাকের পাতা উত্তমরূপে তৈয়ার হয়।

হিঙ্গিলি গ্রাম নিবাসী সভারাম মণ্ডল হিঙ্গিলি তামাকের সৃষ্টিকর্ত্তা। হিঙ্গিলি ও তন্নিকটবর্ত্তী গাজীপুরের ন্যায় তামাকের চাষ কোথাও হয় না। ঐ স্থানের কৃষকেরা পলি ও বোদ মাটির দ্বারা তামাকের ভূমি তৈয়ার করে।

মাঘের শেষে কিংবা ফাল্গুনের প্রথমে পাতাগুলি লাল হইলেই তামাক কাটিবে। পাতাগুলি এরূপে কাটিবে, যেন তাহার সহিত কাষ্ঠেরও কিয়দংশ থাকিয়া যায়। দুই একদিন ক্ষেত্রে রাখিয়া কাঁচা থাকিতেই পাতা সকল গৃহে আনিবে। চারিটি করিয়া পাতা একত্র বাঁধিয়া বাঁশ কিংবা দাঁড়ার উপর শুকাইবে। এমন স্থানে শুকাইতে দিবে, যেন দিনে রৌদ্র ও রাত্রিতে শিশির লাগিতে পারে। কিন্তু ঐ তামাকে যাহাতে কিছুমাত্র ঝড় বৃষ্টি না লাগে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। এইরূপে তিন চারিদিন শুকাইলে অতি প্রত্যূষে কিংবা কোয়াসার দিনে ঐ সকল তামাক মইয়ের উপর, গোড়াগুলি উভয় প্রান্তে রাখিয়া উপরি উপরি সাজাইবে। মধ্যস্থলে একটি বাঁশ দিয়া ঐ বাঁশের

দুই, প্রান্ত মইয়ের সহিত বাঁধিবে। ইহাকে "জাত" দেওয়া কহে। ২।৩ দিন জাতে রাখিয়া পুনরায় খুলিয়া পূর্ব্ববৎ বাঁশে শুকাইবে! উত্তমরূপে শুষ্ক হওয়ার পর, ঘরের মধ্যে মাচার উপর পালা দিয়া সাজাইবে। এইরূপে ১০।১২ দিন রাখিয়া হালা, ঝাড়া বা গোছা ইত্যাদি বাঁধিবে। নীচে উপরে চট দিয়া পাটী ও হালা বাঁধিতে হয়।

এদেশে প্রতি বিঘায় তিন পাটী পর্য্যন্ত তামাক জন্মে। দুই পাটীতে এক ছালা। খরচ বাদেও তামাকের চাষে প্রতি বিঘায় ভালরূপ উৎপন্ন হইলে, একশত টাকা লাভ হইতে পারে। খরচ ১৫৲ টাকার অধিক হয় না।

কিন্তু হিঙ্গিলি তামাক তৈয়ার প্রণালী এবং উহার ব্যয় ও লাভের প্রণালী একটু স্বতন্ত্র। রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলীয় তামাকের চাষের বিবরণই অধিক লিখিত হইল। হিঙ্গিলি পাতা প্রস্তুত হইলে গাছগুলি কাটিয়া খোলায় শুকাইতে হয়। যেমন যেখানে ধান্যাদি শস্যের ঝাড়াই মাড়াই হয়, সেই স্থানকে খামার কহে, সেইরূপ যে স্থানে তামাকের কার্য্য হয় তাহাকে তামাকের খোলা কহে। পরে গাছগুলিকে একরূপ দন্তহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাস্তিয়া-দ্বারা ছেদন করিতে হয়। প্রত্যেক খণ্ডে দুইটী হইতে চারিটী পর্য্যন্ত পাতা রাখিতে হয়। অনন্তর সে গুলিকে গোছাইতে হয়। এইরূপে গোছান তামাক গুলিকে গোশালা বা শূন্য ঘরের মধ্যে ঘরের দড়ির উপর ঝুলাইয়া দিতে হয়। এই অবস্থায় প্রায় একমাস দেড়মাস থাকে, পরে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পাটী বাঁধিতে হয়। হিঙ্গিলি তামাক বিঘা প্রতি তিন হইতে পাঁচ পাটী পর্য্যন্ত উৎ-পন্ন হয়। প্রতি ছালা ১৬৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। হিঙ্গিলি তামাকের চাষে বিঘা প্রতি ৮৲ টাকার অধিক খরচ পড়ে না। * (কৃষিভাণ্ডার)

স্বার্থ।

জীবন ক্ষণভঙ্গুর। জন্মের পর মৃত্যুই একমাত্র অবশ্যম্ভাবী ঘটনা এবং এই মৃত্যুর অবধারিত কাল নাই। কিন্তু মরজগতের অধিবাসিগণ এরূপ মোহাচ্ছন্ন যে, এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদের গোচরীভূত হইলেও সহজে ইহা বাস্তবিক উপলব্ধি বা বিশ্বাস করিতে পারে না, অথবা এরূপ দুর্ব্বলহৃদয় যে, ইহা

---

* বিঘাপ্রতি প্রদর্শিত লাভের হিসাবটী আমাদের কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। স্বঃ সং

বিশ্বাস করিতে সাহসী হয় না। প্রতিদিন আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবেশী বা দেশবাসিগণকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও, সকলেরই, মুখে যতই বৈরাগ্যের আড়ম্বর থাকুক না কেন, মনে এই এক মিথ্যা অনুভূতি বর্ত্তমান যে,—আমি বা আমার পরিবারবর্গ অন্ততঃ বহুবর্ষব্যাপী পরমায়ু লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামাতা যেন চরিতার্থ; সন্তানের দীর্ঘজীবন কামনা, বা তাহার নির্ব্ব্যাধি শরীরে, স্বচ্ছন্দে বা খ্যাতি প্রতিপত্তির সহিত বহুকাল সংসারে অবস্থিতিসূচক ধারণা পিতামাতার স্বাভাবিক। এবম্প্রকার মোহ ঐশ্বরিক মায়ারই একাংশ। যাহা সত্য, এই মায়া তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবে, এবং যাহা মিথ্যা, তাহাকে সত্য বলিয়া অনুভূত করাইবে। এই মায়ার প্রভাব অতিক্রমের নাম জ্ঞান বা আত্মোন্নতি ; এই মোহান্ধকার যাঁহার যে পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে উন্নত ও জ্ঞানী।

জীবন ক্ষণ-ভঙ্গুর হইলেও, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঠিক তদনুরূপ নহে। আমার আজ মৃত্যু হইলেও আমার আত্মীয়ের, প্রতিবেশীর, দেশবাসীর বা মানব মাত্রের প্রত্যেকেই আমার অনুগমন করিবে না।

আমার পরবর্ত্তিগণের হিতাহিত কতক পরিমাণে আমার কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। যেমন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কৃতকর্ম্মের ফল আমরা অনেক পরিমাণে ভোগ করিতেছি, সেইরূপ আধুনিকগণেরও কতকাংশ কর্ম্মফল তাহাদের বংশধরগণ উপভোগ করিবে।

ঐশ্বরিক মায়ার অধীন হইয়া ও উপরোক্ত যুক্তিবশে, আমরা আমাদের ভাবী উত্তরাধিকারিগণের সুখ সচ্ছন্দ বিধানের জন্য নানারূপ আত্মনিগ্রহ সহ্য করিয়া থাকি ; অর্দ্ধাশন স্বীকার করিয়া শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়া এবং পাপানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইয়া, বংশধরগণের জন্য সম্পত্তি সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত থাকি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, কেবল মাত্র আমার বংশধরগণের জন্য অতুলিত ঐশ্বর্য্যাদির ব্যবস্থা করিতে পারিলেই আমার উপরোক্ত অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে কি না। আমার পুত্রাদির জন্য অর্থ সঞ্চয়ে মত্ত থাকিয়া, যদি প্রতিবেশীর পুত্রগণকে চৌর্য্য বা শঠতাবৃত্তি শিক্ষা দিয়া যাই, কিম্বা তাহাদের এই বৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন অন্য উপায়ের ব্যবস্থা করিতে না পারি, অথবা তাহাদের পিতৃ-পিতামহাদির অনুরূপ শিক্ষা দিবার সঙ্গতি না থাকে, তাহা হইলে আমার পুত্রাদির জন্য অর্থ সঞ্চয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না।

অবস্থাপন্ন গণের অনেকেই নগরে বাস করিবার জন্য আগ্রহ-সম্পন্ন; নানারূপ উপভোগের লালসাই যে এরূপ আগ্রহের মূল কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। নগরের অধিবাসিগণের অনেকে সঙ্গতিপন্ন বলিয়াই সেখানে এই সকল সুবিধার উৎপত্তি। সুতরাং প্রতিবেশিগণ অবস্থাপন্ন হইলে, নানারূপ সচ্ছন্দ সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে। পরস্পর সচ্ছন্দ বিধানের আকাঙ্ক্ষাই সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। এইমূল মন্ত্র বিস্মৃত হইয়াই এদেশবাসী এক্ষণে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত। সমাজের কল্যাণ চিন্তার অবসরমাত্রও আর আমাদের নাই। ইতর জন্তুগণ যেমন স্বীয় উদরপূর্ত্তির জন্যই ব্যতিব্যস্ত, ব্যক্তিগত গ্রাসাচ্ছাদন ও বৈভবের জন্য প্রায় সকলেই সেইরূপ তৎপর। সঙ্কীর্ণ স্বার্থরূপ ঘোর অদূরদর্শিতা প্রায় মর্জ্জাগত হইয়া দেশবাসীগণকে প্রায় পশুপ্রকৃতিক করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই ঊর্দ্ধপদস্থগণের অনেকে অধীনস্থগণের উচ্ছেদ সাধনে সচেষ্ট, অথবা তাহাদের মঙ্গল বিধানে উদাসীন; সামান্য মাত্র ক্ষমতা লাভেই সে ক্ষমতার সার্থকতা বিস্মৃত হইয়া তাহার অপব্যবহারে যত্নশীল।

পরোপকার মহাব্রত। ব্রত নিয়মের কথা এক্ষণে অনেকের নিকটেই উপ-কথার শ্রেণীভুক্ত; সুতরাং পরোপকারের সহিত স্বার্থেরই সম্পর্ক কি, তাহাই দেখিতে হইবে।

দৈব বা পৈশাচিক কোনরূপ শক্তিসহায়ে যদি দেশের কোন সম্পন্ন ব্যক্তির মঙ্গল-বিধান বা উচ্ছেদ-সাধন তোমার করায়ত্ত হয়, কিন্তু সামান্য স্বার্থসিদ্ধির আশায় যদি তুমি তাহার উচ্ছেদ সাধন কর, তাহা হইলে সেই সঙ্গে তাহার আশ্রিতগণেরও সর্ব্বনাশ সাধন করা হইবে এবং সহসা যদি তোমার এই অপ-রূপ শক্তি অপহৃত হয়, কিম্বা তোমার কল্পিত ঐশ্বর্য্য সঞ্চয়ের পূর্ব্বেই তোমার ক্ষণভঙ্গুর জীবনের অবসান হয়, তাহা হইলে তুমি ও তোমার পুত্রাদিও এই মহদাশ্রয়ের আশা বিচ্যুত হইবে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থে অন্ধ হইয়া, অনেকে সম্পন্না-বস্থগণের উচ্ছেদ সাধনে, দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

রুগ্ন-শয্যায় শায়িত তোমার কোন মধ্যবিত্ত প্রতিবেশীর সংসারে বয়ঃপ্রাপ্ত অভিভাবকের অভাব; শক্তিসত্বেও তুমি তাহার চিকিৎসা পথ্যাদির কোনরূপ সাহায্যেই পরাঙ্মুখ থাকায় সে মৃত্যুগ্রস্ত; তাহার পুত্রকন্যাদিরও কেহ কোন-রূপ তত্ত্বাবধারণ না করায় কালক্রমে তাহারা বিবিধ অসৎ প্রবৃত্তি-পরবশ হইয়া তোমারও পুত্রাদির সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

একমুষ্টি অন্নের আশায় দরিদ্র তোমার দ্বারস্থ হইয়া কাতরকণ্ঠে ভিক্ষা

প্রার্থনা করিলেও তুমি নির্ম্মম হৃদয়ে তাহাকে গৃহ-বহিস্কৃত করিয়া দিলে; উদর জ্বালায় অখাদ্য ভক্ষণে বাধ্য হইয়া সে বিসূচিকা-গ্রস্ত এবং তোমার পল্লীতে সংক্রামক বিষ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সামাজিক কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলে এইরূপ অসংখ্য উপায়ে দেশমধ্যে দারিদ্র্য, পাপ ও রোগের উৎপত্তি বিচিত্র নহে। কিন্তু আমাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপ্রবণতা বদ্ধমূল হওয়ায় পরিণাম দৃষ্টি তিরোহিত হইয়াছে এবং আমরা আমাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছি। দেশের উন্নতিই যে প্রকৃত উন্নতি সে জ্ঞান এক্ষণে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে।

হিন্দুমাত্রেই জন্মান্তরবাদে আস্থাবান। ইহজীবনের সহিত যে আত্মার চরম পার্থিব সম্বন্ধ, হিন্দু একথা বিশ্বাস করেন না। পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা থাকিলে মহর্ষিগণ এই দেশেই জন্মগ্রহণ বাঞ্ছা প্রকাশ করিতেন। দেবতাগণও এই দেশে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস থাকিলে এবং মহর্ষিগণের বাক্যে আস্থা থাকিলে, এই দেশেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। সে সময়ে নিজ পুত্রাদিরই ঔরষে জন্মগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী নহে। যিনি পরজন্মে পুত্রাদির গৃহে পুনরাগমনের অথবা বিলাতে জন্ম গ্রহণের ব্যবস্থায় অক্ষম এবং পুনর্জ্জন্ম নিবারণেও অসমর্থ, তিনি স্বীয় দেশকে আপনার অভীপ্সিত আবাস স্থানের উপযোগী করিয়া যাইবার চেষ্টা না করিলে, পরিণামে আত্মপদে কুঠরাঘাতেরই ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছেন, একথা যেন তাঁহার স্মরণ থাকে।

কদলী।

কলা যে অতি আবশ্যকীয় এবং উপকারী বৃক্ষ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হিন্দুর সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যে কদলীর বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহার পত্র, পুষ্প, ফল, মূল এবং কাণ্ড অর্থাৎ সমুদায় বৃক্ষটিই ব্যবহারে লাগে। ইহা সকল ঋতুতেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলে; তবে গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এই সময়ে ইহা অধিক সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর হয়। হিন্দুরা কদলীকে একটী পবিত্র ও নির্দ্দোষ খাদ্যমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। কবিরাজেরা কাঁচকলাকে অজীর্ণ রোগে পথ্য এবং সুস্থ ব্যক্তির

বিশেষ উপকারী খাদ্য বলিয়া ইহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত চাষ বিশেষ লাভ-জনক।

কদলীর জন্মস্থান।

উষ্ণকটীবন্ধদেশে, বিশেষতঃ আমাদিগের দেশে, দাক্ষিণাত্যে, সিঙ্গাপুর, মলয়, যবদ্বীপ এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে কদলী প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। চট্টগ্রামে কলার জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায় এবং তন্মধ্যে হস্তী মহিষাদি বন্য পশুগণ আহারের জন্য বিচরণ করে। এসিয়া মহাদেশের পূর্ব্ব চীন হইতে পশ্চিম তুরস্কদেশ এবং ইউরোপের ভূমধ্য-সাগরের উপদ্বীপ সমূহের নিম্ন প্রদেশে কলার আবাদ হইয়া থাকে। আফ্রিকার বহুস্থানে কলা জন্মে। আমেরিকার অনেকস্থানে কলার প্রচুর চাষ হয় এবং তথাকার আদিম নিবাসীরা ইহাকে প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। আমেরিকার ফ্লোরিডা দেশে 'ওরফো' নামে এক প্রকার উপাদেয় কলা জন্মে এবং এই কলাগাছে কলা পাকিলে তাহার সুগন্ধে মানুষ এবং পশুপক্ষী পর্য্যন্ত মাতোয়ারা হইয়া উঠে। হিমালয়ের পাদ-দেশস্থ কমায়ুন, মুসোরী ও গড়োয়াল প্রদেশে এক প্রকার বীচাকলা হয়, তাহাতে শস্য বড় একটা থাকে না। নেপালেও কলা জন্মে।

বিশেষ বিশেষ স্থানের কলার নাম ও গুণাবলী।

কলা প্রধানতঃ দুই জাতীয়, বীচাকলা ও বীজহীন; বীজ রহিত কলাই সুস্বাদু, কিন্তু কোন কোন স্থানের লোক বীচাকলার জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করে। আমাদিগের দেশে মর্ত্তমান, চাঁপা, কাঁঠালী, অমর্ত্তমান, চিনিচাঁপা, কানাই বাঁশী, রামরম্ভা অপরিমর্ত্ত, কালীবউ, অনুপাম, ঘিয়ে, মালভোগ, মদনা, মনুয়া, মদনী, তুলসী, রঙ্গবীর ও পোড়া রঙ্গবীর এই কয়েক জাতীয় কলাই প্রধান; ইহাদিগের মধ্যে শেষের ছয় জাতীয়ে বেশী বীজ হয় এবং প্রথম কয়েক জাতীয় কলা খাইতে বেশ সুস্বাদু। এতদ্ব্যতিরেকে আনাজিকলা বা কাঁচকলা নামে কলা তরকারীতেই বেশী ব্যবহৃত হয়। 'ডোগরে' নামে কলা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানেই জন্মে এবং ইহার ফলে এতই বীজ হয়, যে ইহা পাকিলে খাওয়া যায় না; মোচা ও থোড় খাইবার জন্য এবং পাতার জন্যই ইহার আবাদ হইয়া থাকে। যশোহরের দয়েকলার সরবত বড়ই উপাদেয় হয়। কলিকাতা অঞ্চলের লোক মর্ত্তমান কলারই বেশী আদর করে; ইহা খাইতেও বিশেষ সুস্বাদু ও অধিক দরেও বিক্রয় হয়। ইহার গাছ বেশীদিন বাঁচে না। কারণ পোকায় ঝাড় নষ্ট করিয়া ফেলে। আমাদের দেশে আজ-

কাল 'কাবুলে' কলা পাওয়া যায়, তাহার আকার বৃহৎ এবং খাইতে সুস্বাদু। চট্টগ্রাম ও আরাকান প্রদেশে মর্ত্তমান কলা বেশী জন্মে। সিঙ্গাপুর ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৭০।৮০ রকমের কলা পাওয়া যায় তন্মধ্যে 'পিস্যাংসু' বা দুধেকলা, 'পিস্যাংটিম্বানা' বা রাঙ্গাকলা, ও 'পিস্যাং রাজা' বা রাজকলাই প্রধান এবং সুগন্ধ বিশিষ্ট ও সুস্বাদু।

যবদ্বীপে একপ্রকার কলা জন্মে; অন্যান্য কলার ন্যায় ইহার মোচা বা কাঁদি দেখা যায় না। বৃক্ষাভ্যন্তরে একটীমাত্র বৃহৎ কলা লুক্কাইত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া কাণ্ড ফাটিয়া পাকিয়া উঠে এবং এই প্রকাণ্ড কলাটিতে চারিটি লোকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত এখানে কানাই-বাঁশীর ন্যায় "পিস্যাং টণ্ডক" নামে একপ্রকার দুই ফুট দীর্ঘ কলা হয়। ফিলিপাইন দ্বীপে এক জাতীয় কলা জন্মে, তাহার একটীমাত্র কলা একটি মুটের বোঝা। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে অনেক জাতীয় কলা জন্মে, তন্মধ্যে মান্দ্রাজের রসথলি কলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কদলীর নাম।

কদলী যে সমুদয় নামে অভিহিত হয় তাহার প্রত্যেকটি ইহার গুণের পরিচায়ক। যথা—কদল [ক বায়ু—দল্‌ভেদ করা + অ (অল)। যে বায়ু কর্ত্তৃক দলিত হয়; ৩য়া-ষ, অথবা শীতবীর্য্য হেতু যে বায়ুরোগ দলন করে, (২য়া ষ) সং পুং, রম্ভাবৃক্ষ। ক্লীং, তৎফল। লী-স্ত্রী কলাগাছ। সকৃৎফলা (একটী গাছে একবার মাত্র ফলধরে), ভানুফলা (সূর্য্যোত্তাপপ্রিয়া) অংশুমৎফলা (যাহার অংশু বা তন্তু আছে); চর্ম্মণ্বতী (যাহা চর্ম্মের ন্যায় আবরণযুক্ত); বনলক্ষ্মী (বনের শোভা বৃদ্ধিকারী বা যদ্দ্বারা বনেও অর্থাগম হয়); হস্তি-বিষাণী (হস্তির দন্তের ন্যায় সুগোল-; বারণ-বল্লভা ও বারণ-বুসা (হস্তিপ্রিয়া); মোচক (যাহা আবরণী হইতে মুক্ত হইয়াছে); বাকী নামগুলি পড়িলেই মানে বুঝা যায় যথা:—বালকপ্রিয়া, নিঃসারা, রম্ভা, রোচক, লোচক, সুফলা, রাজেষ্টা, গুচ্ছফলা, সুকুমার, উরুস্তম্ভা, কদল, কাষ্ঠিল ইত্যাদি।]

কদলীর চাষ।

তোলামাটীতে কদলীবৃক্ষ সতেজে বর্দ্ধিত হয় এবং সুফল প্রদান করে। তবে বিশেষ কঠিন ও বালি মাটি ভিন্ন, সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই এগাছ উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে ইহার চাষের জন্য তেমন যত্ন দেখিতে পাওয়া

যায় না; তথাপি যেমন তেমন ভাবে লাগাইয়াও ইহা অনেক ফসল প্রদান করে। বোদমাটী * ও ছাই কলাগাছের হিতকর।

রোপণের সময় সম্বন্ধে খনার প্রাচীন উক্তি ঃ—

১। কি কর শশুর মিছে খেটে,
ফালগুণে পোঁত এটে কেটে,
বেধে যাবে ঝাড় কি ঝাড়,
কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়।

২। যদি পোঁত ফাল্গুনে কলা,
কলা হবে মাস ফসলা।

৩। ডাক দিয়ে বলে খনা,
আষাঢ় শ্রাবণে কলা পুতনা,
রুবি বটে খাবিনে, কলাতলায় যাবিনে,
লেগে যাবে জুয়ে, কলা পড়বে শুয়ে।

৪। সিংহ মীন বর্জ্জে,
কলা খাবে আর্জ্জে।

৫। ভাদরে ক'রে কলা রোপণ,
সবংশে মরিল রাবণ।

৬। ডাকদে ব'লে রাবণ,
কলা পুতগে আষাঢ় শ্রাবণ।

খনার নিয়মে ভাদ্র ও চৈত্রমাস ব্যতীত সকল মাসেই কলাগাছ পোতা যায়। ফাল্গুনমাসে এঁটে কাটিয়া পুতিলে খুব সতেজ কলাঝাড় হয় এবং কাঁদিও বড় হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কলাগাছ পোতা যায় বটে, কিন্তু জুঁয়ে নামে একপ্রকার পোকা লাগিয়া ঝাড় নষ্ট হইবার ভয় আছে। কোনও কোনও মতে বৈশাখ হইতে শ্রাবণমাস পর্য্যন্ত রোপণের প্রশস্ত সময়। তবে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে আষাঢ় মাসে তেউড় রোপিবার এবং ফাল্গুন মাসে এঁটে কাটিয়া পোতিবার উৎকৃষ্ট সময়। এক ভূমীতে বৃক্ষ সকল পাঁচ বৎসর কাল বেশ সুফল প্রদান করে, তৎপরে জমী পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

* পুষ্করিণী খনন করিবার সময় যে কালো মাটী বাহির হয়, তাহাকেই কৃষকেরা বোদমাটি বলে; এবং এই মাটি বৃক্ষাদি পচিয়া কালে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়।

কলার বাগান প্রস্তুত।

জমীর চতুষ্পার্শে অথবা দু এক ধারে পগার কাটিয়া অন্ততঃ একহাত মাটী জমীর উপর তুলিবে এবং মাটী চারাইয়া দিয়া সমতল করিবে। তৎপরে মূল সমেত তেউড় কাটিয়া যদৃচ্ছাক্রমে লাগাইয়া দাও। কিছুদিন পরে গাছ গুলি বড় হইলে গোড়াগুলি রাখিয়া গাছ সকল কাটিয়া দূরে নিক্ষেপ করতঃ মূলগুলি কোদাল বা লাঙ্গলের দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে আট হাত ব্যবধানে প্রোথিত হয় এমতে চারাইবে। এই সকল টুকরা গোড়া হইতে যদিও ছোট ছোট গাছ জন্মিবে কিন্তু তাহারা বৃহৎ বৃহৎ কাদি প্রদান করিবে এবং কলাও বড় হইবে। (২) উল্লিখিত নিয়মে জমীতে মাটী তুলিয়া কিম্বা কদলী শ্রেণী বসাইবার হিসাবে স্থানে স্থানে মাটী তুলিয়া খনার নিম্নলিখিত নিয়মে পুতিলেও বিশেষ ফল হয়।

(ক)　　সাত হাতে, তিন বিঘাতে,
　　　　কলা লাগাবে মায়ে পুতে।

অর্থাৎ এটে সমেত চারা সকল সংগ্রহ করিয়া সাত হাত অন্তর দেড়হাত গভীর গর্ত্তে বসাইবে।

(খ)　　নলে কান্তর গজের বাই,
　　　　কলা রুয়ে খেও ভাই।

অর্থাৎ নল বা প্রায় সাতহাত অন্তর দুহাত গভীর গর্ত্ত খুড়িয়া চারা সকল বসাইবে।

(গ)　　সাতহাত অন্তর সাতহাত বাই,
　　　　কলা পুতে খাও চাষা ভাই।

এই নিয়মে সাত হাত অন্তর পৌনে দুহাত গভীর গর্ত্তে চারা বসাইতে উপদেশ দিয়াছেন।

কদলীর উদ্ভিদ্ তত্ত্ব।

এই বৃক্ষের কাণ্ডটী কেবলমাত্র পত্রগুলির গোড়ার সমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহাতে কঠিন পদার্থ নাই; এ কারণ উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা কদলীকে কোমলকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। কলা গাছের পিণ্ডমূল বা এটেই ইহার প্রধান অবলম্বন এবং এই পিণ্ডমূলের ঠিক মধ্যস্থল হইতে একটী শুভ্রবর্ণ গোলাকার মজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পত্র পিণ্ডমূল হইতে নির্গত হইয়া উক্ত মজ্জাটীর চতুর্দ্দিকে সজ্জিত ভাবে থাকে। মজ্জার

চতুষ্পার্শ্বস্থ এই সকল কাণ্ডকোষ বা কলা-বাসনা বৃক্ষের বা বৃক্ষকাণ্ডের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া থাকে। কালে এই মজ্জাটী থোড় বা পুষ্পদণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে। এই মজ্জাটী কেবল কতকগুলি রসনিঃশোষক শিরার সমষ্টি মাত্র। মোচা বা ফুল হইবার পূর্ব্বে এই মজ্জার শেষভাগ হইতে একখানি অসিফলক সদৃশ পত্র নির্গত হয় এবং চলিত কথায় তাহাকে 'পাতমোচা' বলে। এই পাত মোচার গোড়াতেই মোচা থাকে। নারিকেল, তাল ও সুপারি বৃক্ষের পুষ্পাবরণের ন্যায় পাত মোচাটী কলা ফুলের আবরণ বিশেষ। যখন মোচা পুষ্ট হয় তখন ইহার পাত মোচার তলার দিক ফাটিয়া নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়ে। মোচা ঃ—সচরাচর একটী মোচার দৈর্ঘ্য প্রায় ১॥০ ফুট হইতে ২ ফুট এবং বেড় প্রায় ½ হইতে ১ফুট পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একটী মোচার মধ্যে বহুসংখ্যক পুষ্পমুকুল দুইটী দুইটী করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে এক একখানি চর্ম্মবৎ সুচিক্কণ পৌষ্পিক পত্রাবর্ত্তে আবৃত থাকিয়া স্তরে স্তরে সাজান থাকে। প্রতি সারে প্রায় ৮।১০টি করিয়া মুকুল থাকে। যেমন মোচাফুলগুলি বাড়িতে থাকে তাহাদিগের আবরণ সকল (মোচার খোসা) খসিয়া পড়ে, (চলিত কথায় 'মোচাছাড়া' বলে)। মোচার গোড়ার ভাগের সকল ফুলগুলিই কলায় পরিণত হইয়া কাঁদির আকার ধারণ করে এবং নিম্নস্তরের ফুলগুলি ক্রমশঃ ঝরিয়া যায়। (মোচা কাঁদি ছাড়া হইলে এই অংশটুকু প্রায় কাটিয়া লইয়া যাওয়া হয়)। একটগাছের কাঁদি পর্য্যন্তই শেষ এবং কলা পাকিলেই গাছটি মরিয়া যায়, কিন্তু মোচা হইবার পূর্ব্ব হইতেই বৃক্ষটির চতুর্দ্দিকে ৬।৭টি চারাগাছ বা তেউড় পিণ্ডমূল,হইতে নির্গত হইয়া কদলী বৃক্ষের বংশ অক্ষুণ্ণ করিয়া থাকে।

কলাগাছের আয়।

কদলী বৃক্ষের রীতিমত আবাদ করিলে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। এতদ সম্বন্ধে খনার বচন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

তিন শ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে,
থাকগে চাষী ঘরে শুয়ে।
কলা পুতে না কাটিস পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

প্রায় তিনবিঘা জমিতে ৩৬০ ঝাড় কলাগাছ রোপণ করা যায়। এবং প্রায় এক বৎসরের মধ্যে সকল গাছগুলিই ফলিয়া থাকে। একটি কাঁদিতে গড় পড়তায় প্রায় ১৬০ পর্য্যন্ত কলা হয়। একটি কাঁদি পাইকারী হিসাবে।৵০

হইতে ৮০ বার আনা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। খুব কম লাভ হিসাব করিলেও তিন বিঘা জমীতে বৎসরে অ ্যুন ১৪৫৲ টাকা আয় হইতে পারে; সুতরাং খনার বচন অনুসারে একটি পল্লীগ্রামে মাসিক ১০।১২ টাকায় একটি সামান্য গৃহস্থের স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। তিন বিঘা জমিতে ১৪৫৲ টাকা আয় বড় সহজ আয় নহে।

এতদ্ব্যতীত কলা বাসনার দড়ী ও সূতা প্রস্তুত করিলে এবং শুষ্ক কলা হইতে পালো ও বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিলে আরও আয় হইতে পারে।

কলাগাছের ব্যবহারও উপকারিতা।

হিন্দুরা দৈব ও মাঙ্গলিক কার্য্যসমূহে কলার তেউড় গৃহের দরজায় মঙ্গলের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহার করেন। ৺ দুর্গোৎসবের সময় "কলাবউ" নবপত্রিকারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। বোম্বাই প্রদেশস্থ হিন্দু স্ত্রীলোকেরা কদলী বৃক্ষকে ধন ও আয়ুপ্রদ বোধে পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের বিবাহ, উপনয়নাদি সংস্কারে, চারিটী পত্র চতুষ্কোণাকারে পুতিয়া "কলাতলা" করা হয়। শ্রাদ্ধে কলার খোলার ব্যবহার হিন্দুমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। অনেক হিন্দু স্ত্রীলোক সন্তানের মঙ্গল কামনায় "সো দো" বা তুলসীব্রত করিয়া পৌষসংক্রান্তির দিন কলার খোলায় নৌকা গঠন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত প্রদীপ সহিত নদী বা পুষ্করিণীতে ভাসাইয়া ভবানীর পূজা করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা পীরের সিন্নি দিবার জন্য কদলী ব্যবহার করেন। হিন্দুর সকল পূজা, ব্রত ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে কদলীর প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে।

বন্যার সময় অনেক প্রদেশে কলাগাছের মান্দাস ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার কোন কোন স্থানের লোকে কলার পাতায় ঘর ছাইয়া থাকে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কলাপাতে আহার প্রচলন আছে; এবং অনেকে ধাতুপাত্রে আহার অপেক্ষা কদলীপত্রে আহার করিয়া সাতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন। ভারতবর্ষে পশ্চিমাঞ্চলে শুষ্ক পাতায় বিড়ি চুরুট জড়াইয়া থাকে। কচি কলাপাতা ব্লিষ্টারের বা অন্যপ্রকার ক্ষত আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। চোখ উঠিলে কলাপাতার আবরণ বিশেষ হিতকর।

কলার পিণ্ডমূলের রস বহুমূত্র রোগে ফলপ্রদ এবং কবিরাজী ঔষধে প্রয়োজন হয়।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে গো মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণ কলাগাছ খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

যবদ্বীপে এক জাতীয় কলাগাছের পাতার নীচের পিঠে মোমের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ জন্মে, তদ্দ্বারা বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কলাগাছের কাণ্ড, বিশেষতঃ পাতার ডাঁটা হইতে অতি সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত করা যায়। এক একটী গাছ হইতে প্রায় /২ সের পর্য্যন্ত সূতা প্রস্তুত হইতে পারে। কলার সূতায় কাপড় ও দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে। ঢাকার জনৈক তন্তুবায় কলার সূতায় একখানি অতি সুন্দর তসরের ন্যায় রুমাল প্রস্তুত করিয়া ১৮৮৪ সালে কলিকাতার প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিল; সেখানি আজও যাদুঘরে (Museum) দেখিতে পাওয়া যায়। এই রুমালখানি দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় দুই হাত; ইহা ৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। কলার আঁশে (Fibre) অতি সুন্দর, মসৃণ ও চামড়ার ন্যায় কড়া (Stiff) কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ১৮৬৪ সালে ডাক্তার ফ্লে কলার আঁশ হইতে একপ্রকার অতি সুন্দর চিঠির কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৫১ সালে মান্দ্রাজের মহা প্রদর্শনীতে ডাক্তার হণ্টার কলার সূতায় প্রস্তুত দড়ি, কাছি, কাগজ ও সূতার নানাপ্রকার নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত নমুনায় রূপার পাতের ন্যায় পাতলা এবং মসৃণ একপ্রকার কাগজ ছিল, তাহা পার্চমেণ্টের ন্যায় কড়া ও জলে ভিজিলে নষ্ট হয় না। কলার আঁশের কাগজে ভাঁজ পড়িলে ফাটিয়া যায় না। কলে কাগজ প্রস্তুত করিবার সময় ইহাতে সুটুলি বা গাঁইট পড়ে না; কাগজ বেশ মজবুত হয়। বালীর কলে (Bally Paper Mills) এক সময়ে কলার আঁশে বেশ ভাল কাগজ তৈয়ার হইয়াছিল। (এই কাগজের কলটি উঠিয়া যাওয়ায় দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে)।

ফিলিপাইন দ্বীপের এক জাতীয় কলাগাছ হইতে "ম্যানিলা শণ" (Manilla hemp) নামক সূতা প্রস্তুত হয়; ইহা অত্যন্ত দৃঢ়; সণের সূতা অপেক্ষাও ২৷৷০ গুণ ভার সহনক্ষম। এই জাতীয় বৃক্ষে ফল হইতে দিলে সূতা ভাল হয় না। ইহার ফলও অখাদ্য। আজকাল আমাদের দেশে স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ বোম্বাই অঞ্চলে এই জাতীয় কলার চাষ হইতেছে। এই এই গাছের বাস্‌না (ত্বক্) গুলি ৩ ইঞ্চি চওড়া ভাবে চিরিবার পর পিষিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া সূতা বাহির করিতে হয়।

সূতা প্রস্তুতের নিয়ম।

প্রথমে বাসনাগুলি উত্তমরূপে থেঁতো করিয়া বা কলে পেষাই করিবার পর জলে পচাইয়া লইতে হয়। সূতাকে দৃঢ় করিবার জন্য তৎপরে কলিচুণ ও সোডা দিয়া সিদ্ধ করা আবশ্যক। ৪।৫ বার সিদ্ধ করিলে বেশ পরিষ্কার ও মজবুত সূতা পাওয়া যায়। যদি সূতার রং কালবর্ণ দেখা যায়, তাহা হইলে ১৫।১৬ ঘণ্টা ধৌত করা আবশ্যক; কিন্তু যদি সিদ্ধ করিবার পর ফিকা রঙ্গের সূতা বাহির হয় তবে ৫।৭ ঘণ্টা ধুইলেই অতি সুন্দর সূতা পাওয়া যাইবে। ১১।১২ মণ সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য অর্দ্ধমণ কলিচুণ ও অর্দ্ধমণ সোডার আবশ্যক হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এল, সি, পি, এস।

পল্লীগ্রামের দুরবস্থা।

আমাদের দেশের পল্লীগ্রামবাসিগণের দুরবস্থার হ্রাস না হইয়া যে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অহঙ্কার যে, তাঁহাদের রাজত্বে ভারতবাসীর অবস্থার ক্রমোন্নতি হইতেছে; প্রতি বৎসরই গবর্ণমেণ্ট এইরূপ মন্তব্য সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা পল্লীগ্রামের অবস্থার বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের এ কথার অনুমোদন করিতে সমর্থ নহেন। প্রত্যেক জেলায় যে তিন চারিটী মাত্র স্থানে মিউনিসিপাল কার্য্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইগুলিকে সহর বলা যাইতে পারে এবং সেইগুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল; কিন্তু অবশিষ্ট বহুসংখ্যক গ্রামের অবস্থা অতীব শোচনীয়। আমরা বাঙ্গালা ও বিহার অঞ্চলের অনেক পল্লীগ্রামের বিষয় সবিশেষ অবগত আছি, তাহাদের প্রকৃত চিত্র নিম্নে বর্ণিত হইল।

প্রত্যেক পল্লীগ্রামে নানাবিধ জাতির বাস। যে গ্রামে ৫০ ঘর লোকের বাস তাহার মধ্যে হয়ত ১০ ঘর ব্রাহ্মণ, ৫ ঘর কায়স্থ, ২ ঘর তন্তুবায়, ১ ঘর কর্ম্মকার, ১ ঘর সূত্রধর, ২ ঘর রজক, ১ ঘর নাপিত, ১ ঘর কুম্ভকার, ৫ ঘর সদগোপ, ৫ ঘর মুসলমান এবং অবশিষ্ট শ্রমজীবী নিম্নশ্রেণী। এই সকলের

মধ্যে হয়তঃ দুই ঘর ধনী, ১০ ঘর মধ্যবিত্ত ও অবশিষ্ট নির্ধন। গ্রামের জাতিগত আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, গ্রামবাসিগণ সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিবার অভিপ্রায়ে একত্রে বাস করিয়াছিল। সকলেই পরস্পরের সাহায্যে কোনরূপ অভাব কিম্বা অসুবিধা সহ্য করিতে না হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামেই দুই চারিটী পুষ্করিণী ও দু একটী বাগিচা এবং গ্রামের চতুর্দ্দিকে প্রচুর চাষের জমি। গ্রামের লোকের পরস্পর সহানুভূতি ও সদ্ভাব ছিল এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য তাহাদিগকে অপরের মুখাপেক্ষী হইতে কিম্বা সাহায্য খুঁজিতে হইত না। অপর জাতির লোক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে সকল বিষয়ে নেতা বলিয়া সম্মান করিত এবং নেতাগণও নিরপেক্ষ ভাবে বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দিয়া সমাজ ও শান্তিরক্ষা করিত। জমিদার গ্রামবাসী হইলে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন এবং প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। কোন কোন গ্রামে জমীদারের নায়েব কি গোমস্তা জমীদার-স্থানীয় ছিলেন। পল্লীগ্রামবাসিগণ ভ্রাতৃভাবে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে ঐহিক ও পারত্রিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত। গ্রামের মধ্যে দেবালয় ছিল। দেবপূজা, পুষ্করিণী ও বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সাধারণের হিতকর কার্য্য করিবার জন্য সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিত। প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই বৎসর বৎসর বারওয়ারী পূজার উপলক্ষে সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ উৎসবে কয়েক দিন যাপন করিত; ধনী, নির্ধন সকলেই অক্ষুণ্ণমনে যথাসাধ্য চাঁদা দিয়া এই সকল শুভকার্য্য সম্পাদন করিত। রামায়ণ, মহাভারত, ধর্ম্মগান, কথকতা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও মঙ্গলকর্ম্মে দুই তিন গ্রামের লোক যোগদান করিত। পল্লীবাসীগণের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, হিংসা ছিল না; মামলা মকদ্দমা ছিল না; জাতিভেদ স্বত্ত্বেও সকলের মধ্যে আত্মীয়তা ছিল। সরলতা, অকপটতা তাহাদের চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সকল বিষয়েরই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পল্লীগ্রামে এখন আর চরিত্রবান্ লোক নাই বলিলেই হয়। বিবাদ বিসম্বাদ, দলাদলি, মকদ্দমা আজকাল দৈনিক কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বারওয়ারী পূজা ও অন্যান্য সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে, পুরাতন দেবমন্দির সংস্কারাভাবে ভগ্ন হইতেছে। পুরাতন অট্টালিকা সর্প প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর আবাস স্থান হইয়াছে; অট্টালিকা স্বামীর উদরান্নই যোটা ভার, তিনি গৃহ সংস্কারের খরচ কোথা পাইবেন? ম্যালেরিয়া জ্বরে লোকে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে,

এবং অনেক গৃহ জনশূন্য হইয়াছে। আবার মধ্যে মধ্যে ওলাউঠা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবে লোককে সশঙ্কিত হইতে হয়। বাঙ্গালা বিহারের অনেক পল্লীগ্রামে প্লেগও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং প্রতি বৎসর লোকসংখ্যার হ্রাস করিতেছে। কোন গ্রামেই নূতন ইমারত দেখা যায় না, এবং গ্রামবাসীদের দেখিলেই বোধ হয়, তাহাদের মনের প্রফুল্লতা নাই, শরীরে বল নাই, সকলেই যেন অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; যেন সকলেই গুরু কর-ভারাক্রান্ত, মকদ্দমা ব্যয়ে ঋণজালে জড়িত, পুলিসের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত এবং জমিদারের পীড়নে উৎপীড়িত। এখন আর ইতরলোক ভদ্রলোককে সম্মান করিতে ইচ্ছুক নহে; জাতিভেদ আছে, কিন্তু শূদ্র আর ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান করিতে চাহে না। যে সকল সদ্গুণের জন্য ব্রাহ্মণ সম্মানার্হ ছিলেন, এখন সে সকল গুণের সম্পূর্ণ অভাব। সরলতার পরিবর্ত্তে অসরলতা, স্বার্থশূন্যতার স্থানে স্বার্থপরতা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিবাসীর মধ্যে সামান্য বিবাদ হইলেই এখন আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হয়; প্রত্যেক গ্রামেই গ্রাম্য মোক্তার আছে, তাহারা বিবাদ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং অর্থের লোভে যত্নপূর্ব্বক বিবাদকারীদিগকে আদালতে লইয়া যায়। আদালত ও উকিল মোক্তারে পরিপূর্ণ; তাঁহারা পেটের জ্বালায় মকদ্দমা সংখ্যার বৃদ্ধি খুঁজিয়া বেড়ান এবং মক্কেল পাইলেই মকদ্দমা জুড়িয়া দেন। একবার মকদ্দমা রুজু হইলেই ঘটী বাটী গরুবাছুর বিক্রয় করিয়া খরচ যোগাইতে হয় এবং শেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া প্রাণান্ত হয়! আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইলে পাছে অজ্ঞাতসারেও দুই একটা মিথ্যা কথা বলিতে হয় এই ভয়ে পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোকে সাক্ষ্য দেওয়া পাপ মনে করিত। এখন আর মিথ্যা সাক্ষীর অভাব নাই। পূর্ব্বে কোন রূপ দলিল সম্পাদিত না হইয়াই মৌখিক ঋণদান ঋণগ্রহণ চলিত; এখন দলিল স্বত্বেও অধমর্ণ উত্তমর্ণকে ফাঁকি দিবার জন্য নানারূপ প্রয়াস পাইয়া থাকে। বাস্তবিক, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি পাপে সহর ও পল্লীগ্রামের লোকে সমভাবে কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পল্লীগ্রামের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষাকালে অধিকাংশ গ্রাম চতুর্দ্দিকে জলময় হওয়াতে দ্বীপে পরিণত হয়; কয়েকমাস লোকের কষ্টের সীমা থাকে না; অনেক সময়ে খাদ্য দ্রব্যের অভাবে গ্রামবাসীদিগকে অনাহারে থাকিতে হয়। জল নিকাশের বন্দোবস্ত না

থাকাতে সমস্ত জলই গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী জমিতে আবদ্ধ থাকে এবং তদ্বারা জঙ্গল ও বৃক্ষের পত্র ও ফল পচিয়া চতুর্দ্দিক দুর্গন্ধময় হয় ও বায়ু দূষিত হওয়ায় জ্বর প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সে দিন বাঙ্গলার ছোট লাটসাহেবের সভায় ১৯০৫ সালের জ্বর হইতে মৃত্যু সংখ্যার যে তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে দেখা যায় যে, কোন কোন জেলায় সহস্র লোকের মধ্যে একত্রিংশেরও অধিক কেবল ম্যালেরিয়া জ্বরে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। প্রায় সকল পল্লীগ্রামেই পানীয় জলের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। পুরাতন পুষ্করিণীগুলি পঙ্কোদ্ধারাভাবে মজিয়া গিয়াছে এবং নানাবিধ জলজ জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায় জল একবারে পানের অযোগ্য। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত পল্লীগ্রামবাসিগণকে জলাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। দূষিত জল ব্যবহারেই যে উদরাময় ওলাউঠা বসন্ত ও জ্বর প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয় তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রামের বড় বড় পুষ্করিণীগুলি জমিদারের খাস সম্পত্তি, সেগুলিকে পরিষ্কার রাখা জমিদারের কর্ত্তব্য হইলেও তিনি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অধিকাংশ গ্রামের যাতায়াতের রাস্তা নাই ; সেই জন্য বর্ষাকালে কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র যাইতে হইলে বহুব্যয় ও অসুবিধা হয়। গ্রামবাসীরা রোডশেষ দিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ এপর্য্যন্ত সুবিধাজনক যাতায়াতের রাস্তা প্রস্তুত হইল না !

পল্লীগ্রামে চুরি ডাকাতির হ্রাস দেখা যায় না। গ্রামবাসিগণের ধন প্রাণ রক্ষার জন্য চৌকীদারী কর লওয়া হয় ; এই করের পরিমাণও অল্প নহে ; কিন্তু চুরি ডাকাতি নিবারণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত কোথায় ? দুই একটী অকর্ম্মণ্য চৌকীদার পুলিষের হুকুম তামিল করিতেই ব্যস্ত, তাহারা রাত্রিতে চৌকী পাহারা দেয় না। তাহাদের শারীরিক অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায় যে, তাহাদের দ্বারা চুরি ডাকাতির নিবারণ হওয়া অসম্ভব। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে নিরস্ত্র করাতেই চুরি ডাকাতি বৃদ্ধি পাইতেছে। বন্দুক ডাকাতি নিবারণের প্রধান অস্ত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ অধিকাংশ গ্রামেই একটী মাত্রও বন্দুক নাই। সকলে অবগত আছেন বন্যশূকর প্রভৃতি জন্তু কৃষক দিগের ফসল অপচয় করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, বন্দুকের অভাবে ইহার প্রতীকার হয় না।

পল্লীগ্রামবাসিগণ পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা উপভোগ করে না। অনেক গ্রামেই টেলিগ্রাফের সংবাদ পাইবার বন্দোবস্ত

নাই। কোন কোন গ্রামে পাঠশালের গুরুমহাশয়ের উপর পোষ্ট আফিষের কার্য্যভার ন্যস্ত। তাহার অধীনে একটী কিম্বা দুটী ডাকপেয়াদা থাকে, একটি পেয়াদাকে পঞ্চাশ বাইটখানি দূরবর্ত্তী গ্রামে চিঠি বিলি করিতে হয়, সুতরাং অনেক বিলম্বে চিঠি বিলি হয়। আবার পেয়াদা মহাশয় সময়ে সময়ে চিঠি গুলি নষ্ট করিয়া নিজের পরিশ্রমের লাঘব করিয়া থাকেন; কিছু পয়সা না পাইলে মনিঅর্ডর টাকা প্রদান করেন না।

শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল বিষয়েই পল্লীগ্রামবাসীদিগের অবস্থা শোচনীয়। কোন কোন গ্রামে একটি সামান্য ঘরে একটি পাঠশালা আছে; তাহাতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে বালকগণ পাঠ করিতে আসে। গুরুমহাশয়টি সামান্যরূপ লেখা পড়া জানে এবং ছাত্রদিগকে শিক্ষা অপেক্ষা প্রহার দিতেই বিশেষ পটু। স্থানে স্থানে প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, অধিকাংশ গ্রামই সেই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত। বাস্তবিক, শিক্ষার অভাবে দেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। পল্লীগ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সহরে বাস করিয়া সন্তানগণকে লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন বলিয়াই আজকাল শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কিছু কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। পল্লীগ্রামে শিক্ষিত ডাক্তার কবিরাজের সম্পূর্ণ অভাব। অশিক্ষিত "হাতুড়ে ডাক্তার" নামধারী ব্যক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থা করে ও গরিব রোগীদিগকে যম-সদনে প্রেরণ করে; কঠিন পীড়া হইলে বিনা চিকিৎসায় যে রোগীর মৃত্যু হয় ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে। আজ কাল কোন কোন গ্রামে শিক্ষিত ডাক্তার আছেন-কিন্তু তিনি এত টাকা ফি চাহিয়া বসেন যে, অবস্থা-হীন লোক তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইতে নিতান্ত অসমর্থ। প্রত্যেক জেলায় তিন চারিটীমাত্র সরকারী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অত্যল্প লোকই উপকৃত হয়। এখানে একটা ব্যক্তব্য যে, সরকারী চিকিৎসালয়ে রোগীদিগকে যথারীতি যত্ন করা হয় না বলিয়া সম্ভ্রান্ত দরিদ্রলোক সেখানে চিকিৎসিত হইতে যায় না। পূর্ব্বে কবিরাজগণ দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিতেন এবং পণ্ডিতেরা বিনা অর্থে ছাত্রগণকে বিদ্যাদান করিতেন, কিন্তু ক্রমশঃ দেশে সেই দেবোপম নিষ্কাম ধর্ম্মকর্ম্ম লুপ্ত হইতেছে। ধনবান্ রাজা ও জমিদার এখন আর পণ্ডিত ও কবিরাজদিগকে অকাতরে সাহায্য প্রদান করেন না, কাজেই তাঁহারা দরিদ্রের প্রতি দয়া দেখাইতে অসমর্থ।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশার জন্য কে দায়ী এবং কি কি উপায়ে দুরবস্থার উন্নতি হইতে পারে। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, পল্লীগ্রামবাসীই নিজের দুর্দ্দশার জন্য কতক পরিমাণে দায়ী। কু অভ্যাস-বশতঃ গ্রামের ভদ্র ও ছোটলোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না, আপন আপন গৃহ ও গৃহের চতুস্পার্শ্ব পরিষ্কার রাখে না; পচা দুর্গন্ধ গোবর ও জঞ্জাল বাড়ীর নিকটেই জমা করিয়া রাখে। পানীয় জলের পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দ্দিক যে সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য এবং কোন রকমে জল ময়লা করা উচিত নহে, তাহা তাহাদের জ্ঞান নাই। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, দরিদ্রতা নিবন্ধন লোকে উপযুক্তরূপ ব্যবহার্য্য পরিধেয় বস্ত্রাদি ক্রয় করিতে পারে না ও সর্ব্বদা বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও পরিষ্কার করিতে অসমর্থ; গরম মূল্যবান শীতবস্ত্র ও শয্যা হইতেও দরিদ্রলোক বঞ্চিত, এবং স্বাস্থ্যকর, এমন কি যথেষ্ট আহার্য্য সংগ্রহ করিতে অপারগ। দরিদ্র লোকের অভাব পুরণ না হওয়াতে মনের প্রফুল্লতা থাকিতে পারে না। অর্দ্ধাশনে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়ে; এবং তাহাকে নানারূপ ব্যাধি আক্রমণ করে। ফলতঃ আমাদের দেশে দরিদ্রতার প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়াই রোগের বৃদ্ধি হইতেছে এবং লোকসংখ্যার হ্রাস করিতেছে।

পল্লীগ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি সহরে বাস করিতেছেন; তাঁহাদের কোনরূপ অসুবিধা সহ্য করিতে হয় না, সুতরাং স্বগ্রাম-বাসীদিগের সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি নাই, গ্রামের লোকের সুখ দুঃখে তাঁহারা সম্পূর্ণ বীতরাগ। ইহাই পল্লীগ্রামের দুর্দ্দশার একটী প্রধান কারণ। জমিদার ও প্রজার মধ্যে পূর্ব্ববৎ সদ্ভাব না থাকাতে জমিদার পল্লীগ্রামের উন্নতির বিষয়ে একেবারে উদাসীন। গ্রামের ভিতর যে সকল রাস্তা আছে, সেগুলির সংস্কার করা ও খাস পুষ্করিণীগুলি পরিষ্কার রাখা জমিদারের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু জমিদার সে সকল কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ। বড় বড় জমিদার সহরে বাস করেন। জীবনে একবারও জমিদারী পরিদর্শনে বহির্গত হন না; ভৃত্যবর্গের উপর সকল কার্য্যের ভার দিয়া আমোদ প্রমোদ ও সাহেব সেবায় জীবন যাপন করেন। ভৃত্যগণ খাজনা ও আদায় করিয়া কতক মনিবকে দেয় ও কতক আত্মসাৎ করে; প্রজা মরুক আর বাঁচুক সে বিষয়ে লক্ষ্য নাই। আর গবর্ণমেণ্ট যে পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে অমনোযোগী সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব শীতকালে

একবার মফঃস্বল পরিভ্রমণে বাহির হন এবং ধনীলোকের সহিত সাক্ষাৎ ও শীকারাদি করিয়া বেড়ান। যে সকল রাস্তাদিয়া তাঁহার গাড়ী যায়, জেলার ইঞ্জিনিয়ার সেই রাস্তাগুলি তালি তুলি দিয়া মেরামত করিয়া রাখেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যপটুতার প্রশংসা করেন, এবং মফঃস্বলের লোক খুব সুখ স্বচ্ছন্দে আছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট পাঠান। গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জেলার একটী অবৈতনিক বোর্ডের উপর জেলার সকল কার্য্য ভার ন্যস্ত রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। বোর্ডের মেম্বরগণ সহরে থাকেন। কখন মফস্বল পরিদর্শনে বহির্গত হন না; মাজিষ্ট্রেটই তাঁহাদের কর্ত্তা ও পরিচালক। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা কাহার সাধ্য? এই সকল "ধামাধরা" কর্ত্তব্য-জ্ঞান-রহিত লোকের উপর পল্লীগ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের ভার অর্পিত। এইরূপ "কার শ্রাদ্ধ কেবা করে" বন্দোবস্তে যে সাধারণ হিতকর কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। প্রতি জেলায় বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে, কিন্তু মফস্বল বাসিদিগের দুরবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। বোর্ডের বেতন ভোগী কর্ম্মচারিগণ "স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ" কথাটী স্মরণ রাখিয়া তদনুরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া জ্বর নিবারণের কি কি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিয়া থাকেন যে, শস্তাদরে কুই-নাইন বিক্রয় করিবার উপায় করা হইয়াছে। আহা! কি সুবন্দোবস্ত! কুইনাইন ব্যবহার করিয়াই দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। ইহার সেবনে জ্বরের আশু উপশম হয় বটে, কিন্তু রোগীর শরীর একবারে চিরদিনের জন্য রুগ্ন হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ দরিদ্র লোকে কুইনাইন ব্যবহারের পর দুগ্ধ ও অন্যান্য পথ্যের ও গাত্রাচ্ছাদন বস্ত্রের অভাবে পুনঃ পুনঃ জ্বরে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমরা দেখিতেছি, কুইনাইন দরিদ্র লোকের পক্ষে ঔষধের ন্যায় উপকার না করিয়া বিষের মত অপকার করিয়া থাকে।

আজ কাল আমাদের দেশের লোকের মনে স্বদেশানুরাগ জন্মিয়াছে। দেশের তন্তুবায় কর্ম্মকার প্রভৃতির অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এখন এই সকল পল্লীগ্রামস্থ লোকের স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়েও আমাদের নেতৃগণের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য, গবর্ণমেণ্টের উপর ভারদিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে। জমিদারগণ যাহাতে পল্লীগ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি করিতে যত্নবান্ হন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

স্বদেশী সভা সমিতিতে এবং সংবাদ পত্রে মফস্বলবাসিদিগের দুরবস্থার পর্য্যালোচনা ও আন্দোলন করা ও গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। কেবল দেশী শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করিলেই যে শিল্পীদিগের দুরবস্থার অপনোদন হইবে তাহা নহে। তাহাদের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। দেশের শিল্পী অপেক্ষা কৃষকের সংখ্যা অনেক বেশী; পল্লীগ্রামের উন্নতি না হইলে শিল্পী ও কৃষকের দুর্দ্দশা দূরীভূত হইবে না।

আমাদের বিশ্বাস ডিষ্ট্রীক্‌ট বোর্ডের অনেক টাকার অপব্যয় হয়। প্রতি বৎসর যে পরিমাণ রোডশেষ আদায় হয়, তাহাতে অনেক সৎকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে; দু চারিটী রাস্তা মেরামত ভিন্ন অন্য কোন সাধারণ হিতকর কার্য্য হইতে দেখা যায় না। পল্লীগ্রামের পানীয় জলের পুষ্করিণীর সংস্কার ও প্রতি বৎসর নূতন নূতন পুষ্করিণীর খনন হওয়া আবশ্যক। দেশের গণ্য মান্য মহোদয়গণ এইসকল বিষয়ে মনোযোগ দেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে ডিষ্ট্রীক্‌ট্ বোর্ডের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টকে জানাইলে বোধ হয় সুফল ফলিতে পারে। কলিকাতার ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন ও ল্যাণ্ড হোল্‌ডার্স এসোশিয়েসন আছে সেই সকল সমিতির সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রামবাসীদিগের দুরবস্থার বিষয় আন্দোলন করিলে উন্নতির সম্ভাবনা বলিয়া আমাদের মনে হয়।

তুলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় তুলার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে কাপড়ের কল স্থাপিত হওয়ায় তুলা চাষেরও ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। সিন্ধু প্রদেশে তুলার চাষ লাভজনক হইতেছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশেও ইহার উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। উত্তরপাড়ার রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় তুলা চাষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন ও ইহাতে দেশের জমিদারগণকে ইহার উন্নতির জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি

আরও কয়েকজন মহোদয় ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। দেশের জমিদারগণ আন্তরিক চেষ্টা-সম্পন্ন হইলে বঙ্গদেশে পাটের ন্যায় তুলাও যে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় চাষ হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে দেশের যে একটী মহান্ অভাব বিদূরিত হইয়া বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিতেছেন। অন্নের ন্যায় অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রের জন্য চিরদিন বিদেশের মুখাপেক্ষী হওয়া অপেক্ষা লজ্জা ও অনিষ্ট-বিধায়ক আর কি হইতে পারে? * পূর্ব্বে বস্ত্রই দেশের বিশেষ আয়-জনক ছিল, এক্ষণে ইহাই আবার দেশের বিশেষ ব্যয়জনক হওয়ায়, দেশের লোক বস্ত্র সংগ্রহের জন্য অন্ন বিক্রয়ে বাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

বিদেশীয় বস্ত্রের বহুল আমদানিই এ দেশের তুলাচাষের অবনতির কারণ; এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্র দেশে উৎপন্ন করিয়া দেশের অর্থব্যয় নিবারণ ও অন্নরক্ষা করিতে গেলে, তুলা চাষের উন্নতিও নিতান্ত বিধেয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কার্পাস এ দেশে স্বভাবজ ও সেই জন্যই অতি পুরাকাল হইতে এদেশে কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার। যেখানে বস্ত্র-শিল্পীর অভাব নাই, সেখানে দেশীয় বস্ত্রের আদর ও বস্ত্রের উপাদান তুলা অনায়াসলভ্য হইলে, বস্ত্রোৎপাদনের বাহুল্য হওয়াই স্বতঃসিদ্ধ।

সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত দেশবিদেশে তুলার ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ১৮৮১ সালে পৃথিবীতে ৯৪ লক্ষ গাঁইট ও ১৮৯৬ সালে ১ কোটী ২০ লক্ষ গাঁইট তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্য (United States) হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তুলা সংগৃহীত হইতেছে। পরিমাণ তুলনায় ভারতীয় তুলার স্থান দ্বিতীয় ও মিসরীয় তুলার স্থান তৃতীয়। এক্ষণে যুক্তরাজ্যের তুলা-ক্ষেত্রের পরিমাণ প্রায় ৮ কোটী বিঘা, ভারতের প্রায় ৬ কোটী বিঘা ও মিশরের প্রায় ৩ কোটী বিঘা। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল, পেরু প্রভৃতি দেশে, পশ্চিম সাগরীয় কিউবা, জামেকা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে, গিনি, নেটাল প্রভৃতি আফ্রিকার অপর কয়েকটি দেশে, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপে, তুরস্ক, এসিয়া-মাইনর, পারস্য, চীন এবং তুর্কীস্থানেও তুলার চাষ আছে। তুলার জন্য আমেরিকারই অধিক মুখাপেক্ষা করিতে হয় বলিয়া, আমাদের সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁহার অধিকার মধ্যে তুলাচাষের বিস্তৃতির উপদেশ দিয়াছেন।

যে সকল স্থানে তুলার চাষ হয়, সেগুলি বিষুবরেখার দক্ষিণ ৩৫

হইতে উত্তর ১৫ ডিগ্রীর অন্তর্ব্বর্ত্তী, অর্থাৎ গ্রীষ্মপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ দেশ। সম্প্রতি জাপানেও তুলার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। শীতপ্রধান দেশ তুলা চাষের উপযোগী নহে; সুতরাং এই সকল স্থানের অধিবাসিগণ চিরদিনই তুলার জন্য অপর দেশের মুখাপেক্ষী। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ দেশ; কার্পাস চাষের উপযোগী ভূমি এদেশে বিস্তর আছে; বহু সহস্র বর্ষ হইতে এদেশে তুলার চাষ হইতেছে। এই সকল কারণে, তুলাচাষের উন্নতি ও বিস্তার এদেশে কষ্টসাধ্য নহে এবং ইহাতে দেশের অর্থাগমের বিশেষ সম্ভাবনা বলিয়া বোধ হয়।

অপর বৃক্ষাদির ন্যায় কার্পাসেরও নানা জাতিভেদ আছে। যেমন এক-স্থানের আম্রবীজ বিভিন্ন স্থানে সমরূপ আকার-বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিণত হয় না এবং তাহার ফলেরও ইতর বিশেষ সংঘটিত হয়, সেইরূপ একস্থানের কার্পাস বীজ লইয়া ভিন্নরূপ জলবায়ু প্রভৃতি উপাদান বিশিষ্ট অপর স্থানে আবাদ করিলে ইহা প্রায়ই স্বতন্ত্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়; শেষোক্ত স্থানের অপর জাতীয় পুষ্পরেণু ইহার পুষ্পে নীত হইয়াও সঙ্কর জাতি উৎপাদন করে; এই স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন কার্পাস কোন স্থানে উৎকৃষ্ট ও কোথাও বা নিকৃষ্ট জাতীতে পরিণত হয়।

উদ্ভিদ্‌বিদ্‌ পণ্ডিতগণ কার্পাসের জাতি বিভাগ করিতে গিয়া, নানা জনে নানা জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার রইল চারিটী, পণ্ডিত লিনীয়াস পাঁচটি, পার্‌লাটোর সাতটি, লেমার্ক আটটি, পইরেট বারটি, ডি ক্যাণ্ডোল তেরটি, ভন্‌রর্‌ একত্রিশটি এবং বেনেট একশতের অধিক সংখ্যার নির্দ্দেশ করেন। উপরোক্ত কারণে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়ার জন্যই কার্পাসের এইরূপ বিবিধ জাতির উৎপত্তি বলিয়া বোধ হয়। টম্‌লিন্‌সন সাহেব কার্পাসকে তিনটিমাত্র জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা ঃ—তরু (Tree), গুল্ম (Shrub) এবং ওষধি (Herbaceous) জাতীয়। যদিও কোন কোন তরুজাতীয় কার্পাস স্থান বিশেষে গুল্ম বা ওষধিতে এবং কোথাও বা গুল্ম জাতীয় কার্পাস ওষধি জাতীয়ে পরিণত হয়, তথাপি সাধারণের বোধগম্য বলিয়া কার্পাসের এই তিন জাতিরই আমরা উল্লেখ করিব।

তরুজাতীয় কাপাসের বৃক্ষ ৮ হাত হইতে ১৩ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়, ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং বৎসরে একবার মাত্র ফল প্রদান করে। ভারতবর্ষ, সিংহলদ্বীপ, চীন, আরব ও মিসর দেশ ইহার আদি স্থান। ইহার

ফুলের রং মেটে লাল, বীজের খোসার রং সবুজ, এবং বীজ হইতে ইহার তুলা সহজে পৃথক করা যায় না। উদ্ভিদ্‌বেত্তাগণও ইহাকে আর্‌বোরিয়ম (Gossypium Arboreum) বা তরুজাতীয় বলিয়াছেন। ইহার সাধারণ নাম "গাছ কার্পাস"; কোন কোন স্থানে ইহাকে "দেব কার্পাস" এবং কোথাও বা "নর্ম্মাবাড়ি" বলে। সাধারণতঃ মন্দির, মস্‌জিদ প্রভৃতি দেবালয়ের সন্নিকটে ও উদ্যানে এই বৃক্ষ রক্ষিত হয়। ইহার তুলা হইতেই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের উপবীত এবং দেবস্থানে প্রদত্ত প্রদীপের সলিতা প্রস্তুত হইত।

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশেও তরুজাতীয় কার্পাস আছে; সেখানে ইহা দুই তিন বৎসর ফল প্রদান করে। ইহাতে অধিক কীট লাগে না; ইহার ফলও বড় এবং প্রত্যেক ফলে ১৭টি করিয়া বীজ থাকে। ফলন কম হইলেও অনেক ওষধি জাতীয় অপেক্ষা ইহার তুলা উৎকৃষ্ট।

শা ওয়ালেস কোম্পানি (Shaw Wallace & Co.) দ্বারভাঙ্গা জেলায় তরু জাতীয় কার্পাসের চাষ করিতেছেন।

গুল্মজাতীয় কার্পাস ৫ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়; অপেক্ষাকৃত শীতপ্রধান স্থানে ইহা একবার মাত্র ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। কিন্তু কোন কোন স্থানে ২।৩ বৎসর ও গ্রীষ্মপ্রধানস্থানে ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া প্রতি বৎসর দুই বারও ফল প্রসব করে।

দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে "নাদম" নামক গুল্মজাতীয় কার্পাসের চাষ আছে। অনুর্ব্বর লাল মাটীতে (Redsoil) এই কার্পাস জন্মিয়া থাকে। ইহার ফলন অতি কম হয়।

বারাণসী জেলায় "নর্ম্মা" নামক গুল্মজাতীয় কার্পাস জন্মে। সাধারণতঃ উদ্যানে কিম্বা পুষ্করিণীর পাড়ে ইহা রক্ষিত হয়; ইহার ফুল ফুটিলে অতি সুন্দর দেখায়। ইহার প্রচুর ফলন হয় এবং এক একটী বৃক্ষ হইতে ৪।৫ বৎসর তুলা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। গুজরাটের যেখানে জল সেচনের সুবিধা আছে সেই সকল স্থানের নগরের সন্নিকটে "নর্ম্মা" নামক গুল্মজাতীয় কার্পাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার তুলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, রেসমের ন্যায় কোমল ও এই তুলার আঁশ (Fibre) এক ইঞ্চির অধিক দীর্ঘ হয়। উৎকৃষ্ট মস্‌লিন প্রস্তুতের জন্যই এই তুলা ব্যবহৃত হইত।

বিদেশী কয়েকটী গুল্মজাতীয় কার্পাসেরও এদেশে চাষ হইতেছে। বিদেশীয় কার্পাস প্রধানতঃ নিম্ন লিখিত কয়েকটী শ্রেণীর অন্তর্ভূত।

১ম। বোর্বোদ্বীপ-জাত কার্পাস (G. Barbadense) বোর্বোদ্বীপ হইতে এই কার্পাস বীজ প্রথমে আনীত হইয়াছিল বলিয়া এ দেশে ইহাকে বোর্বো কার্পাস কহে। কিন্তু পশ্চিম সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের (West Indian Islands) বার্ব্বাডেন্‌স নামক দ্বীপ ইহার আদি স্থান। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী উষ্ণপ্রধান দেশই এই কার্পাস আবাদের বিশেষ উপযোগী। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা মান্দ্রাজের করোমণ্ডল উপকূলেই ইহার চাষ ভাল হইয়াছে। গুজরাট প্রদেশে বপনের দেড় বৎসর পরে এই বৃক্ষ বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া প্রচুর ফল উৎপাদন করে। হাল্‌কা বালি মাটিযুক্ত জমি ইহার বিশেষ উপযোগী। গুজরাট ও মালব প্রদেশে ইহা দেশীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সি আইলাণ্ড (Sea Island) কার্পাস, মিসরের গ্যালিনা কার্পাস এবং জর্জ্জিয়া ও ফ্লোরিডার কার্পাস এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত; বস্তুতঃ আমেরিকার অনেক কার্পাসই এই শ্রেণীর বীজ হইতে উৎপন্ন। ইহার তুলা অতি আদরণীয় (১২৪ পৃষ্ঠা দেখুন)। এই কার্পাসের বীজ কৃষ্ণবর্ণ, ইহা সহজে নষ্ট হয় না বলিয়া অনেকস্থানে এই বীজের আবাদ হইয়াছে। ইহার ফুল পীতবর্ণ। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের (United States) দক্ষিণাংশে, মিসর, অষ্ট্রেলিয়া, বাহামা ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ইহার আবাদ হইয়াছে।

২য়। মেক্সিকো-দেশজ (G. Hirsutum) বা কেশরযুক্ত কার্পাস। বীজ, সুঁটি, শাখা ও পত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশরবিশিষ্ট হয় বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই শ্রেণী সমুদ্র-তীর হইতে অনেক দূরবর্ত্তী স্থানের বিশেষ উপযোগী। যুক্তরাজ্যের আপ্‌ল্যাণ্ড জর্জ্জিয়ার উচ্চ ভূমিতে ইহার বিস্তর আবাদ হইয়াছে। মেক্সিকো দেশই ইহার আদিস্থান। ইহার বীজের রং সবুজ ও তুলার আঁশ প্রথম শ্রেণীর অপেক্ষা ছোট। কোন কোন স্থানে ২।৪ বৎসর আবাদের পর ইহার বীজের কেশর থাকে না ও সবুজ বর্ণের পরিবর্ত্তে কালবর্ণ হয়। স্থানবিশেষে এই কার্পাস প্রথমোক্ত বোর্বো কার্পাসের ভাব ধারণ করে বলিয়া ডাক্তার রইল ইহাকে প্রথমোক্তের একজাতীয় বলিয়াছেন।

৩য়। পেরুদেশজ (G. peruvianum)। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও ব্রেজিল দেশ ইহার আদিস্থান। ইহার বৃক্ষ ৭ হাত হইতে ১০ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহার ফুল বৃহৎ ও পীতবর্ণ। প্রত্যেক ফলে ৮।১০টী করিয়া বীজ পরস্পর জড়িত থাকে; বীজ কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ, কোনরূপ কেশর বা

গুঁড়া লাগিয়া থাকে না। ইহার বীজ হইতে তুলা সহজেই পৃথক করা যায়। এই জাতীয় তুলার আবাদ এদেশে অনেক দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, এবং অনেক স্থানে ইহা দেশীয় ভাবাপন্ন হইয়োছে। এই কার্পাসের ফলন এত প্রচুর হয় যে, একটী বৃহৎ বৃক্ষ হইতে একহাজার পর্য্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বোম্বাই প্রদেশের পুনা জেলায় ইহাকে "দেব কার্পাস" বলিয়া থাকে। গুজরাট প্রদেশে ইহাকে "হির গুণ্ডা" কার্পাস বলে। কেহ কেহ বলেন, ইহা আর্দ্রভূমির বিশেষ উপযোগী; কিন্তু ব্রেজিল দেশের যে সকল স্থানে ইহার আবাদ হয় এবং যে সকল স্থান ইহার বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, সেস্থানগুলি সমুদ্র-তীর হইতে অধিক দূরবর্ত্তী, নীরস ও জলসেচনের সুবিধা-বিহীন। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ও ঋতু পরিবর্ত্তনের বাহুল্য-বিশিষ্ট স্থান ইহার আবাদের উপযোগী নহে বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। যেখানে বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বৃষ্টির অভাব, সেখানে এই কার্পাস ভালরূপ আবাদ হইয়া থাকে; ফল ফাটিবার সময় বৃষ্টি হইলে তুলা নষ্ট হইয়া যায়। লাল মাটীর জমী এই কার্পাস চাষের অনুকূল; অধিক দিন বর্ষা না হইলে এইরূপ জমি কঠিন হইয়া উঠে।

ওষধিজাতীয় কার্পাস এক হাত হইতে দেড় হাত উচ্চ হয় ও সাধারণতঃ বৎসরে একবার মাত্র ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যায়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ৩।৪ হাত উচ্চ হয় ও ২।৩ বৎসর জীবিত থাকে। শস্যাদির ন্যায় এই জাতীয় কার্পাসের সাধারণতঃ প্রতি বৎসর আবাদ হয়; এবং চারিমাস হইতে আট মাসে বা কোথাও কোথাও এক বৎসরে ইহার ফল পাকে। অনেক দেশে এই জাতীয় কার্পাসেরই অধিক পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। ইহার বীজ সহজে নষ্ট হয় না বলিয়া ভিন্ন দেশে লইয়া আবাদ করিবার উপযোগী। ভারতবর্ষের অনেক কার্পাসই ওষধি জাতীয়।

ভারতীয় কার্পাসের (G. Indicum) মধ্যে "ঢাকাই", "বেরারি" ও "চীনা" এই তিন শ্রেণীই প্রধান। ঢাকাই কার্পাসের মধ্যে "ফোটী" সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ইহার তুলা যেরূপ সুন্দর সেইরূপ সূক্ষ্ম। ফোটী কার্পাসের বীজ সাবধানে রক্ষা করিতে হয়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ কিম্বা চৈত্র বৈশাখ এই দুই সময়েই ইহার বীজ বপন করা যায়; বপনের ৬।৭ মাসের মধ্যে ইহার তুলা সংগৃহীত হইতে পারে। ইহার গাছ প্রায় দেড় হাত উচ্চ হয় এবং একবার ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। পূর্ব্বে এই "ফোটী" কার্পাস পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিল। এক্ষণে সি আইল্যাণ্ড কার্পাস ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

টেলর সাহেব "দেশী" "বৈরাতি" এবং "ভোগ" এই তিন শ্রেণীর কার্পাসকে ঢাকাই কার্পাসের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর কার্পাসের সাধারণ নাম "দেশী"। বৈরাতি কার্পাসের গাছ ২।৩ হাত উচ্চ হয়; ইহার বীজ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বপন করিতে হয় এবং বৈশাখ মাসে ইহার তুলা সংগ্রহ করা যায়। বিঘাপ্রতি বৈরাতি কার্পাসের প্রায় ৫/০ মণ তুলা উৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত হয়। ইহার তুলা "দেশী" কার্পাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ঢাকার পূর্ব্বাঞ্চলে "ভোগ" কার্পাসের বিস্তর আবাদ হইত। চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহার বীজ বপন করা হইত এবং কার্ত্তিক মাসে তুলা সংগৃহীত হইত।

বারাণসী বিভাগে "রাচী" বা "বঢ়ই" নামক কার্পাসের চাষ আছে। ইহার বীজ ভাদ্রমাসে বপন করিয়া চৈত্র মাসে তুলা সংগ্রহ করা হয়। এই জাতীয় কার্পাসের জন্য উর্ব্বরা ভূমি ও জল সেচনের আবশ্যক। "মনোয়া" বা "জেটই" নামক অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এক জাতীয় কার্পাসের এই বিভাগে অন্যান্য ফসলের সহিত এক ক্ষেত্রে আবাদ হইয়া থাকে। ইহা যে কোন জমিতে জন্মিতে পারে এবং এক বৎসরে ফল প্রসব করে।

"বেরারি" কার্পাস অনেক স্থলে "নর্ম্মা" কার্পাস নামেও অভিহিত হয়; বেরার প্রদেশে ও মসলিপাটম প্রভৃতি জেলায় ইহার আবাদ হয়। উমরাবতী কার্পাস এই জাতীয়; ইহার তুলা সুন্দর, রেসমের ন্যায় কোমল এবং প্রায় আমেরিকান তুলার সমকক্ষ। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলবায়ুর গুণে ইহার নানারূপ প্রভেদ হইয়া থাকে। মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তর সরকার বিভাগের লংক্লথ কাপড় ইহার তুলা হইতেই প্রস্তুত হয়।

গুজরাটের কার্পাসের মধ্যে "কানম্" বা "লালিয়া" নামক কার্পাসই উৎকৃষ্ট; এই কার্পাস অধিক বালিযুক্ত, কাল মাটিতেই ভাল জন্মে। ইহার গাছ ২।২॥০ হাত দীর্ঘ হয়।

কচ্ছপ্রদেশে "ওয়াগ্রিয়া" নামক কার্পাস জন্মে; ইহা নিকৃষ্ট জাতীয়। দাক্ষিণাত্যে "উপম" নামক ঔষধি জাতীয় কার্পাস জন্মে। ইহার মূল অধিক নিম্নে প্রবেশ করে ও ইহার বৃদ্ধি অধিক বিলম্বে হয়। অধিক উর্ব্বরা কালমাটী ভিন্ন অন্য মাটীতে এই কার্পাস জন্মে না। ইহার তুলা প্রায় আমেরিকান তুলার ন্যায়। "উপম" কার্পাসের কেশরযুক্ত এক জাতিও এখানে জন্মিয়া থাকে।

বিদেশীয় কার্পাসের মধ্যে আমেরিকান্ বা মার্কিণী কার্পাস বোম্বাই প্রদেশের ধারওয়ার নামক স্থানে ও মিশর দেশীয় কার্পাস সিন্ধুপ্রদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই দুই স্থানে বিদেশীয় কার্পাসের চাষ বেশ লাভজনক হইয়াছে। মানভূম ও সিংহভূম জেলায় মার্কিণী কার্পাসের সামান্য রূপ আবাদ আছে; এখানে এই কার্পাসকে "বঢ়িয়া" কার্পাস বলে। "বঢ়িয়া" কার্পাসের গাছ-গুলি ২।৩ হাত উচ্চ, ফল বড় এবং তুলাও উৎকৃষ্ট। সিংভূম জেলায় "বড়েয়া" নামক একরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর কার্পাসেরও আবাদ আছে।

বঙ্গপ্রদেশের স্থানে স্থানে চীনদেশীয় কার্পাসের চাষ হইয়াছে। ইহা ওষধি জাতীয়; গাছগুলি ছোট। ইহার তুলার রং শাদা ও "ঘিয়ে" (পীতাভ)। সাধারণ তুলার অপেক্ষা "চীনা" কার্পাসের তুলা কতকাংশে ভাল।

ভারতীয় অন্যান্য কার্পাসের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের হিঙ্গন ঘাট, হায়দ্রাবাদের উমরা এবং বোম্বাই প্রদেশের ঢ়লেরা, ব্রোচ ও কুমটা নামক স্থানবিশেষের নামে আখ্যাত কার্পাস উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গপ্রদেশের সকলস্থানের ভূমি ও জলবায়ু একরূপ নহে; কতকগুলি স্থান সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী ও নিম্নভূমি এবং কতক স্থান উচ্চভূমি বা পর্ব্বতময় অথবা পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত; সুতরাং সকল স্থানে সকল জাতীয় কার্পাস ভালরূপ হইতে পারে না; কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা উৎপাদনের উপযোগী ভূমি ও জলবায়ু অর্থাৎ যেরূপ স্থানে অন্যান্য দেশে উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলা উৎপন্ন হয়, এই প্রদেশেও সেইরূপ অনেক স্থান আছে। কিরূপ ভূমি ও জলবায়ু কোন্ কোন্ জাতীয় কার্পাস চাষের বিশেষ উপযোগী তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই। অন্যদেশের কার্পাসক্ষেত্রের তুল্যরূপ কোন কোন স্থানে সেই দেশের বীজ আনাইয়া আবাদ করান হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে অনেক স্থানেরই ফল ভালরূপ হয় নাই। (ক্রমশঃ)

কৃষক ও কৃষি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কৃষিক্ষেত্রগুলির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতে হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বিশেষ-রূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও, কৃষকগণের দরিদ্রতা, স্বাস্থ্যহীনতা ও বিবিধ অসুবিধার জন্য কৃষি ক্ষেত্রের

উৎপাদিকা শক্তির বিশেষ হ্রাস হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে বিভিন্ন জমীর বিঘা-প্রতি কি পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু বহুস্থানেই জমীর উৎপাদিকা শক্তি যে ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন; সুতরাং এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে যে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। দেশের কৃষক যে পূর্ব্বে এখনকার অপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিল, গবাদি পশুর সংখ্যাধিক্য ও চারণের সুবিধা থাকায় তাহার ও যে উন্নতাবস্থ ছিল, যন্ত্রাদি এখনকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না থাকিলেও নিকৃষ্ট ছিল না, পূর্ব্ব লিখিত কারণে অনায়াস-লভ্য থাকায় সারের প্রাচুর্য্য ছিল এবং জলসিঞ্চনের উপযোগী অনেকসংখ্যক তড়াগাদি যে বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; সুতরাং বিঘাপ্রতি উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ এখনকার অপেক্ষা অধিক হওয়ারই সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবনা ছিল। বর্ত্তমান কালে কোন কোন স্থানে গবর্ণমেণ্ট জল-প্রণালী (Canal and drainage system) দ্বারা কতকগুলি জমির উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এগুলির পরিমাণ অতি যৎসামান্য; কোন কোন স্থানে এই জল প্রণালী দ্বারা উপকার সাধিত হইয়াছে, আবার কোথাও বা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে; এবং কোন স্থলে উপকারের তুলনায় অনেক অধিক কর সংগৃহীত হয়। স্থানে স্থানে ভেড়ীবাঁধ বা পুল-বন্দী (Fmbankment) দ্বারা কতকগুলি জমিকে বন্যা হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। ইহাতেও যেমন কতকগুলি জমীর উপকার করা হইয়াছে, সেইরূপ অনেকগুলি জমীর বিশেষ অপকার সাধিত হইয়াছে। তবে এই দুই উপায় দ্বারা প্রধানতঃ উপকার করা হইয়াছে বলিতে হইবে। রেল-ওয়ে দ্বারা অনেক স্থানেই জমীর প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। দারিদ্র্য-নিবন্ধন কৃষক জমীতে উপযুক্তরূপ সার, কর্ষণ ও জল সিঞ্চন করিতে পারে না; পরিমিতরূপ আইল (হিড়) রক্ষা করিতে পারে না ও বিভিন্ন জাতীয় শস্যের আবাদ (পর্য্যায়রোপণ) করিয়া কিম্বা মধ্যে মধ্যে জমী পতিত রাখিয়া তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে পারে না। রোগের আক্রমণে ও উপযুক্ত আহারাভাবে কৃষক ও গোমহিষাদি দুর্ব্বল হওয়ায়, কর্ষণ, জলসেচন প্রভৃতি তাহাদের কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। গোমহিষাদি পালনের অসুবিধা ও তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হওয়ায়, সারও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, সকল স্থানেই জ্বালানি কাষ্ঠের অসদ্ভাব হওয়ায় কৃষকগণ গোময় ও ক্ষেত্রের তৃণ পর্য্যন্ত রন্ধনাদির জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে; গোবরের ছাই গোবর অপেক্ষা যে অতি নিকৃষ্ট সার, তাহা অনেকেই

জানেন; কৃষকগণ এই অপকৃষ্ট সার, তাহাও আবার অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়ায়, জমীর উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস হইতেছে। একদিকে যেমন গোচর জঙ্গল প্রভৃতি আবাদী জমীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে, অপরদিকে গোমহিষাদির সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় জমীর উর্ব্বরাশক্তি তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। হাড় জমীর একটি বিশেষ সার। পূর্ব্বকালে জমীদারগণ সাধারণতঃ মাঠের মধ্যে একটি উচ্চস্থান ভাগাড়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতেন; গোমহিষাদির হাড় ক্ষয়প্রাপ্ত ও বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া নিকটস্থ ক্ষেত্র সকলে নীত হইত ও তাহাদের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিত। এখন এই সকল ভাগাড়ের জমা বিলি হইয়া হাড় বিক্রীত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং কৃষকগণের এই সামান্য সুবিধাটিরও বিলোপ সাধিত হইতেছে। কোন কোন স্থানে মিউনিসিপালিটি এই সকল ভাগাড়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া হাড়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাধারণ কৃষকগণের সম্পত্তি কোন্ অপরূপ যুক্তিবশে তাঁহারা অপহরণ করেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাহাই হউক এ পদ্ধতি নিবারিত হওয়া বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। জমী হইতে শস্য আহরণ করিতে হইলে,তাহাকে সাররূপ খাদ্য সরবরাহ করিতে হয়। এদেশ হইতে শস্যাদি রপ্তানি হইবার পূর্ব্বে, উৎপন্ন শস্যের প্রায় সকল অংশই কোন না কোনরূপে জমীতে ফিরিয়া আসিত; এক্ষণে প্রতি বৎসর ক্ষেত্রজ প্রাণিজ প্রভৃতিতে যে বহুকোটি মণ দ্রব্য এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রত্যেকটিই পূর্ব্বে এদেশের জমী সাররূপে পুনঃ প্রাপ্ত হইত; এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে জমীর গ্রহণোপযোগী প্রায় কিছুই আমদানী হয় না; সুতরাং জমীর উর্ব্বরাশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার বিচিত্র কি? এক্ষণে এক এক জন কৃষক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জমি আবাদ করিয়াও অধিক ফসল উৎপাদন করিতে পারে না; কারণ তাহাদের কর্ষণের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অল্প জমিতে যে সার দিতে পারিত, অধিক জমিতে সে পরিমাণে সারও দিতে পারে না এবং জল সেচনেরও সুবিধা নাই। বর্ষণাভাব হইলে জল সেচনের সুবিধার জন্য মাঠের মধ্যে পূর্ব্বে অনেক জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার অনেকগুলিই ভরাট হইয়া আবাদী জমিতে পরিণত হইয়াছে ও অবশিষ্টগুলিও প্রায় মজিয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীগুলির অধিকাংশই জমিদারের খাস এবং কৃষকগণ দরিদ্র; সুতরাং এগুলির পঙ্কোদ্ধার করিতে অক্ষম; এবং জমীদারগণও ইহাতে নারাজ, বরং যাহাতে

নষ্টপ্রায় জলাশয়গুলি সত্বর আবাদী জমীতে পরিণত হইয়া জোত জমার শামিল হইতে পারে সেই জন্যই অনেকে ব্যগ্র; সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের আর পূর্ব্বের ন্যায় সুবিধা নাই।

এদেশের জলবায়ু কৃষির উপযোগী হইলেও পূর্ব্বলিখিত নানা কারণে ইহা দূষিত হওয়ায় কৃষক ও গোমহিষাদির অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন স্থানে পাট শণ প্রভৃতি জলে পচান হয় বলিয়াও জলবায়ু দূষিত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগ আজকাল প্রায় দেশব্যাপী; তাহার উপর আবার নানাবিধ অপররোগও সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। দূষিত জলবায়ু কৃষির অনিষ্ট-বিধায়ক কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু কৃষক প্রভৃতির স্বাস্থ্যনাশ করিয়া যে কৃষির অবনতি সাধন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও অধিবাসিগণের বুদ্ধিমত্তা সত্বেও, এবং এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াও ইহার উন্নতি সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চেষ্ট। সেই প্রাচীন লাঙ্গল প্রভৃতি কৃষি যন্ত্রাদির এপর্য্যন্ত এদেশে কিছুই উন্নতি সাধিত হয় নাই। অপর অনেক নীচবৃত্তি এদেশীয় শিক্ষিতগণের অবলম্বনীয় হইলেও কৃষিকার্য্য ইহাদের নিকট ঘৃণিত। অনভ্যস্তের পক্ষে কৃষি নিতান্ত সহজ-সাধ্য না হইলেও শিক্ষিতগণ নানা উপায়ে কৃষির উন্নতি বিধান করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করেন না; এবং দরিদ্র, অশিক্ষিত ও নিঃসহায় কৃষকগণের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তাহাদের কোনরূপ সাহায্য করা দূরে থাক, অনেকে তাহাদের প্রতি অত্যাচারের সুবিধা মাত্রই অন্বেষণ করিয়া থাকে।

কৃষককুল সাধারণতঃ জমীদারগণ কর্ত্তৃক অর্থাগমের যন্ত্র বিশেষরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের শিক্ষা বা উন্নতি বিষয়ে কোনরূপ সাহায্য করা ও ইহাদের মঙ্গল বিধানে যত্নবান হওয়া যে তাঁহাদের লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ প্রধান কর্ত্তব্য, এ জ্ঞান অনেকেরই নাই। “বাবা কি কলই বানিয়ে গেছেন!—নাম সহি করিলেই টাকা” এ উক্তি একটী সামান্য জমিদার সন্তানের; কিন্তু অনেকেই প্রায় তদ্ভাবাপন্ন। অনেকেই ধনমদে মত্ত; সহরে থাকিয়া আমোদ প্রমোদে জীবন যাপনই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য; ইঁহারা প্রজার সুখ দুঃখের সংবাদ রাখেন না এবং রাখিবার প্রয়োজনও বোধ করেন না। এমন অনেক জমিদার আছেন, যাঁহারা জীবনে কখন

জমিদারী পরিদর্শনও করেন না; আবার কেহবা নজর সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করিলেই এক একবার মফঃস্বলের কাছারী বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ গোমস্তা গণেরই উপর জমিদারীর কার্য্য নির্ভর থাকে; তাহারা নানারূপ উৎপীড়ন করিয়া মালগুজারি ওয়াশীল করে এবং নিজের জন্য কিছু কিছু উপরি সংগ্রহ করে। জমিদারগণ প্রায়ই এই সকল গোমস্তাদিগকে অল্পবেতনে নিযুক্ত করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা জানেন যে, ইহারা উক্তরূপে আপনাদের প্রয়োজনীয় বা আশানুরূপ অর্থ উপার্জ্জন করিবে; সুতরাং গোমস্তাগণ জমিদারের জ্ঞাতসারেই প্রজার উৎপীড়নে প্রবৃত্ত থাকে এবং জমিদারগণ একরূপ স্পষ্টই তাহাদিগকে এজন্য ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। বাস্তবিক দেখা যায় যে প্রজার নিকট হইতে জমীর খাজনা আদায় করারও তাহাদের কোনরূপ মঙ্গল বিধানের চেষ্টা না করিয়া কেবল অপর নানারূপে অর্থ উপার্জ্জনের চিন্তা করাই জমিদার ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। জমীর বিন্দুমাত্র উন্নতি সাধনের কল্পনা তাঁহাদের নাই; কিন্তু নানাবিধ উপায়ে জমিদারী হইতে অধিক অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে অতি কার্য্যকুশল বলিয়া বোধ করেন ও সাধারণের নিকট অতি যোগ্য জমিদার বা যোগ্য কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। এই কারণে প্রজাকুলও যেমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে, জমিদারগণের অবস্থাও ক্রমশঃ সেইরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। ভূমির উন্নতি সাধন করিলে জমিদারগণ আইনসঙ্গতরূপে করবৃদ্ধির দাবী করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের সেদিকে লক্ষ্য নাই। কোনরূপে প্রজার যোত উচ্ছেদ হইয়া জমী খাসে আসিলে অনেক জমিদার অতি আপ্যায়িত বোধ করেন এবং এই জমী হইতে অক্লেশে তাঁহাদের অধিক অর্থোপার্জ্জনের পথ সুপ্রশস্ত হইয়া থাকে। আবার অনেক জমিদার অশিক্ষিত, স্বার্থপর ও ক্রূর-প্রকৃতিক। জমীর উন্নতি ও প্রজাগণের মঙ্গল সাধিত হইলে যে প্রকারান্তরে তাঁহাদের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইবে, এ জ্ঞান তাঁহাদের নাই। ভূমি, কৃষি ও কৃষকের উন্নতি বিষয়ক শিক্ষা তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। কেহ কেহ বা বংশগতদোষে প্রজাপীড়নেই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; ফলতঃ, আমাদের বিবেচনায় জমীদারের ঔদাসীন্যই প্রজাগণের বিবিধ অমঙ্গলের বিশেষ কারণ। জমীদারী ও প্রজার অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, যে সকল উপায়ে প্রজার শস্যহানি না হয় ও জমীর উৎপাদিকা

শক্তির বৃদ্ধি হয়, যদি জমিদারগণ মধ্যে মধ্যে সে সকল বিষয়ের তদন্ত করিয়া সুবন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে অনায়াসে কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে। আমাদের অনুরোধ এই যে, জমিদার মহোদয়গণ আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে অবহেলা করিবেন না; তাঁহাদের দোষেই কৃষকগণের ও দেশীয় শিল্পের অবনতি হইয়াছে। দরিদ্র প্রজাগণকে অর্থলোলুপ গোমস্তার কবলে চিরকাল নিহিত রাখায় দেশের প্রভূত অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে। প্রজার দুঃখে দুঃখিত ও দয়ার্দ্র হইলেই জমিদারগণ কৃষির উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হইবেন এবং ইহাতেই তাঁহাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন করা হইবে।

আমাদের দূরদর্শী গবর্ণমেণ্ট কৃষির নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপ উপলব্ধি করিলেও, ইহার উন্নতির জন্য উপযুক্তরূপ আগ্রহ-সম্পন্ন হয়েন না; অথচ রেলওয়ে দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ও দেশের প্রায় বিশেষ কিছুই উপকার না হইলেও, কেবল সামান্যসংখ্যক বিদেশীয়গণের সুবিধার জন্য আপন ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রেলপথ বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট রিক্তহস্ত। সেইজন্য কোন কোন কূট তার্কিকের সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ত্তমান উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যাদির বহনোপযোগী রেল বিস্তার এখনও হয় নাই বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট কৃষি উন্নতি বিষয়ে বিশেষ আগ্রহসম্পন্ন হয়েন নাই; যখন রেলের জন্য মালের অভাব বোধ হইবে, তখন গবর্ণমেণ্ট কৃষির উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। ইলিয়ট জেম্স সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

"That India has been neglected as far as her agricultural prospects are concerned, is a fact apparent to all who take an interest in her welfare."

ভাবার্থ—"ভারতের মঙ্গলের জন্য আগ্রহ-সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারেন যে, কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে এদেশ বিশেষ রূপ উপেক্ষিত হইয়াছে"!

গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে এজন্য কতকটা চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ফলে প্রায় কিছুই উন্নতি হয় নাই। সম্প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি এবিষয়ের যেন কথঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পূর্ব্বাপর যেরূপ যৎসামান্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিকতর সুফল প্রত্যাশার বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। মহামতি হিউম সাহেব তাঁহার লিখিত Agricultural Reform of India" নামক গ্রন্থে

এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ;—"ভারতবর্ষের কৃষির বাস্তবিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী কার্য্যকর কৃষিবিভাগ স্থাপিত হওয়া উচিত; ইহাতে একজন অভিজ্ঞ প্রধান ডিরেক্টরও তাঁহার অধীনে প্রাদেশিক ডিরেক্টরগণ থাকিবেন; যথেষ্ট অর্থ ও কৃষিযন্ত্র এবং বিবিধ কৃষি-কার্য্যের জন্য সুদক্ষ কৃষিবিদ্ কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে ও দেশের নানা স্থানে প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান হওয়া উচিত।" এতদিন পরে গবর্ণমেণ্ট একটী কৃষিবিভাগ, স্থানে স্থানে কয়েকটী কৃষি বিদ্যালয় ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিহার প্রদেশে মজঃফরপুর জেলায় পুসা নামক স্থানে বিস্তর অর্থব্যয়ে একটী কৃষিকলেজ স্থাপিত হইতেছে এবং বর্দ্ধমান, শিবপুর, চট্টগ্রাম, কটক, রামপুর বোয়ালিয়া, রংপুর এবং ডুমরাও প্রভৃতি স্থানে পরীক্ষার নিমিত্ত আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। অপর প্রদেশ-গুলিতেও কৃষিবিদ্যালয় ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্রাদি স্থাপিত হইতেছে। জেলার মাজিষ্ট্রেটগণও স্থানে স্থানে কৃষি প্রদর্শনী স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল কার্য্যে কৃষির বিশেষ উপকার সাধিত না হইলেও, গবর্ণমেণ্টের যে কতকটা মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতেই আমরা গবর্ণমেণ্টকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় কৃষিবিভাগটীও ফিরিঙ্গী-বহুল হইলে, ইহার ফলও যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কৃষি প্রদর্শনী ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্রগুলি দ্বারা কৃষি বা কৃষকগণের যে বিন্দু-মাত্র উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিনা; এগুলির কার্য্য যে ভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা কেবল আড়ম্বর প্রদর্শনের জন্য বা "নামকা ওয়াস্তে" বলিয়াই আমরা বুঝি; সুতরাং ইহাতে যে কেবল কতকগুলি অর্থেরই শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাই আমাদের ধারণা। দুই চারিটি কৃষিকলেজ স্থাপিত হইলেও অন্যরূপ ফললাভের প্রত্যাশা করা যায় না। বিলাত প্রত্যাগত কয়েকজন কৃষি বিদ্যাবিৎ কর্ত্তৃক এপর্য্যন্ত কৃষির একক্রান্তি পরিমাণ ও শিবপুর কলেজের কৃষি বিভাগে শিক্ষিতগণ কর্ত্তৃক একয়েক বৎসরে একদন্তি পরিমাণও উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই এইরূপ কৃষি-কলেজ স্থাপনে কৃষির উন্নতি সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করিবেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ প্রত্যেক চেষ্টাই সর্ব্বতোভাবে ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র।

স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন অপেক্ষা কৃষির উন্নতি বিধান বহুপরিমাণে দুঃসাধ্য; গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে বিদেশী শিল্পজাতের আমদানী বন্ধ করিয়া

কিম্বা তাহাদের উপর গুরু গুরুভার স্থাপন করিয়া দেশীয় শিল্পের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন, এই উপায়েই নানা দেশের শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু কৃষির উন্নতি কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা-সাপেক্ষ নহে। কতকগুলি বেতনভোগী কর্ম্মচারী কিম্বা "যে আজ্ঞা হুজুর" প্রকৃতি সম্পন্নগণের দল লইয়া কৃষির উন্নতি সম্ভবপর নহে। উপযুক্ত রূপ আগ্রহ প্রকাশ না করিলেও, গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত কোনরূপ কৃষির উন্নতির জন্যই যে চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে। তুলার চাষের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট এক সময়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই (১২৬ পৃষ্ঠা দেখুন)। "যার বিয়ে তার মনে নাই" ধরণের কার্য্যে যেরূপ ফল হয়, ইহাতেও প্রায় তদ্রূপই হইয়াছিল। বিদেশীয় বণিকগণের চেষ্টায় ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এদেশে চা বাগানগুলির এরূপ বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। লাভের আস্বাদে উৎসাহিত হইয়া বিদেশীয়গণ রেলবিস্তারের সুবিধাপ্রাপ্তির জন্য গবর্ণমেণ্টকে তাহাদের সাহায্যে বাধ্য করিতেছে; "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হইয়া আসিয়া, তাহারা বিস্তর ক্লেশ ও রাশি রাশি অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া রেলবিস্তারে প্রবৃত্ত হইতেছে; এরূপ আগ্রহসম্পন্ন হইলে গবর্ণমেণ্টের কথা কি, দেবতাও সুপ্রসন্ন হইতে পারেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেলবিস্তারে সাহায্য প্রদান করা বিচিত্র বা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হয় নাই। কিন্তু কৃষির উন্নতিতে যাহাদের অবশ্য মঙ্গল সে উন্নতির জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা, আগ্রহ বা উৎসাহ দূরে থাক, অযাচিত সুবিধাও যদি উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিতান্ত দুর্ভাগ্যবান্ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এরূপ স্থলে কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিলেও গবর্ণমেণ্টের প্রতি সম্পূর্ণ দোষারোপ করা যায় না। দেশের লোক ইহার জন্য আন্তরিক চেষ্টা সম্পন্ন না হইলে কৃষির উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভবপর।

ইতর ও ভদ্র এই দুই শ্রেণী লইয়াই সমাজ; ভদ্রশ্রেণীর উপরই সমাজের হিতাহিত নির্ভর করে। এক্ষণে ভদ্র অর্থে শিক্ষিত ও ধনবানগণকেই বুঝিতে হয়; কৃষকগণ সাধারণতঃ দরিদ্র ও অশিক্ষিত সুতরাং ইতরশ্রেণী-ভুক্ত। ভদ্রগণের মধ্যে যাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বনে দিনপাত করেন, তাঁহারা অধিকাংশস্থলেই কৃষকগণের সহিত সম্পর্কমাত্র বিহীন অথবা কৃষকগণের উচ্ছেদ সাধনেই যত্নশীল এবং কৃষকগণই যে তাঁহাদের অন্ন সংস্থানের মূল এরূপ চিন্তা সাবকাশও তাঁহাদের নাই। কিন্তু দেশের জমীদারগণও যদি এই শ্রেণী

সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কৃষক ও কৃষির অবনতি ভিন্ন আর অন্য গতি কি থাকিতে পারে ?

জমীদারগণ যত্নপরায়ণ না হইলে কৃষির উন্নতি যে বিশেষ আয়াস-সাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই ; ইহাতে তাঁহাদের যেরূপ সুবিধা, অপরের তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু অপর সাধারণে যদি জমীদারদিগের সহিত যোগদান করেন তাহা হইলে ইহা অল্পায়াস-সাধ্য হইবে। স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃগণ যদি দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধনে বাস্তবিক ইচ্ছা-সম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের পরামর্শ এই যে, তাঁহারা শিল্পোন্নতির সহিত কৃষির উন্নতি সম্বন্ধেও মনোযোগ দিউন। (ক্রমশঃ)

পেন্সিল প্রস্তুত প্রণালী।

বহুকালাবধি আমাদের দেশে লেড্ পেন্সিলের ব্যবহার চলিতেছে। এখন এমন হইয়া পড়িয়াছে যে পেন্সিল না হইলে শিক্ষিতগণের একদিনও চলে না ; কিন্তু অনেকেই ইহা কি উপাদানে প্রস্তুত তাহাও জানেন না। ইহার নাম ও বর্ণ হইতে অনেকেরই ধারণা যে ইহা সীসক (Lead) হইতে প্রস্তুত হয় ; কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে সীসার সম্পর্কও নাই। গ্রেফাইট (Graphite) নামক এক প্রকার ধাতু হইতে লেড্ পেন্সিল প্রস্তুত হয় ; এই ধাতুর অপর দুইটী নাম প্লম্বেগো ও ব্ল্যাক্ লেড্ (Plumbago and Black lead)। গ্রেফাইটের উপাদান প্রধানতঃ (শতকরা ৮৮ ভাগ) বিশুদ্ধ অঙ্গার (Carbon) জল, বালি, মাটি, লৌহ ও মৃদঙ্গারে অবশিষ্ট ১২ ভাগ ; সীসকমাত্রও ইহাতে থাকে না। অবিশুদ্ধ গ্রেফাইটে লৌহ, মৃদঙ্গার ও বালির ভাগ অধিক থাকে।

ইংলণ্ডের কম্বরলাণ্ড নামক স্থানে একটী পাহাড়ের গাত্রে গ্রেফাইটের বৃহৎ খনি আছে। এই স্থানের গ্রেফাইট প্রায় বিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও (United States) গ্রেফাইটের কতকগুলি খনি আছে। ভারতবর্ষের খনি হইতেও গত বৎসর তিন লক্ষ টাকার গ্রেফাইট উত্তোলিত হইয়াছে।

কম্বারল্যাণ্ডের গ্রেফাইট বিশুদ্ধ বলিয়া ইহা হইতে সহজেই পেন্সিল প্রস্তুত করা যায়। ইহাকে বদ্ধপাত্রে অধিক উত্তাপে (White heat) পুড়াইয়া

লইয়া করাত দিয়া পেন্সিলের আকারে সরু সরু করিয়া চিরিয়া কাষ্ঠের আবরণ গুলির মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া লইলেই পেন্সিল প্রস্তুত হয়।

বিশুদ্ধ গ্রেফাইট অধিক মূল্যবান। ইহার এক সেরের দাম প্রায় ৭০৲ টাকা; সুতরাং ইহা হইতে পেন্সিল প্রস্তুত করিতে অধিক খরচ পড়ে। সেই জন্য সাধারণতঃ গ্রেফাইটের সহিত বিশুদ্ধ মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া পেন্সিল নির্ম্মিত হয়।

প্রথমে গ্রেফাইটকে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহা হইতে লৌহ, মৃদঙ্গার ও বালি পৃথক করিতে হয়। চূর্ণ গ্রেফাইটকে একটী জলপূর্ণ পাত্রে ভালরূপ গুলিয়া সামান্য রূপ থিতাইতে দিলেই, লৌহ প্রভৃতি অধিক ভারি পদার্থ নীচে পড়িয়া যায় এবং উপরের গ্রেফাইট মিশ্রিত জল অপর পাত্রে ঢালিয়া থিতাইয়া লইলে প্রায় বিশুদ্ধ গ্রেফাইট পাওয়া যায়। যে মৃত্তিকার সহিত অধিক বালি কাঁকর ও অপর কঠিন পদার্থ না থাকে সেইরূপ মৃত্তিকাই পেন্সিল প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। মাটীকেও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে জলে গুলিয়া ইহার কঠিন পদার্থ বিভিন্ন করিতে হয়। উক্তরূপে বিশুদ্ধীকৃত গ্রেফাইট মুচির মধ্যে অধিক উত্তাপে পুড়াইতে হয়। তাহার পর ইহার সহিত প্রয়োজন মত মাটী মিশ্রিত করিতে হয়। শক্ত (hard) পেন্সিলের জন্য ২ ভাগ মাটী ও ১ ভাগ গ্রেফাইট, মাঝামাঝির (Middling) জন্য উভয়ের সমান ভাগ ও নরম (soft) পেন্সিলের জন্য ২ ভাগ মাটী ও ৩ ভাগ গ্রেফাইট ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ মাটী ও গ্রেফাইট জল দিয়া মিশ্রিত করিয়া শিলে উত্তমরূপে পিষিয়া ময়দার তালের মত করিয়া লইতে হয়।

একখানি তক্তায় উপর পেন্সিলের আকারে সরু সরু লম্বা গর্ত্ত বা ঝুরি (Groove) কাটিয়া তাহাকে শিরীশ কাগজ দিয়া ঘসিয়া মসৃণ করিতে হইবে এবং এই তক্তা খানিকে উত্তপ্ত চর্ব্বি বা তৈলে ডুবাইয়া লইতে হইবে। ইহাই পেন্সিলের ছাঁচ (Mould) হইল উপরোক্ত মিশ্রিত তালটী লইয়া এই তক্তায় চাপিয়া চাপিয়া বসাইতে হইবে। তাহার পর আর এক খানি তক্তা ইহার উপর চাপিয়া বসাইতে হইবে। এখন মিশ্রিত পদার্থটী কেবলমাত্র লম্বা গর্ত্ত বা ঝুরির মধ্যে থাকিবে; তক্তা দুইখানির কেবল দুই প্রান্ত হইতে ঝুরির ভিতর দিয়াই মিশ্রিত পদার্থে বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে। পেন্সিল গুলি শীঘ্র শুষ্ক করিবার জন্য ছাঁচখানি অল্পউত্তাপে রাখিতে হয়। বেশ শুষ্ক হইলে ছাঁচ হইতে পেন্সিলগুলি আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া লম্বা লম্বা মুচির

(Crucible) মধ্যে রাখিতে হয়। মুচিগুলির সছিদ্র ঢাকন থাকে ও ইহার মধ্যে বালি ও কাঠের কয়লার গুড়া দিয়া ভর্ত্তি করিতে হয়। এক্ষণে এই পেন্সিল সমেত মুচিগুলি পুড়াইয়া লইলেই পেন্সিল প্রস্তুত হইল। যেরূপ শক্ত পেন্সিল করিবার প্রয়োজন সেই পরিমাণে আন্দাজ করিয়া পুড়াইতে হইবে।

পেন্সিলের আবরণ সিডার নামক (Cedor) কাঠ হইতে প্রস্তুত হয়। অর্দ্ধ গোলাকার কাষ্ঠগুলির মধ্যে ঝুরি কাটা থাকে, শিরীশ দিয়া উপরোক্ত পেন্সিল গুলি বসাইয়া দিয়া অপর অর্দ্ধও শিরিশ দিয়া জুড়িয়া বেশ গোলাকার ও মসৃণ করিয়া কোনরূপ রং মাখাইয়া লইলে পেন্সিল নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইল।

রঙ্গিন পেন্সিল প্রস্তুত করিতে হইলে, উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্থের সহিত ম্যাজেণ্টা (Aniline) মিশাইয়া লইতে হয়।

স্থায়ী (Indelible) পেন্সিল।

বিশুদ্ধ মাটী	৮ ভাগ
সিলভার নাইট্রেট	৩ "
মৃদঙ্গার (Manganese dioxide) গুড়া	২ "

এইগুলি ৫ ভাগ জলের সহিত একটী তাল কর; এই তাল শুষ্ক করিয়া পেন্সিলের আকারে কাটিয়া কাষ্ঠের আবরণে ভর্ত্তি কর।

অপর প্রক্রিয়া ঃ—আরবি গঁদ গরম জলে গুলিয়া ঘন আটা প্রস্তুত কর; তাহার সহিত সিলভার নাইট্রেটের (Silver nitrate) গুড়া ও সামান্য ভূষা একত্রে পিষিয়া লও ও পেন্সিলের আকারে সরু সরু কাঠির মত প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিয়া লও।

কপিইং পেন্সিল। (Copying Pencil)

ফেবারের (Faber's) কপিইং পেন্সিল চারিপ্রকার প্রস্তুত হয়।

১নং অত্যন্ত নরম ঃ—

ম্যাজেণ্টা	৫০ ভাগ
গ্রেফাইট	৩৭৷৷০ "
বিশুদ্ধ মাটি	১২৷৷০ "

২নং নরম ঃ—

ম্যাজেণ্টা	৪৬ "
গ্রেফাইট	৩৪ "
বিশুদ্ধ মাটী	২৪ "

৩নং শক্ত ঃ—

ম্যাজেণ্টা	৩০ ভাগ
গ্রেফাইট	৩০ "
বিশুদ্ধ মাটী	৪০ "

৪নং অত্যন্ত শক্ত ঃ—

ম্যাজেণ্টা	২৫ "
গ্রেফাইট	২৫ "
বিশুদ্ধ মাটী	৫০ "

উপাদানগুলি গুড়া করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে ও তাহার পর শীতল জলের সহিত মিলাইয়া চিটের (paste) মত করিতে হইবে। উত্তমরূপে মিশান হইলে পর, একটী তারের ছাকনীর (wire screen) ভিতর দিয়া গলাইয়া লইলে পেন্সিলের ন্যায় সরু সরু কাঠির আকারে বিভক্ত হইবে। এ গুলি ছায়ায় শুষ্ক করিয়া কাষ্ঠের আবরণের ভিতর শিরীশ দিয়া বসাইয়া লইলে সাধারণ লেড্ পেন্সিল প্রস্তুত হইল।

আমাদের দেশের তিলকমাটী পেন্সিল প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধহয়। তিলকমাটীর ন্যায় আরও কয়েক প্রকার মাটী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেও কাঁকর বালি প্রভৃতি থাকে না।

তাঁত সংবাদ।

স্বদেশী আন্দোলনে আজকাল অনেকেই অনেক প্রকার তাঁত প্রস্তুত করিয়াছেন ও করিতেছেন ; কিন্তু ইহার অধিকাংশই শ্রীরামপুরী ফ্লাইসাটল্ তাঁতের রূপান্তর মাত্র। কাগজে অনেকেই লিখিয়া থাকেন ও তাঁত বিক্রয়কারীরাও বলিয়া থকেন যে, আমাদের তাঁতে দৈনিক একজোড়া কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহা অতিরঞ্জিত কথা। অধিকাংশ তাঁতেই দেড়খানা কাপড়ের বেশী বুনিতে পারে না। কদাচিৎ দুই একজন তাঁতি যদিও একদিনে একজোড়া কাপড় বুনিতে পারে, তাহাও দৈনিক ৯ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না। মোটের উপর দক্ষ তাঁতি দৈনিক দেড়খানা কাপড় বুনিতে পারে। যাহাতে দৈনিক ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাপড় প্রত্যেক তাঁত হইতে বাহির হইতে পারে, সেই প্রকার তাঁত পাইবার জন্য আজকাল সকলেই ব্যস্ত। কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যে সকল তাঁত প্রস্তুত হইয়াছে, তন্মধ্যে জোড়াসাকো মদনমোহন চাটার্য্যের গলিতে ৪ নং ভবনে বাবু হুদিলাল আগরওয়ালা যে তাঁত প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং ইহার কার্য্য সন্তোষজনক। ইহা শ্রীরামপুরী ফ্লাইসাটল্ তাঁতের মত নহে ; ইহাতে যে কোন নম্বরের সূতা সহজেই বুনিতে পারা যায়। প্রত্যেক মিনিটে নব্বই বার মাকু চলে ; কেবল পায়ের সাহায্যেই মাকু চলে ও

"ব" উঠে নামে এবং ইহা এত হালকা যে, পেডেল করিতে একটুও ক্লান্তিবোধ হয় না। এই তাঁতের কার্য্য অনেকটা বিলাতী ও জাপানী তাঁতের মত, অথচ সেরূপ জটিল নহে। এই প্রকার তাঁতই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ এই তাঁতের নির্ম্মাণ-কৌশল অতি সহজ; ইহার কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে যে কোন মিস্ত্রীই মেরামত করিতে পারিবে। ইহার দামও বেশী নহে; সাধারণ ফ্লাইসাটল তাঁত অপেক্ষা কাপড়ও অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহাতে দৈনিক আড়াইখানা তিনখানা কাপড় হয় যাঁহারা হ্যাণ্ডলুম ফ্যাক্টরী (Hand Loom factory) খুলিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে এই তাঁত ব্যবহার করিতে আমি অনুরোধ করি এবং এই তাঁত ব্যবহার করিলে সাধারণ ফ্লাইসাটল তাঁত অপেক্ষা যে তাঁহারা লাভবান্ হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে সৈয়াজি কটেজ লুম (Sayaji Cottage Loomও) আছে। কিন্তু আমি বাবু হুদিলাল আগড়-ওয়ালা উদ্ভাবিত তাঁতটির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনে করি; এই তাঁত এক সপ্তাহের মধ্যেই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকিবে। বাবু হুদিলাল আগড়ওয়ালা অতি ভদ্রলোক; যদি কেহ তাঁহার নিকট তাঁত দেখিতে যান, তিনি স্বচ্ছন্দে দেখাইয়া শুনাইয়া দিবেন।

সন্ধ্যা।

স্বদেশী দ্রব্য।

বাঁকুড়া কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনীতে যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটির নাম এস্থলে পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইল।

নিব ও হেণ্ডেল—দাসপুরের মহেন্দ্রনাথ দাসের হেণ্ডেল, পিতলের নিব ও জর্ম্মণ সিলভারের নিব। পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত রামসদয় কর্ম্মকারের কৃত পিতলের নিব এক গ্রোস, মূল্য ১৷৵০ টাকা। বরিশাল নিব ম্যানুফেক্টারী হইতে পার্ব্বতীচরণ কর্ম্মকার অফিসের ছোট, বড়, মধ্যম নিব ও ম্যাগনামবোনাম। মহিমচন্দ্র দের (বাঁকুড়া) তামার নিব, চিত্র অঙ্কনের নিব ও ফাউণ্টেন পেন। সুরেন্দ্রনাথ পাল (বাঁকুড়া) কাঠের হেণ্ডেল। মহেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার ও কেশবচন্দ্র মণ্ডল (বাঁকুড়া) হেণ্ডেল।

লেড পেন্সিল—দিঘপাড়ের শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের নির্ম্মিত

স্বদেশী লেড পেন্সিল। মহেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার ও কেশবচন্দ্র মণ্ডল (বাঁকুড়া) লেড পেন্সিল।

বিবিধ প্রকার কালি—বিপিনবিহারী প্রতিহার (মাণিকবাজার) কালির পাউডার, রবারষ্ট্যাম্পের কালি, কাষ্ঠের জন্য বার্ণিস। টিন পিত্তল, লোহা ও কাষ্ঠ জুড়িবার পুটিং এবং বিবিধ রংয়ের কালি। দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া) লেখার ও জুতার কালি। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের (দীঘপাড়া) ডুপ্লিকেট ইঙ্ক বা একেবারে দুইখান কাগজ লিখিবার কালী।

সাবান—দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাকুড়া)।

তুলার বীজ বাহির করিবার যন্ত্র—বাকুড়া রামপুরের শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তুলার বীজ বাহির করিবার যন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছেন।

নলী ও সূতা পাকান যন্ত্র—বাকুড়া রামপুরের শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নলী ও সূতা পাকান যন্ত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এটি একটি চরকার মত যন্ত্র। একজন চরকাটি ঘুরাইলে একবারে দুইটী কার্য্য সম্পন্ন হয়। একদিকে সূতা পাকান ও আর একদিকে নলীতে সূতা গুটান হয়। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

দেশলাই—যোগেন্দ্রনাথ দুবের (রামডিহা) নির্ম্মিত দেশলাই এবং দেশলাইয়ের কাঠি প্রস্তুতের ছোট কাঠ কাটা কল। রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (বাঁকুড়া) স্বদেশী দেশলাই ৵১০ আনা ডজন।

বন পালো—রাইপুরের শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রেরিত এক শিশি বন-পালো। বনকুন্দরীর মূল ও বন হরিদ্রার মূল হইতে প্রস্তুত। এই দ্রব্য ফুটন্ত দুগ্ধে গুলিয়া চিনি মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট পায়স প্রস্তুত হয়। পয়সায় ১২টী বটিকা।

শৃঙ্গের দ্রব্য—রাজারাম সূত্রধরের (বাঁকুড়া) হাটালী খোদা মহিষ শৃঙ্গের কালীয় দমন হেণ্ডেল। উপেন্দ্রনাথ দের নির্ম্মিত (বাঁকুড়া) শৃঙ্গের চেন।

এঞ্জিন—সোণামুখীর কালীচরণ কর্ম্মকারের এঞ্জিন একটী। এতদ্ভিন্ন কালীচরণ জলের ফোয়ারা ও হাতীর দাঁতের শিল্পকার্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ছুরী ও কাঁচি ইত্যাদি—সাসপুর গ্রামের ভূপতিনাথ দাসের ছুরী, ছোরা, কাঁচি ও ক্ষুর। লালবাজারের রাজারাম কর্ম্মকারের নির্ম্মিত খাড়া ও জাঁতি। ছাতনার রাজবল্লভ কর্ম্মকারের ভূজালী। গোবিন্দচন্দ্র কর্ম্মকার (হাড়মাসড়া) ছোরা, কাস্তে ইত্যাদি। গোবিন্দচন্দ্র কর্ম্মকার (ভুলুমপুর) বড় ছোরা ও বর্শী।

ট্রেসিং কাগজ ইত্যাদি—বঙ্কিমবিহারী রায় (দার্জ্জিলিঙ্গ) স্বদেশী ট্রেসিং কাগজ, স্বদেশী কাল কার্ব্বন কাগজ, স্বদেশী ব্লু কার্ব্বন কাগজ।

ঝিনুকের বোতাম—ঢাকা বজ্রযোগিনীর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে কোট ও কামিজের জন্য সকল রকমের বোতাম। এই বোতামের দর ও খুব সুবিধা ছিল। পূর্ণচন্দ্র সূত্রধর (বিষ্ণুপুর) কান নামক অলঙ্কার।

সূতার কাপড়—প্রেমচাঁদ দাস (লালবাজার) কামিজের থান। বেণী দত্ত (গোপীনাথপুর) সূতার চেক থান।

দড়ী—গিরিশচন্দ্র পাঁজা (রাজগ্রাম নিবাসী) সরমঞ্জরী।

লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র—জয়পুরের অন্তর্গত ছাগলদিবী গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম্মকারের দুইটী প্লাস। চৈতনপুরে যজ্ঞেশ্বর কর্ম্মকারের নির্ম্মিত কোদাল একটী ; মূল্য ২৲ টাকা। হেমচন্দ্র আঢ্যের (বাঁকুড়া) ইস্পাতের ডাইস। দোলগোবিন্দ কর্ম্মকারের অঙ্গুরী ও বোতামের ডাইস।

টিনের দ্রব্য—বাঁকুড়ার মতিলাল লোহারের নির্ম্মিত টিনের ফুলঝাড়।

শিরীষ কাগজ।—বাঁকুড়া বড়বাজারের সূর্য্যনারায়ণ দাস।

জুতা—বৈকুণ্ঠনাথ মুচির (বাঁকুড়া) জুতা। বাঁকুড়া ওয়েশিয়ান মিশন শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের জুতা।

পোষ্টকার্ড—পাটপুরের শ্রীআনন্দলাল বিশ্বাসের দ্বারা ১০৩ ছত্র লেখা। মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া) পোষ্টকার্ডে ১৭১ লাইন লেখা। অমূল্য রতন চৌধুরী (বাঁকুড়া) একটী পোষ্ট কার্ডে ১৮১ লাইন ও একটীতেও ২০১ লাইন। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া) একটি পোষ্টকার্ডে ১৪৫ লাইন লেখা। ধনকৃষ্ণ রায় (বেলেতোড়) একটী পোষ্টকাডে ১৩২ লাইন।

হিতবাদী।

সমালোচনা।

"বর্ত্তমান সমস্যা ও স্বদেশী আন্দোলন" শ্রীচারুচন্দ্র বসু মজুমদার প্রণীত ৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য /১০ দেড় আনা মাত্র। কলিকাতা ২৩১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে ও মেদনী পুর কোতবাজার গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য) পুস্তক খানি একটী স্কুলের ছাত্র কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে

দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অতি সরল ভাষায় বিষদভাবে বুঝান হইয়াছে। স্বল্পবয়স্ক বালক এ বিষয়টী যেরূপ সুন্দর ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে; দেশবাসী বয়োবৃদ্ধগণ ইহা সেরূপ ভাবে বুঝিতে পারিলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। দেশের দারিদ্র, বঙ্গ বিভাগ, গবর্ণর নিযোগ প্রভৃতি বিষয়ও ইহাতে সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালিকে এই পুস্তিকা খানি পাঠ বা ইহার ভাব উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি। আমাদের পরিচিত গণের জন্য আমরা ইতিমধ্যে ইহার দেড় শত কপি ক্রয় করিয়াছি। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করি।

ঠাকুর মহাশয়ের সংসার শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য প্রতি সংখ্যা ৵০ মাত্র। বেহালা গ্রামে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। আমরা এই পুস্তিকার ২২ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। পুর্ব্বেই বলিয়াছি এই পুস্তক গল্প শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা জনক।

স্বদেশী শিল্প প্রসঙ্গ।

সুগন্ধি তৈল। মেদনীপুর বড়বাজারের ডাক্তার শশধর দের প্রস্তুত "সূর্য্যকান্তি তৈল" আমরা ব্যবহার করিয়াছি। এ তৈলটী মন্দ হয় নাই। শশধর বাবু এসেন্স, সাবান প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতেছেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ আছে।

বসন্তমালতী তৈল। চ্যাটার্জ্জি ফেণ্ড দ্বারা প্রস্তুত এবং ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, স্বদেশী নিকেতনে প্রাপ্তব্য। আমরা এই তৈল ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি ইহার গন্ধ যেমন মনোহর এবং মূল্য যেরূপ সস্তা তাহাতে আশা করা যায় শীঘ্রই ইহার অত্যন্ত কাটতি হইবে।

গ্রাহকগণের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে তাঁহারা স্থানীয় স্বদেশী ভাণ্ডার গুলির ঠিকানা ও সংবাদ আমাদের নিকট পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

স্বদেশী।

প্রথম খণ্ড।]　　বৈশাখ, ১৩১৩।　　[সপ্তম সংখ্যা।

বন্দে মাতরম্।

স্বদেশানুরাগ।

স্বদেশানুরাগ মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ হইলেও আমাদের দেশের লোকের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বহুকালাবধি অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় আমাদের চিত্তবৃত্তির এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, আমরা মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়াছি। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যেমন পরাধীন ব্যক্তির মনোবৃত্তির বিকাশ হইতে পারে না, সেইরূপ পরাধীন জাতিরও মনোবৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তির অভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বাস্তবিক, স্বাধীন জাতির উন্নতির যেরূপ সুবিধা আছে, আমাদের সেরূপ সুবিধা নাই। স্বায়ত্ব শাসনের অভাবে আমরা দেশ ও সমাজের দায়িত্ব জ্ঞানবিহীন এবং আইনের কঠোরতায় আমাদের ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই সর্ব্বদা সশঙ্কিত। রাজার সহানুভূতি ব্যতিরেকে প্রজার উন্নতি অসম্ভব। আমাদের ইংরাজ রাজা স্বয়ং কখনও এদেশে পদার্পণ করেন না, প্রজার দুঃখের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হয় না। প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ দেশীয়গণের রীতিনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এবং তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে কয়েক বৎসরমাত্র এখানে থাকিয়া স্বদেশে চলিয়া যান;

কাজেই এদেশের উন্নতি হউক আর অবনতি হউক তাহাতে তাঁহাদের লাভালাভ নাই। রাজকর্ম্মচারিগণ মোটা মোটা বেতন পাইয়া থাকেন, তাঁহারা কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হইয়া পড়েন ও এদেশের অর্থ স্বদেশে লইয়া যান। বিদেশী বণিকগণও এদেশ হইতে বহুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশে পাঠাইয়া থাকে; অর্থ সংগ্রহই ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। এইরূপে রাজা ও রাজকর্ম্মচারিবর্গ এবং দেশের শিক্ষিত ও ধনী বা ভদ্র সম্প্রদায়, অর্থাৎ দেশের উন্নতি যাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, যাঁহারা দেশের উন্নতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব-জ্ঞান-বর্জ্জিত বা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হওয়ায় আমাদের দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের শিল্প বাণিজ্য বিদেশীয়গণের করায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের শিল্প জগদ্বিখ্যাত; এখানকার শিল্প-জাত কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিশেষ আদৃত হইত। এখানকার শিল্পিগণই ইংলণ্ড প্রভৃতি আধুনিক সভ্যদেশ সকলকে শিল্পশিক্ষা দিয়াছে। সেই শিল্পিগণ পূর্ব্বে বেশ অবস্থাপন্ন ছিল, কিন্তু বিদেশীয় শিল্পিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় এদেশের শিল্প ধ্বংসপ্রায় হওয়াতে দেশীয় শিল্পী একেবারে অবস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে; অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আবার অনেকে জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন কিম্বা মজুরি করিয়া অতি কষ্টে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। তাহাদের দুরবস্থার জন্য প্রধানতঃ আমরাই দায়ী, কারণ আমাদের যদি স্বদেশানুরাগ থাকিত, যদি দেশবাসীর সহিত আমাদের সহানুভূতি থকিত, আত্মোদর পূর্ত্তির চেষ্টার সহিত স্বদেশীয়গণের অন্ন সংস্থান চেষ্টাও যে আমাদের নিতান্ত বিহিত, ইহা যদি আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা কখন স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিতাম না। আমরা ভয় করি যে, দেশী জিনিষ ব্যবহার করিলে পাছে গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়া আমাদিগকে নির্য্যাতন করেন। কিন্তু সেভয়ে ভীত হইলে চলিবে না এবং ভয়েরও বিশেষ কারণ দেখা যায় না। দেশী জিনিষ ব্যবহার আইন-বিরুদ্ধ অপরাধ নহে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট সভ্য ও উদার-নৈতিক এবং একেবারে যে প্রজাবৎসল, নহেন এরূপ বলিলে প্রকৃত কথা বলা হয় না। গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্প বিনাশের কতক কতক বন্দোবস্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, এদেশের প্রধান প্রধান শিল্প যে একেবারে বিনষ্ট হয়, গবর্ণমেণ্টের ইহা অভিপ্রেত নহে। শিল্পশিক্ষার

জন্য গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেদিন বড়লাটের রাজস্ব সচিব বেকার সাহেব, আয়ব্যয়ের হিসাব পর্য্যালোচনা করিবার সময়, প্রকাশ করিয়াছেন যে, বস্ত্রশিল্প শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে শ্রীরামপুরে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে গবর্ণমেণ্টকে দেশীয় শিল্পের সম্পূর্ণ বিরোধী কি প্রকারে বলা যায়? যাঁহারা স্বদেশানুরাগী নহেন, তাঁহারাই গবর্ণমেণ্টের উপর দোষারোপ করিয়া আপনাদের দায়িত্ব কাটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

স্বদেশানুরাগ একটী গুরুতর ধর্ম্ম। অন্যান্য ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে যেমন কতকগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হয়, সেইরূপ, স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিকে স্বদেশের উন্নতির জন্য যত্নবান হইয়া তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আমি ধার্ম্মিক বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে যেমন প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারি না, সেইরূপ আমার স্বদেশপ্রেম আছে বলিয়া বসিয়া থাকিলে স্বদেশানুরাগীর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি না। বদ্ধপরিকর হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, কেবল "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইলে চলিবে না। গীতার উপদেশ স্মরণ করিয়া কর্ম্মফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া জীবনকে স্বদেশোন্নতি ব্রতে উৎসর্গ করিতে পারিলে, স্বদেশানুরাগী নামের যোগ্য হইতে পারা যায়। নিষ্কাম ধর্ম্মই মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে অপরের উপকার করিতে পারা যায় না। আমাদের দেশে স্বার্থপরতা এতই প্রবল হইয়াছে যে, পুত্র পিতামাতাকে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক নহে। একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের মধ্যে যে সদ্ভাব ও সহানুভূতি ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে। দয়া দাক্ষিণ্যাদি ঐশিক গুণ বর্জ্জিত হইয়া আমরা সঙ্কীর্ণমনা ও স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি। ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির দোষগুলির অনুকরণ করিয়া আমরা কিম্ভূতকিমাকার হইয়া উঠিয়াছি। ইংরাজের স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্য যথেষ্ট আছে; তাঁহাদের দোষগুলির অনুকরণ না করিয়া যদি কতক পরিমাণে এই সকল গুণের অনুকরণ করিতে শিখি, তাহা হইলে আমাদের দুর্দ্দশার কথঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে। কোন কোন ইংরাজের ন্যায় স্বজাতির উপকারের জন্য ন্যায়পরতায় জলাঞ্জলি দেওয়া যে অধার্ম্মিকতা তাহার আর সন্দেহ নাই, এবং আমরা আমাদের দেশের লোককে সেরূপ মহাপাপে কলুষিত হইতে বলি না। আমাদের বিশ্বাস যে, ন্যায় ও সত্য বজায় রাখিয়া আমরা

দেশহিতৈষী হইতে পারি এবং দেশব্যাপ্ত দরিদ্রতার প্রকোপ নিবারণ করিতে পারি।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, ভারতবর্ষে নানাবিধ জাতির বাস সুতরাং জাতীয়তা ও একতা সম্ভবপর নহে এবং দেশব্যাপী স্বদেশানুরাগ থাকাও অসম্ভব। আমরা জাতিভেদ ও জাতীয়তা প্রবন্ধে (স্বদেশী ২য় সংখ্যা দেখ) প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, জাতিভেদ স্বত্বেও এদেশে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সে বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রোয়জন। এখানে এই-মাত্র বলা আবশ্যক যে, ইংরাজ রাজত্বে জাতীয়তার অনুকূলে অনেকগুলি উপাদান সমুদ্ভূত হইয়াছে ও হইতেছে। আর জাতিভেদ ও ধর্ম্মভেদ থাকিলেও মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ স্বদেশানুরাগ বৃত্তির কেন লোপ পাইবে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। স্ববর্গ আত্মীয়গণকে ভালবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন, মনুষ্যত্বের লক্ষণ ও চরিত্রবান লোকের পরিচয়; সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সহিত এ সকলের সংশ্রব নাই।

স্বদেশানুরাগ হইতে যে দেশের কতদূর উন্নতি হয়, সম্প্রতি জাপানবাসিগণ তাহা সুস্পষ্টভাবে জগৎকে দেখাইয়াছেন। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে জাপান পৃথিবীর মধ্যে একটি আদর্শ দেশ হইয়া উঠিয়াছে; ইহা কি জাপানবাসিদের স্বদেশানুরাগের ফল নহে? বিগত যুদ্ধে জাপানের স্ত্রীলোকগণ পর্য্যন্ত স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রাণাধিক স্বামী পুত্রগণকে অকাতরে যুদ্ধে যোগদান করিতে পাঠাইয়াছেন। আমাদের দেশের রাজপুত ইতিহাসেও এরূপ স্বার্থত্যাগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বর্ত্তমান ভারতে সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

স্বদেশানুরাগ দেখাইতে হইলে, যাহাতে এদেশের শিল্প বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কেবল বক্তৃতা করিয়া, মুখে "বন্দে মাতরম" বলিয়া ও সভাস্থলে "দেশী জিনিষ ব্যবহার করিব" প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে বিপরীত কার্য্য করিলে চলিবে না। আমি ও আমার পরিবারগণ দৈনিক চর্ব্যচূষ্যলেহ্যপেয় প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়া সুখে কালযাপন করিব, আর আমার প্রতিবেশিগণ অন্নাভাবে কষ্ট পাইবে কিম্বা অনাহারে মরিবে, তথাপি আমি তাহাদের দুঃখের কথা কর্ণে স্থান দিব না, ইহা মনুষ্যত্ব নহে এবং এরূপ করিলে আর চলিবে না। বিদেশী রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ যখন আমাদের কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে

উপযুক্তরূপ মনোযোগী নহেন, তখন আমাদের স্বাবলম্বী হইতে হইবে। জমিদারগণ আপন আপন প্রজার অবস্থা যাহাতে উন্নত হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ দিউন। ধনী, নির্ধন সকলেই দেশজাত বস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য পুনর্ব্বার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেই, ধ্বংস-প্রায় শিল্পের উন্নতি হইবে ও তন্তুবায়, কর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পিগণের অন্ন সংস্থানের উপায় হইবে। প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইতেছে; দরিদ্রতাই এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ এবং আমরাই এই দরিদ্রতার মূল, একথা যেন আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি। অবাধ-বাণিজ্য আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; গবর্ণমেণ্ট এই অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারেন না; আমরাও ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ নহি; তবে ইহা দ্বারা আমাদের দেশের যে অনিষ্ট হইয়াছে, আমরা মনে করিলে কতক পরিমাণেও তাহার প্রতীকার করিতে পারি। যদি আমরা একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া যথাসম্ভব বিদেশী দ্রব্য পরিবর্জ্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহা হইলে অবাধ বাণিজ্য সত্ত্বেও আমাদের শিল্পের উন্নতি হইতে পারে এবং দরিদ্র অর্দ্ধমৃত শিল্পিগণের দুরবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দেশের উপকার করিতে হইলে আমা-দিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। দেশজাত দ্রব্য মূল্যবান্ হইলেও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। দেশের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে দেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে পারেন। স্বদেশানুরাগের অভাবে ও কুঅভ্যাসবশতঃ তাঁহারা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের অনুরোধ যে, তাঁহারা দেশের লোকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া একবারে বিদেশী দ্রব্য পরিবর্জ্জন করুন। দেশের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ না থাকিলে দরিদ্রদিগের উপায়ান্তর নাই। হৃদয়বান্ লোক স্বভাবতঃই স্বদেশানুরাগী ও স্বদেশহিতৈষী হইয়া থাকেন। দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার অপনোদন করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে কার্য্যে স্বদেশানুরাগ দেখাইতে হইবে এবং অপরের মনে যাহাতে স্বদেশানুরাগ বৃত্তি সমুদ্ভূত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশের রাজা বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া সেই সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন এবং স্বীয় দেশোৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রীত হইবার সুবিধা করিয়া দিয়া শিল্পিগণকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজরাজ প্রথম হইতে আমাদের শিল্পের উন্নতির কথা দূরে থাক ইহার বিনাশের সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং

আমাদিগকেই দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিরূপ উপায়ে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হইতে পারে ও বহুসংখ্যক অবলম্বনবিহীন লোকের জীবিকার পথ প্রস্তুত হইতে পারে, আমরা বস্ত্র-শিল্প প্রবন্ধে তাহা বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছি। সহৃদয় দেশবাসিগণ সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা স্বদেশানুরাগ ব্রত প্রতিপালনে যেন পরাঙ্মুখ না হন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আমরা এই বিষয় লইয়া "স্বদেশী"তে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিব ; আশা করি ভগবান আমাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিতে হইলে, প্রধানতঃ কয়েকটী বিষয়ের সমালোচনা আবশ্যক—যেমন স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি, আর্থিক অবস্থা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। আমাদের রাজপুরুষগণ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, এদেশে সাধারণ লোকের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। কিন্তু আমরা সকল বিষয় ভাবিয়া যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশীয় লোকের বিশেষ অবনতি দেখিতে পাওয়া যায় ; এমন স্থান নাই, যেখানে ম্যালেরিয়া জ্বরে লোক কষ্ট না পাইতেছে ও না মরিতেছে। পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া জ্বর কাহাকে বলে, তাহা এদেশের লোক জানিত না। যে সকল স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সে সকল স্থানে এখন বৎসরের সকল সময়েই, বিশেষতঃ বর্ষাকালের শেষে, ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। য়্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় কুইনাইনই ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র ঔষধ ; সেই কুইনাইন দ্বারা জ্বর তাড়ান হয় ; কিন্তু বারম্বার জ্বর আক্রমণ করায়, শরীর শীর্ণ হইয়া লোক অল্পায়ুঃ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে প্রায় দৃষ্টিহীন ; কুইনাইন বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইলেই ম্যালেরিয়া বন্ধ হইবে, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। ভেড়ী বাঁধ (Embankment) রেলপথও গমনাগমনের অন্যান্য পথদ্বারা স্বাভাবিক জলপ্রণালী রুদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ হওয়ায়, ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজ উৎপন্ন হয়। প্রধান প্রধান সহর ও পল্লীগ্রামে পুরাতন পুষ্করিণীর সংখ্যা অনেক ; সেই গুলির চতুর্দ্দিক আগাছা ও জঙ্গল পরিপূর্ণ

থাকায়, তাহাদের পত্র ফলাদি দ্বারা জল দূষিত হয়; লোকে সেই জল পান করে ও তাহাতে স্নান করে; বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে সেই জল একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হয়; কিন্তু ভাল জলের অভাবে লোকে সেই জলই ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। ইহাই জ্বর, ওলাউঠা, উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রধান কারণ। আমরা সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করি, কিন্তু তাহা ঠিক নহে;—আমাদেরও অনেক দোষ আছে; সেই জন্য আমাদেরই ভুগিতে হয়। আমরা কি আমাদের পুষ্করিণী গুলি পরিষ্কার রাখিতে পারি না? পুষ্করিণীর নিকটের জঙ্গল ও বৃক্ষ কাটান অল্পব্যয়ে হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি নাই।

ম্যালেরিয়া জ্বরের ন্যায় ওলাউঠা, বসন্ত ও প্লেগে আমাদের দেশের অনেক লোক অকালে মরিতেছে; সেই সকল ব্যাধি অপরিচ্ছন্নতামূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে; দেশের সাধারণ লোক এত দরিদ্র যে, উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন পায় না এবং দরিদ্রতা নিবন্ধন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে না, ভাল খাদ্য আহার করিতে ও ভাল গৃহে বাস করিতে পায় না সেই জন্য তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। দরিদ্রতার কারণ লোকের মনে স্ফূর্ত্তি না থাকাতে, তাহাদের শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া পড়ে ও তাহাদিগকে নানাপ্রকার রোগ আক্রমণ করে। ভারতবর্ষের সাধারণ লোক যে পূর্ব্বে দরিদ্র ছিল না। একথা বলা যায় না; তবে বর্ত্তমান কালে দেশে দরিদ্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

প্রজার স্বাস্থ্য বিষয়ে রাজার যতদূর মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য, গভর্ণমেণ্ট তাহা দেন না বলিয়া আমাদের মনে হয়। কোন কোন সহরে পানীয় জলের ব্যবস্থা হইয়াছে; কিন্তু পল্লীগ্রামে পানীয় জলের নিতান্ত অভাব। পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হয় না; গবর্ণমেণ্টের উচিত, বড় বড় গ্রামে এক একটি পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেওয়া; এই উদ্দেশ্যেই রোডসেসের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক জেলার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড যদি প্রতি বৎসর দু চারটী নূতন পুকুর কাটাইয়া দেয়, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের মহৎ হিতকর কার্য্য করা হয়; কিন্তু ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডেরও সে বিষয়ে লক্ষ্য কই? স্বাস্থ্য রক্ষাই মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য; হিন্দুধর্ম্মে অনেক কর্ম্মই স্বাস্থ্য রক্ষার কারণ করিতে হয়; সাধারণ লোকের স্বাস্থ্যের উপরই সংসারের সকল বিষয় নির্ভর করে। বর্ত্তমান সময়ে

ভারতবর্ষের লোক যেরূপ নানা প্রকার কঠিন পীড়াক্রান্ত হইতেছে ও যে ভাবে লোক সংখ্যার হ্রাস হইতেছে, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যে এদেশে একেবারে লোকাভাব হইবে বলিয়া বোধ হয়। কয়েক মাস পূর্ব্বে প্লেগ রোগে প্রতি সপ্তাহে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক মরিয়াছে, এখনও অনেক লোক মরিতেছে। ইহা হইতে দেশের লোকের অব্যাহতি দেখা যায় না এবং গবর্ণমেণ্টও প্রতীকারের বিশেষ চেষ্টা করেন না।

ধর্ম্মবিষয়ে যে দেশীয় লোকের আস্থা কমিয়াছে, তাহাতে আরে সন্দেহ নাই। হিন্দু মুসলমান আর পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্ম কর্ম্ম কিম্বা ধর্ম্ম চর্চ্চা করেন না। ধর্ম্মই হিন্দুর জীবন ছিল; আহার বিহার, শয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে প্রায় সকল হিন্দু ভগবানকে স্মরণ করিত; এখন কয়জন আর সেরূপ করিয়া থাকে? পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমাদের ধর্ম্মভাব লোপ পাইয়াছে। হিন্দুগৃহে পূজা হোমাদি ধর্ম্ম কার্য্য প্রায় প্রত্যহই সম্পাদিত হইত; স্ত্রীলোকগণ ব্রতাদি মঙ্গল কার্য্য করিত; এখন সে সকল উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। গৃহে পূজাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান হইলে পরিবারবর্গ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে; তাহাতে তাহাদের শরীর ও মন ভাল থাকে, রোগেরও শান্তি হয়; একথা সকলকেই মানিতে হইবে; এখনকার হিন্দু স্ত্রী পুরুষের ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় সমান অবস্থা; সাধারণ কথায় বলিতে গেলে, ধর্ম্ম বিষয়ে ভারতবাসিগণ না হিন্দু না মুসলমান, অর্থাৎ নাস্তিক ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহাতে আমাদের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইতে পারে না। সাংসারিক লোকের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রবল না থাকিলে, দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের স্ফূর্ত্তি হয় না; ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনের একাগ্রতা ও প্রফুল্লতা সাধিত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় অর্থোপার্জ্জন এবং আহার ও পরিচ্ছদই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; এবং ঐতিহাসিক কাল্পনিক সুখ সচ্ছন্দতাই ধর্ম্ম। আমাদের দেশের অনেক লোক এইরূপ সভ্যতায় শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা পরকাল মানিতে প্রস্তুত নহেন; ইহকালই জীবনের অন্ত জানিয়া, যথেচ্ছাচার পরায়ণ হইয়া থাকেন ও পরিণামে কষ্ট পাইয়া অনুতাপ করেন।

আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি অন্ততঃ এদেশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। দেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক একরূপ নিরক্ষর; অবশিষ্ট ২০ জনের মধ্যে একজনও উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না; ইংরাজী শিক্ষাই এখন দেশের লোকের প্রধান লক্ষ্য; সংস্কৃত, আরবী, পার্শী প্রভৃতি শিক্ষার প্রথা বিশেষরূপ হ্রাস পাইয়াছে; তৎসহ ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা প্রায় লোপ পাইয়াছে। অর্থকরী বিদ্যার

অনুশীলনেই যাহারা সমুৎসুক তাহাদেরও সে শিক্ষাজনিত অর্থাগমের পথও সংকীর্ণ। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির চৈতন্য সম্পাদন ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইলেও, আধুনিক শিক্ষা এই উভয় উদ্দেশ্য বর্জ্জিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রাজনীতি সম্বন্ধে এদেশীয়দিগের অবস্থা অতীব শোচনীয় বলিলেই হয়। ভারতবর্ষ পাঁচশত বৎসর মুসলমানদের শাসনাধীনে থাকিয়া, আজ দেড়শত বৎসর ইংরাজদের অধীনে পড়িয়াছে। ইংরাজদের আইন ব্যবস্থাদি ভাল, কিন্তু কোন কোন প্রধান রাজপুরুষের দোষে প্রজার কষ্ট হইয়া থাকে; এদেশে অনেক বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোক আছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বড় বড় রাজকার্য্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত না করিয়া বিদেশীয়দিগকে নিযুক্ত করেন। বিদেশীয়গণ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান হইলেও দেশের আচার ব্যবহার জানেন না, জানিতে চেষ্টাও করেন না; সেই জন্য বিচার বিভ্রাট ঘটে। দেশীয় লোককে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলে সর্ব্ব বিষয়ে দেশের উপকার সাধিত হয়। আমাদের অনেক আবেদন ন্যায়-সঙ্গত হইলেও গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করেন না। বঙ্গবিভাগ অনাবশ্যক ও অহিতকর বলিয়া আমরা কত প্রতিবাদ করিলাম, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আমাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দেশে কর ভারও অধিক হইয়া উঠিয়াছে; এবং দেশের আর্থিক অবস্থার ক্রমাগত যেমন অবনতি হইতেছে, করভার সেইরূপ ক্রমাগত বর্দ্ধিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট এই অবস্থার বিপরীত ভাব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পরায়ণ হইতেছেন। এদেশীয় প্রত্যেক ব্যক্তির মাসিক আয় গড় পড়তায় দেড় টাকা মাত্র; ইহাতে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও কুলান হয় না; তবে কোথা হইতে সে ব্যক্তি কর দিতে পারে? আত্মশাসন প্রণালী প্রচারিত করিয়া আমাদের দেশের লোকের যে একবারে হিতসাধন করা হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। দেশের লোক রাজকার্য্যের জন্য লালায়িত; আত্মশাসন ও অবৈতনিক কর্ম্মচারীর নিয়োগ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিনাব্যয়ে সম্পাদিত হইতেছে; বেতন দিয়া সেই সকল কার্য্য করিতে হইলে, অনেক লোককে নিযুক্ত করিতে হইত ও তাহাদের উদারান্নের উপায় হইত; আবার সাধারণের বিশ্বাস, এবং ইহাও প্রকৃত কথা যে, অবৈতনিক কর্ম্মচারিগণ যত্ন ও মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের অযোগ্যতা হেতু বিচার ও অন্যান্য কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।

বাঙ্গলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটী মহতী কীর্ত্তি। ইহার দ্বারা জমিদার ও প্রজার বিশেষ উপকার হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকায় প্রজাগণ নিতান্ত অবস্থাহীন। গবর্ণমেণ্ট যাহাদের সহিত বন্দোবস্ত করেন তাহারা জানে যে, ঐ জমির উন্নতিসাধন করিলে কর বৃদ্ধি হইবে কিম্বা কয়েক বৎসর পরে অন্য লোকের সহিত বন্দোবস্ত হইতে পারে; সেই জন্য তাহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে নানা বাবদে টাকা আদায় করিয়া থাকে ও জমির উন্নতির জন্য চেষ্টা করে না।

এদেশের লোক পূর্ব্বে সত্যনিষ্ঠ, দানশীল, সরল প্রকৃতিক ও ধর্ম্মভীরু ছিল; কিন্তু এখন সে সকল গুণবিশিষ্ট লোক অল্পই দৃষ্ট হয়। আদালত ধর্ম্মাধিকরণ না হইয়া অধর্ম্মাধিকরণ হইয়াছে। উকিল, মোক্তার ও আদালতের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, ততই মোকর্দ্দমার সংখ্যা বাড়িতেছে ও লোক সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যেন পাপ নয় বলিয়া অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

দেশীয় লোক গবর্ণমেণ্টের পুলিষের কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাদের অনেকেরই অকার্য্য কিছুই নাই; অর্থের লোভে অনেক কর্ম্মচারী সর্ব্ব প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকে ও দেশীয় লোকের প্রতি অত্যাচার করে। গবর্ণমেণ্ট সে সকলই জানেন ও স্বীকার করেন এবং পুলিষ সংস্কার করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এপর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই। পূর্ব্বের অপেক্ষা চুরি, ডাকাতি, দস্যুতা ও নরহত্যা কমিয়াছে দেখিয়া, গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, ইংরাজ রাজত্বে এদেশীয়দিগের সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা হইতেছে; একথা কতক সত্য বটে। পার্শী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দাদাভাই নরৌজী বলেন যে, ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষের লোকের সম্পত্তি নাই বলিলেই হয়; আর তাহাদের যেরূপ দুরবস্থা তাহাতে তাহাদের জীবিত থাকা না থাকা সমান। আমরা ততদুর বলিতে চাহি না। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে দস্যুভয় বাস্তবিকই অনেক কম। রেল পথ হওয়াতে লোকে আর স্থল ও জল পথে যাতায়াত করে না; আজকাল লোকে ঘরে নগদ টাকা না রাখিয়া কোম্পানির কাগজ করিয়া রাখে; এই সকল কারণেও চুরী ডাকাতির সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। চুরী, ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি যাহাতে বন্ধ হয়, সে বিষয়ে যে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে পুলিষের দোষে গবর্ণমেণ্টকে লোকাপ্রিয় হইতে হয়। পুলিষের অধ্যক্ষগণ তাঁহাদের

অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখেন না ও তাঁহাদের প্রশ্রয় দেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

দেশের লোককে নিরস্ত্র করিয়া গবর্ণমেণ্ট সুশাসনের কাজ করেন নাই। এ দেশীয় লোক চিরকালই রাজভক্ত। ইংরাজ রাজত্বে যে অনেক হিতকর কার্য্য হইয়াছে, ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন এবং যাহাতে এই রাজত্ব দৃঢ়তর হইয়া স্থায়ী হয়, ইহাই আমাদের বাস্তবিক ইচ্ছা; তবে গবর্ণমেণ্ট কেন যে এ দেশীয়দিগকে ভয় করেন ও নিরস্ত্র করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রত্যেক গ্রামে দুই চারিটী বন্দুক থাকিলে, ডাকাতির সংখ্যা হ্রাস হইতে পারে; কারণ ডাকাইতগণ বন্দুককে বড় ভয় করে।

সামাজিকতায় আমাদের বিশেষ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্মভেদ হেতু দেশে সামাজিকতার স্থিরতা নাই। এখন সমাজ-বন্ধন নাই বলিলেই হয়; আমরা সমাজকে ভয় করি না এবং কাহাকেও সমাজের নেতা বলিয়া মানিতে চাহি না। ইহার ফলে কদাচার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও নৈতিক অবনতি সাধিত হইতেছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও বৃত্তিগত জাতিধর্ম্মের প্রায় বিলোপ সাধন হইতেছে। সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার এখনও নিবৃত্তি হয় নাই। বিবাহের ব্যয় এত অধিক হইয়াছে যে, লোকে ইহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। সে বিষয়ে আমাদের পরস্পরের সহানুভূতি নাই। সভ্য শ্রেণীর মধ্যে পুত্রের বিবাহদ্বারা ও ইতর শ্রেণীর মধ্যে কন্যার বিবাহদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করা একটী প্রধান ব্যবসায় রূপে পরিণত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে দলাদলি ও দ্বেষহিংসা বাড়িয়াছে।

ভাবিয়া দেখিলে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইয়া অবনতি হইয়াছে বলিতে হইবে। আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই দুর্মূল্য হওয়াতে, টাকার দর অনেক কমিয়াছে। পূর্ব্বে এক টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, এখন সেই একমণ চাউলের দাম পাঁচ টাকা হইয়াছে। অন্যান্য জিনিষের দরও সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে। আর্থিক অবস্থার অবনতি নিবন্ধন এখানে দুর্ভিক্ষ প্রায় চির বিরাজমান; এক বৎসর অল্প বৃষ্টি হইলেই অল্প শস্য হয় ও শস্যের দর বৃদ্ধি হয়; আর অর্থাভাবে লোকে সেই শস্য কিনিতে না পারিয়া অনাহারে মারা যায়।

দেশের শিল্প বাণিজ্য ও অনেকগুলি কৃষি বিদেশীয়দিগের হস্তগত। এদেশের বিবিধ শিল্পোপযোগী দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয় এবং বিদেশ হইতে আমাদের

পরিধেয় প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া আসে। ফলতঃ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও আমাদিগকে বিদেশীয়দিগের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। ভারতবর্ষের শিল্প চির প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকাই মস্‌লিন ও কাশ্মিরী শাল জগতে বিখ্যাত; মুরসিদাবাদ, কাশী প্রভৃতি স্থানে উত্তম রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এখানে স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি ও কাঁসা পিতলের বাসনাদি তৈয়ার হইত এবং এখনও হয়; কিন্তু আমরা বিদেশীয় জিনিষের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া দেশীয় জিনিষের ব্যবহার ত্যাগ করাতে দেশীয় সকল শিল্পই লোপ পাইয়াছে বলিলে হয় এবং শিল্পীদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। তাহাদের অনেকেই পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য করিতেছে। বিদেশীয়গণ আমাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ লইয়া যাইতেছে। অনেক অব্যবহার্য্য ও অনাবশ্যকীয় চিনে মাটীর খেলানা ও কাচের জিনিষ এখানে বিক্রীত হইয়া বিদেশে টাকা যাইতেছে।

দেশীয় কৃষকের অবস্থা ভাল কি মন্দ তাহা সামান্যরূপ বিবেচনায়ই অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। দেশে এখন দুই একটী কৃষির উন্নতি ও বিস্তার হইয়াছে; বিদেশীয়দিগের ব্যবসার জন্য পাটের দরকার। সেইজন্য এদেশের কৃষকগণ অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন করিয়া অধিক উপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়ায়, তাহাদিগকে সেই সকল দ্রব্য অধিক দরে ক্রয় করিতে হয়; সেই জন্য পাট হইতে যে লাভ করে, তাহা ক্ষয় হইয়া যায়। আবার বিদেশীয় ব্যবসাদারগণ অনেক প্রকার অনাবশ্যকীয় দ্রব্য এখানে আমদানী করে এবং এখানকার কৃষক ও অপর সাধারণ লোক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সেই সকল দ্রব্য কিনিয়া থাকে; কারণ শিক্ষা ও সমাজ শাসনের অভাবে, লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিলাস-প্রিয় হইয়াছে। পীড়ার চিকিৎসা ও পথ্যাদির জন্যও অনেক ব্যয় হইয়া থাকে এবং রোগ ভোগ করিয়া কৃষকেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিতে সমর্থ নহে। অর্থাভাবে জমিতে রীতিমত ও উপযুক্ত সার দেওয়া হয় না। তাহাতে জমির উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস হইতেছে; দেশীয় প্রায় সকল কৃষকই ঋণগ্রস্ত এবং সুদের হারও অধিক। কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য ইংরাজ রাজা কোন কোন স্থানে খাল কাটাইয়া জল সরবরাহ ও জলনিকাশের বন্দোবস্ত করিয়াছেন; সেজন্য দেশীয়গণের রাজার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। দামোদর প্রভৃতি নদীর ধারে বাঁধ বাঁধাইয়া অনেক গ্রাম রক্ষা করা হইয়াছে। যদিও এই সকল কার্য্য আমাদের কর দ্বারা

সম্পাদিত হইয়াছে, তথাপি গবর্ণমেন্ট উহা প্রজার হিতার্থে করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদ-যোগ্য।

রেল ও ট্রামওয়ে বিস্তার, ডাকের সুবন্দোবস্ত এবং টেলিগ্রাফ এই কয়েকটীকেই অনেকে দেশের বিশেষ উন্নতিসূচক কার্য্য বলিয়া প্রদর্শন করেন। রেলপথ বিস্তারে বিদেশীগণেরই যে সম্যক্ সুবিধা, তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় তদ্বিষয়ক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। যাতায়াতের সুবিধারূপ প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া লোকে প্রত্যক্ষভাবে যেমন পদব্রজে ভ্রমণের অভ্যাস ও শক্তি-বিহীন হইতেছে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির সহায়তা করিয়া, দেশের লোককে শক্তি-বিহীন করিয়া, তাহাদিগকে অপরোক্ষভাবে রেলপথ আপনারই মুখাপেক্ষী করিতেছে। ট্রামওয়ে সহায়ে দেশের উন্নতিও প্রায় রেলেরই অনুরূপ। গবর্ণমেণ্টের সুবিধার জন্য ডাক ও টেলিগ্রাফের সুবন্দোবস্ত হওয়ায়, দেশের লোকও ইহা দ্বারা প্রকৃতরূপ উপকৃত হইয়াছে বলিতে পারা যায়। কিন্তু আবকারী এদেশের অনেক স্থানে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

এই প্রবন্ধে দেশের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত হইল, তাহা প্রকৃত কিনা, পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমরা নিরপেক্ষ ভাবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা প্রকাশ করিলাম। যদি কোন বিষয়ে অমোদের ভ্রম হইয়া থাকে, সহৃদয় পাঠক তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

চামড়ার পালিষ।

(চামড়ার কালি, পালিষ ও জলাভেদ্যকরণ প্রণালী)

চামড়ায় পালিষ লাগাইলে উহা নরম, নমনীয় এবং অল্প ঘর্ষণেই উজ্জ্বল হয়। ইহার প্রণালী জুতার কালী প্রস্তুত প্রণালী হইতে বিভিন্ন।

রং করিবার নিমিত্ত হাড়ের কয়লা, কাঠের কয়লা ও কজ্জল বা ভূষা (Lamp black) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু হাড়ের কয়লা প্রথমে পরিষ্কার করিয়া লইলে উহার রং সর্ব্বাপেক্ষা ঘোর উজ্জ্বল এবং স্থায়ী হয়।

হাড়ের কয়লা পরিষ্কার করিবার প্রণালী :—প্রথমে ২০ ভাগ হাড়ের কয়লার সহিত ৬ ভাগ পরিষ্কার লবণ-দ্রাবক (হাইড্রোক্লোরিক এসিড) একত্রে ২৪ ঘণ্টা রাখিতে হইবে ; তাহার পর ১০০ ভাগ ফুটন্ত জল উহাতে মিশ্রিত

করিয়া কিছুক্ষণ পরে থিতিয়া পড়িলে তরল ভাগ ঢালিয়া ফেলিবে এবং নীচে যে থিতুনি বা পলি পড়িবে তাহাতে ৫ ভাগ তীব্র গন্ধক দ্রাবক (সলফিউরিক এসিড) মিলাইয়া পুনরায় ২৪ ঘণ্টা রাখিবে। তাহার পর আবার ১০০ ভাগ ফুটন্ত জল মিলাইয়া জলীয় অংশ পৃথক করিলে অবশিষ্ট পলি পরিষ্কার এবং অম্লতা-হীন হইবে।

চর্ম্মের সহিত সংলগ্ন করিবার জন্য উহার সহিত কোন চটচটে দ্রব্য মিলান আবশ্যক; সেই জন্য ২ ভাগ গুড় এবং এক ভাগ গ্লিসারিণ ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিম্বা এরূপ কোন দ্রব্য দেওয়া যায় যাহা শুকাইয়া যায় না। যথা—জলপাই, তিল, তিসি বা কড্ তৈল এবং চর্ব্বি ইত্যাদি। ডিমের শুভ্রাংশ, মৎস্য শিরিস (Isinglass) এবং ময়দা ব্যবহৃত হইলে চামড়ায় ছাতা পড়ে এবং ফাটিয়া যায়। ধুনা বিশিষ্ট তৈলও ব্যবহার করা উচিত নহে; ধুনা বিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা পালিষ তৈয়ার করিলে চামড়া জলাভেদ্য হয়; কিন্তু ঐ সকল পদার্থ শুকাইলে শক্ত হয় এবং চামড়া ফাটিয়া যায়। সেই জন্য উহার সহিত গ্লিসারিণ (glycerine) মিশ্রিত করিয়া লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গ্লিসারিণ (glycerine) দ্বারা চামড়া নরম থাকে।

নিম্নে কয়েকটী বিভিন্ন প্রণালী লিখিত হইল ঃ—

১ম। পালিষ ঃ—প্রথমে একটী পাত্রে ৪ আউন্স টুকরা সিরিষের সহিত ১ পাইণ্ট সির্কা (venegar) মিলাইয়া কিছুক্ষণ রাখিলে উহা গলিয়া নরম হইয়া যাইবে। অন্য একটী পাত্রে আধ পাইণ্ট ইংরাজী কাল কালীতে ২ আউন্স গঁদ ভিজাইতে হইবে। এক্ষণে প্রথম পাত্রটীর সিরিষের সহিত অল্প উত্তাপে আবার আধ পাইণ্ট সির্কা মিলাইলে যখন উহা সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যাইবে তখন দ্বিতীয় পাত্রটীর গঁদ ও কালী উহাতে ঢালিয়া দিবে এবং উত্তাপ ১৮০ ডিগ্রী রাখিয়া সামান্য জলের সহিত ২ ড্রাম মৎস্য সিরিষ উহার সঙ্গে মিলাইতে হইবে। তাহার পর উত্তাপ বন্ধ করিয়া শীতল হইলে কার্য্যোপযোগী হইবে।

স্পঞ্জের দ্বারা অল্প পরিমাণে চামড়ায় লাগাইতে হয়। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া তারপর ঘষিলে চামড়া উজ্জ্বল হইবে।

২য় কালি ঃ—২ আউন্স মেষ চর্ব্বি এবং ৬ আউন্স মোম একত্রে গলাইয়া উহাতে ৬ আউন্স মিছরি, ২ আউন্স নরম সাবান, ২½ আউন্স ভূষা ও ½ আউন্স নীলের গুঁড়া উত্তমরূপে মিলাইতে হইবে। শেষে ½ পাইণ্ট টার্পিন তৈল মিলাইতে হইবে।

৩য় কালি ঃ—(ক) ১ পাউণ্ড মোম ৪ আউন্স হাড়ের কয়লা, ১ আউন্স প্রসিয়ান নীল একত্রে, ২ আউন্স তিসি তৈল, ৩ আউন্স টার্পিন তৈল ও ১ আউন্স কোপ্যাল বার্ণিশের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মিলাইতে হইবে, এইগুলি সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হওয়া আবশ্যক এবং গরমথাকিতে থাকিতে পিষ্টক করিয়া রাখা উচিত।

(খ) গরম থাকিতে থাকিতে উহার সঙ্গে ৪ আউন্স নরম সাবান এবং ৬ আউন্স টার্পিন তৈল মিলাইলে ভাল হয়।

৪র্থ—জলাভেদ্য কালি ঃ—একটি মসৃণ পাত্রে ২ আউন্স কালধুনা অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া উহাতে ৩ আউন্স মোম মিলাইতে হইবে। ইহাও যখন গলিয়া ধূনার সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে তখন উত্তাপ বন্ধ রাখিয়া উহার সহিত ½ আউন্স ভাল কজ্জল ও ½ ড্রাম প্রসিয়ান নীলের গুঁড়া উত্তমরূপে নাড়িয়া মিলাইতে হইবে। শেষে উহাতে টার্পিন তৈল এরূপ পরিমাণে মিলিত করিতে হইবে যাহাতে উহা পাতলা কাই অবস্থায় পরিণত হয়।

ইহা একটি স্পঞ্জের দ্বারা চামড়ায় লাগাইয়া শেষে নরম তুলি বা ব্রসের দ্বারা ঘসিলে চামড়া উজ্জ্বল ও জলাভেদ্য হইয়া থাকে।

৫ম কালি ঃ—

মৎস্যসিরিষ	¼ আউন্স
উত্তম গুঁড়ানীল	¼ আঃ
নরম সাবান	৪ আঃ
সিরিষ	৫ আঃ
লগউড্ (Log wood)	৪ আঃ
সির্কা	২ পাইণ্ট
হাড়কয়লার গুঁড়া	½ আঃ
মোম	১ আঃ

প্রথমে লগউডের সহিত সির্কা মিলাইয়া অল্প উত্তাপ দিলেই ঐ সির্কা লাল হইয়া যাইবে; তারপর উহা ছাঁকিয়া সির্কার সঙ্গে অন্য অন্য উপকরণ মিলাইলে উত্তমরূপ মিশ্রিত হইয়া যাইবে। শেষে প্রস্তর কিম্বা কাচের শিশিতে রাখিতে হইবে।

৬ষ্ঠ কালি ঃ—প্রথমে ৪ আউন্স মেষচর্ব্বি ও ১২ আউন্স মোম একত্রে গলাইয়া ইহার সহিত ১২ আউন্স মিছরি ৪ আউন্স নরম সাবান (ইহা অল্প

জলে মিলাইয়া লইতে হইবে) এবং ২ আউন্স সূক্ষ্ম গুঁড়া নীল উহার সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া শেষে ½ পাইণ্ট টার্পিন তৈল দ্বারা পাতলা করিয়া লইতে হইবে।

এই কালি প্রতিসপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া তুলি দ্বারা চামড়ায় লাগাইয়া ঘষিলে উহা উজ্জ্বল মজবুত এবং স্থায়ী হয়।

৭ম কালি ঃ—

গুড়	৮ আউন্স
কজ্জল	১ "
মদের ফেণা	১ ড্রাম
মিছরি	১ আউন্স
জলপাই তৈল	½ "
মৎস্যসিরিষ	১ "
গঁদ ট্রাসাকান্থ	১ "

একত্র করিয়া ইহার সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণ গো-পিত্ত ও ২ পাইণ্ট পুরাতন বিয়ার মদ মিলিত করিয়া ১ ঘণ্টা অগ্নির উত্তাপের নিকট রাখিতে হইবে।

৮ম কালি ঃ—কাল গালার ৩টি বাতি ½ পাইণ্ট সুরাসারে গলাইয়া গাড়ীর সাজের নিমিত্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অধিক পরিমাণে কিম্বা শীঘ্র শীঘ্র লাগান উচিত নয়, কারণ চামড়া ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

৯ম কালি ঃ—ময়লা চামড়া পরিষ্কার এবং কার্য্যোপযোগী করিবার কালি।

ষ্টিয়ারিণ	৪½ আউন্স
টার্পিন	৬¾ "
হাড় কয়লা	৩ আউন্স

প্রথমে ষ্টিয়ারিণ পিটিয়া পাতলা পাত করিয়া তারপর টার্পিন মিলাইয়া উত্তমরূপে নাড়িতে নাড়িতে জলের উত্তাপ গরম করিতে হইবে, শেষে কয়লা মিলাইয়া উহাকে অপর একটি পাত্রে ঢালিয়া ক্রমাগত নাড়িতে হইবে যাহাতে জমিয়া যাইতে না পারে।

ব্যবহারের পূর্ব্বে গরম করিয়া লওয়া আবশ্যক। একখণ্ড কাপড়ের দ্বারা চামড়ায় শীঘ্র শীঘ্র পাতলা করিয়া লাগান উচিত। শুকাইলে কাপড়ের দ্বারা ঘষিলেই ময়লা চামড়াও উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার হয়।

১০ম কালি ঃ—

গুড়	৮ ভাগ
কজ্জ্বল	১ "
Sweet oil	১ "
গঁদ	১ "
মৎস্যসিরিষ	১ "
জল	৩২ "

একত্র করিয়া উত্তাপে গলাইয়া শীতল হইলে ১ আউন্স সুরাসার মিলাইতে হইবে।

ব্যবহারের পূর্ব্বে আবশ্যক হইলে গরম জলে বসাইয়া গরম করিতে হয়।

১১শ ঃ—জলাভেদ্য তরল পালিশ—

(ক) ১ আউন্স রবারের টুকরা ১ পাইণ্ট সিদ্ধ তৈলে অগ্নির উত্তাপে মিলাইতে হইবে। শেষে আর এক পাইণ্ট উত্তপ্ত সিদ্ধ তৈলের সহিত নাড়িয়া লইবে।

(খ)	সিদ্ধতৈল (Boiled oil)	১ পাইণ্ট
	মোম	২ আউন্স
	হরিদ্রাবর্ণ ধুনা	২ "

একত্রে গলাইয়া লইতে হয়।

(গ)	স্যালাড তৈল	১ পাইণ্ট
	মেষ চর্ব্বি	৪ আউন্স
	স্পার্মাসেটাই	১ "
	সাদা মোম	১ "

একত্রে গলাইতে হয়।

(ঘ)	কার্ব্বন বাইসলফাইড	২ আউন্স
	গটাপার্চা	½
	শিলাজতু	২ "
	ব্রাউন আমবার (Brown amber)	½ "
	তিসি তৈল	১ "

প্রথমে গটাপার্চা কার্ব্বন বাইসালফাইতে এবং শিলাজতু ও amber তৈলে গলাইয়া তারপর উভয়ে একত্রে উত্তমরূপে মিলাইতে হয়।

১২ শঃ—জলাভেদ্য পালিস—

সুরাসার (৯৪)	১ গ্যালন
ভিনিস টার্পিন	১ পাঁউণ্ড
মেদি মোম (myrtle wax)	৪ আউন্স
গম সেলাক	১ পাউণ্ড
গ্লিসারিণ	১ "

উত্তম কজ্জল (or Ivory black)—রং এবং ঘন করিবার মত।

প্রথমে সুরাসারে গঁদ সিদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে মিলাইতে হইবে। কিয়ৎ পরিমাণ গ্লিসারিণের সহিত মোম গুড়াইতে হইবে এবং কিয়ৎ পরিমাণের সহিত কজ্জল গুঁড়াইয়া ঐ সুরাসারের সহিত উত্তম রূপে মিশ্রিত করিতে হইবে।

পরিষ্কার রেড়ির তৈল গ্লিসারিণের সহিত মিশ্রিত করিলেও চলিতে পারে কিন্তু পালিশ তত উজ্জ্বল হয় না।

১৩ শঃ—সাধারণ চলিত তৈল—

৩ পাউণ্ড গো চর্ব্বি একটী পাত্রে রাখিয়া ১ পাউণ্ড গোক্ষুর তৈল (neats foot oil) ক্রমে ক্রমে ঢালিয়া অল্প উত্তাপে গলাইতে হইবে। ইহা যে পর্য্যন্ত না শীতল হয় উত্তমরূপে নাড়া আবশ্যক। ইহাতে রং করিবার নিমিত্ত অল্প পরিমাণে কজ্জল বা ভূষা মিলাইতে পারা যায়।

১৪ শঃ—বিলাতি বল পালিষ—

(ক) পরিষ্কৃত চর্ব্বি (lard)	১ আউন্স
মোম	১ "
Ivory black	৮ "
চিনি	৮ "
তিসি তৈল	৪ "
জল	২।৩ "
(খ) Ivory black	৪ আউন্স
প্রসিয়ান নীল	২ "
মোম	৮ "
টার্পিণ স্পিরিট	২ "
কোপ্যাল বার্ণিশ	১ "

প্রথমে মোম গলাইয়া অন্যান্য উপাদান মিলাইতে হয়। শীতল হইলে গোলাকার করিয়া রাখিতে হয়।

ভারতে উচ্চ শিক্ষা।

দি নাইণ্টিস্থ সেঞ্চুরি য়্যাণ্ড আফ্‌টার নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় মান্দ্রাজের খৃষ্ট-ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় এক বৎসর পূর্ব্বে ভারতে উচ্চ শিক্ষা নামে একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার প্রবন্ধে আমরা খৃষ্টিয় জনোচিত সঙ্কীর্ণতা না দেখিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। আমরা নিম্নে তাঁহার প্রবন্ধের ভাবানুবাদ দিলাম।

ইংরাজ সরকার ভারতে যতগুলি বিষয়ের সংস্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যে শিক্ষা-সংস্কারই প্রধান। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের সভায় ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার উন্নতি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিস্তার কার্য্যে ভারত সরকার কায্যতঃ সাহায্য করিবেন। এই আদেশ ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ম্যাগ্না-চ্যার্টা-স্বরূপ। ইহার পর যথাক্রমে ১৮৮২ সালে "ভারতের শিক্ষা-কমিশন" ও ১৯০২ সালে "ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়কমিশন" বসে, এবং ১৯০৪ সালে স-কৌন্সিল বড়লাট ভারতীয় শিক্ষা-প্রথা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করেন। বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় শিক্ষা-প্রথার দুরূহ বিষয়গুলি সমাধানের জন্য কত চিন্তাশক্তিও পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা এই সব উদ্যম হইতে অনেকটা বুঝা যায়।

১৮৫৪ অব্দের পূর্ব্বে ভারতে শিক্ষা-প্রথা অতি হীন ও ঘৃণিত ছিল বলিলে ভারতবাসীর প্রতি অযথা অন্যায়াচরণ করা হয়। ১৮৮২ সালের মন্তব্যে, বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে ভারতে যেরূপ শিক্ষা প্রথা প্রচলিত ছিল,তাহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার একাংশে এরূপ লিখিত আছে যে, "ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ কাল হইতেই ভারত শিক্ষা গৌরবে সর্ব্বদাই গৌরবান্বিত ছিল।" তিন শত খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস উপস্থিত থাকিতেন, তিনি তদানীন্তন ভারতের গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ সুসভ্য সমাজ, উন্নত দর্শন ও বিজ্ঞানালোচনা দেখিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত

হইয়াছিলেন। সে সময়াবধি ভারতীয় শিক্ষা, রাজ-নৈতিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও, যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে।

১৮৮২ সালের "ভারতীয় কমিশনের" মন্তব্যের একাংশে আমরা নিম্ন-লিখিত কথাগুলি দেখিতে পাই। "ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম-শাস্ত্র দ্বিজগণের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এবং শূদ্র ও সঙ্কর জাতি-সমূহকে কেবল মাত্র সামান্য প্রাথমিক শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। বৌদ্ধ বিপ্লবে ধর্ম্ম ও শিক্ষা অনেকটা সার্ব্বজনীন হইয়া পড়ে। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ ও পালি-গ্রন্থ সমূহই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দের বিরাট মঠে যে শিক্ষা-লয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার ছাত্রবৃন্দের সংখ্যাধিক্য ও আগ্রহাতিশয্য ইউরোপের মধ্যযুগের বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মুসল-মানগণ ভারত জয় করিলে ভারতে মসজিদ নির্ম্মিত হইয়া অন্যান্য মহাম্মদীয় দেশের ন্যায় তাহা শিক্ষা ও সাহিত্যের কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। হিন্দু-মুসল-মান উভয়েরই শিক্ষাপ্রথা ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; এবং তাহা রাজদত্ত উৎসাহ ও সাহায্যে প্রতিপালিত হইত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে চারি প্রকার শিক্ষা-প্রথা প্রচলিত থাকিতে দেখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ গৃহে, টোলে, মাদ্রাসায় ও পল্লী পাঠশালায় ছাত্রগণ শিক্ষিত হইত। পল্লী পাঠশালায় বণিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার ও ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের সন্তানগণ প্রাথমিক শিক্ষা পাইত।

বৃটিশ-শাসনে ভারতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রবেশ লাভ করিয়া বর্ত্ত-মান বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহের উৎপত্তি ঘটাইয়াছে। যে দিন ভারতবাসিগণ বুঝিল যে, ইংরাজী শিখিলে ধনাগমের যথেষ্ট সুবিধা হইবে, সেইদিন হইতে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিয়াছে। জাতীয় উন্ন-তির খাতিরে কেহই ইংরাজীর প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া সরকারী চাকরী পাইলেই ইংরাজী শিক্ষা সার্থক হইত।

সরকারী স্কুল কলেজে শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পশ্চাত্য ভাবা-বলম্বিদিগের অনেক দিন ধরিয়া তুমুল আন্দোলন হয়; কিন্তু অবশেষে ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের প্রভাবে পাশ্চাত্য-ভাবীরাই জয়লাভ করেন। তদ-বধি পাশ্চাত্য জ্ঞান বন্যার ন্যায় ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে ও তাহাতে কি শিক্ষা-প্রথাদি সম্বন্ধে, আর কি শিক্ষিত ভারতবাসীর চিন্তা ও আদর্শ সম্বন্ধে এক নীরব বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে সংস্কৃত টোলে যে সকল ব্রাহ্মণ ছাত্র দশ-পনের বৎসর ব্যাপিয়া নীরস

ব্যাকরণ, ন্যায় ও দর্শনাদি পাঠ করিত, তাহাদের সহিত বর্ত্তমান কালের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাদ-প্রাপ্ত, সেক্সপিয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডওয়ার্থ,বার্ক, মার্টিনো ও হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতির প্রতি অনুরক্ত ছাত্রদের বুদ্ধি বৃত্তিতে যথেষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে আমার কোন বন্ধু বঙ্গদেশের কোন বিখ্যাত টোল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি পণ্ডিত মহাশয়দের বলেন যে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাঁহারা একথার বিরুদ্ধে * কোনরূপ প্রমাণ না দিয়াই তাঁহার কথা ভুল বলিয়া হাঁসিয়া উড়াইয়া দেন। এসব কথার বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে টোলে শিক্ষিত ছাত্রেরা অধুনিক বি, এ, এম ও ছাত্র সমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাপন্ন। কুসংস্কার-বিচ্ছিন্ন লোকমাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, মোটের উপর বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ভারতের অভিশাপ নয়,প্রত্যুত অধিকতর উন্নতিপ্রদ। ১৯০০ সালে ভারত সরকার যথার্থই বলিয়াছেন, প্রায় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিগত অর্দ্ধশতাব্দীতে ভারতে যে শিক্ষা-স্রোত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ভারতের প্রকৃত উপকার হইয়াছে, জ্ঞান স্বপ্নাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থার্জ্জনের কত নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে; আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দেশীয় লোকের সচ্চরিত্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।" †

ভারতে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী এখনও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করে নাই; ইহার পরিণাম এখন সকলের লক্ষ্য স্থলে দাঁড়াইয়াছে। আজকাল ভারতীয় জ্ঞানের বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, কত শত শতাব্দী পোষিত অভ্যাস ও সংস্কারের সহিত নূতন সংস্কারের বিষম সংঘর্ষণ উপস্থিত হওয়ায় পুরাতন ভাব সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এরূপ বৈপ্লবিক যুগে প্রাচ্য জ্ঞানাজ্ঞ ইংরাজ পাশ্চাত্য ভাবাজ্ঞ ভারতবাসীর শিক্ষা সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়ায়, ভারতে জাতীয় পূর্ণাঙ্গি বিকাশের আশা করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু ইহাতে ভারতের নৈতিক ও মানসিক শক্তি বিকাশের ফল সন্তোষজনক না হইলেও আমাদের নিরাশার কোন কারণ নাই।

ধর্ম্মবিচ্যুতিই ভারতের আধুনিক উচ্চ শিক্ষার প্রধান ও প্রথম গলদ।

---

* ইহাতে এমন প্রমাণিত হয় না যে,ভারতবাসিগণ উক্ত বিজ্ঞানে একেবারে অজ্ঞ। ইউরোপের বহু পূর্ব্ব হইতে যে ভারতবাসিগণ ইহা জানেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

† একথার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এরূপ বিচ্যুতি এ যুগেরই নবসৃষ্টি। ১৮৮২ সালের মন্তব্যের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, হিন্দু মুসলমান উভয়েরই শিক্ষাপ্রথা ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং এ কথা ব্রাহ্মণ ও হিন্দুদ্বিজগণের প্রতি সর্ব্বাগ্রে প্রযোজ্য। হিন্দু সভ্যতার প্রারম্ভ কালে ধর্ম্মসেবাই দ্বিজ যুবকগণের শিক্ষার একমাত্র পন্থা ছিল, এবং ব্রাহ্মণগণ চারি প্রকার আশ্রমে ধর্ম্মালোচনা করিয়া জীবনাতিবাহিত করিতেন। (১৮৮২ সালের মন্তব্যের একাংশ)।

আজকাল ইংলণ্ডে যেরূপে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম শিক্ষার তুলনায় কিছুই নয়। ইংলণ্ডে ধর্ম্মশিক্ষা অর্থে আমরা এই বুঝি যে, ধর্ম্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার একটী অঙ্গ মাত্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকে ধর্ম্মশিক্ষা বলে। কারণ, সেখানে প্রতিদিন এক ঘণ্টা করিয়া "বাইবেল" পড়িবার নিয়ম আছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে ধর্ম্ম-শিক্ষাই হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার মূল ছিল, এবং অন্যবিধ শিক্ষা সমূহ তাহারই অংশমাত্র ছিল। শিক্ষকগণ ধর্ম্মভাবে বিভোর ছিলেন। প্রাচীন টোল সমূহে শিক্ষার পরিবর্ত্তে বেতন লওয়া দূরে থাকুক, গুরু ছাত্রদিগকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় বিনা অর্থে আহারাদি দানে পালন করিতেন। জীবিকার্জ্জনের জন্য শিক্ষাদান ঘৃণ্য ছিল। শিক্ষাদান ধর্ম্মকার্য্য বলিয়াই প্রচারিত ছিল ; এজন্যই গুরু অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মনুসংহিতায় দেখা যায় যে, ছাত্র-গণ শিক্ষকের নামোচ্চারণ করিবে না, তাঁহার চালচলনাদির অযথা বা ব্যঙ্গার্থে অনুকরণ করিবে না এবং তাঁহার সমক্ষে মিতাহার করিবে ও রুক্ষ পোষাক পরিধান করিবে ; পাঠের পূর্ব্বে ও পরে গুরুর পাদ বন্দনা করিবে ; তাঁহাকে অশ্রদ্ধা বা অযথা সমালোচনা করিলে পর জন্মে ভয়ানক শাস্তি অবশ্য ভোগ্য। মনু ইহাও বলেন যে, ছাত্রগণ গুরুনিন্দায় গর্দ্দভত্ব, তাঁহার সম্বন্ধে মিথ্যা কথা রটনায় কুক্কুরত্ব, আজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন কার্য্য করিলে কীটত্বও তাঁহার জ্ঞানের হিংসা করিলে ভবিষ্য জন্মে হিংস্র জীবত্ব প্রাপ্ত হইবে।

ছাত্রগণের উদ্দেশ্য ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল। শিক্ষা সমাপনান্তে ধন সঞ্চয় করিয়া বা সহজে জীবিকার্জ্জন করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনে আদৌ উদিত হইত না। মুক্তি বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তিই শিক্ষার সর্ব্বোত্তম উদ্দেশ্য ছিল। মনু বলেন যে, শিক্ষা সমাপন করিতে অন্ততঃ ৩৬ বৎসর লাগে। ইহা হইতেই সহজে অনুমেয় যে, শিক্ষার শেষাংশ অতি অল্প লোকেই শিক্ষা করিত ; কিন্তু সর্ব্বত্রই শিক্ষাকাল ধর্ম্মজীবনের একাংশ বলিয়া

কীৰ্ত্তিত হইত; জীবনের পবিত্রতা ও মুক্তিপ্রদায়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং ছাত্রগণ কেবল বেদ পড়িয়াই ক্ষান্ত হইত না, পরন্তু যোগাদিও শিক্ষা করিত। মনুসংহিতায় দেখা যায় যে, ছাত্রগণ বাহ্যেন্দ্রিয় সুখ-জনক কার্য্যে পরাঙ্মুখ এবং বিলাসিতা-বর্দ্ধনকারী দ্রব্যাদি হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিত। তাহারা মধু কিম্বা মাংস খাইত না। ফুলের মালা বা সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিত না। তৈল মর্দ্দন করিতে বা জুতা ব্যবহার করিতে জানিত না।

প্রাচীন শিক্ষার আদর্শ অতি সুন্দর ও মহৎ ছিল। আধুনিক শিক্ষা সংস্কারে এই পবিত্র আদর্শ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। খৃষ্টান রাজা হিন্দু মুসলমানের শিক্ষাপ্রথা তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মের ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিতে পারেন না। খৃষ্ট ধর্ম্মের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রথার প্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর; এবং তাহা কেবল খৃষ্টানদের জন্যই হইতে পারে। যে দিন ইংরাজ সরকার ভারতবাসীর শিক্ষা দান স্বহস্তে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের পূর্ব্ব আদর্শ লোপ পাইতে লাগিল। হিন্দু মুসলমানকে ধর্ম্মভাব-হীন আর্থিক শিক্ষা দানই তাঁহার পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর। প্রস্তাব হইয়াছে যে, ভারতের সরকারী স্কুল কলেজে নিয়মিতরূপে বাইবেল পড়াইয়া ভারতবাসীদের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগাইতে হইবে। কিন্তু যে ধর্ম্মে তাহাদের আদৌ বিশ্বাস নাই, সে ধর্ম্ম স্কুল কলেজেও শিক্ষা দিলে তাহাদের ধর্ম্মভাব কখনই বর্দ্ধিত হইবে না। ইহাতে কেবল ধর্ম্মবিপ্লবই ঘটাইবে। ধর্ম্ম বিপ্লব সংঘটনে সরকারের আদৌ ইচ্ছা নাই। কিন্তু তাহা যদি থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে যাবতীয় স্কুল কলেজে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম রীতিমত রূপে শিক্ষাপ্রদান করিতে হইত; কিন্তু তাহা হইলেও তাহাতে ধর্ম্ম শিক্ষা না হইয়া ধর্ম্ম বিপ্লবই ঘটিত।

ভারতের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক হইলেও শিক্ষার আদর্শ নষ্ট হওয়ায় আমরা দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারি না। বর্ত্তমান শিক্ষপ্রথা যে প্রাচীন শিক্ষা অপেক্ষা অনেক উন্নত, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ঠিক যেন নির্ব্বাপিত প্রায় আলোকে আলোকিত গৃহ হইতে প্রভাতের উজ্জল আলোকে আগমন। টোল সমূহের ছাত্রগণকে এক জাতীয় বিষয় মাত্র জানিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হয়; কিন্তু আধুনিক বিদ্যালয়ে তাহাদের সম্মুখে প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। ফলে এই দেখা যায় যে, ভারতের একদল

লোক এরূপ বিস্তৃত শিক্ষা পাইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; এবং তাহাদেরজ্ঞান পূর্ব্ব পুরুষগণের অপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করায় জগতের সত্য গ্রহণে আসক্তি বাড়িয়াছে। মোটের উপর ভারতের এ লাভ সুখকর; কিন্তু ইহাই একমাত্র বাঞ্ছনীয় লাভ নহে। ধর্ম্ম ও বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভারতের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার কতকাংশ বর্ত্তমান শিক্ষায় পূরিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যে স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধি-বৃত্তি একবারে লোপ পাইয়াছে, তাহা আজও পূরিত হয় নাই। ১৯০২সালের ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশনের প্রত্যেক সাক্ষই একবাক্যে ভারতের ছাত্রগণের স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যকরী শক্তিহীনতার নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ছাত্রগণ পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশ ব্যতীত অন্য কিছুই শিক্ষা করিতে উৎসুক নহে। কয়েক জন ব্যতীত ভারতের কোন ছাত্রেরই শিক্ষার প্রতি যথার্থ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না; কলিকাতার কোন বিজ্ঞ ইউরোপীয় অধ্যাপক দুইটি অতি সত্যকথা বলিয়াছেন; তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষার ধারণা এদেশীয় ছাত্রদের নাই। তাহারা যেন মনে করে যে, অধ্যাপকগণ কেবল তাহাদের সুবিধার জন্য অধ্যয়ন-নিরত থাকিবেন, আর তাঁহারা তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের সারমর্ম্ম লেখাইয়া দিবেন ও ছাত্রগণ তাহা মুখস্ত করিয়া পরীক্ষা-সাগর পার হইবে। অভিভাবক ও ছাত্রগণ উভয়ের মধ্যে শিক্ষার যথোচিত ব্যবহার আদৌ দেখা যায় না, বরং শিক্ষার অপব্যবহার দৃষ্ট হয়।

শিক্ষার যথোচিত ব্যবহারে মনোযোগ না দেওয়ায় অধিকাংশ ছাত্রেরই বিদ্যালয়লব্ধ জ্ঞানের বিকাশ আদৌ হয় না। যে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য মুখস্থ বিদ্যার সহায়তা করে, ছাত্রগণ সেই বিদ্যালয়ের দিকেই ঝুকিয়া পড়ে, এবং যেখানে প্রকৃত শিক্ষা দান হয়, সেখানে কাহাকেও যাইতে বড় দেখা যায় না; যে বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয়, সে বিদ্যালয়েরও শিক্ষাদান অরণ্যে রোদনবৎ। যদি আধুনিক ছাত্রগণ তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় ধর্ম্মভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিত, প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্তিই যে জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চ্চার একমাত্র উদ্দেশ্য,ইহা বুঝিতে পারিত, তবে ভারত আজ আবার শিক্ষা গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিত। সুতরাং ভারতের স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধি-বৃত্তি যতই লোপ পাউক না, ধর্ম্মচ্যুতিই তাহার এ সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। একথা সত্য যে, সর্ব্বপ্রকার সত্য ও প্রকৃত জ্ঞানে চরিত্রের অভিনব উন্নতি হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাও সত্য যে, আধুনিক

বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষাপ্রথা ধর্ম্মভাব হইতে পৃথগ্‌ভূত। ৩০ কোটি ভারতবাসীকে উন্নতির স্রোতে ভাসাইতে পারে, এমন একটি নৈতিক শক্তির (moral force) অভাব এখন সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল ত্রুটিই ভারবাসীর নিজেরই চরিত্রগত। এ ত্রুটি যতদিন না দূরীভূত হইবে, ততদিন সকল রূপ উন্নতি সুদূর-পরাহত। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতায় অবস্থান কালে শিক্ষাবিভাগের একজন নেতার সহিত আমার কথাবার্ত্তা হয়। তিনি বলেন আমরা কতকগুলি এম, এ বা বি, এ চাইনা, কিছু অর্থ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, এমন কতকগুলি সচ্চরিত্র লোকের বিশেষ অভাব দেখা যাইতেছে। অবশ্য এ মন্তব্য বিদ্রূপাত্মক, এবং অন্যান্য মন্তব্যের ন্যায় অত্যুক্ত ; কিন্তু তাহা হইলেও ইহার মধ্যে যে একটু সত্য নিহিত আছে, তাহা কোন ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্কারক অবহেলা করিতে পারেন না। ভারতবাসীর চরিত্রের সংশোধন ও উন্নতি সাধনই এখন প্রত্যেক রাজনৈতিক ও শিক্ষিতের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যদি কার্য্যে সাফল্য না ঘটে, তবে ভারতের কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রথায় ধর্ম্ম-বিচ্যুতিই চরিত্র-হীনতার একমাত্র কারণ। কেবলমাত্র আর্থিক জ্ঞান কোন জাতিরই শক্তি প্রদায়ক নহে। প্রমাণের জন্য জাপানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাপানে ধর্ম্মশক্তি স্বাদেশিকতার দ্বারাই পরিপোষিত,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দ্বারা নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বাদেশিকতার স্রোতকে কার্য্যকরী ও শক্তিশালী করিয়াছে, এই মাত্র। কিন্তু ভারতে স্বাদেশিকতা বলিয়া কোন আকর্ষণ দেখা যায় না। ভারতের নব অভ্যুদয়ের জন্য স্বাদেশিকতার প্রতি দৃষ্টি করিলে বড়ই নিরাশ হইতে হয়। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ কাল হইতেই দেখা যায়, ভারতে ধর্ম্মশক্তিই একমাত্র কার্য্যকরী। তিন হাজার বৎসরেরও বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসীর জীবন ধর্ম্মোপাদানে নির্ম্মিত হইতেছে। ভারতের ইতিহাস কেবল ধর্ম্ম-চিন্তা ও ধর্ম্মভাবেই পূর্ণ। যদিও ইহার ভবিষ্যৎ বলা নিষ্ফল ও নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, তথাপি বোধ হয়, বলিলে দোষ হইবে না যে, কেবল ধর্ম্মের উপরেই ভারতবাসীর চরিত্র নির্ভর করিতেছে ও ধর্ম্মের বিপ্লবে তাহার চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইবে। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিকের বা শিক্ষাভিমানীর উপর নির্ভর না করিয়া ধর্ম্মযাজকদিগের উপরই নির্ভর করিতেছে।

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আর একটি প্রধান গলদ এই যে, প্রয়োজনের অনুরোধে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে সর্ব্ববিধ জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে অনেক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী সাক্ষী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ভারতীয় ছাত্রের ইংরাজী শিক্ষার অসম্পূর্ণতার অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ছাত্রগণের প্রথম অসুবিধা এই যে, তাহারা বক্তৃতা বুঝিতে পারে না। এ অসুবিধা শীঘ্র সংশোধিত হয় সত্য; কিন্তু বক্তৃতা বুঝিবার অক্ষমতাই তাহাদের প্রধান অসুবিধা নহে; ইংরাজীতে চিন্তা করিতে বা মনোভাব প্রকাশের অসুবিধাই সর্ব্বপ্রধান; মুখস্থ বিদ্যার প্রতি অতিমাত্র অনুরাগ ভারতীয় ছাত্রের স্বাভাবিক দোষ। অধীত বিদ্যা ইংরাজীতে প্রকাশ করিবার জন্য তাহা তাহাদিগের মুখস্থ করিতে হয়। দর্শন, ন্যায় বা ইংরাজী সাহিত্য প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট পাঠটী মুখস্থ করিবার বা শিক্ষাদত্ত সারাংশটী মনে রাখিবার প্রথা ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়।

ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই ভারতবাসীর উপরোক্ত দোষ বৃদ্ধি করিয়াছে। স্বাধীন চিন্তা বা সমালোচনার ক্ষীণশক্তি পুনঃপ্রকাশ কালেই বৈদেশিক ভাষার গুরু চাপে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে। সত্য, বিশ্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণ কয়েকজন সর্ব্বোত্তম ছাত্র সকল প্রকার অসম্পূর্ণতা সংশোধন করিয়া অতি সুন্দর ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই বৈদেশিক ভাষায় বৈদেশিক ভাব প্রকাশ করার অসুবিধা অতিমাত্র অনুভব করে। ফল এই যে, সাধারণ ছাত্রগণ কতকগুলি বিষয় না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া রাখে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হয় না। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে আমি একবার দাক্ষিণাত্যের কোন মিশন কলেজ পরিদর্শনে গিয়াছিলাম; আমার অভিনন্দনের জন্য ও তাহাদের মৌলিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দিবার জন্য উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্র-বৃন্দ একটী বিতর্ক সভা আহ্বান করে। আমি সে সভার সভাপতি বরিত হইয়াছিলাম; আমি এখানে তাহাদের শিক্ষার অসম্পূর্ণতা বেশ হৃদয়ঙ্গম করি। ছাত্রদের এরূপ অসম্পূর্ণতা তাহাদের কার্য্যকরী জীবনে প্রায়ই দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বহুল জ্ঞান সঞ্চয় করে সত্য, কিন্তু তাহারা তাহা যথোচিত ভাবে ব্যবহার করিতে শিখে না। মৌলিকতাই তাহাদের প্রধান অভাব; কিন্তু যতদিন না তাহারা মাতৃভাষায় চিন্তা করিবার অবসর পাইবে, ততদিন এ মৌলিকতার আশা নিরাশা মাত্র। ছাত্রগণ যদি ইংরাজী না শিখিয়া লাটিন কিম্বা জর্ম্মাণ ভাষা শিখিত, তাহা হইলেও তাহাদের

এ মৌলিকতার অসম্পূর্ণতা থাকিত। ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদান বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য্যতঃ অসম্ভব হওয়ায় তজ্জাত এ দোষ সংশোধন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এখানে ইহা উল্লেখ যোগ্য যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাহায্যে জাপানে যে ফল উদ্ভূত হইয়াছে, ভারতে তাহার কিছুই হয় নাই। ভারতে যত উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, জাপানে তত উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু জাপানীরা যাহা শিখে, তাহা তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশ হইতে তাহারা যে যে জ্ঞান পাইতে পারে, তাহা তাহারা অসংলগ্নভাবে মুখস্থ করে না, তাহা তাহাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করে। এজন্যই তাহার ফল অতি শীঘ্র তাহার জাতীয় জীবনে পরিদৃষ্ট হইতেছে। এরূপ শিক্ষা ভারতের কুত্রাপি দেখা যায় না। সত্য, এ প্রভেদের অনেক কারণ নির্দ্ধারণ করা যায়; কিন্তু জাপানীরা যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান প্রথমাবধি মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিতেছে ও তাহাতেই যে তাহাদের এ উন্নতি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এজন্যই তাহারা ভারতবাসী অপেক্ষা অতি সুন্দর ও বিশদরূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝিতে ও আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছে।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের দ্রুত উন্নতিই তৃতীয় অসুবিধা। ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় ছাত্রসংখ্যা অতি অল্প। কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ ও লাহোরে এক একটী বিশ্ব বিদ্যালয় আছে। ১৯০১ সালে মাত্র ৭,৯৫৩ ছাত্র ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহ হইতে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; আবার ইহাদের অনেকেই পরবর্ত্তী পরীক্ষায় উপস্থিত হয় নাই। ১৯০২ সালের কমিশনের একজন সাক্ষী বলেন যে, তিনি "ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডার হইতে অঙ্ক কসিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ তিন হাজার ছাত্রের মধ্যে প্রায় এক হাজার মাত্র ছাত্র পরবর্ত্তী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে, বি এ'র ছাত্র সংখ্যা আরও অনেক কম। তবেই দেখা যায় যে, প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে প্রায় চারি হাজার মাত্র ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধির জন্য পাঠ করে; ত্রিশ কোটী লোকের তুলনায় এ সংখ্যা কিছুই নয়। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য এই অল্প সংখ্যাই যথেষ্ট হইতে পারে। আমার মনে হয়, তিন ভাগের দুই ভাগ অন্ততঃ অর্দ্ধেক ছাত্রের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধির জন্য পাঠ না করাই উচিত, একথা বলিলে অত্যুক্তি দোষ হয় না। আমি আমার বহুদর্শিতার ফলে জানি যে,

শতকরা ৬০ জন ছাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কি সাহিত্য, কি দর্শন, প্রত্যেক শিক্ষার একান্ত অনুপযোগী। তাহারা কিছুতেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইতে পারে না; এবং তাহা তাহাদের ভবিষ্য জীবনেও কোন কাজে আসে না। তাহাদের অনেকেই সরকারী বা ব্যবসায়ীর আফিসে কেরাণী হয়; অতি অল্প-সংখ্যক ছাত্রই শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে। বিশ্ব-বিদ্যালয় সমূহএরূপ অনুপযুক্ত ছাত্র-বৃন্দের দ্বারা পূর্ণ থাকায় তাহাদের পরিণাম সহজেই অনুমেয়। শিক্ষপ্রণালী অধিকাংশের উপযোগী করা হয়, কিন্তু তাহা শিক্ষা করিতে তাহারা একেবারেই অনুপযুক্ত। আবার যেমন শিক্ষা প্রণালী, পরীক্ষা প্রণালীও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ পরীক্ষা একরূপ নিষ্প্রয়োজন ও নিস্ফল। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি করিতে হইলে ছাত্র-সংখ্যা কমাইতে হইবে, নতুবা, সাধারণ ছাত্রগণ হইতে উৎকৃষ্ট ছাত্রগণকে পৃথক্ করিতে হইবে। এই সংস্কার সাধনের সহজ উপায় এই যে, প্রতি বিভাগে বিভিন্ন "অনার কোর্স" স্থাপন করা। ১৯০২ সালের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কেন যে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, কমিশন এরূপ বিভাগের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ও এই দুইটী প্রয়োজনীয় বিভাগকে একত্র রাখিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু ইহা অতি সত্য যে, উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ বিভিন্ন ভাবে শিক্ষিত হইলে ভারত আবার নূতন চিন্তা ও জ্ঞানে জগৎকে মুগ্ধ করিতে পারিত।

কদলী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কদলীর গুণাগুণঃ—প্রথমে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে।

কাঁচাকলাঃ—মধুর-রস, বিষ্টম্ভী, শীতবীর্য্য, কফঘ্ন, গুরু ও স্নিগ্ধ-কারক।

থোড়ঃ—যোণিদোষহরঃ দন্তঃকদল্যো স্থগ্‌দরং জয়েৎ।
রক্তপিত্তহরং শীতঃস্বরুচ্যোঽগ্নি প্রবর্দ্ধনঃ॥

মোচা—কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বাত পিত্ত হরং শীতং রক্তপিত্ত ক্ষয় প্রণুৎ॥

থোড়, মোচা ও কাঁচকলার তরকারী হইয়া থাকে। কিন্তু কচি থোড় ও

ডগরের মোচার তরকারী অতি উপাদেয় ও উপকারী; বিশেষতঃ থোড় অগ্নিবর্দ্ধক ও রুচিকারক। আমেরিকার অনেক প্রদেশে কলা একটি প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। জ্যামেকা দ্বীপস্থ গরীব লোকদিগের কলাই একমাত্র খাদ্য। আমেরিকা, আফ্রিকা এবং আরও অনেকানেক দেশে বিশেষত; বোম্বাই অঞ্চলে কলা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া প্রস্তুত করিয়া রাখে এবং ঐ গুঁড়া হইতে আমেরিকায় বিস্কুট প্রস্তুত হয়। দুই একটী পেটেণ্ট্ খাদ্য এই গুঁড়া হইতে প্রস্তুত হয়। অনেকানেক ডাক্তার এইরূপে প্রস্তুত কলার পালোকে শিশু, রুগ্ন ও সদ্য-প্রসূতা স্ত্রীলোকের পক্ষে বলকারক ও উপকারী খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। কলার পালো প্রায় চাউলের ন্যায় পুষ্টিকর। ডাক্তার হম্‌বোল্ট (Humboldt) বলেন, কোন ক্ষেত্রে গমের চাষে যে পরিমাণ লোকের খাদ্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে, কলার চাষে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক লোকের খাদ্য উৎপন্ন হয়। খোসা ছাড়াইয়া লম্বালম্বি ভাবে কাটিয়া টুকরা করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া রাখিলে কলা নষ্ট হয় না। ভালরূপ শুষ্ক হইলে তাহাকে গুঁড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। খোসা ছাড়াইবার কিম্বা টুকরা করিবার জন্য ইস্পাত কিম্বা লৌহ ব্যবহার করিলে রং ময়লা হইয়া যায়। ডাক্তার লিণ্ডলি (Lindley) শুষ্ক কলা ১৬ বৎসর রাখিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহার কিছুমাত্র বিকৃতি হয় নাই। কলার গুঁড়ার রং ঈষৎ পিঙ্গল; ইহার একটু সুগন্ধ আছে, গরম জলে মিশ্রিত করিলে এই গন্ধ বেশ পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা জল মিশাইলে ইহা ময়দার ন্যায় একটু আটাল হয়। ইহা রুটির ন্যায় করিয়া ভাজিলে বেশ খাওয়া যায়। কলাও আলুর রাসায়নিক উপাদান প্রায় একরূপ; কলার পালো ও চাউলের উপাদানও প্রায় তুল্যরূপ। অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কলায় আলু অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর পদার্থ থাকে। আমাদের দেশে একথা প্রায় কাহারও অবিদিত নহে। বোম্বাইবাসীরা পাকাকলার খোসা বাদ দিয়া পাতলা পাতলা করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখে এবং তাহা হইতে একপ্রকার সুন্দর মোরব্বা প্রস্তুত করিয়া রাখে। সাধারণতঃ কলা সম্পূর্ণ পাকিবার পূর্ব্বে তাহা হইতে পালো প্রস্তুত করা হয়। বোম্বাই বাসীরা কলার আর এক প্রকার নূতন সামগ্রী তৈয়ার করিয়া থাকে; পাকাকলা উত্তম রূপে মজিলে খোলা ছাড়াইয়া সারাদিন রৌদ্রে শুকায় এবং রাত্রে ঘৃত মাখাইয়া কলাপাতা চাপা দিয়া গৃহ মধ্যে রাখে; যত দিন না কলাগুলি বেশ শুকাইয়া যায় ঐরূপ

করিয়া থাকে। এইরূপে প্রস্তুত কলা অনেক দিন থাকে এবং খাইতেও মন্দ হয় না। আমাদের দেশের সাধারণ কলার আঁশ ম্যানিলা শণের (Manilea Hemp—Musa Teatilis) অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট সুতরাং ইহাতে দড়ি কাছি প্রভৃতি ভাল প্রস্তুত হইতে পারে না; কিন্তু ইহাতে সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। কতক জাতীয় অপক্ক কলার খোসা হইতে একরূপ কাল রং প্রস্তুত হয়। শুষ্ক কলাবাসনা ও পাতা পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত হয়; ইহা সাজি মাটীর (Fuller's Earth) পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

কলাগাছের রকমারি।

১। কদলী পুষ্প—বড় টবের নীচে যে ছিদ্রটী থাকে, সেটীকে আরও একটু বাড়াইয়া দিয়া তাহার মধ্যে ৭।৮ অঙ্গুল আন্দাজ মাটী ভরিয়া তাহাতে একটী চাঁপা কলার ক্ষুদ্র তেউড় (Sucker) পুতিবেন ও মধ্যে মধ্যে একটু জল দিবেন। চারাটী বেশ সতেজ হইলে তাহার সমুদায় পাতাগুলি কাটিয়া দিয়া একটী অনুচ্চ মাচায় টবটী স্থাপন করিবেন। পাতাগুলি গজাইলে পুনরায় কাটিয়া দিবেন। ৫।৭ দিনের মধ্যেই টবের নিম্ন দেশ দিয়া শিকড় নামিতে দেখা যাইবে; তাহাতে প্রত্যহ দুই তিনবার করিয়া জলের ছিটা দিবেন; কিছু দিন পরে যখন পাত-মোচা বাহির হইবে, তাহার ডগাটি ছাঁটীয়া দিবেন পরে যে মোচাটী দেখা যাইবে সেটি ঊর্দ্ধমুখী হইয়া ফুটিয়া একটি ছত্রবৎ বৃহৎ পুষ্পাকারে পরিণত হইবে।

২। লতানে মোচা—বাগানের একটু পরিষ্কার স্থানে একটি যে কোনও জাতীয় কলাগাছ পুঁতিয়া রাখিবেন। কিছুদিন পরে যখন তেউড় গজাইবে তাহাদিগকে সাবধানে উপড়াইয়া দিবেন এবং সেই সময়ে বড় গাছটীর কেবল মাত্র একহাত আন্দাজ গোড়া রাখিয়া বক্রি গাছটী কাটিয়া ফেলিবেন এবং প্রত্যহ ঐ গোড়াটীতে এক কলসী জল ঢালিবেন। ঐ গোড়া গজাইয়া একহাত উঠিলেই পুনরায় পূর্ব্বকল্পিত স্থানে কাটিয়া দিবেন এবং জল ঢালা চলিতে থাকিবে। এমতে পুনঃ পুনঃ কাটিতে কাটিতে গাছটীর বৃদ্ধি শেষ হইয়া গেলে, অবশেষে থোড় সমেত মোচা দেখা দিলে আর কাটিতে হইবে না। এই সময় গোড়াটী মাটী দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া দিবেন। এদিকে আবরণ-বিহীন থোড়টী মোচার ভারে ঊর্দ্ধে গজাইতে না পারিয়া মাটীর উপর হেলিয়া পড়িয়া লতাইয়া লতাইয়া বাড়িতে থাকিবে।

৩। এক গাছে চারি কাঁদি—চারিটী এক মাপের তেউড় (বিভিন্ন জাতীয় হইলে ক্ষতি নাই) পিণ্ডমূল সমেত উত্তোলন পূর্ব্বক গাছগুলি বাদ দিয়া কেবল মাত্র এঁটেগুলির প্রত্যেকটীকে উর্দ্ধাধোভাবে চারি খণ্ড করিয়া ফেলিবেন। তৎপরে প্রত্যেকটীর এক একটী টুকরা একত্র করিবেন, একটু সতর্কভাবে একত্র করা আবশ্যক, যেন প্রত্যেক টুক্‌রা অপর টুক্‌রার গায়ে সমানভাবে (ফাঁক না থাকিয়া) লিপ্ত হইয়া একটি গোটা এঁটে তৈয়ার হয়। তৎপরে ঐ গোটা এঁটেটির মাথা বাদে অপর সমস্ত অংশটী দৃঢ়রূপে পাট দিয়া জড়াইয়া গোময় লেপিয়া দিবেন। চারিটী তেউড় একমাপের হইলে তাহাদিগের টুক্‌রা মিলাইবার বড়ই সুবিধা হয়। তৎপরে একটু ভাল জায়গায় একটি এক হাত গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার কিয়দংশ পচা খড়ে পরিপূর্ণ করতঃ তদুপরি ঐ এঁটেটি বসাইয়া মাটী চাপা দিবেন। ঐ এঁটে হইতে কিয়ৎ দিন মধ্যে একটি মাত্র তেউড় জন্মিবে এবং এক বৎসরের মধ্যে বৃক্ষটীর চতুর্দ্দিক হইতে চারি জাতীয় * চারিটী মোচা দেখা যাইবে। মোচা নির্গত হইবার পূর্ব্বে যখন পাতমোচা দেখা দিবে, সেই সময় গাছের ডগাটী একটু দড়ী দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দেওয়া এবং মোচার ভারে গাছটী না পড়িয়া যায় সেজন্য একটু সতর্ক ভাবে ঠেক্‌না দেওয়া আবশ্যক। এটি করিতে পারিলে বড়ই আনন্দপ্রদ হয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এল্ সি পি এস্।

কার্ব্বন পেপার।

আমরা দিন দিন যতই উপায়হীন এবং গরীব হইয়া পড়িতেছি, ততই আমাদের অভাব মোচনের চেষ্টা কথঞ্চিৎ পরিমাণে বলবতী হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের শুভফলে লোকের একটু চক্ষু ফুটিয়াছে; সুতরাং দেশের লোকে, দেশীয় বিলুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার এবং পাশ্চাত্য জাতির অভিনব শিল্পের অনুকরণ চেষ্টায়, সচেষ্টিত ভাবে চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছেন; কিন্তু এদেশের শিক্ষার দোষে, লোকে কেবল বিলাতী চাক্‌চিক্যে মতিভ্রান্ত; নিজ দেশে প্রায় কেহই শিল্পবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা

* বা যে যে জাতীয় এঁটে গৃহীত হইবে।

লাভ না করিয়া অতি ঘোর দুর্দ্দিনের মধ্যে পড়িয়া আজিকালি সেই পথে ছুটিতেছেন! তাই আমরা সময়ের ভাবগতিক বুঝিয়া দুই চারিটী ছোট ছোট শিল্প কাজের অবতারণা পূর্ব্বক লোকশিক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইংরাজ রাজত্বের আমলে আমাদের লেখাপড়া, আফিস, আদালত, গৃহসজ্জা ইত্যাদিতে নানাবিধ দৈনিক আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীরও বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব শীর্ষস্থিত সামান্য শিল্পটী প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে, বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন হইতে পারে। ইহাতে খরচাও তাদৃশ অধিক নহে। প্রস্তুত প্রণালীও তত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না। পাঠকগণ সর্ব্বদা ডাকঘর, সওয়াদাগরি আফিস, রেলওয়ে আফিস প্রভৃতি স্থানে যে কালিমাখান কাগজ, কেরাণী ও পোষ্টমাষ্টার বাবুদিগকে খাতা পত্রের মধ্যে ব্যবহার করিতে দেখিয়া থাকেন, তাহাকেই "কার্ব্বনিক্ পেপার" বলে।

প্রস্তুত প্রণালী।

(১) ল্যাম্প ব্লাক (ভূষাকালী) ২ ভাগ

(২) গ্রাফাইট্ ১ ঐ

(৩) সাল্ফিউরিক্ ইথার, কিঞ্চিৎ পরিমাণ

(৪) খস্খসিয়া কাগজ প্রয়োজন মত (অর্থাৎ সাদা বালি, শ্রীরামপুর প্রভৃতি কাগজ হইবে।) মসৃণ কাগজে ইহা প্রস্তুত হইতে পারিবে না। কারণ ঐ প্রকারের কাগজকে কালিময় করিলে সেই কাগজের উপর সাদা কাগজ রাখিয়া লিখিলে উপরের কাগজে, পেন্সিলের দাগ পড়া অসম্ভব।

প্রস্তুত করিবার সময়, প্রথমতঃ গ্রাফাইটের সহিত ধীরে ধীরে Lamp Blackকে মিশাইয়া ঐ কাগজে উত্তমরূপে মাখাইয়া লইয়া ঐ কাগজকে পুনরায় "ইথারে" ডুবাইয়া লইয়া প্রখর রৌদ্রে অথবা অতি সাবধানতার সহিত উপযুক্ত উত্তাপে শুকাইয়া লইলেই কার্ব্বনিক কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিবে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

অপর প্রক্রিয়া।

১০ ভাগ পরিষ্কৃত চর্ব্বি (Lard) ও এক ভাগ মোম একত্রে গলাইয়া তাহার সহিত পরিমাণ মত পরিষ্কৃত ভূষা মিলাও। অমসৃণ কাগজ

(Unglazed paper) ইহাতে ডুবাইয়া লইয়া অতিরিক্ত মসলা ঝাড়িয়া ফেল এই কাগজ চাপ দিয়া রাখিয়া দিলে কার্ব্বন কাগজ প্রস্তুত হইল।

স্বদেশী ও গবর্ণমেণ্ট।

আজকাল স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা, আসাম হইতে পঞ্জাব সর্ব্বত্রই সকলে এই আন্দোলন লইয়া ব্যস্ত। দৈনিক সংবাদপত্র পাঠে জানা যায় যে, প্রতিদিন নানা স্থানে শত শত স্বদেশী সভার অধিবেশন হইতেছে। সেই সকল সভায় দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সহস্র সহস্র লোক, এমন কি স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত, সমাগত হইয়া স্বদেশী প্রতিজ্ঞা করিতেছে। দেশের খ্যাতনামা বক্তা ও নেতাগণ সমবেত লোকলগুলীকে উৎসাহজনক বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশানুরাগী করিয়া তুলিতেছেন। সকলেই যেন নব অনুরাগে বিভোর ও স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। চির পরাধীন ভারত সন্তানগণ যেন নবজীবন পাইয়া প্রফুল্লিত হইয়াছে। তাহাদের মনে যে এরূপ ভাবের আবির্ভাব হইবে, এতদিন ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পরাধীন মনুষ্যের মনোবৃত্তি যেমন স্ফূর্ত্তির অভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ও মনুষ্যত্বের লোপ হয়, পরাধীন জাতি-রও সেইরূপ দুরবস্থা হয়। তবে কেন হঠাৎ এই স্বাধীন প্রবৃত্তির বিকাশ হইল, স্বদেশ-প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইল? কেন সকলে বিদেশী দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিয়া স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর যে, দেশের দুরবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া ভগবান কৃপা করিয়া দেশের লোককে স্বদেশানুরাগী করিয়া তুলিতেছেন। এতদিন দেশের লোক স্বার্থপর, হৃদয়শূন্য, কর্ত্তব্যজ্ঞান-রহিত ছিল, জগদীশ্বর তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন। তাহারা এখন বুঝিতেছে যে, তাহাদের দোষেই দেশের বর্ত্তমান দুর্গতি, আর পরাধীন হইলেও তাহারা এই দুর্গতির উপশম করিতে সমর্থ। যে ভারতবর্ষের শিল্প জগদ্বিখ্যাত ছিল ও এখনও আছে, যেখানকার শিল্পী পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রয়োজনীয় শিল্প দ্রব্য যোগাইয়াছে ও বিদেশীগণকে শিল্প শিক্ষা দিয়াছে, আহা! সেই ভারতের শিল্পিগণ এখন দুর্দ্দশাপন্ন, অনাহারে কিম্বা অল্পাহারে শীর্ণকায় ও মুমূর্ষু! তাহাদের দুর্দ্দশার

জন্য যে সমস্ত ভারতবাসী দায়ী, আমরা এতদিন তাহা একবারও ভাবি নাই। শত সহস্র শিল্পী দুর্ভিক্ষে, অনাহারে সপরিবারে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে; আর আমরাই যে তাহাদের মৃত্যুর কারণ, এতদিন পরে আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আমাদের সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক; তাই আমরা "স্বদেশী" "স্বদেশী" বলিয়া চীৎকার করিতেছি। দেড় শত বৎসর হইল এদেশে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ইংলণ্ড ও অন্যান্য বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী হওয়াতে এদেশের শিল্প ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে ও শিল্পিকুল দরিদ্র হইয়াছে, দেশের শিল্প বাণিজ্য বিদেশীয়দের করায়ত্ত হইয়াছে; আমাদের দোষেই যে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, আমরা এতদিন পরে তাহা বুঝিতে পারিলাম। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী, ইংরাজ রাজপুরুষগণের স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম প্রবল, কাজেই ইংরাজ বণিককে ধনী করিতে হইলে ভারতের শিল্প-বিনাশ আবশ্যক। ইংরাজের মনস্কামনা পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এতদিন আমরা যদি অবাধ বাণিজ্য স্বত্বেও, বিদেশী জিনিষ ব্যবহার না করিয়া, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতাম, যদি অল্পবুদ্ধি শিশুর ন্যায় বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে কি দেশী শিল্প বিনষ্ট হইত? দেশের লোক একযোগে যদি কেবল দেশী জিনিষ ব্যবহার করে, তাহা হইলে বিদেশী জিনিষের আমদানী বন্ধ হইবে ও বিদেশী বণিকগণ ব্যবসা বন্ধ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সভ্য, উদারনৈতিক ও প্রজাবৎসল। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার আইন-বিরুদ্ধ অপরাধ নহে। আর সভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পক্ষপাতী আইন প্রণয়ন দ্বারা প্রজাকে যে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে বাধ্য করিবেন, আমাদের এরূপ বিশ্বাস হইতে পারে না। আমরা অবাধে স্বইচ্ছায় দেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে পারি। এবং এতদিন যদি তাহাই করিতাম, তাহা হইলে দেশের দুরবস্থা ঘটিত না, দরিদ্রতা বাড়িত না। যাহা হউক এতদিন পরে যে আমরা আমাদের দোষ বুঝিয়াছি ও প্রতীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, ইহাই যথেষ্ট।

ইংলণ্ড, জর্ম্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন দেশে দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য তত্তদ্ দেশের গবর্ণমেণ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিদেশীয় শিল্পদ্রব্য সেই সকল দেশে আমদানী করিলে গবর্ণমেণ্ট সেই দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া দেন, সুতরাং সেই দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে হয়ত তদনুরূপ

দেশী জিনিষ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ হইয়া পড়ে ও লোকসানের আশঙ্কায় ব্যবসায়িগণ বিদেশী দ্রব্যের আমদানী বন্ধ করিয়া দেয়। আবার কোন কোন গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পীকে রাজকোষ হইতে অর্থ সাহায্য করিয়া তাহার জিনিষ বিদেশে অর্দ্ধমূল্যে বিক্রীত হইবার সুবিধা করিয়া দেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশের শিল্পের উন্নতি কিম্বা রক্ষার জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন না। এবিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা থাকিলেও ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। লর্ড কর্জ্জন মরিশস্ দ্বীপের সাহেব ব্যবসায়ীদের উপকারের জন্য বিদেশী চিনির উপর যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক আদায়ের বন্দোবস্ত করাতে ইংলণ্ডে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। মান্চেষ্টারের কাপড়ের উপর মাশুল বসাইলে আমাদের বস্ত্রশিল্প রক্ষিত হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে ৪০ নম্বরের অপেক্ষা সরু সূতা তৈয়ার করিলে শুল্ক দিতে হয়; দেশীয় বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি করাই এই শুল্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য। যদিও গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করেন যে, এদেশের শিল্পরক্ষার জন্য তাঁহারা প্রয়াস পাইয়া থাকেন, কিন্তু এতাবৎকাল তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দু চারিটী টেক্নিকাল্ স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ভবিষ্যতে সেই সকল স্কুল হইতে দেশের বিশেষ কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। শিল্প শিক্ষার মধ্যে এই স্কুলে কামার ও ছুতারের কাজই শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশের কামার ও ছুতারগণ কার্য্যের অভাবে অন্নহীন; সুতরাং জনকয়েক ভদ্র সন্তানকে এইরূপ শিল্প শিক্ষা দিয়া দেশের কি উন্নতি সম্ভবপর, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ এই সকল ছাত্র চাকরীর লোভেই এই স্কুলে প্রবেশ করে। সে চাকরীতে তাহাদের শিল্প শিক্ষার কোনরূপ প্রকৃত ব্যবহার হয় না। যতদিন না এই সকল স্কুলে প্রকৃত শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয় ততদিন এগুলি নিতান্ত নিরর্থক। আজকাল গবর্ণমেণ্টের আফিসাদি ও পূর্ত্ত বিভাগে এদেশীয় অনেক জিনিষ ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা সুখের বিষয় বটে। তবে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, এদেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যথোপযুক্ত মনোযোগ নাই এবং অবাধ বাণিজ্য প্রথা দেশীয় শিল্পনাশের হেতু হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা অসম্ভব দেখিয়া এদেশের লোক বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হই-

য়াছে। ছয়মাস কাল মাত্র স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে, ইহার মধ্যে আশাতীত ফললাভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। আজ কাল কলিকাতা প্রভৃতি সহরে এবং অনেক পল্লীগ্রামে স্বদেশী দ্রব্যের দোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সকল দোকানে সকল রকমের আবশ্যকীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। বোম্বাই, নাগপুর, রাজপুতানা, কানপুর প্রভৃতি স্থানের কল হইতে প্রচুর বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। বাঙ্গালার নানা স্থানে ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি জায়গায় উত্তম ব্যবহার্য্য তাঁতের কাপড় তৈয়ার হইতেছে, এবং অনেক অবলম্বন-হীন তাঁতি অবলম্বন পাইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। অধিক পরিমাণে কাটতি হওয়াতে দেশী কল ও তাঁতের কাপড় পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পদরে বিক্রীত হইতেছে এবং বিলাতী কাপড়ের আমদানী ও বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে। দেশী ছুরি কাঁচি প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। সেগুলি বিলাতী ছুরি কাঁচি হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট ও মূল্যবান নহে। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, মণীন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি ধনী মহোদয়গণ শ্রীরামপুরে একটি কাপড়ের কল ক্রয় করিয়া চালাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। ভদ্রলোক এখন আর ব্যবসাকে একটি হেয় বৃত্তি মনে করেন না, অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তান আগ্রহের সহিত স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন।

এইরূপ উৎসাহ ও স্বদেশানুরাগ সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, কোন কোন ইংরাজ রাজপুরুষ ইহার প্রতিরোধ আবশ্যক মনে করিয়া, দেশের লোকের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা জাতভায়া বণিকদের সর্ব্বনাশ আশঙ্কা করিয়াই ছলে বলে স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বাঙ্গালা বিভাগ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বটে, কিন্তু এই আন্দোলনে রাজদ্রোহিতার কোনরূপ লক্ষণ নাই। আক্ষেপের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই আন্দোলনটি অনুমোদন না করিয়া ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছেন। দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি হইলে গরিব প্রজাকুলের উদরান্নের যোগাড় হইবে, দুরাবস্থার উপশম হইবে, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস হইবে, ইহা কি গবর্ণমেণ্টের বাঞ্ছনীয় নহে? আমরা বুঝি, প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার অমঙ্গলেই রাজার অমঙ্গল। ইংরাজ রাজপুরুষগণ যে তাহা বুঝেন না, আমরা একথা বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একবারে স্বার্থান্ধ ও অযথা স্বজাতি-বৎসল, তাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াও বিবেকশূন্যের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন। বর্ত্তমান রাজ-

প্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো স্বদেশীর যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। স্বদেশী জিনিষ যদি বিদেশী জিনিষের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, তবেই তাঁহার স্বদেশী আন্দোলনের সহিত সহানুভূতি আছে, কিন্তু যদি বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার ত্যাগ না করিলে স্বদেশীর সাফল্য না হয়, তাহা হইলে তিনি সেই আন্দোলনের বিরোধী। এই অর্থ আমাদের বোধগম্য হইল না। আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, বিদেশী শস্তা জিনিষের বিক্রয় বন্ধ না হইলে দেশীয় দ্রব্য বিক্রীত হইতে পারে না; সুতরাং লোকে যাহাতে বিদেশীজিনিষ ব্যবহার না করে,তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক, নতুবা স্বদেশী আন্দোলন ফলপ্রদ হইবেনা। লর্ডমিণ্টোর সাপক্ষে একথা বলা কর্ত্তব্য যে, যখন অবাধ বাণিজ্যপ্রথা গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত এবং প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ বণিক দলই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পরিচালক, তখন তিনি স্বদেশীর অন্যরূপ অর্থ করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার এই অর্থ আমাদের বিষম অনর্থের মূল হইয়াছে, কারণ তাঁহার অধীনস্থ কোন কোন কর্ম্মচারী মনিবের মতলব বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ্য ভাবে স্বদেশীর শক্রতা করিতেছেন। পূর্ব্ববঙ্গের ছোট লাট ফুলার সাহেব যেন তেন প্রকারেণ স্বদেশী আন্দোলনকারী নেতৃগণকে নির্য্যাতন করিতেছেন। তিনি লোককে "বন্দে মাতরম্" বলিতে দিবেন না, স্বদেশী সভা সমিতিতে যোগদান করিতে দিবেন না, এস্‌পেসাল পুলিষ' মিলিটারি পুলিষ ও বর্ব্বর নির্ম্মম গুর্খা সৈন্য দ্বারা প্রজাগণের উপর উৎপীড়ন করিতেছেন, দেশীয় ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমান করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না। বাস্তবিক ইনি নানা প্রকারে নিজের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন। বিগত ১৫ই এপ্রেল তারিখে গুডফ্রাইডের অবকাশে বাঙ্গালার গণ্য মান্য শিক্ষিত কয়েক সহস্র লোক কন্‌ফারেন্স (প্রাদেশিক সম্মিলন) উপলক্ষে বরিশাল সহরে সমবেত হইয়াছিলেন; বরিশালের মাজিষ্ট্রেট্ ইমার্সন সাহেবের হুকুমে পুলিষ সেই সভা ভঙ্গ করিয়াছিল। পূর্ব্বদিন যখন সভ্যগণ কন্‌ফারেন্স করিবার জন্য রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন, পুলিষ অকারণে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনেককে আঘাত করে এবং পুলিষ সাহেব বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান নেতা বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়া যায় ও মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ সরাসরি বিচার করিয়া দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা মতে সুরেন্দ্র বাবুর দুইশত টাকা অর্থদণ্ড করেন, এবং সুরেন্দ্র বাবু দুই একটী কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া আদালত অবমাননা অপরাধে আরও দুইশত টাকা জরিমানা

করেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালার রাজপুরুষদের এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া সমস্ত ভারত বর্ষ যে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইহার প্রতিবিধান জন্য সর্ব্বত্র সভা আহূত হইতেছে, দেশীয় সংবাদ পত্রে মহান্ আন্দোলন চলিতেছে। সুরেন্দ্র বাবু একজন খ্যাতনামা সুবিজ্ঞ মহামান্য দেশ-হিতৈষী। মাজিষ্টেট ইমার্সন ইঁহাকে বসিতে দেন নাই, ও অবজ্ঞা-সূচক ভাষায় সম্বোধন করিয়াছিলেন দেখিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী-মাত্রেই, এমন কি অনেক ইংরেজও ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা কি আইন বলে "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ বন্ধ করিতে চাহেন ইহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। "বন্দে মাতরম্" কথার অর্থ মাতাকে বন্দনা কিম্বা মাতৃসেবা; ইহা রাজদ্রোহ-সূচক ভাষা নহে। আমরা জনিতে পাই যে বঙ্কিম বাবুর আনন্দ মঠ নামক গ্রন্থে সন্ন্যাসীর কৃত যুদ্ধউপলক্ষে "বন্দে মাতরম্" চীৎকার ধ্বনি করিত বলিয়া ফুলার সাহেব এটীকে রাজদ্রোহের কথা বলিয়া বন্ধ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। ফুলার সাহেবের ভাষা-জ্ঞান, বিচার-শক্তি ও ন্যায়-পরায়ণতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। কোন পুস্তক বিশেষে রচিত সন্ন্যাসীর দল "বন্দে মাতরম্" কথা ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে,অতএব ফুলার সাহেবের প্রজারা ইহাও উচ্চারণ করিতে পারিবে না, কারণ তাহা হইলে তাহারা লড়াই করিয়া ফুলার সাহেবকে পদচ্যুত করিবে, এই ভয়ে তিনি অস্থির হইয়াছেন। এখানে আমাদের ইন্দ্রনাথ বাবুর "বটাইয়া দাও সব পাষণ্ড ইংরাজে" পদ্যাংশটী মনে হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করিয়াছেন; তবে কি তাহারা বাস্তবিক বটী দ্বারা যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়া ইংরাজকে তাড়াইয়া দিয়া রাজা স্থাপন করিবে? ভারতবাসিগণ স্বভাবতঃ রাজভক্ত ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করে; আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দেড়শত বৎসরেও রাজপুরুষগণ আমাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। সাধারণ কথায় বলে, "রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।" প্রজাবৎসল রাজার কোনরূপ আশঙ্কার কারণ থাকে না। তাই বলি, গবর্ণমেণ্ট যাহাতে প্রজাবৎসল ও লোকপ্রিয় হয়, রাজপুরুষগণ কেন তদনুরূপ শাসনপ্রণালী অবলম্বন না করেন? সৌভাগ্যক্রমে ফুলার ও ইমারসন সাহেবের মত অদূরদর্শী রাজপুরুষের সংখ্যা অল্প, নতুবা আমাদের দুরবস্থার একশেষ হইত। সুরেন্দ্র বাবু অন্যান্য সভ্যের সহিত কন্ফারেন্স করিতে যাইবার সময়, পুলিশ সাহেব কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। যদি তিনি ১৮৮ ধারার অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে ইহা পুলিসের

ধর্ত্তব্য অপরাধ নহে; তবে পুলিস সাহেব কি আইনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন, ইহা আমাদের বোধগম্য নহে। তিনি হয়ত বলিবেন, সভ্যগণ তাঁহার নিকট হইতে পাশ না লইয়া সভার অধিবেশন করিতে যাইতেছিলেন সেই জন্য তিনি অবৈধ জনতা বলিয়া তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। কোনরূপ সভা-সমিতির অধিবেশনের জন্য যে পাশের আবশ্যক,পুলিশ আইনে এরূপ কোন বিধান নাই। আর পাশ না লইলে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা কোথায়? কন্‌ফারেন্স ভঙ্গ করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট ইমার্‌সন ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাঁহার সামান্যরূপ আইনবোধ আছে, তিনি জানেন যে, ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ও ১৪৪ ধারা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা না থাকিলে প্রয়োগ করা যায় না। বরিশাল কন্‌ফারেন্সের সভ্যগণ কি মূর্খ, না অশিক্ষিত, তাহারা কি দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল? মনে কর, কোন সভ্য কি দর্শক পথে "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করিত, তদ্বারা কি প্রকারে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হইল, ইহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আসল কথা, ফুলার সাহেব বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলনকারিগণকে নির্য্যাতন করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন এবং সেই সুযোগ পাইয়া, তাঁহাদের বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহার জঘন্য প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন। ইমার্‌সন ও কেম্প সাহেব মনিবের হুকুম তামিল করিয়াছিল; কথায় বলে, "দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই"; আইনে বিধান থাক আর নাই থাক, ১৪৪ ধারা খাটুক আর নাই খাটুক, ইমার্‌সন তাহা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কোন বিচারকই আসামী কিম্বা সাক্ষীর প্রতি অযথা ভাষা প্রয়োগ করিতে পারেন না। সুরেন্দ্র বাবুকে অযথা ভৎর্সনা করাতে তিনি প্রতিবাদ করিয়া আদালত অবমাননা করেন নাই ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনে গবর্ণর হইতে চৌকীদার পর্য্যন্ত "সাধারণ ভৃত্য" পদবাচ্য। বাস্তবিক গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সাধারণের কল্যাণকর কার্য্য করিতে বাধ্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোন কোন কর্ম্মচারী ক্ষণিক ক্ষমতা গর্ব্বে কর্ত্তব্য জ্ঞান রহিত হইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে ও গবর্ণমেণ্টকে লোকাপ্রিয় করিয়া থাকে। অল্প দিন হইল ফুলার সাহেব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে হিন্দুদের কুব্যবহারে তিনি এতই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন যে তিনি হিন্দুদের পাঁচশত বংশাবলী যাহাতে সরকারী চাকরি না পায় তাহার বন্দোবস্ত করিবেন; এবং সেই জন্য তিনি মুসলমানদিগকে চাকরিতে নিযুক্ত

করিতেছেন। মুসলমানেরা চাকরি পাইতেছে বলিয়া হিন্দুরা দুঃখিত নহে। কিন্তু ফুলার সাহেব উচ্চপদস্থ হইয়া এইরূপ, অভিমত প্রকাশ করিয়া যে সাধারণের অশ্রদ্ধা ভাজন হইলেন ইহার জন্য হিন্দুরা বিশেষ দুঃখিত। ফুলার সাহেব রাজবিপ্লব নিবারণের জন্য বন্দে মাতরম নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাহস দিয়া বলিতে পারি যে হিন্দুদের মনে দাঙ্গা হাঙ্গামা যুদ্ধ বিগ্রহ নরহত্যা প্রভৃতি পাশবিক প্রবৃত্তি আদৌ নাই, এবং তাহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ ইচ্ছা করেনা, তবে তাহারা তাঁহার ন্যায় অযোগ্য রাজ কর্ম্মচারীগণ গবর্ণমেণ্টের উপকার না করিয়া সমূহ অপকার করে বলিয়া তাঁহাদের পদচ্যুতি প্রার্থনা করে। পাঁচশত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে কতই প্রলয় ঘটিবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কি হয় ত ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের অস্তিত্ব লুপ্ত হইবে। তবে হিন্দুদের জন্য ফুলার সাহেবের ভাবনা কেন? তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কেন? স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে পূর্ব্ববাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশে সর্ব্বদা সভার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, সেই সকল সভায় ও রাজপথে সকলে "বন্দে মাতরম্ চীৎকাব করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান সেই সকল সভায় যোগদান করে। কোথাও ত কোন রূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা শান্তি-ভঙ্গ হয় না। অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা বন্দেমাতরম্ নিবারক হুকুম জারিকরা আবশ্যক বোধ করেন নাই, তাঁহারা ফুলার সাহেবের ন্যায় রাজ বিদ্রোহের ভয় করেন না। তবে কেবল ফুলার সাহেবের এত বিভীষিকা কেন? আজ ত্রিশ বৎসর জাতীয় মহা সমিতির ও প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইতেছে কোথাও ত শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। কিন্তু ফুলার সাহেব নূতন লাট পদাভিষিক্ত হইয়া নূতন শাসন প্রণালীর অবতারণা করিয়া নিজের অযোগ্য-তার পরিচয় দিতেছেন।

স্বদেশী আন্দোলন লইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালায় দুই চারিটী ফৌজদারি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা আইন বিরুদ্ধ দোষ করিবে তাহারা অবশ্য দণ্ডাই। কিন্তু কোন কোন স্থলে দেখা যায় স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করিবার মতলবে মাজিষ্টেট ও পুলিষ অকারণে লোককে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিয়াছে। রঙ্গপুরের এস্‌পেসাল কনেষ্টবলদের মকদ্দমা ইহার একটী উদা-হরণ। এইরূপ করিলে যে আন্দোলনটী স্থগিত না হইয়া ক্রমশ প্রবল হইবে রাজ বম্মচারীদের সে জ্ঞান নাই বলিয়া বোধ হয়। স্কুলের ছাত্রগণ স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহারা পরিণত

বয়স্ক বালক, হুযুগে পড়িয়া লেখা পড়া পরিত্যাগ করিবে ইহা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নহে এবং গবর্ণমেণ্ট যে তাহা প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পান ইহাতে আমাদের আপত্তি উত্থাপন করা অকর্ত্তব্য। তবে বয়স্ক কলেজের ছাত্রগণ ইহাতে যোগ দান করিলে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি করা উচিত নহে। স্কুলের ছাত্রগণ "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করিলে অপরাধী হইতে পারে না, বাল্যকাল হইতে স্বদেশানুরাগী হইলে ভবিষ্যতে তাহারা প্রকৃত দেশ হিতৈষী হইবে। সেই সকল ছাত্রের উপর ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত করা ও পুলিষের দ্বারা তাহাদিগকে নির্য্যাতন করা যে নিতান্ত গর্হিত ও নৃশংস কাণ্ড তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে আমরা ভারতবাসী ইংরাজ চরিত্র দেখিয়া হতবুদ্ধি ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগতআছেন যে ইংরাজ স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে কাতর ছিলেন না। ইংরাজই ক্রীতদাস ব্যবসা পৃথিবী হইতে উঠাইয়াছেন। কিন্তু কালদোষে সেই ইংরেজ বংশধরগণের পক্ষে আমাদের স্বাধীন বৃত্তির বিকাশ চক্ষুশূল্য হইয়া উঠিয়াছে এবং তাঁহারা ইহা দমন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। তাঁহাদের কি অধঃপতন হইয়াছে! আমরা অভাবের প্রতীকার উদ্দেশে সামান্য উদরান্নের জন্য স্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত, আর কোন কোন নীচ প্রবৃত্তি ক্ষমতাপ্রিয় ইংরাজ রাজপুরুষ ইহার গতিরোধের জন্য ব্যস্ত! আমাদের দেশের লোক ভীত না হইয়া সাহস ও উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইলে ভগবান নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে সফল মনোরথ করিবেন। তাই বলি এস সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া আইনের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া অকুতোভয়ে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করি, সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া স্বদেশী ধর্ম্ম পালন করি। আমরা ভরসা করি সময়ে গবর্ণমেণ্ট বুঝিবেন যে স্বদেশী আন্দোলন রাজদ্রোহের কারণ নহে। আমাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে অনেক হৃদয়বান, চরিত্রবান্ ইংরাজ আছেন তাঁহাদের স্বদেশী আন্দোলনের সহিত বিশেষ সহানুভূতি আছে এবং আবশ্যক হইলে তাঁহারা আমাদের সাহায্য করিবেন। এস আমরা হৈ চৈ না করিয়া, মানাপমান উপেক্ষা করিয়া যাহাতে স্বদেশী দ্রব্য বিদেশী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে এমন কি বিদেশী দ্রব্য অপেক্ষা শস্তা দরে বিক্রিত হইতে পারে অচিরে তাহার উপায় উদ্ভাবন করি। আমরা কলের বিরোধী কারণ কলের জন্য অনেক টাকা বিদেশীদিগকে দিতে হইবে ও কলে অতি অল্প লোকই কাজ পাইবে। যাহাতে তাঁতের উন্নতি হয় ও সূতা তৈয়ার হয় তাহার সুবন্দোবস্ত আবশ্যক। কৃষকেরা

যাহাতে অধিক পরিমাণে তুলার চাষ করে জমীদারগণকে তদ্বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় এই সকল উপায়ে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হইবে ও দেশের দরিদ্রতা ঘুচিবে।

সাঙ্গেনীর ছাপা

সাঙ্গেনীর একটি পুরাতন সহর; ইহা জয়পুর হইতে ৭মাইল দক্ষিণ। সহরের উপস্থিত অবস্থা ভগ্ন ও কিছুই ভাল নহে। সহরের উত্তরাংশে অমানিসা নামক একটি সঙ্কীর্ণ নদী আছে। নদীর গর্ভ বালুকাময়; বর্ষাকালে ভিন্ন অপর সময় সামান্য একটি ধারা মাত্র বহিয়া থাকে। সহরের দক্ষিন পূর্ব্বাংশে এই নদীর উপর জয়পুর মহারাজার একটি পাকা বাঁধ আছে। তাহার প্রভাবে ইহার সমস্ত জল বহুদূর ব্যাপিয়া চাসের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। এবং সেই বাঁদ হইতেরাজ্যের বিশেষ লাভ হয়। সহরের মধ্যে প্রায় একসহস্র বৎসরের একটি অতি উৎকৃষ্ট জৈন মন্দির আছে। মন্দিরের গঠন ছাঁটা পাথরের এবং ইহার দৃশ্য মনোরম। এই স্থানে দুইটি প্রধান শিল্প কার্য্য আজিও বর্ত্তমান—দেশী কাগজ ও কাপড়ের উপর রং ও ছাপা। এই দুইয়েরই এতদ্দেশে বিশেষ ব্যবহার আছে এবং উভয়ই অতি সুন্দর বলিয়া সাধারণের নিকট আদরনীয়।

কাপড়ের উপর ছাপা অনেক দেশে অনেক প্রকার আছে কিন্তু এইরূপ পাকা রং কোথায় পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সূক্ষ্ম মলমলের উপর এই ছাপা খুব ভাল হয়। কাপড়ের উপর এই ছাপা ও রং উঠাইতে প্রায় চারি পাঁচ মাস লাগিয়া যায় কিন্তু অধিক সময় লাগে বলিয়া ইহার কার্য্য প্রণালী তত কঠিন নহে। ২০ গজের একটি সাদা ধোয়া মলমলের উপর রং ও ছাপা তুলিতে যে রূপ মসলা লাগিয়া থাকে ও যে প্রণালীতে ইহার কায্য হয় তাহা বলিতেছি।

প্রথম—একসের সুক্ষ ছাগল নাদীকে গুঁড়াইয়া ঐ ২০ গজ থানটী যে পরিমাণ জলে সম্পূর্ণ রূপে ভিজিতে পায় সেই মত জলে ইহা গুলিয়া থানটীকে এক রাত্রি তাহাতে ভিজাইয়া রাখিতে হয় এবং পরদিন ঐ থানটীকে রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়।

য়—ক্ষার (Alkaline) ইহার রং শাদা দুধের মত ইহা কটু ও

লবণাক্ত। ইহা শীতকালে এতদ্দেশের অনেকানেক নদীর গর্ভের অর্দ্ধসিক্ত (Damp) জমীর উপর আপনা আপনিই জন্মিয়া থাকে। ইহা হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন একটি মেচ্‌লা বা বড় গামলাতে পাঁচসের নদীর জল লইয়া প্রথমে একসের ঐ ক্ষার মিশাইয়া লইতে হয় পরে ইহাতে দুইসের তিলের তৈল মিশাইয়া হাত দিয়া খুব মিলাইলে উহার সাদা দুধের মত রং হয় এবং সেই মিশ্র জলে থানটা উত্তম রূপে ভিজাইয়া ঐ মেছলার মধ্যেই ইহার জলকে নিঙ্গড়াইয়া লইয়া থানটাকে শুকাইতে হয়। এই ভাবে পুনঃপুনঃ ১৫।২০ দিন ব্যাপিয়া ঐ জলে এই রূপ কাৰ্য্য করিতে হয়। পরে শেষ দিনে থানটী ভিজা উঠাইয়া লইয়া নদীর সাধারণ জলে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। এই সময়ে থানের রং ধোয়া সাদা রং হইয়া থাকে।

তৃতীয়।—দুইসের হরিতকী লইয়া উত্তমরূপে তাহাকে গুঁড়াইয়াজলে গুলিয়া লইতে হয় এবং সেই জলে ঐ শুষ্ক থানটী তিন ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তাহাকে শুকাইয়া লইলে তখন কাপড়ের রং (Light yellow) পীত বা হলুদিয়া হইয়া পড়ে।

চতুর্থ—ছাপার রং আলাদা প্রস্তুত হয়। ক্ষেতড়ীর ফিটকিরি (Khetri alum) ইহা জয়পুরস্থ ক্ষেতড়ী নামক স্থানের একটা পাহাড়ে উৎপন্ন হয় ও তাহা সাধারণ অপর ফিটকিরী হইতে কিছু বিভিন্ন। ইহা এই দেশে যথেষ্ট পাওয় যায়। এই ফিটকিরী এক সের ও সাধারণ গঁদ এক সের এই দুইটি দুইসের জলে গুলিয়া লইলেই তাহা ছাপার কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই গঁদ ও ফিট্‌কিরী মিশ্রিত জলটি একটি পাত্রে রাখিয়া যে নমুনার বা নকসার ছাপা হইবে সেই ছাপাটী ইহাতে হালকা ভাবে ডুবাইয়া কাপড়ের উপর ইহার অঙ্ক উঠাইয়া লইতে হয়। এই ফিটকিরী মিশ্রিত জল কাপড়ের মধ্যে অন্ত-নির্হিত হরিতকীর কসে মিলিত হইয়া কাপরের যে যে স্থানে ঐ ছাপা লাগান হইয়াছে তাহাদের কিঞ্চিৎ গাঢ় হলুদিয়া (Dark yellow) করিয়া দেয়, আর ইহার গঁদটী সেই রংকে পাকা (fast) করিয়া দেয়।

পঞ্চম।—আল (Aiol) ইহা এক প্রকার মূল বা শিকড় ৴২ সের

মজিত	ঐ	৴১ সের
সকুর	ইহা একপ্রকার ফল	৴।০ পোয়া
ধাওড়া পুষ্প শুষ্ক		৴।০ সের

আল্ ও মজিত এই দুইকে গুঁড়াইয়া লইতে হয়, সকুর ইহাকে হলুদের মত

বাটীয়া লইতে হয়। পরে এই কয়টিকে ও ধাওড়ার ফুলগুলিকে একসের তিলের তৈলে মিশ্রিত করিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দিতে হয়। একটা বড় তামার (মেচ্‌লা) পাত্রে ১মণ জল রাখিয়া তাহাকে খুব ফুটাইতে হয় এবং ইহা যখন অত্যুষ্ণ তাপে ফুটিতে থাকে সেইসময়ে ঐ পূর্ব্ব মিশ্রিত মসলাটী ইহার মধ্যে ঢালিয়া দিতে হয় ও সেই মসলাটী ঐ জলে দুইঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া ফুটিলে পর তাহার মধ্যে থানটি দিয়া তাহাকে একটী লম্বা কাটী দিয়া এমন ভাবে নাড়িতে হয় যেন কাপড়ের কোন অংশ ঐ উষ্ণ তামার পাত্রে লাগিয়া জ্বলিয়া না যায়। থানটী এই ভাবে একঘণ্টাকাল ঐ অত্যুষ্ণ জলে ফুটিলেপর তবে তাহাকে উঠাইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। এই সময়ে থানের রং ময়লা ঘোলাটে এবং ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট রং বোঝা যায় না।

ষষ্ঠ—পুনরায় ঐ নদীর জল লইয়া ইহাতে পূর্ব্বমত গুড়া ছাগল নাদী ও দেশী সাবান বা অন্য কোনরূপ Bleaching Powder মিশাইয়া লইতে হয় ও সেই জলে ৭।৮ দিন পর্যন্ত থানটীকে ফেলিয়া রাখিতে হয় পরে ইহাকে উঠাইয়া শুকাইয়া লইলেই দেখিতে পাওয়া যায় ইহার ছাপা গুলি গাঢ় লাল বা কাল হইয়াছে আর কাপড়ের মধ্যভাগের রং (Faint yellow) পীতাভ হইয়াছে।

এই কাপড় দেখিতে অতি সুন্দর হয়, ইহাকে যত ধৌত করা যায় ততই ইহার রং উজ্জ্বল হয়। এইরূপ একটি সাদা মলমলের থান যাহা বাজারে ৫৲ টাকায় পাওয়া যায় সেই থান রং করা হইলে তাহার মূল্য ১০।১২ টাকা হইয়া থাকে। এতদ্দেশের লোকেরা এই ছাপার কাপড়কে পাকড়ী, পরদা, রুমাল পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। সাঙ্গেনীরে ধুতী এখানকার সৌখিন বস্ত্র। ইহা বৃন্দাবনের ছাপা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। সাহেবেরাও সক্ করিয়া ইহার ঘাগরা পর্দ্দা ইত্যাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এক-জোড়া ৪৪ইঞ্চি পাঁচগজ এই ছাপার ধুতী জয়পুরে ৬।৭ টাকায় বিক্রয় হয়। মোটা কাপড়ে ও এই ছাপা হইয়া থাকে কিন্তু তাহাতে ছাপা তত পরিষ্কার ও স্পষ্ট হইয়া উঠে না। সে রূপ বস্ত্রের মূল্য কম এবং তাহা সাধারণ লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে।

সাঙ্গেনীরের ছাপাওয়ালাদের জ্ঞান এই ছাপা এমন উৎকৃষ্ট ভাবে অপর কোথায় বা অন্য কোন নদীর জলে উঠেনা। ইহা অমানিশা নদীর জলের স্বতন্ত্র-গুণের প্রভাব। অমানিশা নদীর জল পরিষ্কার, আমি তাহা ব্যবহার করিয়াছি ইহা কোনরূপ alkaline মিশ্রিত বা ক্ষারী নহে, এই নদীর মধ্যে একপ্রকার

মোটা ঘাস জন্মে তাহা লম্বে ৫।৬ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অপর কোন বিচিত্র ভাব দেখি নাই। সাঙ্গেনীরে কাগুজেরা যেরূপে কাগজ প্রস্তুত করে তাহা পরে লিখিব।

শ্রীকুলদানন্দন মুখোপাধ্যায়,
জয়পুর।

স্বদেশী কাগজের কল।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, কলিকাতায় একটী নূতন কাগজের কল প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে দিন দিন যে সকল নূতন নূতন কল কারখানার উদ্ভব হইতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান দেশীয় কলে প্রস্তুত কাগজ বিদেশী কাগজকে পরাভব করিতে পারিতেছে না। তবে দেশীয় উপাদানে যে সকল কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহা সৌন্দর্য্যে বিলাতীর সমতুল্য না হইলেও স্থায়িত্বে দেশী কাগজ অনেক উৎকৃষ্ট। সংবাদপত্রের সংশ্রবে থাকায় কাগজের কারবার সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, আবশ্যক মত ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব।

বাঙ্গালায় সামান্য কৃষক হইতে রাজা মহারাজ পর্য্যন্ত আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই বালির কাগজের নাম জানেন। যে বাদামি বা হরিদ্রা বর্ণের কাগজকে সকলের বালির কাগজ বলিয়া জানেন, ঐ কাগজ বালি পেপার মিল প্রস্তুত করিয়া ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম প্রচলন করেন। তাহা হইতেই ঐরূপ বর্ণের কাগজকে সকলেই বালির কাগজ বলিয়া থাকেন। এক্ষণে অন্যান্য কলের প্রস্তুত বাদামি কাগজকেও লোকে বালিকাগজ বলেন। এইঁ বালির কাগজের কল অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ। এক সময়ে এই কল বার্ষিক ৩।৪ লক্ষাধিক টাকা লাভ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় কুলি মজুরদিগের মজুরি বাদে লাভের সমুদায় টাকা বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ এই, বালির কাগজের কলের অংশীদারগণ সকলেই বিলাতের লোক। কলিকাতার সাহেব সওদাগর মেসার্স জর্জ্জ হেণ্ডারসন কোং ঐ কলের তত্ত্বাবধান করিলেও ইহার পরিচালনা কার্য্য সমস্তই বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণ করিয়া থাকিতেন।

যে কোন কারণে হউক কর্ত্তৃপক্ষগণ বহুদিনের বালির কলটী সম্প্রতি টিটাগড়-মিলের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। টিটাগড় কাগজের কলে আমাদের দেশী অনেক অংশীদার আছেন; এই পুরাতন জীর্ণ কলটি খরিদ করিয়া তাঁহারা বিজ্ঞোচিত কার্য্য করিয়াছেন কিনা, শীঘ্রই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মিষ্টার এম, এইচ, পেটীট্ সাহেব বালির কাগজের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ১৭ বৎসর যাবৎ তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। শুনিতেছি আগামী জুলাই মাসে তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইবে। এই ঘোরতর স্বদেশী আন্দোলনের দিনে কতিপয় উদ্যোগীপুরুষ তাঁহার সাহায্যে একটী বৃহদায়তনে এবং স্বদেশী তত্ত্বাবধানে কাগজের কল প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন না দেখিয়া আমরা সাতিশয় ভীত হইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িয়া দিলে আমাদিগকে অনেক পশ্চাতে পড়িতে হইবে। এই পেটীট সাহেব দেশীয় কাগজ সম্বন্ধে বিশেষ বহুদর্শী। আমাদের বিশ্বাস, এই পেটীট সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া একটী কাগজেরকল প্রতিষ্ঠিত করিলে কতকগুলি শিক্ষিত উদ্যমশীল দেশীয় যুবককে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী বিশেষরূপে শিখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রায় এককোটী টাকার বিদেশী কাগজ প্রতি বৎসরে আমদানী হয়; এবং কাগজের কাট্তি দিন দিন যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আমাদের দেশে এখনও অনেক-গুলি কাগজের কলের স্থান হইতে পারে।

ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে দিন বালি পেপার মিল উঠিয়া যাইবার সংবাদ কলিকাতায় প্রচারিত হইয়াছে এবং টিটেগড় পেপার মিল একচেটীয়ার ভাব দেখাইয়াছে, সেই সময় হইতে কাগজ ব্যবসায়ীগণ আরও অধিক পরিমাণে বিদেশী কাগজ আনাই বার জন্য অর্ডার পাঠাইতেছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্বদেশী আন্দোলনকারী সংবাদ পত্রকে ও বিদেশী কাগজের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এইস্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কলিকাতার বর্ত্তমান টিটাগর এবং বেঙ্গল মিল নামক যে দুইটী কাগজের কল আছে, সেই দুইটী কোম্পানি গবর্ণমণ্টের কাগজ সরবরাহ করিয়া দেশের অপর সাধারণের কাগজ যোগাইতে না পারায় বাধ্য হইয়া বিদেশী কাগজের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে। এরূপ স্থলে এদেশে আর একটী কাগজের কল হইলে যে বিশেষ লাভজনক হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমরা উদ্যোগীবর্গকে আন্তরিক উৎসাহ ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং প্রার্থনা করি যেন তাঁহাদের উদ্যম অচিরে সফল হয়। এই অভিনব কোম্পানির অনুষ্ঠান পত্র বাহির হইলেই আমরা তৎসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব।

বসুমতী।

বয়ন বিদ্যালয়।

"বন্দে মাতরম্"

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সময় হইতে স্বদেশের উন্নতি সাধনার্থ স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র দাস ও মৃত অশ্বিনী কুমার দাস মহাশয়ের ষ্টেটের একজিকিউটার শ্রীযুক্ত বাবু শিশির চন্দ্র ঘোষ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দুভূষণ ঘোষ মহাশয় স্থানীয় তাঁতী জোলা, ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় তাঁতী জোলাদিগের দ্বারায় ধুতী, চাদর, রেফার ইত্যাদি বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া স্বদেশ অনুরক্ত ব্যক্তিগণের অভাব দুরীভূত করিতেছেন।

সম্প্রতি ইহারা স্বদেশী শিল্পের উন্নতি জন্য নানা স্থানের তাঁত পরিদর্শন করতঃ বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন মানসে আপাততঃ ১০।১২ খানি ফ্লাইসটুল তাঁত আনিয়া বয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে অনেক ভদ্রলোকও ইঁহাদের উৎসাহে যোগদান করিয়াছেন এবং প্রায় দুই সপ্তাহ মধ্যে ১৫।১৬ জন ছাত্র স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া রীতিমত বয়ন কার্য্য শিক্ষা করিতেছে।

এই বিদ্যালয়ে দুইটী বিভাগ খোলা হইয়াছে, প্রথম বিভাগে ধুতী, চাদর ছিট, রেকার ইত্যাদি বস্ত্র বয়ন ও তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং দ্বিতীয় বিভাগে জাপানী লুম, জহুরী লুম, কিম্বা অন্য কোন উন্নত প্রণালীর হ্যাণ্ডলুম, মোজাও গঞ্জির কল আনাইয়া সত্বরই শিক্ষা আরম্ভ হইবে।

শিক্ষার্থীগণের নিকট এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ কালীন ২৲ টাকা মাত্র ভর্ত্তি ফিস্ লওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তদ্ভিন্ন আর মাসিক বেতন লওয়া হইবেনা।

বিদেশী ছাত্রদিগের থাকিবার জন্যে মেস্ করিয়া থাকিবার জায়গা দেওয়া

হইয়াছে। এই জায়গাটীর দৃশ্য অতীব মনোহর ও স্বাস্থ্যকর। গড়াই নদীর উপর স্থাপিত। বিশেষতঃ অসুখ হইলে স্কুলের মেম্বর ডাক্তার বাবু ইন্দুভূষণ ঘোষ মহাশয় নিজে অতি যত্ন সহকারে রোগীদিগকে শুশ্রূষা করিয়া থাকেন।

এই বিদ্যালয়ে বয়ন কার্য্য শিক্ষা করতঃ পরীক্ষায় রীতিমত উত্তীর্ণ হইলে ছাত্রদিগকে ভারত গৌরব বাগ্মী প্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় এবং ল্যাণ্ড হোল ডারস্ এসোসিয়েসনের মেম্বর মিষ্টার এ চৌধুরী ব্যারিষ্টার ও ফরিদপুর জেলার জজকোর্টের উকিল মহামান্যিত স্বদেশ বৎসল বাবু অম্বিকা চরণ মজুমদার মহাশয়দিগের স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। তাহারও ব্যবস্থা করা হইতেছে। সুতরাং এখান হইতে যে সমস্ত ছাত্র পাশ করিতে পারিবেন তাঁহারা এই সার্টিফিকেট বলে অন্য যায়গায় কার্য্যেরও সুবিধা করিতে পারিবেন।

নানাস্থানে অসত্য আচরণ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বাঙ্গালী জাতি যৌথ কারবার করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু যৌথ কারবার করিতে না পারিলেও বাঙ্গালীজাতির উন্নতি করিবার উপায় নাই। সুতরাং বাঙ্গালীজাতির এই দুর্ব্বলতা দূরীকরণ জন্য উপরোক্ত মেম্বরগণ এই স্কুলের নাম "রামনারায়ন বয়ন সমিতি রাখিয়া ২০০০ টাকা মূল ধনে দুইশত অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০৲ টাকা হিসাবে ধার্য্য করতঃ আরও ১০।১২ খানি ফ্লাই সটল্ তাঁত বসাইয়া কার্য্য করিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। আশা করি অংশীদারগণ কার্য্যকারকগণ ও উক্ত শিরোনামের সার্থকতা সম্পাদন করতঃ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া চির বাধিত করিবেন।

উক্ত বয়ন বিদালয় সম্বন্ধীয় কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে উক্ত বিদ্যা লয়ের সেক্রেটারীর নিকট লিখিলেই বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

শ্রীকিরণচন্দ্র শিকদার।

স্বদেশী

প্রথম খণ্ড।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩। [অষ্টম সংখ্যা।

বন্দে মাতরম্।

জাতীয় উন্নতি।

আমাদের জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে,প্রথমতঃ জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না তদ্বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষ একটী বিস্তীর্ণ মহাদেশ, ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশকোটী অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে যত লোক তাহার প্রায় পঞ্চমাংশ ভারতবর্ষে বাস করে। এই ত্রিশকোটী লোক নানা জাতীয় ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী। আবার এক এক ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যে অনেকানেক সাম্প্রদায়িক বিভাগ আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির আবার ব্যবহার ও ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক। এই সকল দেখিয়া মনে হয় যে, এ দেশের লোকের মধ্যে জাতীয়তা ও একতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে জাতীয়তার অনুকূল অনেকগুলি উপাদান দৃষ্ট হয়; এই উপাদান গুলি কি এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে জাতীয় উন্নতি আবশ্যক, তাহা পর্য্যালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ইংরাজ শাসনাধীনে এদেশের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই রেলওয়ে হওয়াতে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, ও বোম্বাই প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের লোক অল্পায়াসে ও অল্পব্যয়ে পরিভ্রমণ করিয়া পরস্পরে মিলিত হইতে পারে; স্থানে স্থানে পোষ্টাফিস

টেলিগ্রাফ আফিস স্থাপিত হওয়ায় পত্রাদি দ্বারা পরস্পর মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারা যায়। রেলওয়ে পোষ্টআফিস হওয়াতে সংবাদ-পত্রের সংখ্যার বৃদ্ধি ও প্রচারের সুবিধা হইয়াছে এবং বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে। বহুল মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নানাবিধ পুস্তকাদি মুদ্রিত হইয়া বিদ্যা শিক্ষার অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে এবং কলেজ, স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে ক্রমশঃ শিক্ষিত লোক ও বিদ্যার্থীর সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজী ভাষা সাধারণ ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। বাণিজ্যোপলক্ষে বিদেশীয় লোক এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে, এবং শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যালাভের জন্য এদেশ হইতে ছাত্রগণ ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি সভ্য দেশে গমন করিয়া সেই সকল দেশের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই সকল কারণে ও বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে আমাদের জাতিভেদের কঠোরতা শিথিল হইতেছে, আমাদের মনের সংকীর্ণতা অপনোদিত হইতেছে। এখন আর ব্রাহ্মণ অপর জাতিকে ঘৃণা করে না। বাল্যকালে এক বিদ্যালয়ে নানা জাতীয় ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী বালকগণ শিক্ষা করে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও নানা জাতি এবং গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজ বণিকগণের আফিসে নানা জাতীয় লোক একত্রে কর্ম্ম করিয়া থাকে। আদালত প্রভৃতি সাধারণের কার্য্যস্থানেও উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট জাতির লোক সর্ব্বদা সমবেত হইয়া থাকে। এরূপ মিলনে যে দেশের নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল সাধিত হইতেছে, আমরা এমন কথা বলিতে প্রস্তুত নহি, তবে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে ইহা দ্বারা আমাদের মধ্যে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইবার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষে জাতীয়তা সংস্থাপিত না হইলে দেশের উন্নতির আশা কম। যদি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি পরস্পর শত্রু ভাবে বিবাদ করিতে থাকে, তাহা হইলে দেশের দুরবস্থার হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইবে। ইংরাজ রাজা আমাদের ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, আমরা অবাধে নিজ নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারি। জাতীয়তার অনুরোধে আমরা হিন্দুকে মুসলমান হইতে বলি না কিম্বা মুসলমানকে হিন্দু হইতে বলি না। আমাদের বিশ্বাস যে "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ভগবদ্গীতার এই উপদেশ লঙ্ঘন না করিয়া, আমরা একতা সূত্রে সম্মিলিত হইয়া, দেশের মঙ্গলোপায় স্থির করিতে পারি, দেশব্যাপ্ত দরিদ্রতার উপশম করিতে পারি।

জাতীয় উন্নতির বিষয় ভাবিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ের উন্নতি আবশ্যক এবং কি কি উপায়ে সেই উন্নতি হইতে পারে, তদ্বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা এই সকল দ্বারা যেমন মনুষ্য-চরিত্র গঠিত হয় ও মনুষ্য-জীবন রক্ষিত হয় সেইরূপ এই গুলিই জাতীয় চরিত্র গঠনের ও জাতীয় জীবন রক্ষার প্রধান উপাদান। সমগ্র ভারতবাসী যে এক ধর্ম্মাবলম্বী হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না, সুতরাং ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই যে, যিনি যে ধর্ম্মে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যেন সেই ধর্ম্ম আন্তরিক ভাবে ও সংযত মনে প্রতিপালন করিয়া ধার্ম্মিক নামের যোগ্য হইতে পারেন। সকল ধর্ম্মেরই প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ ঐশিক গুণ-সম্পন্ন ও উদার-প্রকৃতিক হইয়া থাকেন এবং বিধর্ম্মীকেও ভ্রাতৃভাবে দেখেন। সুতরাং হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন প্রকৃত ধার্ম্মিকগণের মধ্যে বিদ্বেষভাব কিম্বা কলহ থাকিতে পারে না। আবার ধর্ম্মের উপরেই সামাজিক আচার ব্যবহার নির্ভর করে, অতএব বিভিন্ন ধর্ম্মের উপাসকগণের সামাজিক সম্মিলন সম্ভবপর নহে। হিন্দু ও মুসলমান বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে,এরূপ আমাদের ইচ্ছা নহে এবং ইহার আবশ্যকতাও দেখা যায় না। হিন্দুর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যে নানা প্রকার বিভাগ হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমাদের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে,সেই সকল শাখা প্রশাখা নষ্ট হইলে দেশের মঙ্গল হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা হিন্দুকে ব্রাহ্ম কিম্বা খৃষ্টিয়ান হইতে বলি না। প্রকৃত ধার্ম্মিক হিন্দু যখন প্রকৃত ব্রাহ্ম কিম্বা খৃষ্টিয়ান হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহেন, তখন পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, কেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণে প্রাচীন রীতি নীতিকে এক দিনে পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র এবং তাহাতে জাতীয় উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইয়া থাকে। আমরা কি অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিলাম যে, নুতন সভ্যতার আলোকে জ্ঞানী ও সুসভ্য হইলাম? আমাদের সভ্যতা প্রাচীন, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি জগৎকে শিক্ষা দিয়াছে ও দিতেছে ; আর আমাদের দেশের হতভাগ্যগণ দেশে শিক্ষার কিছুই দেখিতে না পাইয়া ও পূর্ব্ব পুরুষদিগকে অযথা গালি দিয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতঃ নিকৃষ্ট প্রাণীর ন্যায় অনুকরণ-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ইংরাজ চরিত্রের সদ্‌গুণ গুলির অনুকরণ না করিয়া দোষগুলির অনুকরণ করিতে তৎপর হয় এবং ইংরাজী অশন ও বসন ব্যবহারে চরিতার্থ বোধ করে।

বর্ত্তমান কালে রাজনীতি, শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই কয়েকটী বিষয়ের উপর আমাদের দেশের অবস্থার উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যাঁহারা মনে করেন যে, রাজনীতির সহিত জাতীয় উন্নতি ও অবনতির সংশ্রব নাই, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। প্রাচীন ভারতে রাজাই ধর্ম্ম ও সমাজরক্ষক ছিলেন; অধর্ম্মাচারী ও সমাজ-দ্রোহীকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত, সুতরাং শাসন-প্রণালী দ্বারা প্রজাপুঞ্জের চরিত্র গঠিত হইত। ইংরাজ রাজা কোন ধর্ম্ম কি সামাজিক প্রথায় হস্তক্ষেপ করেন না ও করিতে পারেন না; কেবল আইন প্রণয়ন ও বিচার ব্যবস্থা দ্বারা যতদূর সম্ভব প্রজার জীবন ও ধন রক্ষা এবং দেশে শান্তিরক্ষা করেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণ আমাদের দেশের ও সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ না হওয়াতে ও দেশীয় শিক্ষিত লোকের প্রতি তাঁহাদের যথোপযুক্ত বিশ্বাস না থাকাতে, শাসন কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়া থাকে, আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধী দণ্ডিত না হইয়া নিরপরাধীর দণ্ড হইয়া থাকে। কঠোর দণ্ডবিধি প্রচলিত থাকায় ও পুলিষের উপর অযথা ক্ষমতা প্রদত্ত হওয়ায়, সকলেই সর্ব্বদা ভয়ে সশঙ্কিত আছে বলিলেই হয়। অনেক সময়ে পুলিষ অকারণে সম্ভ্রান্ত লোককেও অপমানিত করিতে ত্রুটি করে না। স্ফূর্ত্তি ও সাহসের অভাবে যে মনুষ্যের মনোবৃত্তি বিকশিত না হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের প্রতি বিশ্বাস না থাকাতে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এক প্রকার নিরস্ত্র করিয়াছেন ও সৈনিক বিভাগের কার্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগেরই প্রধান প্রধান পদগুলি ইংরাজের একচেটিয়া। গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, এদেশের লোক বড় বড় চাকরী করিতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, কাজেই দেশীয় লোককে সেই সকল চাকরী দেওয়া হয় না। কিন্তু "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ" এই মহাবাক্যটী কি সত্য নহে? আজ কাল এ দেশের দু একটা লোককে প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট কি তাঁহাদের যোগ্যতার বিশেষ পরিচয় পান নাই? এদেশের লোক রাজভক্ত, তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। আসল কথা, ইংরাজ এ দেশ হইতে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে চান এবং সেই জন্যই মোটা মোটা বেতনের চাকরীগুলি ইংরাজের একচেটিয়া। এই সকল পক্ষপাতী রাজনীতি আমাদের অবনতির প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

ফলকথা, ইংরাজ রাজপুরুষগণের ইচ্ছা ও অনুকম্পার উপর আমাদের জাতীয় জীবন, জাতীয় সম্মান ও জাতীয় উন্নতি কতক পরিমাণে নির্ভর করিবে। লর্ড রিপন স্বায়ত্ব শাসনের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের জাতীয় উন্নতির একটী পথ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ক্রমশঃ সেই পথ অবরোধের চেষ্টা করিতেছেন। দেশীয় লোকের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু দেশের লোক সংখ্যা ও নিরক্ষর লোকের অনুপাতে সে ব্যয় যৎসামান্য বলিয়া মনে হয়। শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন প্রথার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমাদের দেশের কৃতবিদ্যমহোদয়গণ যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তদ্দ্বারা শিক্ষার উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়; তবে অর্থের অভাবে তাঁহাদের উদ্যম সফল হইবে কি না বলা যায় না। স্ত্রীশিক্ষা একটী জাতীয় উন্নতির পথ। প্রাচীন ভারতে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ যে শিক্ষিতা ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তবে আজকাল যেরূপ ভাবে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা বালিকাগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে বলি না ও বয়ঃপ্রাপ্তা বালিকাগণকে সাধারণ স্কুলে গৃহে অধ্যয়ন করিতে দিতে অনিচ্ছুক; বালিকাদিগকে ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও গার্হস্থনীতি শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোক যাহাতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন না হয়, বাল্যকালে সেইরূপ শিক্ষা দান একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের অবনতি সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। ম্যালেরিয়া জ্বর প্রায় সর্ব্বত্র চির বিদ্যমান; তাহার উপর প্লেগ, বসন্ত, ওলাউঠা মধ্যে মধ্যে লোকসংখ্যার হ্রাস করিতেছে। রেলপথ ও সাধারণের যাওয়াতের পথের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী সকল রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং বর্ষার জল পূর্ব্বের মত নিকটবর্ত্তী নদী প্রভৃতিতে বহিয়া যাইতে না পারিয়া গ্রামের জমিতে আবদ্ধ থাকে এবং বায়ুকে দূষিত করে। অনেক নদী মজিয়া গিয়াছে, পুরাতন পুষ্করিণীগুলির সংস্কার হয় না; পল্লীগ্রাম বাসী দূষিত জল পান করিয়া পীড়াগ্রস্ত হয়। দরিদ্রতা নিবন্ধন অনেকেই অল্পাহারে থাকে কিম্বা অভক্ষ্য আহার করে এবং যথোপযুক্ত বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে না। দরিদ্রের মনের প্রফুল্লতা থাকিতে পারে না, এবং তাহার শরীর শীর্ণ হওয়াতে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র এবং দেশে দুর্ভিক্ষ চির বিদ্যমান বলিলেই হয়। দুই চারিটী ধনী লোক

থাকিলে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। দেশের দরিদ্রতার প্রকোপ কতক পরিমাণে দূরীভূত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে কতক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে,দেশের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা হীনতর হইয়াছে। এই আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে, দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি আবশ্যক। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমলে অবাধ বণিজ্য নিবন্ধন এদেশের শিল্প বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, বিদেশী শিল্পী ও বণিকগণ এখানকার অর্থ শোষণ করিয়া ধনী হইতেছে। ইংরাজরাজ অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী আর এই অবাধ বাণিজ্যই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এদেশের তন্তুবায় উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করিতে পারে কিন্তু বিদেশী শিল্পী কলে বস্ত্র তৈয়ার করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং প্রতিযোগিতায় এদেশের বস্ত্রশিল্প ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। বস্ত্রশিল্পের ন্যায় অন্যান্য শিল্পও প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হইয়াছে। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, আমাদের দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য সকল ব্যবহার করা নিতান্ত বিধেয়; অনেক কাল পরে আমাদের দেশের লোক দেশের দুরাবস্থার দিকে মনোযোগ দিয়াছেন ও দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। এবিষয়ে হিন্দু,মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের ধনী দরিদ্র প্রভৃতি সকল অবস্থার লোক যোগদান করিতে পারে এবং ইহাই তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার হইলে যে আমাদের জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সময়ে জমিদারগণ আপন আপন প্রজাদের কৃষির উন্নতি বিষয়ে মনোযোগী হয়েন, ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা। কৃষকেরা যাহাতে ঋণমুক্ত হয় ও জমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস, জমিদারগণ মনে করিলে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে দেশের লোকের চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে না। এদেশের লোক পূর্ব্বে সরল, সত্যবাদী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান কালে অনেক স্থলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। এখন মিথ্যাবাদী, শঠ ও প্রবঞ্চকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। অভাবই এই নৈতিক অবনতির প্রধান কারণ। পূর্ব্বে এদেশের সাধারণ লোকের অভাব অল্প ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেকগুলি অনাবশ্যকীয় দ্রব্যকে আবশ্যকীয় করিয়া তুলিয়া

অবস্থাহীন লোকের অবস্থা হীনতর করিয়াছে। মদ্যপান, অভক্ষ্য ভোজন প্রভৃতি পাপাচার অনেকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এই সকলের প্রতীকার না হইলে দেশ উৎসন্ন যাইবে।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা তাহাতে দেশের লোকের স্বাবলম্বী হওয়া আবশ্যক। সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া থাকিলে আমাদের দুরবস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। বিদেশীদের সহিত প্রতিযোগিতার প্রকোপ দিন দিন প্রবলতর হইতেছে। বাষ্পীয় পোত ও রেলওয়ে বিদেশীগণের বাণিজ্যের সুবিধা করিয়াছে। ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশীয় বণিকগণ প্রভূত ধনশালী; তাহারা কলের সাহায্যে শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প-মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। আমাদের দেশের শিল্পজাত দ্রব্য সেইরূপ অল্প মূল্যে বিক্রীত না হইলে প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্প ক্রমশঃ একবারে বিনষ্ট হইবে। আমরা সকল শিল্পের জন্য কলের পক্ষপাতী নহি। গৃহস্থোচিত শিল্পের জন্য কলের আধিক্য হইলে, শিল্পিগণ অবলম্বনবিহীন হইয়া অনশনে মারা যাইবে। আমরা পুনঃপুনঃ বলিতেছি ও বলিব যে, যদি আমরা সকলে দেশী জিনিষ ব্যবহার করি,তাহা হইলে বিদেশী দ্রব্যের আমদানী কমিয়া যাইবে এবং দেশী জিনিস অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ শস্তা দরে বিক্রীত হইবে। অন্ততঃ কিছু দিন আমাদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে ও দেশীয় জিনিষ মূল্যবান হইলেও ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অসম্ভব।

আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, আমরা চেষ্টা করিলে জাপানের ন্যায় উন্নত হইতে পারি। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক ও অনর্থ-মূলক; জাপান স্বাধীন দেশ, আর আমরা পরাধীন; জাপানের সহিত আমাদের তুলনা হইতে পারে না। ৩০।৪০ বৎসরে জাপান যেরূপ উন্নত হইয়াছে, আমরা আজীবন চেষ্টা করিলেও সেরূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হইব না। স্বাধীনতা শারীরিক ও মানসিক উন্নতির কারণ। আমরা সেই স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত; গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের উপর আমাদের হাত নাই। রাজস্বের অধিকাংশই সৈনিক বিভাগে ব্যয়িত হয় ও বিলাতে প্রেরিত হয়; তাহা নিবারিত হইবার উপায় নাই। বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় জমিদার ও প্রজার অবস্থা কতক পরিমাণে ভাল,কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের জমিদার ও প্রজা করভার বহনে অসমর্থ; সুতরাং তাহাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। এসকলের প্রতীকার গবর্ণমেণ্টের

হস্তে নিহিত। আমরা কেবলমাত্র আমাদের দুঃখ গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে পারি; না শুনিলে আমাদের উপায়ান্তর নাই। জাপানের উন্নতি দেখিয়া আমাদের উৎসাহিত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না। আমরা জাঁপানকে আদর্শ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে জাপানের ন্যায় উন্নত হইবে ইহা দুরাশা মাত্র। তবে এই মাত্র আশা করা যায় যে, আমরা সকলে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব বলিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলে আমাদের দেশের সাধারণলোকের দুরবস্থা কতক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে ও দেশের কৃষিজীবী, শিল্পজীবী ও শ্রমজীবী লোকের সংখ্যাই অধিক; দেশী জিনিষ ব্যবহার করিলে তাহারা অবলম্বন পাইবে এবং তাহাদের দরিদ্রতা ঘুচিবে। এখানে ইহা বক্তব্য যে. যাহাতে দেশী জিনিষ ব্যবহারের আন্দোলন লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা ও অশান্তি উপস্থিত না হয় সে বিষয়ে আমাদের নেতাগণের দৃষ্টি রাখা উচিত কারণ তাহা হইলে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের মৌখিক সহানুভূতিও থাকিবে না ও নানারূপ ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশী দ্রব্য ব্যবহার করা নিষেধ করিতে পারিবেন না। আমাদের মধ্যে যদি কেহ বিদেশী দ্রব্য শস্তা বলিয়া ব্যবহার করে তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ বলপ্রয়োগে কুলাঙ্গারের কুসংস্কার দূরীভূত হইবে না। স্বদেশের প্রতি সমান্য অনুরাগ-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই যে এক্ষণে স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্বদেশানুরাগই জাতীয় উন্নতির সর্ব্ব প্রধান উপাদান। দেশের লোক অচিরে স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হইবে ও সকলে স্বেচ্ছাক্রমে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেশের দুরবস্থার মোচন করিবে, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রার্থনা। কালচক্র ও আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমরা বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছি; স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার আমাদের উদ্ধারের ও জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায়, ইহা যেন আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি ও দেশের লোককে সরল ভাবে ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করি। শিল্প ও বাণিজ্যদ্বারাই আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। এই শিল্প বাণিজ্যই ইংলণ্ডকে পৃথিবীর মধ্যে অপর দেশ অপেক্ষা ধনশালী করিয়াছে। আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্য বিদেশীগণের করায়ত্ত হওয়াতেই আমাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে। চাকরিই আমাদের বিদ্যাশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশের মধ্যবিত্ত লোকের অধিকাংশই ২০।২৫ টাকা বেতনের চাকরী যোগাড় করিতে পারিলেই কৃতার্থ মনে করে। এই সামান্য টাকায় অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র চলে। মধ্যবিত্ত ও

দরিদ্র ভদ্রলোকের অবস্থা দিন দিন অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে; অনেকেই ঋণগ্রস্ত; সন্তানগণকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিতে অসমর্থ; রোগ হইলে চিকিৎসার ব্যয় বহনে অপারগ। মূলধন না থাকাতে সকলে ব্যবসা করিতে পারে না, আবার প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবসাও পূর্ব্বের ন্যায় লাভজনক নহে। এই সকল কারণে জাতীয় অবনতি বৃদ্ধি হইতেছে। দেশের ধনী মহোদয়গণ যদি কৃপা করিয়া শিল্প বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেন, তাহা হইলে অনেক দরিদ্র ভদ্রলোকের জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় হয়। বাস্তবিক, ধনিগণ নির্ধনদিগের দুর্দ্দশার প্রতি মনোযোগ না দিলে উপায়ান্তর দেখা যায় না। ধনীর সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে না।

শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতির জন্য কতকগুলি কোম্পানি গঠিত হওয়া আবশ্যক। তাঁহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া স্থানে স্থানে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবেন ও যাহাতে শিল্পজাত দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয় তাহার সুবন্দোবস্ত করিবেন। সেই সকল দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সহর ও পল্লী-গ্রামে আড়ত ও দোকানের আবশ্যক। তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পিগণকে দাদন দিলে তাহারা বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া যোগাইতে পারিবে এবং অধিক কাটতি হইলে ক্রমশঃ শিল্পজাত সকল দ্রব্যই অল্প দরে বিক্রীত হইবে। বিদেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্য যে একবারে বন্ধ করিতে হইবে আমরা এমন কথা বলি না। গবর্ণমেণ্ট যে বহির্বাণিজ্য তালিকা প্রকাশ করেন তাহা হইতে দেখা যায় যে, এদেশের কৃষি ও শিল্পজাত অনেক দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। সেই রপ্তানিদ্বারা যে এদেশের আর্থিক অবস্থা কতক পরিমাণে উন্নত হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে কেবল যে বিদেশীয়গণই এই বহির্বাণিজ্য চালাইয়া লাভ করিতেছে এবং তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে আমাদের অন্ন-রূপ রক্ত শোষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। আমরা যাহাতে এই বাণিজ্য চালাইতে পারি ও দেশের লোকের উপযুক্ত অন্ন রক্ষা করিতে পারি, তাহার বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং বিদেশী শিল্পদ্রব্যের আমদানি যত কম হয় ততই আমাদের দেশের মঙ্গল। মোট কথা এই যে, এদেশের অর্থ যাহাতে বৃদ্ধি হয়, ও এ দেশেই ব্যয়িত হইতে পারে, তাহার উপায় ও বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই এদেশের দারিদ্র্য ঘুচিবে।

জাতীয় মহাসমিতি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ভাণ্ডার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ প্রসারিত হইতেছে। এই সকলের ক্রমোন্নতি ও স্থায়িত্ব একান্ত বাঞ্ছনীয়। এখন পর্য্যন্ত এগুলির কার্য্য যে ভাবে সম্পাদিত হইতেছে তাহা বিশেষ প্রশংসিত নহে। বিশেষতঃ সমগ্র বঙ্গের জাতীয় ধনভাণ্ডারের মূল্য লক্ষ মুদ্রাও অনধিক, ইহা বঙ্গ প্রদেশের গৌরব-সূচক নহে। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ছাত্রগণকে বিদেশে পাঠান হইতেছে, তাহারা শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলে দেশের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের বিদ্যার কার্য্যক্ষেত্র কোথায়? কার্য্যক্ষেত্রের অভাবে দেশের শিক্ষিতগণেরই যে উপার্জ্জিত বিদ্যা পুঁথিগত-প্রায় হইয়াছে স্থনিপুণ শিল্পিগণও যে হস্ত-পদ-বিহীনের ন্যায় অথবা কুলিগিরি করিয়া দিন যাপন করিতেছে? সেই জন্য বলি যে, যাহাতে স্থানে স্থানে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, অচিরে তাহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। দেশের ধনী ও নেতাগণ এ বিষয়ে যত্নবান না হইলে তাহাদের শিক্ষার কোন ফল ফলিবে না। এখানে ইহা বক্তব্য যে, শিল্প সম্বন্ধে আমাদের দেশেও শিখিবার অনেক জিনিষ আছে এবং শিক্ষকেরও অভাব নাই, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যেন এ কথা বিস্মৃত না হন।

শিল্প ও কৃষি শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব হইতে কিছু কিছু ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা এত অল্প যে, তাহাতে বিশিষ্ট উপকার সম্ভবপর নহে। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে শিল্প ও কৃষিশিক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত ও ব্যয় করেন তদ্বিষয়ে আমাদের আন্দোলন আবশ্যক। রাজপুরুষদিগের অযথা স্বজাতিপ্রেম ও পক্ষপাতিত্ব থাকিলেও প্রজার মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্য যে তাঁহারা দায়ী, এ কথা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে জানাইলে নিশ্চয়ই আমরা কতক পরিমাণেও সফল মনোরথ হইব। বর্ত্তমান কালে শিল্প বিজ্ঞান ও কৃষির উন্নতির উপরই যখন আমাদের জাতীয় উন্নতি এমন কি আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তখন সে বিষয়ে আমরা যতই মনোযোগী ও যত্নবান হইতে পারি ততই আমাদের মঙ্গল।

গবর্ণমেণ্ট যাহাতে আমাদের দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রণালী বিস্তারিত করেন তদ্বিষয়ে সকলের একযোগে চেষ্টা করা উচিত। স্বায়ত্তশাসনের বিস্তার না হইলে আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ পাইবে না, স্বাধীন প্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইবে না। দেশের অবস্থা আমরা যতদূর জানি ও বুঝি, ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ

ততদূর জানিতে ও বুঝিতে অসমর্থ, এবং সেই জন্য বিচার-বিভ্রাট প্রভৃতি অনর্থ ঘটিয়া থাকে। স্বায়ত্ত-শাসনের সহিত রাজনৈতিক ও নৈতিক উন্নতি সম্পূর্ণ সংস্পৃষ্ট। আজ কাল গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয়দিগকে প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা এতই অল্প যে, তদ্দ্বারা জাতীয় উন্নতির বিশেষ সাহায্য হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। দেশের লোকের প্রতি যাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস জন্মে ও দেশের যোগ্য লোক উচ্চ পদে নিযুক্ত হন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সর্ব্বদা আন্দোলন করিতে হইবে। পক্ষপাতী রাজনীতি সমূহ অমঙ্গলের কারণ; আমরা আশা করি, আমাদের সুসভ্য ও ন্যায়বান গবর্ণমেণ্ট অচিরে সেই রাজনীতি পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন; তাহাতে যে গবর্ণমেণ্টেরও সমূহ লাভ ও মঙ্গল হইবে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট থাকাতেই ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে জাতীয়তা ও একতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টও এতাবৎ কাল নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বদা এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত; ইহার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব-প্রার্থী। গবর্ণমেণ্ট যাহাতে লোক-প্রিয় হয়, ইংরাজ কর্ম্মচারীদের তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া তদনুরূপ প্রণালীতে শাসন কার্য্য পরিচালন অতীব কর্ত্তব্য। প্রজার মঙ্গল ও উন্নতি যে সকল সভ্য গবর্ণমেণ্টেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত।

সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে, বর্ত্তমান ভারতে জাতীয়তার সুবিধাজনক নানাবিধ উপাদান উপস্থিত হইয়াছে। সেই উপাদানগুলির দ্বারা ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবাসীর অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। এখন প্রত্যেক প্রদেশে কতকগুলি দেশহিতৈষী, উদার-প্রকৃতিক, বিচক্ষণ, স্বার্থশূন্য, সাহসী, স্বাধীনচেতা পরিশ্রমী লোকের আবশ্যক। এরূপ লোকের সংখ্যা যতই অধিক হয় ততই দেশের মঙ্গল। এই সকল লোক এই উপাদানগুলির সাহায্যে প্রথমতঃ যাহাতে সমস্ত ভারতবাসীকে স্বদেশানুরাগী করিতে ও একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, অল্প প্রয়াসেই তাঁহাদের সেই চেষ্টা ফলবতী হইবে। সহর ও পল্লীগ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশপ্রেম ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে এবং স্বদেশ জাত দ্রব্য ব্যবহার করিলেই যে দেশের লোকের অন্নসংস্থান হইবে সাধারণকে

বিশদরূপে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। জমিদারগণ যাহাতে কৃষির উন্নতির দিকে মনোযোগী হন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হইবে। শিল্পের পুনরুদ্ধার ও শিল্প-যন্ত্রের উন্নতির জন্য বিশেষরূপ যত্ন ও আগ্রহ দেখাইতে হইবে। এত দিন বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা আমাদের দেশীয় শিল্প বিনষ্ট হইয়াছে ও শিল্পিগণ দুরাবস্থাপন্ন হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। উৎসাহ-হীন শিল্পীদিগকে অর্থ দান করিয়া উৎসাহিত করিতে হইবে। দেশের শিক্ষিত অবস্থাহীন ভদ্রবংশীয় লোক যাহাতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় এবং আপনার শিক্ষার ফল নিরক্ষরগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিলে যে সমস্ত ভারতবর্ষের লোক ধনী হইয়া উঠিবে, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। তবে ইহাতে যে দেশের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার বিলক্ষণ উন্নতি হইবে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর্থিক উন্নতি হইলে দেশব্যাপ্ত দুর্ভিক্ষ ও রোগের উপশম হইবে, চুরী ডাকাতী প্রভৃতি পাপাচার কমিয়া যাইবে এবং দেশের সাধারণ লোক অপেক্ষাকৃত সুখ স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির চেষ্টাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ, অভাবগ্রস্ত মনুষ্যের সে চেষ্টা অসম্ভব। সুতরাং যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের অভাব পূরণ হইতে পারে, এস আমরা সকলে কাল বিলম্ব না করিয়া, আলস্য ও স্বার্থ পরিত্যাগ করতঃ সেই সকল সর্ব্ব-মঙ্গলকর উপায় অবলম্বন করি ও দেশ উদ্ধার ব্রতে ব্রতী হইয়া প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী নামের যোগ্য হই। সকলে কায়মনোবাক্যে যত্ন করিলে যে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর দুর্গতি ঘুচিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পরাধীন জাতীর উচ্চাভিলাষ থাকিতে পারে না, কারণ সে অভিলাষ পূর্ণ হইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের সাধারণ লোকের উদরান্নের উপায় হইলেই যথেষ্ট জাতীয় উন্নতি হইবে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সমাজ।

আমরা দেখিতে পাই এবং ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল জাতিই সমাজ বন্ধনে একত্রে বাস করে। সভ্য অসভ্য, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের লোক আপন আপন সামাজিক প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া চলে। লিপিবদ্ধ আইন অনুসারে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী পরিচালিত হয়, কিন্তু সামাজিক সকল কার্য্যের জন্যই লিখিত ব্যবস্থা নাই; চিরন্তন প্রথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমাজভুক্ত ব্যক্তি আচার ব্যবহার করিয়া থাকে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যেমন রাজার কর্ত্তব্য, তেমনি পাপাচারের প্রতিবিধান ও নিবৃত্তি সমাজের কার্য্য। রাজশাসন ও সমাজ-শাসন উভয়ই সমভাবে সাধারণ হিত সাধন করিয়া থাকে, জাতীয় চরিত্রের গঠন, সংস্কার ও উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত অনেকানেক দুষ্কর্ম্ম আইনানুসারে দণ্ডনীয় না হইলেও সামাজিক ব্যবস্থানুসারে দণ্ডনীয়। সুতরাং একজন অপরাধী আইনের চক্ষে নির্দ্দোষী বলিয়া অব্যাহতি পাইলেও সমাজ তাহাকে শাস্তি দিতে ক্রটী করে না এবং ইহা দ্বারা সাধারণের মঙ্গল সাধিত হয়।

প্রাচীন কালে হিন্দু সমাজ সুশৃঙ্খল ও প্রবল ছিল। সাধারণ কার্য্যের সুবিধার জন্য বৃত্তি অনুসারে আর্য্যগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন এবং অনার্য্য শ্রমজীবিগণ নিকৃষ্ট শূদ্র কিম্বা দাস-শ্রেণীভুক্ত ছিল। এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেক জাতির মধ্যে সদ্বংশীয় শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক সকল সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন এবং ধর্ম্মই সামাজিকতার মূল ভিত্তি ছিল। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সম্পত্তিশালী ব্যক্তিই সমাজের নেতৃত্ব পদে বরিত হইয়া থাকে, কারণ অর্থ ই পাশ্চাত্য জাতির একমাত্র উপাস্য দেবতা। প্রকৃত হিন্দু অর্থকে অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ও সকল অনর্থের মূল মনে করিয়া, সদ্বংশজাত চরিত্রবান্ লোককে, নিঃস্ব হইলেও, সমাজের নেতৃত্বপদে বরণ করিয়া থাকেন। সমাজের নেতাগণ সৎস্বভাব ও উচ্চমনা না হইলে সেই সমাজভুক্ত লোক সমূহের উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতে হিন্দু রাজাই সমাজ-রক্ষক ছিলেন; এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির প্রবর্ত্তক ছিলেন। ত্রৈশিক গুণসম্পন্ন উদারচেতা ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ রাজার মন্ত্রিত্ব করিতেন। প্রজাগণ

যাহাতে নিরাপদে ঐহিক ও পারত্রিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পারে এবং জনসমাজে যাহাতে পাপাচার পরিবর্দ্ধিত না হয়, তদ্বিষয়ে রাজার ও রাজ-মন্ত্রিবর্গের বিশেষরূপ দৃষ্টি ছিল। প্রজাগণও রাজার অভিপ্রায় অনুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মের ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিত। সমাজের উপরই বিচার ও শাসন-প্রণালী ন্যস্ত ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়তগণ বিচারকের কার্য্য করিতেন এবং সমাজবিধি লঙ্ঘনকারীদিগকে শাস্তি দিতেন। অসত্য, ব্যভিচার, পানদোষ, চুরি প্রভৃতি দণ্ডনীয় অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইত এবং অপরাধি-গণকে সমাজচ্যুত হইতে হইত। সমাজ-নিষ্ক্রান্ত ব্যক্তিকে নানাবিধ অসুবিধা সহ্য করিতে হইত। আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশিগণ তাহার সহিত আহার, এমন কি বাক্যালাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিত; রজক তাহার বস্ত্র ধৌত করিত না এবং নাপিত তাহার ক্ষৌর কর্ম্ম ত্যাগ করিত। এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা সহ্য করিয়া থাকা নিতান্ত কষ্টকর, সুতরাং সকলেই সমাজকে ভয় ও সম্মান করিয়া চলিত। এই প্রকারে সমাজ শাসন দ্বারা মনুষ্য চরিত্র গঠিত হইত, সমাজভুক্ত কোন লোক যথেচ্ছাচারী হইতে পারিত না।

সামাজিক প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া গ্রামের ধনী নির্ধন, ভদ্র ইতর, সকল লোক পরস্পরকে সাহায্য করিতে ও পরস্পরের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইত। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ উপলক্ষে হিন্দুকে কতকগুলি অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়; প্রতিবেশিগণের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই সকল কার্য্যোদ্ধার করা অসম্ভব, সুতরাং সকলেই সাহায্য করিতে তৎপর হইত। কেহ বা অর্থদান করিয়া, কেহ বা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য করিত। কোন প্রতিবেশী এরূপ বিষয়ে সাহায্য করিতে বিমুখ হইলে তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইত। গ্রামের কোন পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক অপরাধ করিলে প্রধান প্রধান লোক কোন সাধারণ স্থানে কি কাহারও বাটীতে সমবেত হইয়া তদন্ত ও বিচার পূর্ব্বক দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিতেন। বর্ত্তমান বিচার প্রণালীর সহিত তুলনা করিলে বলা যায় যে, সেই গ্রাম্য বিচার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল, কারণ তদ্দ্বারা প্রকৃত দোষীই দণ্ডিত হইত। সাক্ষিগণ সরল-প্রকৃতিক ও সত্যপ্রিয় ছিল এবং অপরাধীও বিচারকের মধ্যে উৎকোচ-গ্রাহী পুলিষ ও সত্যনাশক উকিল মোক্তার না থাকাতে বিচার বিভ্রাট ঘটিত না। বিচারকগণ অবৈতনিক সুতরাং স্বার্থশূন্য এবং দুষ্টের দমনদ্বারা আপন আপন গ্রামের মঙ্গলের জন্য কৃতসঙ্কল্প, সুতরাং তাঁহারা যে যথার্থ বিচার

করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক, হিন্দুসমাজ দ্বারাই হিন্দুর চরম নৈতিক উন্নতি হইয়াছিল।

কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে,আজকাল হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলাবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়াছে। পাশ্চাত্যগণের চরিত্রগত দোষগুলির অনুকরণ করিয়া আমরা স্বার্থপর অধার্ম্মিক হইয়াছি, বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনকে নেতা ও উপদেশক বলিয়া সম্মান করিতে ইচ্ছুক নহি, সমাজকে ভয় না করিয়া প্রকাশ্যভাবে যথেচ্ছাচার করিয়া থাকি। হিন্দুবংশোদ্ভব বলিয়াই আমরা হিন্দু নামে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরা হিন্দুত্ব-বর্জ্জিত হইয়াছি। অখাদ্য ভক্ষণ, সুরাপান, পরস্ত্রী-গমন হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, কিন্তু আমরা শাস্ত্রের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অনায়াসে সেই সকল পাপাচার করিতেছি। আর আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এখন আর সেই সকল পাপাচারীদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হয় না, কাজেই পাপের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। শিক্ষিত ও সভ্য নামধারিগণ প্রকাশ্যভাবে সমাজকে অবমাননা করিয়া নিজ নিজ কুশিক্ষা ও কুচরিত্রের পরিচয় দিয়া থাকেন, আর সমাজ তাহাদের দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি না দিয়া প্রশ্রয় দিতেছেন। দেশের অশিক্ষিত অসভ্য জাতিদের মধ্যে এখনও সমাজ-শাসন প্রবল আছে, তাহারা সামাজিক নিয়মাবলম্বনকারীকে এখনও সমুচিত দণ্ড দিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা সামান্যরূপ ইংরাজী শিক্ষা করিয়া সভ্য বলিয়া অহঙ্কার করে, তাহারা সমাজকে অনায়াসে পদদলিত করিতেছে। এই সকল অল্পশিক্ষিত লোক তর্ক করিয়া থাকে যে, খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের কোনরূপ সংশ্রব নাই; তাহারা হিন্দুশাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ ও সুরাপান করিয়াও হিন্দু-সমাজভুক্ত থাকিবার যোগ্য। খাদ্যের উপর মনুষ্যের মনোবৃত্তি নির্ভর করে। ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জন্তু যেরূপ হিংস্র ও উগ্রপ্রকৃতিক হয়, মাংসাশী মনুষ্যও যে সেইরূপ উগ্রস্বভাব ও পরদ্বেষী হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে খাদ্যের বিভিন্নতা হইয়া থাকে; শীতপ্রধান দেশের লোক যথেচ্ছ মাংস ভক্ষণ ও প্রচুর মদ্যপান করিয়াও কষ্ট বোধ করে না, কিন্তু আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মাংস ও মদ্য বিষবৎ অপকার করিয়া থাকে। মনুষ্যের স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘায়ুর জন্য হিন্দুশাস্ত্র খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়া কতকগুলি খাদ্যকে অভক্ষ্য বলিয়া পরিবর্জ্জন করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং সেইজন্যই হিন্দুসমাজও সাধারণের মঙ্গলের অভিপ্রায়ে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্য

ভক্ষণকারীকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাত্ত্বিক আহার দ্বারা মনুষ্য সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হয়, আর পাশবিক আহার তমোগুণ উৎপাদন করে; হিন্দুধর্ম্ম মনুষ্যকে সাত্ত্বিক অর্থাৎ প্রকৃত মনুষ্য করিতে যত্নবান্ এবং সেইজন্যই মনুষ্যত্ব-নাশক দ্রব্যের ব্যবহার অকর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, আর হিন্দু সমাজ যাহাতে সেই উপদেশগুলি প্রতিপালিত হয় তাহার উপায় করিতে তৎপর। ভক্ষ্যদ্রব্যের উপর যে মনুষ্যের মনোবৃত্তি নির্ভর করে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের অনেক লোক আজকাল মাংস মদ্য পরিত্যাগ করিয়া নিরামিশ-ভোজী হইয়াছে।

সমাজ শাসনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে দুই মত হইতে পারে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে সমাজ শাসন পূর্ব্ববৎ বলবতী না হইলে আমাদের সম্পূর্ণ অধঃপতন অনিবার্য্য। দেশের শিল্প বাণিজ্য বিদেশীয়গণের করায়ত্ব হওয়াতে আমাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি হইয়াছে এবং সেই জন্য দেশব্যাপ্ত দুর্ভিক্ষের প্রকোপে প্রতি বৎসর অনেক লোক অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এতদিন পরে আমরা ইহা বুঝিতে পারিয়া স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কর্ত্তব্য বলিয়া আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং অনেকে সভাসমিতিতে স্বদেশী প্রতিজ্ঞা করিতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই সকল প্রতিজ্ঞাকারিগণের মধ্যে অনেকে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় বিদেশী কাপড় চিনি প্রভৃতি ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল কাপুরুষকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ একটি পাপ, আইনের চক্ষে ইহা দোষ নহে। সুতরাং সমাজ এইরূপ অপরাধীকে শাস্তি না দিলে আমাদের স্বদেশী আন্দোলন ফলপ্রদ হইবে না। হিন্দুর ন্যায় মুসলমানদিগের মধ্যেও সমাজ শাসন প্রণালী বিদ্যমান আছে। দেশীয় শিল্প দ্রব্য ব্যবহার করিলে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পিগণ যে সমভাবে উপকৃত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব যে সকল হিন্দু ও মুসলমান স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার না কয়িয়া বিদেশী জিনিস ব্যবহার করিবে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নেতাগণ তাহাদিগকে অনায়াসে সমাজচ্যুত করিতে পারেন; তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা নাই, কারণ তাহা হইলে আইন-বিরুদ্ধ অপরাধের জন্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়া স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিবার

সুবিধা পাইবেন। ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, যে সকল অবস্থাহীন লোক স্বদেশী মূল্যবান্ জিনিষ ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাহাদের প্রতি সমাজের কোনরূপ অত্যাচার অবিধেয়। স্বদেশী দ্রব্য সস্তা হইলে ক্রমশঃ সকল অবস্থার লোকেই ব্যবহার করিতে পারিবে। আপাততঃ অবস্থাপন্ন লোক সকল যাহাতে কেবলমাত্র স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজ তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইলে আশু মঙ্গলের বিশেষ সম্ভাবনা এবং সেই উদ্দেশ্যে আমরা এই "সমাজ" প্রবন্ধটীর অবতারণা করিলাম। এই সময়ে আমাদের মৃতপ্রায় সমাজ পুনর্জীবিত হইয়া ইহার শাসন-প্রণালী বিস্তার করিলে স্বদেশী আন্দোলন অশানুরূপ ফলপ্রদ হইবে।

দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ

সসর্প গৃহ কিম্বা হিংস্রপশু-সমাকুল অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া যেমন সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হয়, ভারত ভূমির বর্ত্তমান অধিবাসিগণও প্রতিনিয়ত দুর্ভিক্ষরূপ করাল-বক্র রাক্ষসের ভয়ে প্রায় সেইরূপ সন্ত্রস্ত। যেমন মকর কুম্ভীরাদি হিংস্র জলচরগণের সমুদ্র বা তন্নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে বাস, এবং তৎ-স্বভাবসম্পন্ন চতুষ্পদাদিগণের অরণ্যমধ্যে বিচরণই স্বাভাবিক, মরুভূমি বা অল্পশস্য দেশসমূহেই দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের উপযুক্ত আবাস স্থান হওয়া সেইরূপ সাধারণ যুক্তি-সম্মত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য দোষে এ যুক্তি বর্ত্তমান কালে অসার বা কাল্পনিক। ইংলণ্ড প্রভৃতি অল্পশস্য দেশ সুর্ভিক্ষের লীলাস্থল, এবং বহুশস্য-শালিনী ভারতভূমি দুর্ভীক্ষের অভিপ্সিত নিকেতন। এই নিদারুণ রাক্ষসাতঙ্ক বর্ত্তমান বৎসর বা ইহার দুই চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে এদেশে উপস্থিত হয় নাই; খৃষ্টীয় ১৮৭৭ অব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরই বহু-সংখ্যক ভারতবাসী মানব গবাদি ও পশু এই নির্দ্দয় রাক্ষসের দশন পীড়নে নিষ্পীড়িত হইয়া ইহার কবলিত হইতেছে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কর্ষিত ভূমি ও তৎসহ উৎপন্ন কৃষিজাত ক্রমাগত যে পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এই লোক-ক্ষয়কর দানবের প্রভাবও তৎসহ প্রায় সমরূপ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার আক্রমণ যে কিরূপ ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না; তাহা যথাযথ প্রকাশ করিবার উপযোগী

ভাষা এখনও সৃজিত হয় নাই। ১৮৬৬ সালের পর হইতে বঙ্গপ্রদেশ ইহার আক্রমণ হইতে কতকপরিমাণে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিলে নিতান্ত পাষণ্ড-প্রকৃতিকেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; সে কাহিনী প্রকাশের ভাষা, নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও, হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রকেই বিচলিত করে। বুভুক্ষিত, জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কালসার প্রেতাকার মূর্ত্তিগণ যখন একমুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিতে থাকে; অন্নাভাবে তাহাদের স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গ জঠরানলে দগ্ধ হইয়া তাহাদের সমক্ষেই জীবন বিসর্জ্জন দিতে থাকে; এবং প্রতিপালক-স্থানীয়, কিন্তু নিরুপায় পিতা বা স্বামী শক্তি-বিহনে কপালে করাঘাতেও অসমর্থ হইয়া কেবলমাত্র অবিরল অশ্রুধারা অভিষিক্ত হইয়া সেই দৃশ্য দর্শন করিতে বাধ্য হয়, খাদ্যমাত্রের অসদ্ভাবে অখাদ্য ভোজনে বাধ্য হইয়া যখন তাহারা যন্ত্রণায় অন্তর্ভেদী চীৎকার করিতে থাকে, একমুষ্টি অন্নের আশায় যখন সপ্তাহকাল উপবাস-ক্লিষ্টগণ বহুদূর পথ অতিক্রমণের ক্লেশও স্বীকার করিয়া পথিমধ্যেই কালকবলে নিপতিত হইতে থাকে, অন্নের প্রত্যাশায় যখন জীবনের সম্বল সমস্ত অর্থ, ভূসম্পত্তি, তৈজসাদি, গৃহপালিত পশু ও বাসগৃহ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া শেষে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রাদিও বিক্রয় করিতে থাকে, অন্নাভাবে বিগতপ্রাণা জননীর অস্থিচর্ম্মসার শবদেহোপরি নিপতিত অবোধ শিশু স্তন্যপানে প্রবৃত্ত হইয়া যখন স্তন্যাভাবে ক্ষুৎপিপাসায় কাতরকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে এবং সেই অবস্থায় জীবন বিসর্জ্জন দেয়, তখন এই সকল মর্ম্মভেদী দৃশ্য দর্শনে ও নিদারুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণে নিতান্ত নির্ম্মম হৃদয়েরও মর্ম্মগ্রন্থি বিভিন্ন হইল বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু ইহারই নাম দুর্ভিক্ষ, এবং এই দুর্ভিক্ষই আজ ত্রিশবৎসর ভারতবর্ষে বাস করিতেছে! এবং প্রতি বৎসরই ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে এই দুর্ভিক্ষের আক্রমণ সংবাদ শ্রবণ করা যাইতেছে। তথাপি এপর্য্যন্ত ভারতবাসীর চৈতন্যোদয় হয় নাই; যে প্রদেশে যখন এই প্রচণ্ড রাক্ষস উপস্থিত হইতেছে, তখন সেই স্থানের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে এবং অপর প্রদেশের অধিবাসিগণকে মোহনিদ্রায় অভিভূত রাখিয়া আপনার ভবিষ্যৎ ক্ষুধাশান্তির উপায় অব্যাহত রাখিতেছে।

আমাদের একজন বন্ধু ১৮৬৬ সালের উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ সময়ের যে অতি লোমহর্ষণকর ব্যাপার বর্ণনা করেন, তাহার কিয়দংশমাত্র নিম্নে বিবৃত হইল। তিনি বলেন—"দুর্ভিক্ষ

পীড়িতগণকে চাউল বিতরণের ভার আমার উপর অর্পিত ছিল; কিন্তু প্রয়োজনের শতাংশের একাংশ পরিমিত চাউলও সে সময়ে সংগৃহীত ছিলনা। সুতরাং সে অবস্থায় যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহ করিতে হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না; সাধারণ লোকের বিশ্বাস, আমার হস্তে চাউলের ভাণ্ডার, সুতরাং প্রার্থনামাত্রেই আমার নিকট তাহারা উপযুক্ত পরিমাণ চাউল প্রাপ্ত হইবে; যখন সেই ক্ষুধাতুরগণের অভাব পরিপূর্ণ করিতে অক্ষম হইয়া এবং তাহাদের কাতরোক্তি ও আর্ত্তনাদ শ্রবণে অসমর্থ হইয়া প্রাঙ্গণের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতাম, তখন প্রাণের ভিতর যে কিরূপ ব্যাকুলতা উপস্থিত হইত, তাহা বর্ণনাতীত। যখন বহির্দ্বারে অসংখ্য ক্ষুৎপীড়িত আবাল বৃদ্ধ বনিতা অন্নের জন্য অহরহ চীৎকার ও মুহুর্মুহু অভিসম্পাত উচ্চারণ করিতে থাকিত, তখন নিজের নিতান্ত জঠর-জ্বালাও বিস্মৃত হইয়া, প্রস্তুত অন্ন তাহাদিগকে বিতরণ করিতে হইত। সে সময়ে সেই উপবাস-ক্লিষ্টগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম, খাদ্যাখাদ্য, লজ্জা ঘৃণা প্রভৃতি কিছুরই বিচার থাকিত না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একদিন একজন অপর পাত্রের অভাবে শৌচাগারের পাত্র অপহরণ করিয়া লইয়া, তাহাতেই ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া সেই পাত্রেই ভোজন করিতেছে; একদিন একজন কোন গৃহস্থের নিকট তণ্ডুলাভাবে কলাই ভিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, সিদ্ধ করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া জঠর জ্বালায় তাহা অসিদ্ধই উদরসাৎ করে, কিন্তু বহুদিনের উপবাস নিবন্ধন পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল হওয়ায় কিয়ৎক্ষণ পরে তাহা অজীর্ণাবস্থাতেই নিঃসারিত হইতে থাকে; তখন এক অতি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য অভিনীত হইল, পার্শ্বস্থ একজন সেই কলাই উঠাইয়া লইয়া গিয়া জলে ধৌত করিয়া তাহাই ভক্ষণ করিতে লাগিল; একদিন আর এক পৈশাচিক দৃশ্য দেখিয়াছিলাম; দেখিলাম, একজন নিকটস্থ এক মৃত ব্যক্তির হস্ত ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহা সামান্য অগ্নিতে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। এই বীভৎস ব্যাপার দর্শনে আতঙ্কে অভিভূত হইলেও অশ্রু সম্বরণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "হা অন্ন হা অন্ন" করিয়া লোক "মা—মা" শব্দে কাতর কণ্ঠে চীৎকার করিতে থাকিত, এক গণ্ডুষ ফেণের (ভাতের মাড়) জন্য দলে দলে লোক আসিয়া উপস্থিত হইত, উচ্ছিষ্ট পত্রও নালা নর্দমা হইতে এক একটী ভাত যত্নপূর্ব্বক খুঁটিয়া লইয়া ভক্ষণ করিত।"

দুর্ভিক্ষ বিবরণ আজকাল ভারতবর্ষে অতি অনায়াস-লভ্য; প্রতি

বৎসরেই বহু সাময়িক পত্রে উপরোক্তরূপ কাহিনী প্রকাশিত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহার আর বিশেষ পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। আমরা বলিয়াছি, ইহার প্রকৃত মূর্ত্তি বর্ণনেও ভাষার শক্তি নাই, অতি রঞ্জনের কল্পনা বহু দূরের কথা। ভাষার অক্ষমতা নিবন্ধনই বোধ হয় একপ্রদেশের লোক অপর প্রদেশের দুর্ভিক্ষ সংবাদে বিশেষ কাতর হয় না বা উপযুক্তরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করেনা এবং ইহার প্রতীকারের জন্যও বাস্তবিক আগ্রহ সম্পন্ন হয় না। কিন্তু আমাদের সর্ব্বপ্রদেশদর্শী ভারত গবর্ণমেণ্টও কেন যে দুর্ভিক্ষ দমনের প্রকৃত উপায় অবলম্বনে উদাসীন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। দুর্ভিক্ষের সাময়িক প্রকোপ দমনের জন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই সকল কার্য্যও অনেক সময়ে এরূপ বিলম্বে অবলম্বিত হয় যে, তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয়না। ১৮৬৬ সালের মেদিনীপুর দুর্ভিক্ষের সময় স্থানীয় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র লিখিয়াছিলেন:—

"I consider that if the relief works had been commenced earlier in the season, they would have done much more good. As it was, the people who applied for work were frequently so weak and emaciated that they were not fit for labour"

ভাবার্থঃ—আমার বিবেচনায় যদি দুর্ভিক্ষ দমনের কার্য্যগুলি ইহার প্রথমাবস্থায় আরম্ভ হইত, তাহা হইলে এই সকল কার্য্যে অধিকতর ফল লাভের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা না হওয়ায়, যে সকল লোক কার্য্যের জন্য উপস্থিত হইত তাহারা এরূপ দুর্ব্বল ও জীর্ণ শীর্ণ যে তাহারা শ্রমসাধ্য কার্য্যের অনুপযুক্ত।" বহুস্থলেই এইরূপ নীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। কতক সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত ও অবশিষ্টগণের অধিকাংশ উপবাস ক্লেশে জীর্ণ শীর্ণ না হইলে আর তাহাদের সাহায্যের জন্য উদ্যোগ হয় না। এবং উদ্যোগের পর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় দুর্দ্দশার পরিমাণ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে ২।১ দিন বিলম্বের ফলও সাংঘাতিক। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় প্রথমে চতুর্দ্দিক হইতে যে সকল সূচনা সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল, কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না; স্বপ্নাদেশ কিম্বা কোন ভৌতিক আদেশের সহায়ে তাঁহারা এ সকল সংবাদকে অমূলক বা অলীক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কোন অপরূপ যুক্তিবশে তাঁহাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, প্রজা ও মহাজনগণ গৃহমধ্যে ধান্যাদি লুক্কায়িত

রাখিয়াছে। শেষে বুভুক্ষিতগণ নানাস্থান হইতে আসিয়া সহরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, সহর যেন জীবিত পিশাচ মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, রুক্ষকেশ, রুক্ষদেহ, কোটরগত চক্ষু, শুষ্কোদর, চর্ম্ম মাত্রাচ্ছন্ন নরকঙ্কালগণের ক্ষীণকাতর কণ্ঠ নিনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষগণের সমক্ষেই উপবাস-ক্লিষ্টগণ জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। তখন তাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইল এবং অপর প্রদেশ ও বর্ম্মা প্রভৃতি স্থান হইতে চাউল আমদানীর বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! এই অযথা বিলম্বের ফল অতি শোচনীয় হইয়াছিল; দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোকের জীবন নষ্ট হইবার পূর্ব্বে চাউল আসিয়া পৌঁছিল না; এবং অবশিষ্ট-গণের অনাহারবশতঃ পরিপাক শক্তি এরূপ দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, চাউল উপস্থিত হইলেও, তাহা জীর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা বিসূচিকা ও উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ সে সময় "হাতি ভোগ" নামক যে একপ্রকার নিকৃষ্ট জাতীয় চাউল আমদানী হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রস্তুত অন্নগুলি দেখিলে যেন মক্ষিকাস্তূপ বলিয়া বোধ হইত; তাহা জীর্ণ করা অতি বলিষ্ঠ লোকেরই সাধায়ত্ত, পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল হইলে তাহা নিতান্ত কুপথ্য।

বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গ প্রদেশের উপর দুর্ভিক্ষ রাক্ষস সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ক্ষুধার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়াই যেন এখনও অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। গবর্ণমেণ্টও চির আচরিত রীতি অনুসরণ করিয়া এ সংবাদ এখন বিশ্বাস করে নাই এবং দুর্ভিক্ষাতঙ্ক অমূলক বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। দেশের লোকও অনেকে নিঃশঙ্কে সময়াতিপাত করিতে-ছেন। চাউলের রপ্তানী সমভাবই হইতেছে। দুর্ভিক্ষ সূচনার পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক না হইলে যে কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতে পারে, ১৮৬৬ সালের উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। সুতরাং সূচনাসত্ত্বেও সাবধান না হওয়া যে নিতান্ত অর্ব্বাচীনতা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে উপরোক্ত মেদিনীপুরেও উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের অনুরূপ অবস্থা যে উপস্থিত হইতে না পারে, তাহার কোন কারণ নাই। দেশের লোকের চক্ষু উন্মীলিত না হইলে ভবিষ্যফল অতি শোচনীয় হইবে।

বঙ্গ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যে কিরূপ ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইবে, তাহা বোধ হয় অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন না। অপর প্রদেশ

অপেক্ষা এদেশের ভূমি উর্ব্বরা ; এপ্রদেশে বহুপরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়াথাকে ; অপর প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রধানতঃ বঙ্গপ্রদেশের শস্যই সেখানে প্রেরিত হইয়া থাকে! কয়েক বৎসর এপ্রদেশে অজন্মা হয় নাই বলিয়া সঙ্গতিপন্ন লোকেও সঞ্চয়ের অভ্যাস বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে প্রত্যেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরই গৃহে ধান্য সঞ্চিত থাকিত ; এখন সে প্রথা প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছে। এবৎসর এপ্রদেশে অল্প জন্মা হইলেও প্রতিদিন বহুপরিমাণ শস্য বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইতেছে। কোন কালেই যে বাস্তবিক অজন্মা উপস্থিত হইতে পারে না, তাহার কোন কারণ নাই। একবার সেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে, এপ্রদেশের লোক অতি অল্প দিনেই বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইবে। অনেকেরই গৃহে এক মুষ্টি শস্যও সঞ্চিত থাকে না ; বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আমদানীর সম্ভাবনাও অতি অল্প ; সুতরাং দুর্ভিক্ষের প্রথম অবস্থাতেই লোকের অতি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইবে।

দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান ও তাহার নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং বিভিন্ন সময়ে ইহার ভিন্ন ভিন্ন কারণ উল্লেখ করিলেও নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণকেই প্রধান বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

১মঃ। প্রবল বেগে ভারতের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ; যাঁহারা এই মতের পোষক তাঁহারা বলেন, এরূপ দ্রুতগতিতে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী হইবার বিচিত্র কি ?

২য়। ভারতের কৃষকগণ নিতান্ত অপরিণামদর্শী এবং তাহারা সঞ্চয়ী নহে ; যখন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অধিক হয়, তখন তাহারা নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে শস্যাদি নষ্ট করিয়া ফেলে ; কাজেই অজন্মার বৎসর তাহাদের দুর্দ্দশা ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে ?

৩য়। ভারতবর্ষের কুসীদজীবিগণই সমস্ত অনর্থের মূল ; তাহারা নানা উপায়ে কৃষককুলকে প্রতারিত করিয়া নিঃস্ব করিয়া ফেলে ; কাজেই কৃষকগণ চিরকালই ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং এক বৎসর অজন্মা হইলেই উপবাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

৪র্থ। যে দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, অজন্মার সময় তাহাদের অনাহার ভিন্ন আর উপায় কি ? উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অল্প হইলেই ভারতবাসিগণের উপবাস ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

এক্ষণে, উপরোক্ত কারণগুলির মধ্যে কোন্‌টী সত্য বা যুক্তিসঙ্গত, তাহা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, বিগত ১৯০১ সালের আদম-সুমারি বা লোকগণনার হিসাবে (Census Report) দেখা যায় যে, ১৮৯১ সালের পর হইতে দশ বৎসরে এদেশের লোকসংখ্যা প্রবলবেগে বা মন্দবেগে কি, আদৌ বৃদ্ধি প্রাপ্তই হয় নাই; তথাপি এই কয়েক বৎসরে এদেশে দুর্ভিক্ষের যে ভয়ানক পরাক্রম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন; ১৮৯৮ ও ১৯০০ সালের ন্যায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রভাব বহুদিন এদেশে দৃষ্ট হয় নাই। ১৯০১ সালের পর এ কয়েক বৎসরেও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রায় সমভাবে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট প্রদর্শিত প্রথম কারণটী একেবারে নিতান্ত অযৌক্তিক। ১৮৯১ সালের পূর্ব্বে কয়েকবারের ভারত ও ইংলণ্ডের লোক গণনার হিসাব দেখিলে জানা যাইবে যে, যদিও ঐ কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কতক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু সে বৃদ্ধির হার ইংলণ্ডের লোকবৃদ্ধির হার অপেক্ষা অনেক অল্প। যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধিই দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে এদেশে দুর্ভিক্ষ না হইয়া ইংলণ্ডেই সর্ব্বাগ্রে ভীষণতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহাদের সামান্যমাত্র জ্ঞান আছে তাঁহারাও সে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ক্রমাগত ধনবৃদ্ধিই দেখিতে পাইয়া থাকেন। তথাপি লোকসংখ্যা বৃদ্ধিকেই যাঁহারা দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা মূর্খ ভিন্ন অন্য আখ্যা প্রদান করিতে পারি না।

দ্বিতীয় কারণটি একেবারেই অমূলক। এদেশের কৃষকগণের সম্বন্ধে সামান্য মাত্র অভিজ্ঞতা-সম্পন্নগণও জানেন যে, ইহাদের ন্যায় মিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়ী কৃষক পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। তাহারা দুটী মোটাভাত ও পরিধানে মোটা কাপড় পাইলেই সন্তুষ্ট; আবকারী তাহাদের মধ্যে এখনও প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই; কৃষক গৃহিণীগণও কার্য্যকুশলা ও সর্ব্বথা তাহাদের পতির অনুবর্ত্তিনী; পরিধানে একখানি মোটা শাটী ও একজোড়া শাঁখা পাইলেই তাহারা চরিতার্থ। অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরই যাহাদের নিতান্ত অভাব, অযথা ব্যয়ের কল্পনাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সাম্বাৎসরিক গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহেই যাহাদের শক্তি নাই, অপর বৎসরের জন্য শস্য সঞ্চিত রাখা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহাদের সঞ্চয়ের

মধ্যে বীজধান্য ও সার; এদেশের কৃষক উপবাস স্বীকার করিয়াও এগুলি যেরূপ সযত্নে রক্ষা করে, অপর কোন দেশেই তাহা সম্ভব নহে। বাসগৃহের চালে খড় না থাকিলেও তাহারা কখনই গো মহিষাদির খাদ্যের জন্য সঞ্চিত খড় বাসগৃহের জন্য ব্যয় করে না। তথাপি যদি এদেশের কৃষকগণ অমিত-ব্যয়ী ও অসঞ্চয়ী হয় তাহা হইলে এই দুইটী শব্দের ভিন্নরূপ অর্থ থাকাই সম্ভব; এবং যাহাদের এরূপ ধারণা, তাহাদের এই বিপরীত অর্থবোধক অভিধান প্রস্তুতে যত্নবান হওয়া উচিত। নচেৎ, অকারণ যাহারা এই নিরীহ-গণের উপর সমস্ত দোষ ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করে, বাতুলালয়ই তাহাদের উপযুক্ত আশ্রয়।

তৃতীয় কারণটী নিতান্ত অমূলক না হইলেও, ঋণদাতাগণই যে এই শোচনীয় অবস্থার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী, একথা কিছুতেই বলা যায় না। হাতে পয়সা নাই, অথচ জমীদারের পাইক যখন খাজনার জন্য কিম্বা পঞ্চায়তের লোক চৌকীদারী ট্যাক্সের জন্য ও সরকারী কর্ম্মচারী অপর করের জন্য উৎপীড়ন আরম্ভ করে, তখন মহাজনগণ কি কৃষকগণের বন্ধুস্থানীয় নহে? খাজানাদি না দিলে যখন তাহাদের মানসম্ভ্রম, জোতজমা, হালগরু, এমন কি বাস্তভিটাটী পর্য্যন্ত বিক্রীত হইবার উপক্রম হয়; যখন পাইকের দৈনিক খোরাক ও তলবানা এবং জরিমানা প্রভৃতি তাহাদের স্কন্ধে চাপিতে থাকে, তখন ঋণ না পাইলে তাহাদের উপায়ান্তর কি? এই ঋণের সুদের হার যে অত্যন্ত অধিক তাহা সত্য; কিন্তু নানা কারণে, কখন কখন ইহার আসল পর্য্যন্ত আদায় হয় না; আবার আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে তাহার খরচায় সুদের কথা কি, আসলেরও সময়ে সময়ে ঘাটতি পড়িয়া থাকে। সুতরাং মহাজানর স্কন্ধে সমস্ত দোষার্পণ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। শক্তি সত্বে সাধ করিয়া কেহ কখন ঋণ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় না; অর্থাভাবই এই ঋণ গ্রহণের কারণ। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কোন গতিকে পূরা ফসল উৎপন্ন করিতে পারিলেই তাহাদের এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান হইতে পারে ও এক বৎসর অজন্মা অথবা অর্দ্ধেক ফসল হইলে তাহাদের বীজের দাম, কৃষির খরচ প্রভৃতি যোগাইয়া খাজনাদি ও অন্ন বস্ত্র সংস্থানের কিছুমাত্র উপায় থাকে না। সকল বৎসরেই পূরা ফসল উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অল্প-জন্মা বা অজন্মার বৎসর ঋণ গ্রহণ ব্যতীত কৃষকের অন্য গতি নাই এবং একবার ঋণগ্রস্ত হইলে তাহা পরিশোধেরও আর সম্ভাবনা থাকে না।

তাহার পর চতুর্থ কারণ। অপর অবলম্বন বিনষ্ট-প্রায় হওয়ায় আমরা আমাদের দেশের উৎপন্ন শস্যের উপরই প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করি সত্য; কিন্তু দেশ-ব্যাপী শস্যাভাব ভারতবর্ষে কখনই উপস্থিত হয় না; যেরূপ অজন্মা হউক না কেন, দেশোৎপন্ন শস্যের অভাবে ভারতকে অপর দেশের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিতে হয় না; বরং অজন্মার বৎসরেও বহুকোটী মণ চাউল গোধূম প্রভৃতি বিবিধ শস্য এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া অপর দেশের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে, এবং এদেশের লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। সুতরাং মৃত্যু স্বীকার করিয়াও আমরা অন্ন বিক্রয়েই বাধ্য হইয়া থাকি। আমাদের এরূপ অর্থাভাব যে, দেশের অন্নই আমরা দেশে থাকিয়া ক্রয় করিতে পারি না। অন্নের অপেক্ষা আমাদের অর্থের এরূপ প্রয়োজন যে, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও দেশের অন্ন রক্ষা করিতে পারি না। বোম্বাই প্রদেশে অন্নকষ্ট উপস্থিত, কিন্তু সে প্রদেশের লোক এরূপ নিঃস্ব যে, অপর দেশের লোক জাহাজে ভাড়ার ব্যয় স্বীকার করিয়াও যেরূপ উচ্চদরে বঙ্গ প্রদেশের চাউল ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে পারে, সেরূপ অধিক মূল্য প্রদানে বোম্বাই প্রদেশের লোকের সামর্থ্য নাই; সেই জন্যই সে সময়ে বঙ্গ প্রদেশের অন্ন বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়। এই অর্থাভাবই এদেশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের মৃত্যুর কারণ, দেশোৎপন্ন শস্যের অভাব নিবন্ধন নহে। অধুনা যেমন এদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবি, কর্ষিত ভূমির পরিমাণও সেইরূপ বহুপরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং কৃষিজীবিগণের সংখ্যাবৃদ্ধিও দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ হইতে পারে না।

আমরা উপরোক্ত সকল কারণ গুলিরই অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়াছি; ইহাদের প্রত্যেকটীই যদি দুর্ভিক্ষের কারণ না হয়, তাহা হইলে ইহার বাস্তবিক কারণ কি, তাহা পর্য্যালোচনা করা উচিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেশের দারিদ্র্যই আমাদের বিনাশ সাধন করিতেছে। "দারিদ্র্য দোষাহি গুণরাশি হন্তি"। মূর্খতা, স্বার্থপরতা, স্বাস্থ্যহানিতা ও ধর্ম্ম হীনত্ব প্রভৃতি সকল দোষেরই প্রধান আকর দারিদ্র্য। ইহার জন্যই দেশ অন্নহীন, ক্রিয়াহীন, বুদ্ধিহীন, শক্তিহীন ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিহীন। এই দারিদ্র্য দোষেই দেশের লোক পশু-প্রকৃতিক এবং অপর দেশের লোকের নিকট পশুবৎ ঘৃণিত। আমরা পরাধীন বলিয়াই বৈদেশিকগণের নিকট ঘৃণিত নহি; ইহুদী আর্ম্মিনিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয়গণ সম্পদের প্রভাবে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সম্মান ও প্রতিপত্তির সহিত বাস করিতেছে, আর আমরা সুসভ্য ইংরাজ রাজের অধীনে বাস করিয়াও

দারিদ্র্য নিবন্ধন দুর্দশা-গ্রস্তের ন্যায় কাল যাপন করিতেছি। দরিদ্রের মনে থাকে না, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, চরিত্র-বল থাকে না ওআত্মমর্য্যাদা বোধ থাকে না। নিতান্ত উদার-হৃদয় ভিন্ন অপরের দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি থাকে না। রুষরাজ্যে ইহুদীয়গণের প্রতি ও তুরস্ক রাজ্যে খৃষ্টিয়ানগণের প্রতি অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল, আর সমগ্র জগতের লোকের চক্ষু তৎপ্রতি কাতর ভাবে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু এই দরিদ্রের দেশে অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও আমাদের রাজার জাতির দেশেও প্রায় কেহ তাহার সংবাদ রাখেন না। সে দিন বিলাতের শ্রমজীবিগণের উচ্চশিক্ষা সমিতিতে ভারত হিতৈষী মহামতি সার উইলিয়ম ওয়েডারবরণ সাহেব সমবেত গণকে ভারতের অবস্থা বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন "লণ্ডনের পথে দশজন লোককে অনাহারে মৃত্যুগ্রস্ত দেখিলে আমরা মর্ম্মাহত হই, কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু-সংখ্যা দশ বা শতকিম্বা সহস্র, অথবা অযুত সংখ্যায় গণনা করা হয় না; কিন্তু এইরূপ মৃত্যু লক্ষ বা দশলক্ষ করিয়া সংখ্যা করিতে হয়। ১৮৭৮-৭৯ সালের দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়, নিরীহ নরনারী, বালক এবং বালিকাগণ ইহাদের অধিকাংশই কৃষক শ্রেণীয়; এই সমগ্র লণ্ডন সহরের অধিবাসিগণের সমান-সংখ্যক মানব-দেহ অনাহারের নিদারুণ সময় ব্যাপী যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে পঞ্চভূতে লীন হইয়া গেল। ১৯০০ সালে আবার ইহার অপেক্ষা অধিক স্থানব্যাপী ভীষণতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল: এবং দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য বিশেষ-চেষ্টা সত্ত্বেও সাড়েবারলক্ষ লোক মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্টে এই মৃত্যু-সংখ্যা দেখিয়া থাকিবেন; কিন্তু এই দুর্ঘটনা পরম্পরার সম্বন্ধে অতীব প্রয়োজনীয় তথ্য বোধ হয় কেহই অনুভব করেন নাই; ইহার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, এই সকল দুর্ভিক্ষ কোন ক্রমে শস্যের দুর্ভিক্ষ নহে। যে সপ্তাহে দুর্ভিক্ষের অতি শোচনীয় অবস্থা এবং যেস্থানে ইহার আক্রমণ অতি ভীষণ, সে সপ্তাহে সেই স্থানেই সাধারণ মূল্যে প্রচুর শস্য সর্ব্বদাই উপস্থিত ছিল; শস্যাভাব দুর্ভিক্ষ-জনিত মৃত্যুর কারণ ছিল না কিন্তু শস্যক্রয়ের অর্থাভাবই ইহার মূল। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ ইহা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"তবে কি এই লক্ষ লক্ষ লোক প্রচুর খাদ্যের নিকট উপস্থিত থাকিয়াও অনাহারে মরিয়া গেল ?" কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৮৯৭ ও ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনারগণ রিপোর্ট দিয়াছেন যে, এই দুই

বৎসরই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কোন স্থানেই কখনও শস্যের অভাব ছিল না। গবর্ণমেণ্টের (Custom Report) শুল্ক বিবরণ হইতেও এই উক্তি সমর্থিত হইয়াছে? ইহা হইতে দেখা যায় যে, দুর্ভিক্ষের সময়ও উদ্বৃত্ত শস্য রপ্তানী হইয়াছিল; আরও দেখা যায় যে, দুর্ভিক্ষ দমন কার্য্যে শস্যের পরিবর্ত্তে পয়সাই ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং এক আনা পয়সাতেই একজনের সমস্ত দিনের উপোযোগী খাদ্য বাজারে পাওয়া যাইত। কেবল মৃত্যু সংকল্প করিয়া লোক মরিয়া যায় নাই। সুতরাং খাদ্যের সমক্ষে উপস্থিত থাকিলেও লোকে অনাহারে মরিবার কারণ—তাহাদের একআনা মূল্যের খাদ্য সংগ্রহেরও অর্থাভাব এবং ঋণগ্রহণ শক্তিরও অভাব; এবং তাহারা এরূপ নিরীহ ও শাসনের বশবর্ত্তী যে, তাহা বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করে না। কেহ ইহার অন্য কারণ কল্পনা করিতে পারেন কি? যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ জনিত মৃত্যু যে একমাত্র নিতান্ত দারিদ্র্য-সম্ভূত তাহা স্থিরসিদ্ধান্ত হইল; এবং ভারতবর্ষের সাধারণ অধিবাসিগণ নিতান্ত দারিদ্র্য-গ্রস্ত বলিয়া বেসরকারী ভারতীয়গণের যে ধারণা, তাহা সত্য। সাধারণ কৃষকগণ যে কেবল সম্পত্তি-মাত্র-বিহীন তাহা নহে, অধিকন্তু তাহারা মহাজনগণের নিকট গুরুঋণ-ভারগ্রস্ত; রাজকর্ম্মচারিগণ ইহা অস্বীকার করিলেও এই সকল বিষয়ে দৃষ্টিহীন, কিম্বা পাছে এই সকল অন্ধকারময় স্থানে অনুসন্ধানের আলোক প্রবেশ করিয়া কুকীর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া ফেলে, এই ভয়ে তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষু মুদিত করিয়া থাকে।”

জমিদার ও কৃষক

আমাদের দেশ কৃষি-প্রধান। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই বিস্তীর্ণ মাঠ। বর্ষাকালে ও বর্ষার শেষে সেই সকল মাঠ হরিৎ ধান্যে সুশোভিত এবং শীত ও বসন্তকালে স্থানে স্থানে ইক্ষু ও রবি ফসল পরিপূর্ণ থাকে। এই সকল সুবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জনপদ। গ্রামবাসীর অধিকাংশই কৃষিজীবী, কতক শ্রমজীবী ও অবশিষ্ট ব্যবসায় কিম্বা অন্যান্য উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করে। কোন কোন গ্রামেই স্থানীয়

জমীদারের বাস, আর কোন কোন গ্রামে জমিদারের কাছারি মাত্র থাকে, সেখানে নায়েব কিম্বা গোমস্তা বাস করে। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামবাসী জমিদার স্বগ্রামেই বাস করিয়া প্রজাগণের নেতৃত্ব করিতেন ; কিন্তু আজ কাল বড় বড় জমিদারগণ পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়াছেন। বর্ত্তমান কালে জমীদার ও কৃষক উভয়ের অবস্থার অবনতি দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে পিতা-পুত্র সম্বন্ধ ছিল। জমীদার প্রজাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন ও তাহার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্য নষ্ট হইলে, জমিদার কৃষক প্রজার খাজনা আদায় স্থগিত রাখিতেন কিম্বা মাপ করিতেন ; বীজ ও গো মহিষাদি দিয়া কিংবা অর্থ ঋণ দান করিয়া আবাদের সাহায্য করিতেন এবং দুর্ভিক্ষের সময় অন্নদান করিয়া প্রজার প্রাণ রক্ষা করিতেন। প্রজাও জমীদারকে রাজা ভাবিয়া সম্মান করিত এবং আবশ্যক হইলে তাঁহার গৃহকার্য্য করিয়া দিত। তখন খাজনা আইন ছিল না, গবর্ণমেণ্টকে প্রজার জন্য ভাবিতে হইত না। জমীদার ও প্রজার মধ্যে অসদ্ভাব না থাকাতে কোনরূপ গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল না। জমীদারকে খাজনা আদায়ের জন্য আদালতের সাহায্য খুঁজিতে হইত না এবং প্রজাকেও জমীদারের অত্যাচার নিবারণের জন্য আদালতের আশ্রয় লইতে হইত না। অধিকাংশ জমীদার রাম-রাজার ন্যায় প্রজা-বৎসল ছিলেন ও প্রজাপালন করিতেন। ধনী জমীদারগণ ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও কবিরাজদিগকে অকাতরে যথেষ্ট অর্থ ও জমি দান করিতেন। পণ্ডিতগণ রাজা ও জমিদারের সাহায্যে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন, তাহাদের ভরণ পোষণ করিতেন এবং কবিরাজগণ দরিদ্র রোগিদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য দান করিতেন। প্রজার প্রাণ ও ধন রক্ষার জন্য জমীদারই দায়ী ছিলেন এবং সেই জন্য গ্রাম্য চৌকিদারদিগকে নিষ্কর ভূমি দেওয়া হইত। কুম্ভকার, কর্ম্মকার, রজক, নাপিত প্রভৃতিকে সাধারণ প্রজার উপকারার্থে কিছু কিছু নিষ্কর জমি প্রদত্ত হইত। পূর্ব্বকালে জমির খাজনার হারও অল্প ছিল এবং সেই খাজনামাত্র দিলেই প্রজা সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও সচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু এখন সেই সকল সুব্যবস্থা লোপ পাইয়াছে। এখন সাধারণতঃ জমীদার স্বার্থপর ও নির্ম্মম হইয়াছে। বড় বড় জমীদারগণ নানা কারণে পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া সহর-বাসী হইয়াছেন। তাঁহাদের গোমস্তা প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ প্রজাদিগের প্রতি

নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকে, খাজনা ব্যতীত আরও বহুতর কর আদায় করিয়া কতক আত্মসাৎ করে ও কতক মণিবকে দেয়। প্রজা জমীদারের সাক্ষাৎ পায় না, সুতরাং আপনার দুঃখ জানাইতে সক্ষম হয় না। হাজাই হউক আর শুকোই হউক, প্রজাকে খাজনা দিতে হইবে; সময়ে গরু বাছুর ও থালা বাটী বেচিয়া খাজনা দিতে হয়। সাধারণতঃ জমীদারগণ এক্ষণে অবস্থাহীন, অনেকেই ঋণগ্রস্ত, কাজেই প্রজা-শোষক। কোন কোন জমীদার আপনার দুর্বুদ্ধির কারণ ব্যয় বাহুল্য করিয়া ঋণজালে জড়িত, কেহ কেহ বা উপাধি পাওয়ার প্রত্যাশায় রাজপুরুষদের সেবায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবার জন্য প্রজার সর্ব্বস্ব অপহরণ করেন। নিষ্কর ভূমি দানের ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মোত্তর জমি হরণ আরম্ভ হইয়াছে। কিরূপ ন্যায্য উপায় অবলম্বন করিলে জমীদারীর আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য নাই। আয় বৃদ্ধির জন্য অন্যায় ও আইন-বিরুদ্ধ উপায় সকল অবলম্বিত হইয়া থাকে। অকারণ খাজনা বৃদ্ধি করা হয় ও প্রজা তাহাতে অসম্মত হইলে তাহাকে বলপূর্ব্বক উচ্ছেদ করা হয়। খাজনা আদায়ের জন্য নানাবিধ বে-আইনী ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা হয়, হয়ত প্রজার ফসল ক্রোক করা হয়, হয়ত তাহার গরু বাছুর অপহরণ করা হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রজাকে কাছারি গৃহে অবরোধ করিয়া জরিমানা করা হয় ও বর্দ্ধিত খাজনার কবুলতি লেখাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে কেবল মোকর্দ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া জমীদার ও প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। জমীদার ও প্রজার সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। জমীদার যাহাতে প্রজাকে অন্যায়মতে উচ্ছেদ না করিতে পারে, এবং প্রজার খাজনা বৃদ্ধি ও ফসল ক্রোক প্রভৃতি অত্যাচারের নিবারণ হয় এবং জমিদারীতে পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত-দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইলে জমীদার যাহাতে খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারে, খাজনা আইনে এই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপণের সময় ১৮৮৪ সালে জমিদার-প্রজা সম্বন্ধীয় আইন প্রচলিত হয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি এরূপ আইন সত্ত্বেও প্রজার উপর জমিদার ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের উৎপীড়ন চলিতেছে। তবে আমরা এমন কথা বলিতে চাহি না যে, আমাদের দেশের সকল জমিদারই অত্যাচারী; প্রজা-বৎসল জমিদারও অনেক আছেন।

ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটী, ইহার মধ্যে প্রায় চব্বিশ

কোটী (শত করা ৮০ জনের হিসাবে) কৃষিজীবী। অতএব এ দেশের লোকের অবস্থা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ কৃষকের অবস্থাই আলোচ্য বিষয়। যদি এই সমগ্র কৃষিজীবী লোক দুরবস্থাপন্ন হয়, তাহা হইলে দেশের অবস্থা মন্দই বলিতে হইবে। সাধারণতঃ কৃষকের অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা হীনতর হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষকগণকে, ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে সকল কৃষক দুই শত কিম্বা অধিক বিঘা জমি চাষ করে তাহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে; যাহারা দুই পাঁচ দশ বিঘামাত্র জমি চায করে তাহারা তৃতীয় অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত, আর অবশিষ্ট মধ্যবিত্ত। প্রথম শ্রেণীর কৃষকের সংখ্যা অতি অল্প, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে শস্য-হানি হইলে এই দুই শ্রেণীর কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে এবং দুর্ভিক্ষ সময়ে ইহারাই সর্ব্বাগ্রে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পূর্ব্বে কৃষকেরা দুর্বৎসরের জন্য শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত, বীজের জন্য তাহাদিগকে অপরের উপাসনা করিতে হইত না। কিন্তু আজকাল অতি অল্পসংখ্যক কৃষকই ধান্য প্রভৃতি শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সক্ষম হয়, এমন কি অধিকাংশ কৃষক বীজ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। আবাদের সময় জমিদার কিম্বা মহাজনের নিকট হইতে দেড়িয়া সুদে (অর্থাৎ একমণ ঋণ লইলে মায় সুদ দেড় মণ দিতে হয়) বীজধান কর্জ্জ লইয়া থাকে। কৃষকদের অভাব অল্প এবং সাধারণতঃ তাহারা চরিত্রবান্ ও মিতব্যয়ী। আমাদের গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস যে, কৃষকেরা বিবাহ প্রভৃতিতে অপরিমত ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হয়। সে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। কৃষকেরা বিবাহ প্রভৃতিতে ব্যয় করে বটে, কিন্তু কদাচ ব্যয়-বাহুল্য করেনা। মনুষ্য মাত্রেই নির্দ্দোষ আমোদ করিতে ইচ্ছুক। দেবপূজা ও বিবাহ ধর্ম্ম ও সামাজিক কর্ম্ম এবং মনুষ্যজীবনে অবশ্য কর্ত্তব্য। গরিব কৃষকগণ পুত্র কন্যার বিবাহোপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্বের সহিত একত্র মিলিত হইয়া ইহজীবনে দুই চারিদিন মাত্র আনন্দ উপভোগ করে এবং সেই জন্য সামান্য অর্থ ব্যয় করে। এই সামান্য অর্থের জন্যই তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়, কারণ পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর কৃষকদের সঞ্চিত শস্য কিম্বা অর্থ থাকে না। একটী কৃষক গৃহস্থ সপরিবারে পরিশ্রম করিয়াও প্রয়োজনীয় গ্রাসাচ্ছাদনেরও যোগাড় করিতে পারে না। কোন বৎসর অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন শস্য নষ্ট হইলে, কৃষকের দুর্গতির একশেষ হয়। কেহ কেহ

বলেন, এদেশের কৃষক অলস ও কৃষির উন্নতিবিষয়ে অমনোযোগী। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে একথা প্রকৃত নহে বলিয়া উপলব্ধি হইবে। কৃষককুল যদি অলস ও অকর্ম্মণ্য, তবে ভারতের ত্রিশকোটী লোকের খাদ্য কিরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে ও জাহাজ জাহাজ শস্য ও ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য কিরূপে বিদেশে রপ্তানি হয়? পূর্ব্বে এদেশে আলু কপি প্রভৃতি উৎপন্ন হইত না, অতি অল্প দিন হইতে এ দেশের কৃষক এই সকল নূতন ফসল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করিতেছে। এ কথা সত্য যে, এদেশের কৃষিযন্ত্রের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ইহার জন্য কৃষক দায়ী নহে। কৃষকের শিক্ষাভাব ও অবস্থা-হীনতাই ইহার কারণ, এবং গবর্ণমেণ্ট ও জমীদার যে তাহার শিক্ষাভাব ও দুরবস্থার জন্য দায়ী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কৃষিকার্য্য বিষয়ে এদেশের কৃষক বিলক্ষণ পারদর্শী, তাহারা কোন্ মাটীর কিরূপ শস্যোৎপাদিকা শক্তি আছে তাহা বুঝিতে পারে, কোন্ সময়ে কোন্ শস্য আবাদ করিতে হয় তাহা জানে, জল বায়ুর অবস্থাভেদে যে শস্যের অবস্থান্তর হয়, তাহা ও বুঝে। জমিতে কিরূপ সার দিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়, কৃষক তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও দরিদ্রতা-নিবন্ধন কোনও প্রকার সার দিতে পারে না। প্রতিবৎসর আবাদ করিলে যে জমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়, কৃষকগণ তাহা বেশ জানে; কিন্তু অবস্থাহীনতা-বশতঃ শস্য সঞ্চয় করিতে অপারক হইয়া বৎসর বৎসর, এমন কি বৎসরে দুইবার, জমি আবাদ করিতে বাধ্য হয়। যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় তাহাতে কৃষক ও তাহার পরিবারবর্গের এক বৎসরের জন্য যথেষ্ট খাদ্য হয় না। কিন্তু খামার হইতেই জমীদার মহাজন তাহার উৎপন্ন শস্যের বার আনা অংশ লইয়া যায়; যে চারি আনা মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে বীজের জন্য কিছু রাখিয়া, দুই তিনমাস মাত্র কৃষকের উদরান্ন চলে; সুতরাং বৎসরের ৯।১০মাস কাল কৃষককে অতি কষ্টে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া চালাইতে হয়। অনেকে লাঙ্গল, গরু, স্ত্রীর রূপার গহনা ও থালা ঘটি বেচিয়া চালায়, অথবা ঋণে জড়িত হইয়া পড়ে। সাধারণ কৃষকই এইরূপ দুরবস্থাপন্ন। যাহাদের অল্পমাত্র জমি আছে; তাহারা বৎসরের অধিকাংশ দিন মজুরি করিয়া থাকে। যিনি পল্লীগ্রামের কোন দরিদ্র কৃষকের গৃহ পরিদর্শন করিয়াছেন তিনি জানেন যে, কৃষক পরিবার কিরূপ দুর্দ্দশায় থাকে। সামান্য একখানি মাত্র মাটির ঘরে কৃষক স্ত্রী ও পুত্র কন্যা লইয়া এক পার্শ্বে থাকে এবং একদিকে দুএকখানা পিত্তলের বাসন রাখে। ঘরের বারাণ্ডায় কৃষক-পত্নী কেবল মাত্র ভাত পাক করিয়া সকলের আহারের উপায় করে। যে

কৃষকের দুইটী ঘর থাকে একটী ঘরে পরিবারগণ থাকে ও অপরটীতে গরু বাছুর থাকে। যাহার একটী মাত্র ঘর সে ঘরের একদিকে গরু বাছুর রাখে। শয্যার অবস্থাও অতি শোচনীয়, তালের চেটাই ও খড়ের বালিশই শয়নের উপাদান। শীতকালে একটা মোটা মলিন জীর্ণবস্ত্রের কাঁথা কিম্বা চাদর গাত্রাবরণের কাজ করে। পল্লীগ্রামে চিকিৎসকের অভাব এবং কৃষকেরও অর্থের অভাব, সুতরাং কঠিন পীড়াক্রান্ত হইলে কৃষক পরিবার অচিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(ক্রমশঃ)

রেশম-শিল্প।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ রেশম ও রেশমী বস্ত্রের জন্য জগদ্বিখ্যাত। বৈদিকসময়েও হিন্দুগণ রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন; বিবাহ, পূজা প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্ম্মোপলক্ষে রেশমী কাপড় পরিধান করিবার ব্যবস্থা ছিল। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রচীন গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, মূল্যবান রেশমী বস্ত্র রাজন্যবর্গের পরিধেয় ছিল। রেশমী বস্ত্র পবিত্র বলিয়া মুনিঋষিগণও ইহা ব্যবহার করিতেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেশম প্রস্তুত হইত এবং গুটি পোকা প্রতিপালনের জন্য তুঁত গাছের আবাদ হইত। রেশমী বস্ত্র-শিল্পীরও অভাব ছিল না। তাহারা রেশম হইতে নানাবিধ সুদৃশ্য বস্ত্র বয়ন করিয়া ইউরোপ প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করিত এবং বিলক্ষণ লাভ পাইয়া বেশ অবস্থাপন্ন ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে রেশম-শিল্পের বিশেষ উন্নতি ও সমাদর হইয়াছিল, কারণ বিলাস-প্রিয় মুসলমান সম্রাট ও ধনিগণ মূল্যবান্ রেশমী কাপড় ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন; স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত সুদৃশ্য জরি-খচিত রেশমী বস্ত্র যে বিলাসের জিনিষ তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই সকল বস্ত্রের বিচিত্র কারুকর্ম্ম দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট হিন্দু সাত্ত্বিক আহার ও পরিধান আবশ্যক বিবেচনা করেন এবং সেই জন্যই হিন্দু নিরামিষ ভোজনের ও গরদ তসর পরিধানের পক্ষপাতী। গরদই সুদৃশ্য কোমল মসৃণ রেশম এবং তসর অল্প মূল্য কর্কশ রেশম। আমরা যাহাকে পট্টবস্ত্র বলি, তাহা বাস্তবিক পাট-নির্ম্মিত কাপড় নহে, তসর-নির্ম্মিত কাপড়ই পট্টবস্ত্র বলিয়া অভি-

হিত হইয়া থাকে। এখনও হিন্দুদের পূজা, বিবাহ অন্নাশন প্রভৃতি শুভ কার্য্যে তসর ও গরদের কাপড় ব্যবহার ধর্ম্মতঃ আবশ্যক; বিবাহ সময়ে বর ও কণ্যা যে চেলির কাপড় পরিধান করে, তাহা রেশম-নির্ম্মিত। হিন্দুর অনুকরণে মুসলমান প্রভৃতি জাতিও বিবাহ প্রভৃতিতে তসর ও গরদ কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল কারণে ভারতের রেশম-শিল্প অবস্থাহীন হইয়াও এখনও জীবিত আছে; কিন্তু বিদেশীয় রেশম-শিল্পের প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ এতই প্রবল হইতেছে যে, অন্যান্য শিল্পের ন্যায় রেশম-শিল্পেরও অধঃপতন অনিবার্য্য।

এদেশের রেশম-শিল্পের অনুকরণে আজকাল পৃথিবীর নানা দেশে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। এখানকার ন্যায় চীনের রেশম-শিল্প ও প্রাচীন। চীন ও নবোন্নত জাপান হইতে রেশমী বস্ত্র বহুল পরিমাণে এদেশে আমদানি হইতেছে। ইউরোপের জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, অষ্ট্রিয়া, সুইজারলণ্ড, বেলজিয়ম ও ইংলণ্ড রেশম প্রস্তুত করিয়া কলের সাহায্যে বস্ত্রাদি তৈয়ার করিতেছে। আবার এই সকল দেশের শিল্পিগণ পাটকে কৃত্রিম রেশমে পরিণত করিয়া এদেশে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। আমরা সেই সকল কৃত্রিম জিনিসের বাহ্য চাকচিক্যে মোহিত হইয়া প্রকৃত রেশম ভ্রমে উহা খরিদ করিয়া প্রতারিত হইতেছি ও দেশের শিল্পের বিনাশ সাধনের সাহায্য করিতেছি।

প্রতিযোগিতায় শিল্পী ও ব্যবসায়ী প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী হইয়া উঠে। ইংরাজরাজত্বের পূর্ব্বে যখন এদেশে অবাধ বাণিজ্য প্রবল ছিল না, কলের সৃষ্টি হয় নাই এবং বিদেশী প্রতিযোগিতার প্রকোপ কম ছিল, তখন এদেশের শিল্পী ও বণিকগণ সরল-প্রকৃতিক ও সত্যনিষ্ঠ ছিল; কিন্তু এখন তাহারা বিদেশীয়গণের ন্যায় কৃত্রিম দ্রব্যকে অকৃত্রিম বলিয়া গ্রাহককে প্রতারণা করিয়া থাকে। রেশমের পরিবর্ত্তে পাটকে রঞ্জিত করিয়া বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া চেলির কাপড় বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। কোন কোন শিল্পী পাট ও রেশম মিশ্রিত করিয়া সূতা প্রস্তুত করে। এই সকল কৃত্রিম বস্ত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রীত হয় বটে, কিন্তু সে গুলি অতি অল্প দিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়।

রেশম-শিল্পের অবনতি হইলেও বাঙ্গালার প্রায় অনেক জেলাতে রেশম ও রেশমী কাপড় তৈয়ার হইয়া থাকে। মুরসিদাবাদ, নদীয়া, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, রাজসাহি, মালদহ, বগুড়া, হাওড়া এই সকল

জেলায় স্থানে স্থানে তুত গাছের চাষ ও রেশম তৈয়ার হয়। মুরসিদাবাদের জঙ্গীপুর, মৃজাপুর, বালুচর, ইসলামপুর, সদাই, পৈদাবাদ, বেলগঙ্গা, হরিহরপাড়া, হুগলীর বালী দাওয়ানগঞ্জ, রাজবল্লভপুর, রঘুনাথপুর, শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমানের কাটোয়া, কালনা, মেমারি, রাধাকান্তপুর, মেদিনীপুরের তমলুক, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, কেশিয়াড়া, খেলাড়, বীরভূমের রামপুর হাট, গলুটিয়া এবং বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, প্রধানতঃ এই সকল স্থানে গরদ ও তসর কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিহার অঞ্চলে মুঙ্গের, ভাগলপুর, পাটনা, গয়া জেলার ও স্থানে স্থানে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রাজসাহি জেলায় মিরগঞ্জ ও দাক্রা গ্রামে মটকা এবং আসাম প্রদেশের ও বগুড়া জেলার এণ্ডি রেশমী কাপড় বিখ্যাত। পূর্ব্বে যশোহর, চব্বিশ পরগণা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পুর্ণিয়া প্রভৃতি জেলার স্থানে স্থানে তুঁতগাছের চাষ হইত ও গুটিপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত হইত, কিন্তু রেশম-শিল্পের অবনতির সহিত সেই সকল স্থানের রেশম উৎপাদকগণ ব্যবসা বন্ধ করিয়াছে। ইংরাজি ১৮৯১ সালের লোকগণনা (সেন্‌সস্) রিপোর্ট হইতে জানা যায় বঙ্গদেশে রেশম-বস্ত্র বয়ন-শিল্পীর সখ্যা ২৭২৮৬ মাত্র এবং তাহারা প্রতি বৎসর পঞ্চাশলক্ষ টাকার রেশম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। ১৯০১ সালের সেন্‌সসে রেসম তন্তুবায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩৮৩৬ দাঁড়াইয়াছে। ইহা দেখিয়া বোধ হয় যে, বঙ্গদেশের রেশম-শিল্পের অবস্থা কতক পরিমাণে উন্নত হইতেছে। তবে সেন্‌সসের তালিকা যে অভ্রান্ত এমন কথা বলা যায় না। সাধারণের বিশ্বাস যে রেশম-শিল্পের অবনতি হইতেছে এবং আমরা জানি যে, বাঙ্গালার অনেক স্থান হইতে তুঁতগাছের চাষ ও গুটিপোকার আবাদ একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এবং যে সকল লোক রেশমের ব্যবসা করিত, তাহারা অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। তবে কার্পাস-বস্ত্র বয়ন অপেক্ষা রেশমী বস্ত্র বয়ন অপেক্ষাকৃত অধিক লাভজনক বলিয়া অনেক তন্তুবায় রেশমী বস্ত্র বয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

কাশী, কাশ্মীর, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইসকল স্থানে বাঙ্গালা হইতে রেশম আমদানী হইয়া থাকে এবং সেখানকার শিল্পিগণ রেশমসূত্রে জরি সংলগ্ন করিয়া মনোরম বস্ত্র বয়ন করে। বাঙ্গালার রেশম ইংলণ্ড ফ্রান্স, জর্ম্মাণী অষ্ট্রীয়া, আরব চীন পারস্য আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এবং মরিসস্ জাঞ্জিবর সিংহল প্রভৃতি দ্বীপেও রপ্তানী হয়। কতকগুলি ইংরাজ ও ফরাসি বণিক কোম্পানি এই রেশম রপ্তানী ব্যবসা

দ্বারা যথেষ্ট লাভ করিতেছে। পূর্ব্বে এদেশীয় লোকই এই রেশম ব্যবসা করিত, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যান্য ব্যবসার ন্যায় এই লাভজনক ব্যবসায়টীও বিদেশীয়গণের করায়ত্ব হইয়াছিল। কেবল রপ্তানি ব্যবসা নহে, অনেক ইংরাজ কোম্পানী এ দেশের রেশম উৎপাদন ব্যবসাও হস্তগত করিয়া, ইহা হইতে দেশীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে গবর্ণমেণ্ট রেশমের ব্যবসা করিতেন, কিন্তু স্বজাতিপ্রেমবশতঃ ব্যবসায়ী জাতভায়াগণের উপকারার্থে তাহাদের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

সম্প্রতি স্বদেশী আন্দোলন লইয়া আমরা দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছি এবং কার্পাস-বস্ত্র-শিল্পের উন্নতির জন্য নানাপ্রকার উদ্যোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। এই সময়ে রেশম-শিল্পের ও ব্যবসায়ের প্রতি আমাদের মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। রেশমের আবাদ ও রেশমী বস্ত্র বয়ন-দ্বারা অনেক গরিব হিন্দু মুসলমানের অন্নের সংস্থান হইত। অন্যান্য শিল্পীর ন্যায় তাহারা অবস্থাহীন হইয়াছে এবং অপর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে দিন পাত করিতেছে। যে যে উপায়ে দেশে অধিক পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হয় ও রপ্তানি বাণিজ্যটী দেশীয় লোকের হস্তগত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। বাঙ্গালার রেশম অন্যান্য দেশের রেশম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং এখানে অধিক পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইলে বিদেশে রপ্তানী হইবে ও দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবে। অধিক পরিমাণে রেশম উৎপন্ন করিতে হইলে তুঁত গাছের আবাদ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং তাহা হইলে কৃষকগণও একটী নূতন লাভজনক ফসল উৎপাদন করিবার সুবিধা পাইবে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জমীদার আপন আপন জমীদারিতে কার্পাস তুলা উৎপন্নের বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি যে, এই সকল স্বদেশানুরাগী সহৃদয় মহোদয়গণ রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য যত্নবান্ হইবেন।

ক্রমশঃ

রং তৈল।

কাষ্ঠ কিংবা লৌহের দ্রব্যাদি রক্ষা এবং রঞ্জিত করার জন্যই রংএর আবশ্যক হয়। ইহা তরল হওয়া উচিত এবং লাগাইবার পর শীঘ্র শুকাইয়া যাওয়া আবশ্যক।

এই জন্য তিসিতৈল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং শস্তা। ইহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। ইহা বায়ু হইতে অম্লজান আকর্ষণ করিয়া শীঘ্র শুষ্ক হয় এবং দ্রব্যাদিতে লাগাইলে কঠিন জলাভেদ্য ও উজ্জ্বল আবরণে আবৃত হইয়া থাকে। কিন্তু তিসিতৈল কথঞ্চিৎ গাঢ় বলিয়া টার্পিণ কিংবা অন্যান্য পদার্থ মিশাইয়া তরল করিয়া লওয়া আবশ্যক।

এই জাতীয় অন্যান্য তৈলদ্বারাও রং ভাল হয়, যথা—গাঁজা, আফিম, আখরোট ইত্যাদি; কিন্তু এগুলি অধিক মূল্যবান এবং যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যায় না। এই জাতীয় তৈলে লিনোলীন নামে একপ্রকার দ্রব্য আছে এবং ইহারই অম্লজান আকর্ষণী শক্তি অতিশয় প্রবল। (তৈলের ১৫০।১৮০ গুণ।

তিসির বীজ হইতে এই তৈল প্রস্তুত হয়। শীত প্রধান দেশে ইহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ দেশের তৈলই উৎকৃষ্ট।

রংএর জন্য এই তৈল দুই প্রকারে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা কিংবা সিদ্ধ; কাঁচা তৈল অর্থাৎ সাধারণ তিসিতৈল বিশুদ্ধ; ইহার বর্ণ ঈষৎ সবুজ কিম্বা ঈষৎ পিঙ্গল, আমাদের দেশের তৈল প্রায় সবুজ বর্ণ হইয়া থাকে। তিসি-তৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৯৩২ হইতে ০·৯৩৭।

অপেক্ষাকৃত ভারি তৈলে রং ভাল হয়। ইহা কিছু কাল পাত্র মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার পর ব্যবহার করিলে রং উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। বার্ণিসের কার্য্যে সেই জন্য এক কিম্বা দেড় বৎসরের পুরাতন তৈল ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ু হইতে অম্লজান আকর্ষণ করিয়া ইহা শীঘ্র শুষ্ক এবং কঠিন হয় এবং সেই জন্য রংএর কার্য্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম; এই অম্লজান আকর্ষণী শক্তির তারতম্য অনুসারে এই তৈলের গুণেরও তারতম্য হইয়া থাকে; কোন স্থানের তৈল অধিক এবং কোন স্থানের তৈল অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে অম্লজান আকর্ষণ করিয়া থাকে।

সাধারণ কাঁচা তৈলের রং লাগাইলে শুকাইতে প্রায় দুই দিন লাগে। গ্রীষ্ম

কালে শীতকাল অপেক্ষা কম সময়ে শুকাইয়া যায়। সিদ্ধ তৈলের রং আরও শীঘ্র শুকাইয়া থাকে।

মেদীযুক্ত তৈল অপেক্ষাকৃত মূল্যবান বলিয়া ইহার সহিত প্রায়ই ভেজাল দেওয়া হয় না, কিন্তু খনিজ বা ধূনা-বিশিষ্ট তৈল দ্বারা ইহা দূষিত হইয়া থাকে। এইরূপ দূষিত হইলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়; প্রথমতঃ ইহার গুরুত্বের তারতম্য হয়, খনিজ তৈল মিলিত হইলে গুরুত্ব কম এবং ধূনা-বিশিষ্ট তৈলদ্বারা গুরুত্ব অধিক হয়। দ্বিতীয়তঃ পরিষ্কৃত তিসিতৈল ৫০০ ডিগ্রি উত্তাপ পাইলে জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু দূষিত হইলে ৩৮০ হইতে ৪০০ ডিগ্রিতেই জ্বলিতে থাকে।

সিদ্ধ তিসিতৈল।

২০০ ডিগ্রি উত্তাপে কয়েক ঘন্টা সিদ্ধ করিয়া হইলে তিসিতৈল দ্বারা রং অতিশয় উত্তম হয়। ইহাতে তৈলের গুরুত্ব অধিক হয়, শীঘ্র শুকাইয়া যায়, ও বর্ণ গাঢ় পিঙ্গল হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা রংও অতিশয় উজ্জ্বল হয়। সিদ্ধ করিবার সময় উত্তাপ ২০০ ডিগ্রির অধিক হইতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ ইহাতে তৈল নষ্ট হইয়া রং কাল হইয়া যায়। কাঁচা তৈল অপেক্ষা সিদ্ধ তৈল প্রায়ই অধিক পরিমাণে দূষিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হয়। ধূনা, ধূনা বিশিষ্ট তৈল, টার্পিণ, কেরোসিন, কাঁচা তিসিতৈল প্রভৃতি পদার্থ এই জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধূনা কিংবা ধূনা বিশিষ্ট তৈল মিশ্রিত হইলে রং ভাল হয় না, শুকাইলেও চটচটে থাকে এবং রং স্থায়ী হয় না। বিশুদ্ধ সিদ্ধ তৈলদ্বারা রং করিলে উহা প্রায় ২ বৎসর কিংবা আরও অধিক কাল উজ্জ্বল থাকে কিন্তু দূষিত তৈলের রং ১ বৎসরের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়।

বিশুদ্ধ সিদ্ধ তৈল কিঞ্চিৎ ক্ষারের জল (Caustic soda solution) এবং মিথিলেটেড স্পিরিটের (Methylated spirit) সহিত সিদ্ধ করিলে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যাইবে কিন্তু দূষিত তৈল ঐরূপ করিলে কখনও সম্পূর্ণরূপে মিলিবেনা; উপরে কথঞ্চিৎ তৈল ভাসিতে থাকিবে। আজ কাল বাজারে অনেক স্থলে (Patent boiled oil) নামে দূষিত তৈল বিক্রয় হইয়া থাকে।

রং মিশ্রিত সিদ্ধ তৈল আজ কাল প্রায়ই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। কিন্তু উহা শুকাইয়া এত কঠিন হইয়া যায় যে, ব্যবহারের পূর্ব্বে উহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে তৈল এবং টার্পিণ মিশাইয়া লইতে হয়।

ভিন্ন প্রকার রং এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে তৈল মিশান আবশ্যক নিম্নে পরিমাণের তালিকা দেওয়া গেল, কাঁচা তৈল অপেক্ষা সিদ্ধ তৈল কিঞ্চিৎ অধিক আবশ্যক হয়।

White lead	...	...	শতকরা ৮ ভাগ।
Zinc white	...	...	,, ২২ ,,
Barytes	...	...	,, ৭ ,,
Green Brunswick	...	...	,, ১১ ,,
Black in oil	..	...	,, ২৭ ,,
,, ,, Turp.	...	...	,, ৫৫ ,,
Oxide of Iron	...	...	,, ১০ ,,
Turkey umber Burnt	...	..	,, ২৯ ,,
English ,, Raw	...	...	,, ২০ ,,
Bruwswiok Blue	...	...	,, ১১ ,,
Oxford ochre			৩২
Vandyke Brown	...	...	,, ৪০ ,,
Raw sienna	...	...	,, ৩৭½ ,,
Burnt ,,	...	..	,, ৩৭½ ,,
Chrome yellow	...	...	,, ১৫ ,,
Whiting for putty	...	...	,, ১৮ ,,

তৈল কাঁচা কিম্বা সিদ্ধ এবং টার্পিণের সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোনও পরিমাণ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতে না পারে, কেননা ভিন্ন লোকে ভিন্ন প্রকারের রং এর তরলতা পসন্দ করিয়া থাকে। কাঁচাতৈল সিদ্ধতৈল কিম্বা টার্পিন অপেক্ষা বিলম্বে শুকায়; কিন্তু সচরাচর ১গ্যালন তৈলের সহিত ১ পাইন্ট টার্পিনই ব্যবহৃত হয়। ইহারও ভিন্ন ভিন্ন রং বিশেষে তারতম্য হইয়া থাকে; যথা ঃ—White Leadএ অধিক টার্পিন আবশ্যক হয়। প্রায়ই ১ভাগ সিদ্ধতৈল এবং ৩ভাগ কাঁচাতৈল একত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিদ্ধতৈলের ভাগ অধিক হইলে রং শীঘ্র শুকাইয়া কঠিন এবং উজ্জ্বল হয়; টার্পিনের ভাগ অধিক হইলে রং তত উজ্জ্বল হয় না; শীঘ্র ফাটিয়া যায় এবং দ্রব্যের গায়ে ভালরূপে সংলগ্ন হয় না।

ধূনাবিশিষ্ট তৈল প্রাই রংয়ের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধূনা চুয়াইয়া এই তৈল উৎপন্ন হয়। তাহার পর নানা উপায়ে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

ইহা অত্যন্ত ভারি, ঘন এবং আটাযুক্ত। ইহা দুই প্রকারে বাজারে বিক্রয় হয়; "হার্ড রেজিন তৈল" এবং সফ্ট রেজিন তৈল "(Hard & Soft) উত্তমরূপে পরিস্কৃত হইলেও ইহা শীঘ্র শুকাইতে পারে না।

অপরিস্কৃত ঘন তৈল কোনও পদার্থের উপর লাগাইলে ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে শুকাইয়া যায় এবং সেই জন্য রং তৈল বলিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু ইহাতে রং ভাল হয় না এবং অত্যন্ত ময়লা হইয়া যায়। লাগাইবার ৭।৮ দিবস পরেই আবার নরম এবং আটাযুক্ত হইয়া যায়, ও আর কিছুতেই শুকায় না। ইহার দ্বারা রং করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

গাঁজা, আফিম এবং আখরোটের তৈল তিসিজাতীয়; কিন্তু অতিশয় মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য, সেই জন্য রংএর কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। চিত্রকরেরা এই সকল তৈল অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল তৈল শীঘ্র শুকাইয়া যায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

শ্রীকিশোরি মোহন ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্।

অডিকলন প্রস্তুত প্রণালী

অডিকলন প্রস্তুত সহজ সাধ্য। প্রথমে সুগন্ধি তৈল ও সুরাসার একত্রে মিশাইয়া দুই মাস রাখিতে হইবে। তার পর অল্প উত্তাপে চুয়াইতে হইবে। শেষে উহা পাত্র মধ্যে বন্ধ করিয়া ৫।৬ বৎসর রাখিলে তবে উত্তম ও স্থায়ী সুগন্ধী অডিকলন প্রস্তুত হইবে।

দুই প্রকার প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

১ম। কমলালেবুর গন্ধবিশিষ্ট ঃ—

Oil Auranti Cortex } ,, Citri } ...	৩০
বার্গামট তৈল	১২
নীরোলী (Beimd) তৈল	১
নীরোলী ফুল তৈল	২
রোজ ম্যারিনি তৈল	৪
সুরাসার (Spt. vin. rectified)	

২য় কমলা ফুল গন্ধবিশিষ্ট ঃ—

Ol, Auranti Cort	...	...	...	২৬
" Citri Cort	...	...	...	৩৪
বার্গামট তৈল, কমলা ফুল তৈল, রোজ ম্যারিনী তৈল	প্রত্যেক	...	...	১৪
সুরাসার	...	...	...	৮০০০

ব্যবহারের পূর্ব্বে অনেক বৎসর বন্ধ করিয়া না রাখিলেও চলিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে তৈল গুলি এবং সুরাসার উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সুরাসার দুই প্রকারের ব্যবহার করিলে ভাল হয়—সাধারণ সুরাসার (Ordinary wine spirit) এবং কর্ণ ব্র্যাণ্ডি (corn brandy) ১ভাগ তৈল ১০০০ ভাগ কর্ণ ব্র্যাণ্ডিতে এবং অবশিষ্ট তৈল ৩০০০ গ্রেণ বিশুদ্ধ সুরাসারে গলাইতে হইবে। ঐ মিলিত সুরাসার ও তৈল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে শীতল স্থানে কয়েক দিবস রাখিয়া অবশেষে একত্র করিয়া চুয়াইতে হইবে। অল্প পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইলে চুয়াইবার আবশ্যক না হইতে পারে; উহার পরিবর্ত্তে, ঐ মিশ্রিত দ্রব্য একটী কাকের বোতলে রাখিয়া উহার মুখ তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া ৬০ ডিগ্রি উত্তপ্ত জল মধ্যে কয়েক মিনিট ডুবাইয়া গরম করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু চুয়াইলে জিনিষ উত্তম হয়।

৫।৬ বৎসর না রাখিয়া শীঘ্র ও প্রস্তুত হইতে পারে ঃ—একটী পরিষ্কার কাচের বোতলে ঐ চুয়ান মিশ্রণ ঢালিয়া উহার মুখে একটী সছিদ্র কর্ক লাগাইতে হয় এবং ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ঘুরান (spiral) কাচের নল লাগাইতে হইবে। আর একটী ঐ মাপের বোতলের মুখে ফনেল (funnel) লাগাইতে হইবে। সকাল বেলায় রৌদ্রে ১ম বোতলটীতে উল্টা করিয়া ২য় বোতলটীর উপর এরূপভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে ১ম এর মিশ্রণ ঘুরান নলের ভিতর দিয়া ফোটা ফোটা করিয়া ২য় এর মধ্যে পড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। তার পর আবার ২য়টীর মুখে ঐ ঘুরান নলটা লাগাইয়া এবং ১মটীতে ফনেল লাগাইয়া উহার জল পুনরায় ঐ উপায়ে প্রথমটীতে ফেলিতে হইবে। ৪।৫ বার এইরূপে এক বোতল হইতে আর এক বোতলে পড়িলেই হইবে। সকাল বেলায় রৌদ্রের উত্তাপ অল্প সেই জন্য ঐ সময়ই প্রশস্ত। আর

সরান নলটী নিতান্ত আবশ্যক, কেন না উহাতে অল্প পরিমাণ দ্রব্যে অধিকক্ষণ সূর্য্যের উত্তাপ লাগিবার সম্ভাবনা।

অনেক দিন রাখিয়া পুরাতন করার পরিবর্ত্তে অনেকে ঐ মিশ্রণের সহিত সল আমোনিয়া (Sal Ammonia) মিলাইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে সমস্ত তৈল গুলি নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই জন্য গন্ধ ও স্থায়ী হয় না।

প্রাচীন শিল্প।

মেদনীপুর কেশিয়াড়া।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ বঙ্গদেশের রাজা। যদিও তৎকালে বাঙ্গালার নবাবের হস্তে এদেশের শাসন ভার বিন্যস্ত ছিল, কিন্তু তখন তিনি কেবল নামমাত্র প্রভু ছিলেন; প্রকৃত রাজশক্তি ইংরাজ রাজের আয়ত্ত ছিল। এই দেড়শত বৎসর ইংরাজ আমাদিগের দেশের রাজা; তৎপূর্ব্বেও বাণিজ্য ব্যবসা উপলক্ষে ইংরাজ কোম্পানী বহুদিন এ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। বিশেষতঃ মেদনীপুর, বর্দ্ধমান ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যবসা বদ্ধমূল হইয়াছিল; কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ এই সকল স্থান অধিকার মানসে সম্রাটের নিকটে দেওয়ানি সনন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেদনীপুর জেলায় বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের অধিকার বদ্ধমূল হইয়াছিল।

অদ্য আমি মেদনীপুর জেলার একটী পুরাতন স্থানের ইতিবৃত্তিসহ বিলুপ্তপ্রায় বস্ত্রশিল্পের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বর্ত্তমান মেদনীপুর সহর যে সময় জঙ্গলাবৃত ছিল, যৎকালে ইংরাজ কোম্পানীর অস্তিত্ব এ প্রদেশীয় লোকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তৎকালে বর্ত্তমান মেদিনীপুর সহরের প্রায় ২৫মাইল দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগে ও বেঙ্গল নাগপুর রেলের কণ্টাই রোড নামক ষ্টেশনের প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে, বাঘভূম নামে একটী বিখ্যাত স্থান ছিল, এই বাঘ ভূমের একাংশ কেশিয়াড়ী, অপরাংশ গগনেশ্বর নামে বর্ত্তমান কালে বিখ্যাত। এই কেশিয়াড়ী প্রভৃতি স্থান মুসলমান রাজত্বের বহু পূর্ব্ব হইতে বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ নিবন্ধন যে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি এখানে এখনও সুরক্ষিত আছে।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ১৮৮৬ সালের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সংশোধিত তালিকায়

যেরূপ লিখিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত করিতেছি। এই গগনেশ্বর গ্রামে বর্ত্তমান কালে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী দুর্গ বা মঠ এখনও বর্ত্তমান আছে; উহার দৈর্ঘ্য ২০০ শত ফিট বিস্তার দেড়শত ফিট, উর্দ্ধ ১০ফিট। এই দুর্গ বা মঠ বর্ত্তমান কালে "কুরুমবেড়া" নামে এখানে বিখ্যাত; ইহার মধ্যে দশ ফিট প্রস্থ গৃহশ্রেণী আছে, ইহার পূর্ব্বভাগে একটী শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এই মন্দিরাভ্যন্তরস্থ কূপে মহাদেব শিব আছেন এবং গ্রামবাসিগণ ইঁহার পূজা করিয়া থাকে। এই দুর্গের সন্নিধানে উত্তরদিকে যজ্ঞেশ্বর কুণ্ড নামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই সকল স্থান উড়িষ্যার দেও-রাজবংশীয় মহারাজা কপিলেশ্বর নামক ভূপতির অধিকারে ছিল. এই রাজার অধীন বাঘরাজ নামক একজন সামন্ত নরপতি এপ্রদেশ শাসন করিতেন। উক্ত বাঘরাজার নামানুসারে এই স্থান বাঘভূম নামে বিখ্যাত ছিল। যে স্থানে "কুরুম বেড়্যা" নামক দুর্গ বিদ্যমান আছে, তৎকালে উক্তস্থান নিবীড় জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল; কিম্বদন্তি আছে যে, বাঘরাজার একটী দুগ্ধবতী গাভী এই স্থানে গমন করিয়া একস্থানে দণ্ডায়মান হইলে উহার স্তন হইতে অজস্রধারে দুগ্ধ ভূমিতলে পতিত হইত। বাঘরাজা এই অদ্ভুত ঘটনা মহারাজ কপিলেশ্বরের কর্ণগোচরকরেন। রাজা স্বয়ং এ প্রদেশে আসিয়া মৃত্তিকা নিম্নে এক মহাদেব মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন। উক্ত শিবমূর্ত্তি গগনেশ্বর নামে অভিহিত। তদনুসারে এই স্থানও গগনেশ্বর নামে পরিচিত। রাজা কপিলেশ্বর এই প্রস্তরনির্ম্মিত বাটী ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এই দেবতাকে স্থাপন করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আবদুল সামস্ নামক একজন মুসলমান ফকির বলপূর্ব্বক এই মন্দির অধিকার করেন। মন্দিরমধ্যে গোবধ করিয়া এই স্থানের পবিত্রতা ও মহাত্ম্য বিনষ্ট করেন। তিনি এই বাটীর মধ্যে তিনটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গের পশ্চিম ভাগে অদ্যাপি একটী মস্‌জিদ্ বিদ্যমান আছে। এই মস্‌জিদগাত্রে সন্নিবেশিত উড়িয়া অক্ষরে খোদিত একখানি প্রস্তর ফলক হইতে জানা যায় যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহম্মদ তাহের নামক জনেক মুসলমান কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়।

উক্ত সংশোধিত তালিকায় লিখিত আছে—বাঘভূমের একাংশ পৃথক ২৪১ মৌজার সমষ্টি কেশিয়াড়ি নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মোগল সম্রাট দিগের অধিকার কালে এখানে একটী খাজনা আদায়ের তহসিল কাছারি ছিল। কেসিয়াড়ীর মধ্যে মোগলপাড়া নামক যে পল্লী বর্ত্তমান কালেও বিদ্যমান

আছে, এই স্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত মস্‌জিদ ও অনেক প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী মস্‌জিদগাত্রে আরবি অক্ষরে খোদিত আছে, উহা সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রস্তরনির্ম্মিত একটী সাধুর মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে; উহাতে আরবি অক্ষরে খোদিত আছে, এই মূর্ত্তি সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধিকার সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল।

কেশিয়াড়ীর কয়েক মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান কণ্টাই রোড ও দাঁতণ রেল ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারী নামক স্থানে মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলদিগকে পরাজিত করিলে কুরুমবেড়ার মঠ আবার হিন্দুগণের অধিকৃত হয়।

এই কেশিয়াড়ি ও গগনেশ্বর যে অত্যন্ত প্রাচীন স্থান, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, ইহার প্রত্যেক গ্রামে প্রায় এক একটী শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সর্ব্বমঙ্গলানাম্নী এক প্রস্তরময়ী শক্তিমূর্ত্তি আছেন। ইনি এ প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এখানে অন্য কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত নাই। সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরে সমস্ত দেবদেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। এই কেশিয়াড়ি পরগণার মধ্যে মুকুন্দসাগর ও বিদ্যাধর নামে দুইটী দীঘি আছে, এই সমস্ত দীঘি উৎকলাধিপতি রাজা মুকুন্দ দেবের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই স্থানে কিয়ারচাঁদ্‌ নামক মাঠের প্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভগুলি অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক। ইহাদের সংখ্যা প্রায় এক সহস্র। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন বহুসংখ্যক প্রহরী দিবারাত্রি পাহারায় নিযুক্ত আছে। কথিত আছে, রাজা জহর সিংহ নামক একজন হিন্দুরাজা আক্রমণপর শত্রুগণকে ভয় দেখাইবার জন্য এই স্তম্ভগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

এইস্থানে উড়িয়াসাতি নামক স্থানে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত মস্‌জিদ আছে; ইহার গাত্রে একখানি মর্ম্মর প্রস্তরফলক আছে, তাহাতে খোদিত অক্ষর হইতে জানা যায় যে, রাজা চোহানসিংহ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে এই সকল স্থান একটী প্রধান নগর ছিল। এখানে বাণিজ্য ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি ছিল। এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত আছে, এক সময়ে এই কেশিয়াড়ি প্রভৃতি স্থানে তসরের সর্ব্ববিধ বস্ত্র প্রস্তুত জন্য প্রায় ২।৩ হাজার তাঁতি ছিল। সর্ব্বপ্রকার তসরের কাপড় এখানে উত্তমরূপ প্রস্তুত হইত। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে আমি কোন প্রয়োজন উপলক্ষে কেশিয়াড়িতে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। তৎকালে ২।৩ শত তাঁত ছিল ও সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র

উত্তম প্রস্তুত হইত। এখানকার সকল জাতিই এই বস্ত্রশিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁত বুনিতে জানিতেন। কালসহকারে এই সকল ব্যবসা বিলুপ্তপ্রায়। এই তসরের বস্ত্রাদি প্রস্তুত এবং উহার সর্ব্ববিধ উন্নতি ও কাল সহকারে কিরূপেএই ধ্বংসের অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, ইহার বিষদ বিবরণ অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

মেদিনীপুর।

স্বদেশী শিল্প।

বেহার।

আজ কাল দেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য প্রায় সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; সেইজন্য বেহার দেশোৎপন্ন কয়েক প্রকার দেশী বস্ত্রাদি, কম্বল ও দরি বা শতরঞ্চি ইত্যাদির প্রস্তুত ও প্রাপ্তিস্থান সাধারণের জ্ঞাতার্থ নিয়ে প্রকাশ করিতেছি।

মোটিয়া বা মোটা সূতার কাপড়। বেহার প্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই এই মোটিয়া কাপড় প্রস্তুত হয়। জোলা বা তাঁতো (তাঁতি) এই দুই সম্প্রদায়ের লোকেই ইহা বয়ন করিয়া থাকে। কাপড়ের তারতম্যানুসারে টাকায় তিন গজ হইতে ৮ গজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। মোটিয়ার নানা প্রকার চেক্, চিট, বিছানার চাদর এবং গামছাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল জিনিস অতি উৎকৃষ্ট ও বহুদিন স্থায়ী হয়। উৎকৃষ্ট মোটিয়ায় কোট, প্যাণ্ট এবং কামিজ ইত্যাদিও প্রস্তুত হইতে পারে। মোটিয়ার চেক্ ও ছিটে লেপ ও তোষকের খোল অতিশয় সুন্দর ও মজবুত হয়। এদেশের গরীব লোকে ইহা পরিধেয় বস্ত্র রূপেও ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ব্বে মোটিয়া কেবল মাত্র দেশী সূতায় প্রস্তুত হইত, কিন্তু এখন দেশী সূতা প্রায় দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় বিলাতি সূতা ব্যবহৃত হইতেছে। জেলা সাহাবাদের অন্তর্গত, সবডিবিজন সাসারামের অধীনে, ডিহিরি থানার এলাকায় মুড়িয়ার নামক পল্লীতে হোসেন জোলা নামীয় জনৈক ব্যক্তি মোটিয়ার অতি উৎকৃষ্ট চেক্ ছিট, বিছানার চাদর ও গামছা প্রস্তুত করিয়া থাকে। নিজ বেহার নগরে ও

তন্নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহে জামা, কামিজ, পেণ্ট্‌লেন ও চাপ্‌কান ইত্যাদির উপযুক্ত নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ছিট্‌ প্রস্তুত হয়। দানাপুর সহরে হাতে বোনা মোজা, তোয়ালে, রুমাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর অথচ বিলাতি জিনিস অপেক্ষা শত গুণে অধিক মজবুত। উৎকৃষ্ট বিছানার চাদর (নক্সাদার) ও টেবল ক্লথও (table cloth) দানাপুরে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কম্বল। বেহারের অনেক পল্লীতেই কম্বল ও কম্বলের আসন প্রস্তুত হয়। গেঁড়েরি জাতিরই ইহা একচেটিয়া ব্যবসা। বহু দূর দূর পল্লী হইতে কম্বল প্রস্তুত করিয়া ইহারা মহাজনদিগের নিকট লইয়া যায় এবং তথা হইতে ঐ সকল কম্বল বিক্রয় বা স্থানান্তরে চালান করা হয়। পল্লীগ্রামেও গেঁড়েরিদিগের নিকট কম্বল কিনিতে পাওয়া যায়। সাধারণ কম্বল একখানি ১।০ টাকা হইতে ১॥০ মূল্যে পাওয়া যায়। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট রকমের কম্বল ৸০ আনা বা ১৲ টাকা মূল্যেও পাওয়া যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট কম্বল ২৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকার অধিক নহে। সাদা, কাল, চেক, ডোরা ও কোরদার নানা রকমের কম্বল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২॥০ বা ৩৲ টাকা মূল্যের কম্বল অতিশয় মোলায়েম (নরম) ও পুরু (মোটা), দীর্ঘে ৬ হাত ও প্রস্থে ৪ হাতের কম নহে। ইহা দোহারা করিয়া বিছানায় পাতিলে একটী তোষকের কার্য্য করে। ইহার লোম এত নরম যে, শরীরে কিছুমাত্র বিদ্ধ হয় না। গয়া জেলার অন্তর্গত দাউদনগর, পাটনা জেলায় বিহিটা এবং জেলা সাহাবাদের অন্তর্গত দরিহট, বারাঁও ও নাসরিগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে উৎকৃষ্ট কম্বল ও কম্বলের আসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কম্বলের আসন একখানির মূল্য তিন আনা হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত হয়।

দরি বা সতরঞ্চি।—পাটনা, দানাপুর ও জেলা সাহাবাদের অন্তর্গত ভভুয়া সব্‌ডিবিজনে (Bhabua Sub Divn) উৎকৃষ্ট দরি ও দরির আসন প্রস্তুত হয়। দরি ওজন দরে বিক্রয় হয়। যত মোটা ও বড় হইবে, ওজনে তত অধিক হইবে, এবং মূল্যও তদনুযায়ী কম বা অধিক হইবে। ফরমাইস দিলে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ মাপেই দরি প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে।

"স্বদেশী"র জনেক গ্রাহক।

স্বদেশী শিল্প-প্রসঙ্গ।

কালির পাউডার—আমরা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাস ও শ্রীযুক্ত হরিপদ দের নিকট হইতে সমালোচনার্থে কয়েক পেকেট কালির পাউডার পাইয়াছি; ব্যবহার করিয়া দেখা গেল, দুইটাই প্রশংসা-যোগ্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিলাতী কালির পরিবর্ত্তে এই সকল কালির প্রচার কামনা করি। দুর্গাচরণ বাবুর ঠিকানা—শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাস, শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ দাসের মেডিকেল হল, পোঃ তমলুক, জিলা মেদিনীপুর। হরিপদ বাবুর ঠিকানা—শ্রীযুক্ত হরিপদ দে, স্বদেশী ইঙ্ক ফেক্টরী, বালেশ্বর।

নস্য ইত্যাদি—পাল এণ্ড সন্স ১০।২ শত্রুঘ্ন ঘোষের লেন, কলিকাতা। ইহারা স্বদেশী মেক্‌বা নস্য, টথ পাউডার ও পারিজাত কুসুম তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন।

আশুতোষ রায় এণ্ড ব্রাদার্স ঘোড়ামারা পোঃ রাজসাহী। ইহারা মোম বাতি, ব্রঙ্কো, জমাটদুগ্ধ, জুতার কালি, সুগন্ধি তৈল, পমেটম প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন।

প্রাপ্তি-স্বীকার ও সমালোচনা।

আমরা শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে একখানি পঞ্জিকা উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। পঞ্জিকাকার মহাশয় পঞ্জিকাখানিকে নির্ভুল করিবার জন্য যথাসাধ্য আয়াস স্বীকার করিয়াছেন; এরূপ উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয় এবং আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

কমলা পত্রের সম্পাদক এবং পরিচালক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয় অভাবনীয় বিপৎপাতে পতিত হওয়ায় "কমলা"র প্রচার কয়েক মাস বন্ধ ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি উপস্থিত বিপদ মুক্ত হওয়াতে পুনরায় বৈশাখ সংখ্যা কমলা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা যোগেন্দ্র বাবুর ও কমলার দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

জিলা যশোহরস্থ ভৈরব নামক খালের উন্নতি কল্পে গবর্ণমেণ্ট দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। শুনা যায়, এই নদীর সংস্কার হইলে আবাদের বিশেষ সুবিধা হইবে।

বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতির সভার তত্ত্বাবধানে একটী শিল্প ও ব্যাঙ্ক এবং সামান্য সামান্য শিল্পের উন্নতি-কল্পে একটী জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর সূচনা হইতেছে। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বড়ই ভাল হয়।

আজ কয়েক সপ্তাহ হইতে বিখ্যাত ক্যাপিটাল পত্রিকা বিলাতি বস্ত্রের বিক্রয়ের অবস্থা বড়ই মন্দা বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। ইহা স্বদেশ-সেবকদের পক্ষে একটী সুসংবাদ বটে।

মান্দ্রাজে একটী পেন্সিলের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অল্প দিন হইল মহা সমারোহে ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হইয়াছে।

এদেশ হইতে নিকৃষ্ট গালা লইয়া ইউরোপীয়েরা তাহা হইতে সুন্দর শিল মোহরের জন্য গালা করিয়া এ দেশে বিক্রয় করিয়া থাকে। সম্প্রতি পাঞ্জাবের পুরাণসিংহ নামক এক যুবক জাপান হইতে এইরূপ উৎকৃষ্ট গালা প্রস্তুত করিতে শিখিয়া আসিয়াছেন। আমরা আশা করি, পুরাণসিংহ একটা গালার কারখানা স্থাপন করিয়া লাভবান হইবেন।

পণ্ডিত দীনদয়াল শর্ম্মার বিশেষ উদ্যোগে কলিকাতার মাড়োয়ারিদের বৈশ্য সভায় একটী বিশুদ্ধ দুগ্ধের কারবার খুলিবার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়াছেন।

শিল্প-বিজ্ঞান উন্নতি বিষয়িনী সভার সাহায্যার্থে কটকের শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয় তথাকার উৎকল সমিতি হইতে সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। ইনি আরও সহস্র মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। প্রত্যেক জিলা হইতে যদি দুই সহস্র টাকা প্রতি বৎসর আদায় হয়, তাহা হইলে সভা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পশিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে পারেন।

ইণ্ডিয়া রবারের দ্বারা আজকাল যে কত কাজ হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কালে ইহার ব্যবসায় যে অনেক উন্নতি করিতে পারিবে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বলিয়া থাকেন। এই রবার আমাদের দেশেও

উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু কি প্রণালীতে ইহা দ্বারা নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত হয়, দেশের লোকে তাহা না জানাতে আমাদের ধন অন্যে লুটিয়া খাইতেছে; সম্প্রতি পাঞ্জাবের পুরাণসিংহ অতি কষ্টে উহার গূঢ়তত্ত্ব শিখিয়া আসিয়াছেন; তিনি ইহার জন্য বিশ হাজার টাকা মূল ধন সংগ্রহ করিতে পারিলে একটী কারখানা খুলিতে পারেন। আমাদের দেশের ধনকুবেরগণ কি নিদ্রিত?

আমরা গভীর শোক সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায় নবীন বয়সে সমস্ত বঙ্গবাসীকে কাঁদাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। রমাকান্ত রায় শ্রীহট্টের সম্ভ্রান্ত রায় বংশের সন্তান। ইনি জাপান হইতে শিল্প শিক্ষার প্রথম পথ-প্রদর্শক। রমাকান্ত বাবু জাপানে কয়েক বৎসর থাকিয়া খনিতত্ত্ব শিখিয়া আসিয়াছিলেন। রমাকান্ত বাবু স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা এবং তিনি এই কার্য্যে নিঃস্বার্থ ভাবে মন প্রাণ উৎসগ করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই এই সময়ে এই প্রকার লোকের অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে।

শিবাজী উৎসব।

স্বদেশী মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানেই এ বৎসর কলিকাতায় শিবাজী উৎসবের অবতারণা হইয়াছে। মণ্ডলী নানাপ্রকার নৃত্যাদি, লাঠি খেলা প্রভৃতি কয়েকটী স্বদেশী দ্রব্যের অবতারণা করিয়াছেন। শিবাজী মহারাজের ন্যায় স্বদেশ সেবকের জীবনী যতই আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, ততই যে দেশের মঙ্গল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই?

স্বদেশী

প্রথম খণ্ড।]　　আষাঢ়, ১৩১৩।　　[নবম সংখ্যা।

বন্দে মাতরম্।

বিদেশী বর্জ্জন।

বিদেশীয় দ্রব্য পরিবর্জ্জন আন্দোলন আজকাল ভারতবর্ষে সর্ব্বব্যাপী হইয়াছে। বাঙ্গালা বিভাগ লইয়াই প্রথমে বঙ্গদেশে এই আন্দোলন সমুদ্ভূত হয়; এখন মান্দ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর, গুজরাট প্রভৃতি সর্ব্বত্রই এই আন্দোলন চলিতেছে এবং কতক কার্য্যেও পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশীয় দ্রব্যের সম্পূর্ণ বর্জ্জন সম্ভবপর নহে। এ কথা যে একেবারে অমূলক, তাহা বলা যায় না। আদিম অবস্থায় মনুষ্যের অভাব অল্পই ছিল; এবং সেই অভাব অল্পায়াসে ও অল্প স্থান হইতেই পরিপূর্ণ হইত। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অভাব বর্দ্ধিত হইয়াছে, আবার পাশ্চাত্য সভ্যতা কতকগুলি অভিনব ও অনাবশ্যকীয় দ্রব্যকে ব্যবহার্য্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। এখন আর বিলাসীয় সাবান ও সুগন্ধি দ্রব্য না হইলে একদিন চলে না; বিলাতী অশন ও বিলাতী বসন ব্যবহার না করিলে মন খুঁৎ খুঁৎ করে, অসভ্য ও অশিক্ষিত বলিয়া আত্মঘৃণা জন্মে। যতদিন এরূপ ভাব আমাদের মন হইতে দূরীভূত না হয়, যতদিন না আমরা স্বার্থত্যাগ ও কতক পরিমাণে আত্মত্যাগ করিতে পারি, ততদিন বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন সম্পূর্ণরূপ কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব।

কয়েক মাস ধরিয়া এই আন্দোলন চলিতেছে; আমরা যতদূর বুঝিতে পারিতেছি, এদেশে স্বদেশ প্রেমের বিলক্ষণ অভাব এবং সকলকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। মুসলমানগণের চিরন্তন হিন্দুদ্বেষ স্থানে স্থানে এই আন্দোলনের সহিত প্রদীপ্ত হইতেছে। তাঁহারা মনে করেন, এই আন্দোলনে যোগ না দিলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের প্রিয় হইবেন এবং সরকারী চাকরী পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি হইলে কি, হিন্দু মুসলমান সকলেই সমভাবে উপকৃত হইবে না? দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারই বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জন মন্তব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। এদেশে ক্ষেত্রজ, বনজ ও প্রাণিজ প্রভৃতি দ্রব্যের অভাব নাই, শিল্পীরও অভাব নাই; তবে কেন দেশের অভাব দেশের লোকের দ্বারা দূরীভূত না হইবে? আমরা গবর্ণমেণ্টের সেনসস্ রিপোর্টে দেখিতে পাই যে, ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই তন্তুবায় ও অন্যান্য শিল্পকরের বাস, কোন কোন জেলায় ইহাদের সংখ্যা প্রচুর। এই সকল শিল্পীর মধ্যে অনেকে জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য করিতেছে; যাহাদের জমি নাই, তাহারা মজুরি করিয়া অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিতেছে। যদি আমরা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে অচিরে সকল শিল্পের পূর্ব্ববৎ উন্নতি হয়, শিল্পিগণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হয় ও দেশব্যাপী দরিদ্রতা ও চিরদুর্ভিক্ষের প্রকোপ কথঞ্চিৎ অপসৃত হয়। এ সকল অতি সহজবোধ্য কথা ও সর্ব্বজন-সম্মত। এখন জিজ্ঞাস্য, দেশের সকলেই কেন স্বদেশী আন্দোলনে সহানুভূতি দেখান না ও যোগ দেন না? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমাদের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী। সাধারণ লোকে বলে "বাঘের সঙ্গে বিবাদ করে কি বনে বাস করা যায়?" বাস্তবিক, গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। অনেকে হয়ত বলিবেন—"ভাল, আমরা স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিব, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের যায় আসে কি? আমরা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিবাদ করিব কেন?" কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কি ইংরাজ বণিকদিগের রাজত্ব নহে? সকলেই অবগত আছেন, ইংরাজ ব্যবসার ছলে আসিয়া এখানে রাজত্ব বিস্তার করেন এবং বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই এই রাজত্ব রাখিবার চেষ্টা। লর্ড কর্জ্জন প্রকাশ্য বক্তৃতায় বলিয়া গিয়াছেন যে, রাজ্যশাসন ও বাণিজ্য বিস্তার এই দুইটীই গবর্ণমেণ্টের মুখ্য কার্য্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধিগণও এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ

করিয়াছেন। বাণিজ্যই ইংরাজের লক্ষ্মী, এবং বাণিজ্যবলেই ইংরাজ বলী। এই বাণিজ্য বিস্তারের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাজকোষ হইতে বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন; রেলওয়ে বিস্তার, তিব্বতে যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি কার্য্যে কত ক্রোর টাকা ব্যয়িত হইল; সকলই ইংরাজ বণিকগণের উপকারের জন্য। ভারতবর্ষ হইতে সেই বাণিজ্য লুপ্ত হইলে, ইংরাজ কি জন্য এ রাজত্ব রাখিবেন? কোন কোন ইংরাজ রাজপুরুষ কখন কখন বলিয়া থাকেন যে, এ দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে এবং সেই উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলনের যেরূপ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন এবং এই আন্দোলনের নেতাগণের প্রতি যে প্রকার অবৈধ উৎপীড়ন করা হইতেছে, তাহাতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় যে কি, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। রাজপুরুষগণ মুখে যাহাই বলুন,তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা যে, এদেশীয়গণ কেবল মাত্র কৃষিজীবী হইয়া থাকিবে; এখানকার উৎপন্ন পাট, শণ, তুলা প্রভৃতি ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া, আমাদের জন্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া আসিবে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই ক্রমশঃ আমাদের দেশের সকল শিল্পের সংহার করিয়াছেন। তাঁহারা কি আবার সেই শিল্পের পুনরুদ্ধার দ্বারা ইংরাজ বণিকের সর্ব্বনাশ করিতে ও তাহাদের বিরাগভাজন হইতে প্রস্তুত হইবেন, কিম্বা সাহস করিবেন? আমাদের মধ্যে যাঁহারা মনে করেন যে, গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষপাতী, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। ইংরাজ রাজপুরুষ ও ইংরাজ বণিক এদেশ হইতে অর্থসংগ্রহ করিতে সর্ব্বদা তৎপর, উভয়েই সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে যত্নবান। কি উপায়ে জাতভায়ার ব্যবসার উন্নতি হইবে, কি প্রকারে তাহার ধনবৃদ্ধি হইবে.রাজপুরুষগণ সেই বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগী। ভারতের শিল্পদ্রব্য জগতের সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও আদরণীয় ছিল, এখন সেই শিল্প ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে, শিল্পিগণের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে; ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই ইহার প্রধান কারণ। সেই গবর্ণমেণ্ট কি আবার শিল্পের পুনরুত্থান সহ্য করিতে পারেন? ভারতের শিল্প বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; যদি বিনষ্ট শিল্প পুনর্জ্জীবিত হয়, তাহা হইলে দরিদ্রতার কতক উপশম হয়, প্রজার সুখ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ইংরাজ রাজা প্রজার সুখ বৃদ্ধির বিষয়ে উপযুক্তরূপ মনোযোগী নহেন। আমরা কুলি মজুরের কাজ করিব, চাযের কাজ করিয়া

ফসলাদি উৎপন্ন করিব ও অর্দ্ধাশনে দিনপাত করিব, আর ইংরাজ রাজপুরুষগণ ও ইংরাজ বণিকগণ ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাশালী হইয়া আমাদের উপর প্রভুত্ব চালাইবেন, ইহাই ইংরাজের মুখ্য উদ্দেশ্য। পাছে স্বদেশী আন্দোলনে সেই উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়, সেই ভয়ে রাজপুরুষগণ যেন তেন প্রকারেণ স্বদেশী আন্দোলনের বিনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছেন এবং নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাস্থানে নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন। কোথাও নিষ্ঠুর গুর্খা সৈন্যগণ গরিব নিরস্ত্র প্রজাগণকে বিধ্বস্ত করিতেছে, কোথাও অশিক্ষিত অর্থলোলুপ পুলিষ কর্ম্মচারিগণ দেশীয় বিক্রেতা ও ক্রেতার উপর উৎপীড়ন করিতেছে, আবার কোন কোন স্থানে সম্ভ্রান্ত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণকে কনষ্টেবল পদে নিযুক্ত করিয়া অপদস্থ ও নির্য্যাতন করা হইতেছে। এদেশের লোক রাজভক্ত। ইংরাজ এদেশের অনেক উপকার করিয়াছেন বলিয়া আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করি। কিন্তু ইংরাজ যদি কেবল স্বার্থে অন্ধ হইয়া আমাদিগকে অযথা কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন না। স্বদেশী আন্দোলনে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইলে, ইংরাজ ব্যবসায়ীর কতক লোকসান হইবে বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের বিশেষ লাভ হইবে, দেশের দরিদ্রতার লাঘব হইবে, চির দুর্ভিক্ষের উপশম হইবে, ইহা কি গবর্ণমেণ্টের বাঞ্ছনীয় নহে? আমরা বলি, গবর্ণমেণ্টের স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টা নিতান্ত অন্যায়।

আমাদের মতে, বঙ্গ বিভাগের সহিত স্বদেশী আন্দোলনের সংস্রব রাখাতেই সকল অনর্থ ঘটিতেছে ও গবর্ণমেণ্টও হস্তক্ষেপ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। বঙ্গ বিভাগ একটী রাজনৈতিক ব্যাপার, স্বদেশী আন্দোলন একটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। মনে কর, গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা বিভাগ হুকুম রদ করিলেন, সেই সঙ্গে কি আমাদের স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ করিতে হইবে? বাঙ্গালা দুই খণ্ডই হউক, আর দশ খণ্ডই হউক, আমাদিগকে দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, নতুবা আমরা অনন্যোপায় হইয়া পড়িয়াছি। যখন আমরা ভাবি—আমাদের সকলই ছিল, আর আমরা সকলই হারাইয়াছি, শিশুর ন্যায় গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অপরের মুখ চাহিয়া আছি, তখন আমাদের কি আত্ম-ঘৃণা উপস্থিত হয় না? বিদেশীকে কিম্বা বিদেশী জিনিষকে আমরা ঘৃণা করি না; আমরা চাই যে, আমরাও বিদেশী

বণিক ও শিল্পীর সমকক্ষ হইয়া শিল্প বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইব ও সর্ব্ববিধায়ে স্বাবলম্বী হইব। ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

বাস্তবিক, ভগবানের কৃপা-ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। আমরা চির পরাধীন; তাহার উপর, আমাদের বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের শিল্পের উন্নতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অমনোযোগী ও বিরোধী; আবার, আমরা স্বদেশী আন্দোলন লইয়া হৈ চৈ করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরাগ ভাজন হইয়া পড়িয়াছি, এবং এই আন্দোলনকে একটী রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ইহার বিরুদ্ধে লাগিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছি। কাজেই গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা বলি আর হৈ চৈর আবশ্যকতা নাই, স্বদেশী বক্তৃতা ও সভার প্রয়োজন নাই। এখন সকলকে, বিশেষতঃ দেশের নেতাগণকে, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কোন্ কোন্ জিনিষ আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় ও হইতে পারে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, কি পরিমাণে ও কোন্ কোন্ স্থানে সেই সকল জিনিষ প্রস্তুত হয় ও আরও কত প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, তাহাও স্থির করিতে হইবে। যে সকল উপায়ে স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্য আবশ্যকমত উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা ঠিক করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে। কলিকাতায় যে দেশীয় জমিদার-সমিতি ও বণিক-সমিতি আছেন, তাঁহারাই এই গুরুতর বিষয়ে মনোযোগী হইলে, আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা; নতুবা স্বদেশী আন্দোলনে আমাদিগকে হাস্যাস্পদ ও লাঞ্ছনাগ্রস্ত হইতে হইবে; ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এ গুরুতর ব্যাপার স্কুলের ছাত্রদ্বারা সিদ্ধ হইবার নহে। বাস্তবিক, স্কুলের ছাত্রদিগকে ইহাতে যোগদান করিতে দেওয়া নিতান্ত অযৌক্তিক হইয়াছে এবং সে জন্যই গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে বিরক্ত হইয়াছেন। কলেজের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রেরা রাজনৈতিক, কিম্বা সামাজিক বিষয়ে যোগদান করিতে পারে; কিন্তু স্কুলের অপরিণত অল্পবুদ্ধি বালকগণ লেখা পড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া যে, এ সকল ব্যাপারে মিলিত হয়, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার করিতে দিব না; এরূপ চেষ্টা অতি দুর্ব্বুদ্ধির কার্য্য। বিদেশী অনেক জিনিষ অপেক্ষাকৃত শস্তা; আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক গরিব, তাহারা অল্পমূল্য দ্রব্যও কিনিতে সমর্থ নহে; তাহাদিগকে দেশী জিনিষ কিনিতে বাধ্য করা যুক্তিযুক্ত নহে এবং আইন-সঙ্গতও নহে। আমাদের বিশ্বাস,

ক্রমশঃ দেশী জিনিষ সস্তা দরে বিক্রীত হইবে ও ধনী দরিদ্র সকলেই স্বেচ্ছায় ব্যবহার করিবে। অতএব যে সকল উপায়ে দেশের আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল স্থানে স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় ও বিদেশীয় দ্রব্যের সহিত সমান মূল্যে বিক্রীত হয়, প্রথমে সেই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া ও তাহার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। আমাদের গবর্ণমেণ্টও যাহাতে বিরক্ত না হন, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সে দিন ন্যাসান্যাল চেম্বার অব কমার্সের অভিনন্দনের উত্তরে রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো স্বদেশী আন্দোলনের সাপক্ষে দু' এক কথা বলিয়াছিলেন, ইহা আহ্লাদের বিষয় বটে; কিন্তু তা বলিয়া যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে স্বদেশী আন্দোলন লইয়া যথেচ্ছারূপ কার্য্য করিতে দিবেন, এরূপ কল্পনা যেন আমরা মনেও স্থান না দিই। যে বিষয়ে ইংরাজ বণিকের সর্ব্বনাশ, ইংরাজ রাজপুরুষগণ আমাদিগকে সে বিষয় হইতে পাকে প্রকারে নিরস্ত করিতে ক্রটী করিবেন না, তবে আমরা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিলে তাঁহারা আমাদিগকে নিবারণ করিবেন না, ইহা আমাদের বিশ্বাস। গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয় শিল্প ধ্বংসের কারণ হইলেও, আমাদের দোষেও যে দেশীয় শিল্প নষ্ট হইয়াছে, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্য মাত্রেই স্বার্থপর, ইংরাজও স্বার্থপর না হইবে কেন? ইংরাজের স্বজাতি-প্রেম আছে, সেই জন্যই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বজাতি শিল্পী ও বণিকগণের সুবিধা ও লাভের জন্য যে ব্যস্ত হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু আমরা আমাদের দেশের বিষয়ে এত উদাসীন এবং আমাদের স্বদেশ-প্রিয়তা ও স্বজাতি-প্রেমের এতই অভাব যে, আমরা স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্য ত্যাগ করিয়া, এত দিন দেশীয় শিল্পের বিনাশ কার্য্যে সাহায্য করিয়া আসিয়াছি ও শিল্পিগণের দুর্দ্দশা ও অধঃপতনের কারণ হইয়াছি; আর কেবল গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া, আপনাদের দোষ গোপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বাস্তবিক, এ বিষয়ে আমরা যে গবর্ণমেণ্টের অপেক্ষা অধিক দোষী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজভক্তি ও রাজধর্ম্ম।

রাজভক্তি হিন্দুদের একটী প্রধান ধর্ম্ম। হিন্দুরা রাজাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। *শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্ম কর্ম্মে স্বর্গীয় পিতৃলোকের ন্যায় রাজাও পূজার্হ। হিন্দুরাজত্ব কালে রাজা ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত ছিলেন, তথাপি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণও রাজার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেন। রাজাও প্রজাবর্গকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন; প্রজার সুখে রাজা সুখবোধ করিতেন, প্রজার দুঃখে দুঃখিত হইতেন। রাজা স্বয়ং নানাস্থানে পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া প্রজার অবস্থা অবগত হইতেন, তাহাদের অভিযোগ ও অভাব শ্রবণ করিয়া, প্রতীকার করিতেন। কোন কোন রাজা ছদ্মবেশে রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদের অবস্থা ও মনের ভাব জানিবার চেষ্টা করিতেন। প্রজার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানই যে, রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য, হিন্দু রাজগণ তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। রঘুবংশীয় দিলীপ রাজার সম্বন্ধে কবি কালিদাস বলিয়াছেন,—

প্রজানাম্ বিনয়াধানাদ্ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি
স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।

অর্থাৎ প্রজাদের পিতৃগণ কেবল জন্মদাতা মাত্র ছিল, রাজা দিলীপই তাহাদের বিদ্যাদান, ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ভারবহন করিয়া প্রকৃত পিতৃস্থানীয় ছিলেন। ইহাই যে যথার্থ রাজধর্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রঘুবংশীয় রাজা রামচন্দ্রও এইরূপ ভাবে রাজধর্ম্ম পালন করিতেন এবং তিনি এতদূর প্রজাবৎসল ছিলেন যে, প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, প্রিয়তমা পত্নীকে বনবাস দিয়াছিলেন। সদ্‌গুণের জন্যই তাঁহাকে অবতার বলিয়া হিন্দুরা এখনও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে; এবং যে রাজ্যে প্রজারা সুখে সচ্ছন্দে থাকে, সেই রাজ্যকে রামরাজ্য বলিয়া অভিহিত করে। প্রজার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্যই যে, হিন্দুরাজা কর গ্রহণ করিতেন, তাহাও রঘুবংশের দিলীপ উপাখ্যানে বর্ণিত আছে; যথা—

"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।"

হিন্দুরাজগণ অতি অল্প পরিমাণে কর আদায় করিতেন এবং তাহার প্রায় সমস্তই সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। মনুসংহিতা হইতে জানা যায়

যে, জমির উৎপন্নের ষষ্ঠাংশ মাত্র রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল; কোন রাজা উৎপন্নের অষ্টমাংশ, কেহ বা দ্বাদশাংশ মাত্র কর আদায় করিতেন:—"ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা।"

সাধারণতঃ হিন্দুরাজগণ যে বিদ্যোৎসাহী ন্যায়পরায়ণ ও গুণগ্রাহী ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহারা অপক্ষপাতে ন্যায়বিচার করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন এবং ধর্ম্ম ও সমাজ-রক্ষক ছিলেন। এরূপ স্বার্থশূন্য প্রজাবৎসল রাজা যে লোকপ্রিয় হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

মুসলমান সম্রাট ও সুবাদারগণের মধ্যে কেহ কেহ অত্যাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু আবার অনেকে প্রজাবৎসল ছিলেন। মুসলমান আক্রমণ সময়ে ভারতবর্ষের হিন্দুগণকে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল; বিশেষতঃ মুসলমানেরা হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী হওয়াতে উভয়জাতির মধ্যে বিলক্ষণ মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু মুসলমান রাজত্ব বদ্ধমূল হইয়া যখন সম্রাট্ আকবর সুশৃঙ্খল ভাবে ও সহৃদয়তার সহিত রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন, তখন হিন্দু প্রজাগণও তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিল। হিন্দুগণ আকবরের শাসন-প্রণালী ও ন্যায় বিচারের জন্য তাঁহাকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল এবং বিজিত হিন্দুরাজগণ তাঁহার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল। হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিত, কিন্তু আকবরের সদ্‌গুণে তাহাদের বিদ্বেষ-ভাব একবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। আকবরের ধর্ম্মদ্বেষ ছিল না; তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকে নিরপেক্ষভাবে দেখিতেন ও পালন করিতেন; তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন এবং যোগ্যতানুসারে রাজকর্ম্মচারীর নিয়োগ করিতেন; তাঁহারই রাজত্বকালে হিন্দুগণ বিচার, রাজস্ব ও সৈনিক বিভাগে উচ্চপদ পাইতে পারিত এবং সাধারণ প্রজা নির্ব্বিবাদে বাস করিত। যাহারা মনে করে যে, হিন্দুদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষভাব প্রবল, তাহারা যে আকবরের রাজত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মনুষ্য এবং নিকৃষ্ট জন্তুগণেরও কৃতজ্ঞতা বৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ এবং সহজেই এই বৃত্তির বিকাশ হইয়া থাকে। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন এবং প্রত্যুপকারের ইচ্ছা স্বতঃই সমুদ্ভূত হয়। তুমি আমাকে নিগ্রহ করিবে, আমার অনিষ্ট সাধন করিবে, আর আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিব, ইহা জগতে একবারে অসম্ভব এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী।

সহানুভূতি ও সমবেদনা দ্বারাই আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়; আর সহানুভূতির অভাব, স্বার্থপরতা এবং অবিশ্বাস হইতে বৈরভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। দুইটী মনুষ্য পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার দ্বারা যেমন শত্রু ও মিত্র ভাবাপন্ন হয়, রাজা ও প্রজার মধ্যে ঠিক তদ্রূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে মনুষ্য সাত্বিক ও ঐশিক গুণ-সম্পন্ন, তিনিই স্বার্থশূন্য, উদারচেতা ও চরিত্রবান্ এবং সকলের শ্রদ্ধেয় হন। হিন্দুরা রাজাকে দেবতা জ্ঞান করে; কারণ রাজার নামের সহিত স্বার্থশূন্যতা, ন্যায়পরতা, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি ঐশিকগুণ সংসৃষ্ট আছে; ইহা হিন্দুর মনে স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, সুতরাং এইরূপ গুণবর্জ্জিত রাজাকে হিন্দু ভক্তি করিতে অভ্যস্ত নহে। কেবল হিন্দু কেন, মুসলমান প্রভৃতি অপরাপর জাতিও রাজার গুণের জন্যই রাজভক্ত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, যে রাজা স্বার্থপর, অর্থলোলুপ ও প্রজাপীড়ক, তিনি রাজা নামের অযোগ্য এবং তাঁহার প্রজাগণের নিকট হইতে রাজভক্তির প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র।

বর্ত্তমানকালে সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনাধীন। ইংরাজ রাজা বিদেশীয়, তিনি কখনও এদেশে শুভাগমন পূর্ব্বক স্বচক্ষে প্রজার অবস্থা দেখা আবশ্যক মনে করেন না। কতকগুলি বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারী এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্য চালাইয়া থাকেন। এই সকল রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে কেহ কেহ সময়ে সময়ে যথেচ্ছভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া ইংরাজগবর্ণমেণ্টকে লোকাপ্রিয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা ক্ষণিক ক্ষমতায় উন্মত্ত হইয়া এদেশীয়দিগকে নির্যাতন করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইংরাজ রাজত্বে এদেশের লোকের নানাবিধ সুবিধা হইয়াছে এবং সেই জন্যই এদেশের লোক ইংরাজ রাজত্বের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করে; কিন্তু অদূরদর্শী, দাম্ভিক, নির্ম্মম ইংরাজ রাজপুরুষগণের দোষে ইংরাজনাম কলঙ্কিত হইতেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, অপরাধিগণ দণ্ডিত হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব বাঙ্গালার ছোটলাট সাহেব যেরূপ অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশীয় লোকের ইংরাজ রাজত্বের প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়া যাইবার কথা। এদেশের লোক নিতান্ত রাজভক্ত, নতুবা ফুলার সাহেব ও তাঁহার অধীনস্থ অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারিগণকে নিশ্চয়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত। অযথা স্বজাতি-প্রেম ইংরাজ চরিত্রের একটী প্রধান দোষ এবং সেই জন্য বিচার বিভ্রাট প্রভৃতি অনর্থ ঘটিয়া থাকে। ইংরাজ অপরাধীর বিচারের জন্য দণ্ডবিধি আইনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাজপ্রতিনিধি ন্যায়পরায়ণ লর্ড রিপন

এই পক্ষপাতী ব্যবস্থা রদ করিবার চেষ্টা করাতে ইংরাজদের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়াছিল এবং রিপনের সেই চেষ্টা নিস্ফল হইল। এদেশীয় লোক বুদ্ধি ও বিদ্যাতে ইংরাজের সমতুল্য হইলেও প্রধান প্রধান রাজপদ পাইতে পারিত না। সম্প্রতি অল্পসংখ্যক দেশীয় যোগ্য লোককে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইতেছে এবং সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকের ধন্যবাদার্হ।

কোন কোন ইংরাজ রাজপুরুষ প্রকাশ্য ভাবে বলেন যে, এদেশীয় লোক প্রকৃত পক্ষে রাজভক্ত নহে; কিন্তু তাঁহারা কি বুঝেন না যে, তাঁহাদের শাসন প্রণালীর দোষেই গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের ভক্তি কমিয়া যায়? যদি এদেশীয়দের প্রতি ইংরাজের সহানুভূতি না থাকে, যদি এ দেশ হইতে অর্থ সংগ্রহই ইংরাজের একমাত্র লক্ষ্য হয়, যদি আইনের চক্ষে ইংরাজ ও দেশীয় প্রজাকে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়, তাহা হইলে দেশীয় লোক যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বীতরাগ হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইংরাজ রাজত্বে যে এ দেশের নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। ইংরাজ রাজার আমলেই এ দেশের শিল্প বাণিজ্যের অধঃপতন হইযাছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যচ্ছলে এদেশে প্রবেশ করিয়া রাজ্য স্থাপন করতঃ দেশের যে কি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই কোম্পানির আমলে এ দেশের শিল্প বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য নানা প্রয়াস হইয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ সেইরূপ প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। এ দেশের শিল্প ধ্বংসপ্রায় এবং শিল্পিগণ দুরবস্থাপন্ন, আর ইংলণ্ডের শিল্পের ক্রমোন্নতি হইতেছে এবং ইংরাজ শিল্পী ও বণিকগণ এদেশ হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া প্রভূত ধনশালী হইয়াছে। সম্প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার বিষয়ে কথঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। স্বদেশী আন্দোলনে রাজ পুরুষগণের সহানুভূতি আবশ্যক, তাঁহাদের সহানুভূতি আছে জানিলে, এদেশীয় লোক যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টর প্রতি আন্তরিক রাজভক্তি প্রদর্শন করিবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বদেশী আন্দোলন রাজদ্রোহিতামূলক নহে; রাজপুরুষগণ ও অন্যান্য ইংরাজ যে একথা বুঝিতে অসমর্থ, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। আমাদের মনে হয় যে, তাঁহারা স্বার্থনাশের আশঙ্কায়ই স্বদেশী আন্দোলন প্রতিরোধের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

ইংরাজ রাজা বিদেশী ও বিধর্ম্মী, সুতরাং এ দেশীয় প্রজার অনুরাগভাজন হইতে হইলে, তাঁহার কর্ম্মচারিগণের কার্য্যকলাপের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তাঁহারা যাহাতে এ দেশীয়দিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, তাহাদিগকে অবিশ্বাস না করেন এবং যোগ্যতানুসারে তাহাদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন, রাজার তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া ও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এদেশীয় ইংরাজের মধ্যে কেহ কেহ এত নীচ প্রবৃত্তি-সম্পন্ন যে, তাহারা এদেশীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকেও অসভ্য নেটিভ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে এবং তাঁহাদিগকে নিগৃহীত করিতে পারিলে আপ্যায়িত বোধ করে। সেই সকল দাম্ভিক কৃতঘ্ন ইংরাজের দোষে গবর্ণমেণ্ট লোকাপ্রিয় হইয়া উঠেন। হিন্দু ও মুসলমানগণ রাজাকে ধর্ম্মরক্ষক বলিয়া সম্মান করিত। ইংরাজ রাজা ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না বটে, কিন্তু খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম রক্ষার জন্য রাজকোষ হইতে প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হয়; অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয়িত হয় না; সুতরাং ইহাতে প্রজাদের বিশেষ আপত্তি আছে এবং তাহাদের আপত্তি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই অন্যায় অর্থব্যয় সম্বন্ধীয় প্রতিবাদে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করেন না। এরূপ পক্ষপাতী রাজনীতি সভ্য গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইত এখন রাজস্বের পরিমাণ তাহা হইতে প্রায় দশগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই রাজস্বের প্রায় চতুর্থাংশ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইংরাজ বণিকগণও এখানকার অর্থ স্বদেশে লইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশে নূতন নূতন বন্দোবস্ত হইয়া ভূমির কর বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে, তাহাতে কৃষিজীবী প্রজাগণ অবস্থাহীন হইয়া পড়িতেছে। এই সকল অসন্তোষের কারণ স্বত্বেও আমরা ইংরাজ রাজত্বে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে আছি বলিয়া, এবং অনেক উদার-চেতা ইংরাজ আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন বলিয়া, আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী। সহানুভূতি ও ন্যায়পরতাই যে গবর্ণমেণ্টের মূল ভিত্তি, একথা বলা বাহুল্যমাত্র। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আইন ও শাসন প্রণালী বিধিবদ্ধ ও আমাদের হিতকর অনেক বিষয়ের অনুষ্ঠান হওয়াতে, আমরা গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ আছি। তবে অত্যাচারী রাজপুরুষগণ যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না; এবং সেই জন্যই তাহাদিগকে সৈনিক বিভাগে কার্য্য দেন না, এবং কঠোর অস্ত্র আইন প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছেন। দেশীয় উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের প্রতিও গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস কম। স্বায়ত্ত শাসনপ্রথার বিস্তার করিলে গবর্ণমেণ্টেরও মঙ্গল এবং আমাদেরও উপকার ও উন্নতি হয়; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সেই প্রথার বিস্তার না করিয়া প্রতিরোধ করিতেছেন। রাজ প্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন স্বায়ত্ত শাসন প্রণালীর বিরোধী ছিলেন এবং তদনুরূপ রাজনীতির অবতারণা করিয়া দেশের উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ দেশীয়দের সহিত মিশিতে নারাজ, সুতরাং এদেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। দেশীয় শিক্ষিত লোকদিগকে বিশ্বাস না করিয়াও তাঁহাদের পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য না চালাইয়া ইংরাজ রাজপুরুষগণ সময়ে সময়ে বিষম ভ্রমে পতিত হন, এবং সেই জন্য যে গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া যায়, ইহা নিশ্চয়ই আক্ষেপের বিষয়। এদেশীয়দের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া লর্ড কর্জ্জন বাঙ্গালা প্রদেশটীকে দুই খণ্ড করিয়া গেলেন; তাহাতে বাঙ্গালী প্রজাগণ বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হইয়াছে; আবার ভারত সচিব মর্লি সাহেব কর্জ্জনের এই অন্যায় কার্য্যটীর অনুমোদন করাতে তাহাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ কার্য্য দ্বারা যে প্রজার রাজভক্তির হ্রাস হয়, অবিবেচক রাজপুরুষেরাই ইহার জন্য দায়ী। আমাদের বিবেচনায় যাহাতে এদেশীয়দিগের রাজভক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, ইংরাজ রাজপুরুষদের সর্ব্বদা সেইরূপ প্রয়াস পাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। দেশীয়দের প্রতি সহানুভূতি কার্য্যতঃ দেখাইতে হইবে, কেবল মুখে প্রকাশ করিলে চলিবে না। দিলীপ, রাম ও আকবরকে আদর্শ করিয়া প্রজাপালন না করিলে রাজধর্ম্ম পালন করা হয় না এবং প্রজার ভক্তি প্রত্যাশা করা যায় না।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দের সকল প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে অপারগ। তাহা বলিয়া কি, ন্যায়সঙ্গত আবেদনগুলিও অগ্রাহ্য করিতে হইবে? জেলার মাজিষ্ট্রেটের হস্তে পুলিষ ও ফৌজদারী মকর্দ্দমার বিচারের ভার ন্যস্ত থাকাতে যে বিচার বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, গবর্ণমেণ্টও তাহা স্বীকার করেন। তবে কেন ইহার প্রতীকার না হয়? গবর্ণমেণ্ট বলেন, অর্থের অনটনবশতঃ একজন কর্ম্মচারীর উপরেই দুই কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে।

আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, গবর্ণমেণ্টের অর্থের অভাব নাই, তবে অন্য মতলবে উক্তরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে মাত্র; অর্থের অভাব হইলে বঙ্গ বিভাগ করিয়া আর একটী ব্যয়সাধ্য গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করা কেন হইল? সৈনিক বিভাগে অযথা খরচ হয়, সম্প্রতি আবার সেই খরচ বৃদ্ধির আয়োজন হইল, ইহা কি অনটনের পরিচয়? যদি অর্থেরই এত অভাব, তবে ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগকে মোটা মোটা বেতন দিয়া কেন দেশের সর্ব্বনাশ করা হয়? একজন দুইশত টাকা বেতনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটও জেলার মাজিষ্ট্রেটের অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারেন। কৃতবিদ্য দেশীয়দিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলে, গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয় লাঘব হয়, রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হয়, এবং গবর্ণমেণ্টও প্রজাপ্রিয় হন। সকল ইংরাজ কর্ম্মচারীকে দূরীভূত করিয়া যে, দেশীয় লোককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে, আমরা এমন কথা বলি না; কারণ আমরা জানি নিষ্কাম ধর্ম্মপালনের সুবিধার জন্য ইংরাজ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করেন নাই। তবে আমাদের বিবেচনায় যদি ইংরাজের প্রবল স্বার্থপরতার কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়া ইংরাজ রাজার কতক পরিমাণে রাজধর্ম্ম পালন করা হয় এবং এদেশীয় লোক কৃতজ্ঞ ও রাজভক্ত হয়, তাহা হইলে ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

রাষ্ট্রবিপ্লবে দরিদ্র প্রজারই সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে, ইহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। ফ্রান্সদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবে ফরাসীজাতির সম্পূর্ণ অধঃপতন হইয়াছে। সম্প্রতি রুষরাজ্যের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া নানাপ্রকারে বিধ্বস্ত ও লাঞ্ছিত হইতেছে। সাধারণ কথায় বলে:—"রাজার দোষে রাজ্যনষ্ট প্রজা কষ্ট পায়।" যে রাজ্যে প্রজা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, সে রাজ্যে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় না, প্রজার ন্যায় রাজাও মনের আনন্দে ও শান্তিতে কালযাপন করিতে পারেন, ইহাই ইহজীবনে একমাত্র বাঞ্ছনীয়। সুতরাং প্রজার মনে যাহাতে রাজদ্রোহিতার উদ্রেক না হয়, রাজার সেইরূপ প্রণালীতে রাজকার্য্য পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, এদেশের লোক ইংরাজ রাজত্বে অপেক্ষাকৃত শান্তিতে আছে বলিয়াই ইহার পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা করে না। যে সকল উপায়ে সেই শান্তির বৃদ্ধি হয় ও দেশীয়দিগের মনে রাজভক্তি অটল হয়, রাজপুরুষগণ তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব যে সম্পূর্ণ

দূরীভূত হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সকল ইংরাজ রাজপুরুষ দেশীয়দিগের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন ও তদনুরূপ কার্য্য করেন, তাঁহারাই দেশীয়দের আন্তরিক ভক্তি পাইবার যোগ্য; কিন্তু পক্ষান্তরে যাঁহারা দেশীয় লোকদিগকে অশ্রদ্ধা করেন ও নেটিভ বলিয়া ঘৃণা করেন তাঁহারা কিছুতেই শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারেন না এবং তাঁহারাই যে ইংরাজ রাজ্যের প্রধান শত্রু, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

যৌথ-কারবার।

আমাদের একটি প্রবাদ আছে—"বাণিজ্যে বর্দ্ধতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি"। এ কথাটী অতি সত্য। জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কৃষিতে যেমন জীবন ধারণের উপায় হয়, বাণিজ্যেও সেইরূপ দেশীয় শিল্পাদির সংরক্ষা করিয়া আপনাদের মহান্ গৌরব জগতের সমক্ষে প্রকাশ করা যায়। কোন জাতির বা দেশের গৌরবের একটি চিহ্ন- তাহার শিল্প। এই শিল্প বজায় রাখিতে হইলে, অথবা তাহার উন্নতি সাধন করিতে হইলে, অনেক সময় ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা জনসাধারণের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন হয়। আজ যে আমরা আমাদের জীবনের নবযুগ আনিবার জন্য, আমাদের সকল অভাব আপনারা দূর করিবার জন্য, উদ্‌গ্রীব হইয়াছি, তাহা সাধন করা ব্যক্তি বিশেষের সাধ্য নহে। দেশের জনসাধারণের সমবেত শক্তি নিয়োগ করা চাই, তবে যদি আমরা আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে পারি।

আমাদের দেশের অনেক শিল্পের অধঃপতন ঘটিয়াছে, আবার অনেক শিল্প এককালে লোপ পাইয়াছে। সেই সকল শিল্প রক্ষা ও উদ্ধার করিতে না পারিলে আমাদের গত্যন্তর নাই। এক কাপড়ই ধরুন। এক সময় ভারতের কাপড়ে জগতের অন্যান্য স্থানের লজ্জা নিবারিত হইত, আর আজ ভারতবাসী—বিশেষতঃ বঙ্গবাসী স্বীয় লজ্জা নিবারণের জন্য পরের দ্বারস্থ। আজ যদি ম্যানচেষ্টার বা বোম্বাই আমাদের কাপড় না যোগায়, তবে কাল আমাদিগকে দিগম্বর সাজিতে হইবে। কিন্তু একথা বেশ বুঝিয়াও আমাদের মোহ-নেত্র উন্মীলিত হইতেছে না। যদি আমাদের চেতনা থাকিত,

যদি আমাদের মোহ কাটিয়া যাইত, তবে এতদিন বঙ্গলক্ষ্মী মিল পরের হস্তে থাকিত না,—কবে বাঙ্গালীর আপনার হইত। কবে বঙ্গের চারিদিকে কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্তু হায়! যে বাঙ্গালীর উদ্বোধন মন্ত্র "বন্দে মাতরং" শব্দে সমগ্র ভারত আজ প্রবুদ্ধ, সেই বাঙ্গালী কিনা আজও তমসাচ্ছন্ন, তাহার কার্য্য করিবার শক্তি নাই, সত্ত্বগুণ জাগাইবার যথা চেষ্টা নাই। বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক রাখিবার স্থান কোথায়? চারিদিকে 'টিট্‌কারি' উঠিতেছে। তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমাদের নিজের মঙ্গলের জন্য যদি আমরা এখনও কার্য্যে অগ্রসর না হই, তবে বাস্তবিকই আমরা বাক্য-বীর;—কার্য্য-ক্ষেত্র পাইয়াও কর্ম্ম-বীর হইতে পারিলাম না।

স্বদেশী আন্দোলন আরব্ধ হইবার পর হইতে অনেকগুলি নূতন শিল্পের উদ্ভাবনা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা সমুদ্রের তুলনায় গোস্পদ মাত্র। আমাদের যে সকল শিল্প এককালে লোপ পাইয়াছে, তাহাদের উদ্ধার করিবার জন্য, ও যে সকল নূতন বিদেশী শিল্পের ব্যবহার হইয়াছে, তাহাদের আপনার করিয়া লইবার জন্য, দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। সুতরাং যৌথ কারবার প্রথার ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলন চাই। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লোকে কদাচিৎ অধিক ধন অর্জ্জন করে, এবং তাহাতে কোন বড় কারবারে হাত দেওয়া যায় না। আমাদের এ সোনার ভারতের সর্ব্বত্র এমন অনেক পল্লী আছে, যেখানে অল্প খরচায় অথচ বেশ সাফল্যের সহিত অনেক বড় বড় কারবার চালান যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সমুদয় স্থানে এমন একটী সাহসী ও ধনী উদ্যোগী পুরুষ নাই, যিনি শিল্পের উন্নতির জন্য নিজের মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারেন, এবং তাঁহার টাকা যৌথ-কারবারে খাটাইতে পারেন। কাজেই সে সমুদয় স্থানের শিল্পের বিকাশ আদৌ হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য? জন সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কিছু টাকা তুলিতে হইবে, পরে বিশ্বস্ত ও কার্য্যদক্ষ লোকসমূহের দ্বারা একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির গঠন করিতে হইবে। সেই সমিতি এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে ব্যবসায়ের ভার অর্পণ করিবেন। অন্য কথায়, সেই সংগৃহীত টাকায় একটী যৌথ-কারবার খুলিতে হইবে। ভারতের জন সাধারণ আজও এরূপ ভাবে টাকা খাটাইতে শিখেন নাই। এমন কি, দেশীয় শিক্ষিতগণও আজ এ বিষয়ে যথেষ্ট পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। কলিকাতায়, বোম্বাই সহরে ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থানে কয়েকটী মাত্র

যৌথ-কারবার আছে, যেখানে ভারতবাসীর অধিকাংশ টাকা খাটিতেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি নগণ্য। যতদিন না ভারতবাসী যৌথ-কারবারে টাকা খাটাইতে শিখিবে, ততদিন ভারতবাসীর বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করিবে না, তাহা ব্যক্তিগত হস্তেই থাকিবে, এবং শিল্পাদিরও সত্বর ও যথা উন্নতি সম্ভবপর হইবে না।

ভারতবাসী এরূপ ভাবে টাকা খাটাইতে কেন পারে না, তাহারও কারণ অনুসন্ধান তত শক্ত নয়। আমরা নিয়ে সেইগুলি নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইব।

একটী কারণ এই যে, ভারতবাসী তাহার সমস্ত সম্পত্তি রৌপ্য বা স্বর্ণ অলঙ্কাররূপে এবং জমী প্রভৃতি রূপে স্থাবর করিতে বড় ভালবাসে। সে তাহার সম্পত্তি সর্ব্বদা চক্ষে দেখিতে চায়। কিন্তু তাহার এ প্রথা আধুনিক কালের প্রথার বিরুদ্ধ। পূর্ব্বকালে যখন যৌথ-কারবারের কথা কেহ জানিত না, যখন দেশ অরাজকতায় পূর্ণ ছিল, যখন ঠগ পিণ্ডারী প্রভৃতি ডাকাইত-গণের উপদ্রবে গৃহস্থের বাস বিপদ-সঙ্কুল হইয়াছিল, এ প্রথা তখনকার লোকেরই উপযুক্ত ছিল। তখন লোকে চোরের হস্ত হইতেসম্পত্তি রক্ষার জন্য তাহা জমীরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে বা অলঙ্কারাদি রূপে ব্যবহার করিতে একান্ত উৎসুক হইবে, তাহার আর বৈচিত্র কি? বর্ত্তমান বাণিজ্য যুগের প্রারম্ভেও যে ভারতবাসী পূর্ব্বের ন্যায় তাহার সম্পত্তি স্থাবর করিতে চাহে, তাহাতেও আশ্চর্য্যের কিছু নাই। কিন্তু তাহার বুঝা উচিত যে, সে পুরাতন যুগ আর নাই,—নব যুগ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বকালে, যখন একস্থান হইতে অন্যত্র গমন সুবিধাজনক ছিল না, যে সামান্য রাস্তা-ঘাট ছিল, তাহা কেবল সংসার-বিরাগী তীর্থ-যাত্রীদেরই ব্যবহারে আসিত; যখন চোর-ডাকাতের অতিমাত্র বাহুল্য ছিল, তখন লোকে যে শান্তি-প্রিয় হইয়া স্বীয় কুটীরেই বাস করিবে, জমীকর্ষণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইবে, এবং স্বতঃই জগতের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবে, তাহাতে আর অসম্ভব কি? এখন এই নবযুগে ভারতবাসীকে শিক্ষিত হইয়া আপনার উন্নতির পথ আপনি উন্মুক্ত করিতে হইবে। জমী একটী সুন্দর সম্পত্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ব্ব কালের ন্যায় তাহাই একমাত্র সম্পত্তি হওয়া উচিত নয়। ঠগ-পিণ্ডারী প্রভৃতি ডাকাইতদের কাল অন্ত হইয়াছে। এখন কর আদায়কারী পেয়াদা ব্যতীত আর কেহই গৃহস্থের শান্তি নষ্ট করিতে সাহস করে না। কেবল কৃষিকার্য্যেও আবার তেমন লাভের আশা নাই। জমীই যখন

আমাদের জীবন ধারণের প্রধানতম উপায়, তখন ভারতবাসী কৃষিকর্ম্মও করুক, এবং সেই সঙ্গে কিছু অর্থ শিল্পকার্য্যে খাটাইতে শিখুক। শিল্পের উন্নতি করা এখন বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোনরূপ যৌথ কারবার খুলিতে হইলে কোন মহাজন হইতে টাকা কর্জ্জ লওয়া আবশ্যক হয়; কিন্তু ভারতে সেরূপ সুবিধাজনক প্রথা বিদ্যমান নাই। জমীদার, ব্যবসায়ী, দোকানদার, কেরাণী, শিক্ষক ও উকীল প্রভৃতি সকলেই টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন। ইঁহাদের অনেকেই দলীল লইয়াই টাকা দেন। আইন ব্যবসায়িগণের বা সেইরূপ কোন উচ্চ ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ তেজারতি ব্যবসায়ও করিয়া থাকেন। একজন উকিল আদালতে যাইবার কিছু পূর্ব্বে একজন স্ত্রীলোককে তাহার কোন গহনা বন্ধক লইয়া মাসিক চারি আনা সুদে দশ টাকা কর্জ্জ দিতেছেন, ইহা দেখিতেই কেমন বিসদৃশ বোধ হয়। এরূপ ব্যবসায় যতই নিন্দিত হউক না কেন, লাভ অনিবার্য্য। দশ টাকায় মাসিক চারি আনা সুদ হইলে বার্ষিক শতকরা ত্রিশ টাকা সুদ হয়। এরূপ উচ্চ সুদে এবং আবার কোন সম্পত্তি বন্ধক লইয়া টাকা কর্জ্জ দিতে দেখিলে বাস্তবিকই বড় হিংসা হয়। কিন্তু এরূপ ব্যবসায় কোনরূপ শিল্পের উন্নতির পক্ষে বড়ই মারাত্মক। একজন তাহার কিছু সম্পত্তি এইরূপে গচ্ছিত রাখিয়া শতকরা ত্রিশ টাকা সুদে কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া তাহা কোন কারবারে খাটাইতে সাহস করিবে বলিয়া বোধ হয় না। কারবারে তাহার আয় হয়ত প্রথমে শতকরা দশ টাকার বেশী হইবে না। সুতরাং প্রথম বার সুদ দিতে না দিতেই তাহাকে দেউলিয়া হইতে হইবে। তেজারতি ব্যবসায়ের পরিণাম অতি বিষময়। অধিকন্তু এ ব্যবসায়ে যত লাভ হইবে মনে করা যায়, কার্য্যতঃ তাহা হয় না। সুতরাং ব্যবসায়ীর বিশেষ লাভ নাই। তাহার টাকার কতকাংশ মাত্র খাটে; বাকী সমস্তই পড়িয়া থাকে। সুতরাং যদিও সে শতকরা ত্রিশ টাকা খাটায়, তথাপি হিসাব করিলে দেখা যায়, সমস্ত টাকাতে সে শতকরা দশ পনর, জোর কুড়ি টাকা মাত্র লাভ পাইয়া থাকে। কিন্তু যদি এই সমস্ত টাকা শিল্পোন্নতিকর কোন বড় কারবারে খাটান যাইত, তবে আয় ত যথেষ্ট হইতই, পরন্তু এরূপ ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তি পাওয়া যাইত। উকিল মহাশয়কে এরূপ ব্যস্ত থাকিতে হইত না, অথবা দেনাদারের অপেক্ষায় থাকিতে হইত না। তিনি পাঠের জন্য অনেকটা সময়ও পাইতেন এবং

নিশ্চিন্তমনে পড়িতেও পারিতেন। তেজারতি ব্যবসায়ে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পায় না; কিন্তু সে টাকা যদি অন্য কোন শিল্পোন্নতিকর ব্যবসায়ে খাটান যায়, তবে কয়েক বর্ষেই সেই টাকার মূল্য দ্বিগুণ হইয়া থাকে। মনে কর, একজন কোন শিল্পোন্নতিকর ব্যবসায়ে একশত টাকা ফেলিলেন, এখন যদি সেই ব্যবসায় ভালরূপ চলে এবং প্রথম বর্ষে প্রতি অংশীদার শতকরা আট টাকা লাভ পান, তবে এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয় যে, একশত টাকা মূল্যের অংশ তখন একশত কুড়ি টাকার মূল্যে দাঁড়াইয়াছে। তবেই সেই অংশের প্রকৃত লাভ শতকরা আট টাকা নয়—আটাইশ টাকা। সেই জন্যই বলি, শিল্পোন্নতিকর ব্যবসায়ে টাকা খাটাইলে তাহার লাভ অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি। 'ক্ষত্রস্-ঝেরিয়া খনি'র কথা একবার মনে করুন। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে উক্ত ব্যবসায়ীর প্রতি অংশ দশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। কিছুদিন পর ভারতবর্ষীয় কয়লার আদর হওয়ায় প্রত্যেক অংশের মূল্য বিয়াল্লিশ টাকায় দাঁড়ায় এবং প্রতি অংশীদার বার্ষিক শতকরা চল্লিশ টাকা লাভ পাইতে থাকেন। এখানেই শেষ নয়। এই যৌথ-কারবার অত্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করে। ইহাদের খনিও অত্যন্ত প্রকাণ্ড ছিল। এই খনির একটী অংশ যখন 'শিবপুর কোল মাইনিং' কোম্পানীকে বিক্রয় করা হয়, তখন অংশীদারগণের প্রথম ব্যবসায়ে যে অংশ ছিল তাহা ত রহিলই, অধিকন্তু বিক্রীত অংশের মূল্যস্বরূপ প্রত্যেকে নূতন ব্যবসায়ে পাঁচ টাকা মূল্যের চারিটী অংশ বিনা খরচায় পাইলেন। এই নূতন অংশেরও আয় ছিল। কয়েক বর্ষ মধ্যে নূতন ব্যবসায়ের প্রতি অংশের মূল্য পাঁচ টাকা হইতে চৌদ্দ টাকায় উঠে। তবেই বুঝুন, প্রথম কারবারে যাঁহার দশটী অংশ ছিল, তাঁহার সেই একশত টাকার মূল্য ৪২০৲ টাকায় দাঁড়াইল; অধিকন্তু ৪০৲ টাকা লাভও পাইতে লাগিলেন এবং নূতন ব্যবসায়ে ১১২৲ টাকা মূল্যের আটটী অংশ পাইলেন। সেই বৎসর তাঁহার একশত টাকার মূল্য ৫৭২৲ পাঁচশত বাহাত্তর টাকা হইয়া দাঁড়াইল। তেজারতি ব্যবসায়ে এরূপ লাভের কোন আশা আছে কি? অতি অল্পকাল মধ্যে 'ক্ষত্রস্-ঝেরিয়া খনি' বর্দ্ধিষ্ণু কারবার সমূহের অন্যতম হইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু ইহার লাভ অন্যান্য কারবারের অপেক্ষা অধিক হইতেছিল। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ভারতবর্ষের কয়লার ব্যবসায়িগণ অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। যিনি ব্যবসায়ে টাকা ফেলিতে

চান, তিনি অধিক লাভের আশায় যা'তে তা'তে টাকা না ফেলেন। অনেক কারবারে অনেক লাভ হইবে বলিয়া আপাতঃ বোধ হয়, কিন্তু কার্য্যকালে কিছুই হয় না। সুতরাং টাকা ফেলিবার কালে সাবধান হইয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় কয়লার যে এরূপ হঠাৎ আদর হয়, তাহার একমাত্র কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ ব্যাপার। এরূপ হঠাৎ আদরের ফল সাধারণতঃ বড়ই ভয়ানক। যখন প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়, তখন আর সে বস্তুর আদর থাকে না। সুতরাং তাহাতে অনেককে দেউলিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু এই কয়লার ব্যবসায়ে তাহা হয় নাই। পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় কয়লার আদর কেহই করিত না; কিন্তু উক্ত যুদ্ধের সময় হইতেই তাহার আদর বাড়িয়া গিয়াছে।

তৃতীয় কারণ এই যে, ভারতবাসী যৌথ-কারবারে টাকা ফেলিতে বড়ই ভীত। তাহার উপর আবার কয়েকটী যৌথ কারবার দেউলিয়া হওয়ায় বহুসংখ্যক ভারতবাসী অতীব কষ্টে নিপতিত হয়। এ সব কারণে তাহাদের ভয়ের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে—"Once bitten, twice shy" ভারতবাসীরও হইয়াছে তাই। বঙ্গদেশের ১৮৯০ সালে যে স্বর্ণখনি বিভ্রাট ঘটে, তাহা একবার স্মরণ করুন। ঐ সময়ের কিছু দিন পূর্ব্বে একটী জনরব উঠে যে, বঙ্গদেশের কোন জেলায় স্বর্ণখনি পাওয়া গিয়াছে। অমনি বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীর দল গঠিত হইল। খনি সম্বন্ধে কত সুন্দর সুন্দর ও আশাজনক বিবরণ শুনা যাইতে লাগিল। কলিকাতায় বিশুদ্ধ স্বর্ণখণ্ডও দেখান হইল। সকলেই এই সমস্ত ব্যবসায়ের অল্প বিস্তর অংশ কিনিতে লাগিল। অল্প দিনেই প্রতি অংশের দর বাড়িতে লাগিল। কত রাজা মহারাজা, কত নবাব,উজির বড় বড় অংশ কিনিতে লাগিলেন। তার পর যখন সেই হৃদয়-বিদারক ভীষণ সত্য বাহির হইয়া পড়িল, যখন সকলে স্থির কর্ণে শুনিল, খনি সমূহে অধিক স্বর্ণ নাই, তখন চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। এ ব্যবসায়ে কয়েকজন লোক ধনী হইল বটে; কিন্তু কত রাজা মহারাজাকে পর্য্যন্ত নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। ১৮৮২—৮৩ সালে দাক্ষিণাত্যে ঠিক এইরূপ একটী ঘটনা ঘটে। তাহাতে যদিও ভারতবাসীর কোন ক্ষতি হয় নাই, তথাপি তাহারাও সে কারবারের ভয়াবহ পরিণামের কথা অজ্ঞাত নয়। ঐ সময়ে একটী জনরব উঠে যে, ইয়ানাদ নামক স্থানে কতকগুলি স্বর্ণের খনি আছে। এই জনরব প্রচারিত

হইবামাত্র একটী ব্যবসায়ীর দল গঠিত হইল। এবার সমস্ত টাকাই ইংলণ্ড হইতে আনীত হয়। এ জনরব মূলতঃ মিথ্যা হয় নাই। ভারতবাসিগণ উপর উপর কতক স্বর্ণ তুলিয়া লইয়া উহা ত্যাগ করিয়াছে, সকলে এই বিশ্বাস করিল। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভিত্তিহীনও নহে। সেই জন্য সকলেই মনে করিয়াছিল, উক্ত খনি সমূহে নিশ্চয়ই যথেষ্ট স্বর্ণ নিহিত আছে। ইদানীং যে সকল সুন্দর সুন্দর যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় দ্বারা যথেষ্ট স্বর্ণ উত্থিত হইতে পারিবে এবং তাহাতে প্রত্যেক অংশীদারই বিশেষ লাভবান হইতে পারিবেন। যাহা হউক, অতি সত্বরকার্য্য আরম্ভ হইল। উক্ত স্থানে বহুসংখ্যক বাংলা ও গৃহাদি নির্ম্মিত হইল। য়ুরোপ হইতে কয়েকজন খনি-তত্ত্ব-বিদ্ আসিলেন। মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় যন্ত্র-পাতি পাঠাইবার জন্য ইংলণ্ডে সংবাদ পাঠান হইল। বহু ব্যয়ে ইয়ানাদ পাহাড়ে যন্ত্র পাতিও আনা হইল। কতক আনীত হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইল। অপর যন্ত্রাদি আসিতে না আসিতেই ভ্রম প্রমাণিত হওয়ায় সকল উদ্যম মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় লয় পাইল। আজও যদি কেহ ইয়ানদ পরিভ্রমণে যান, তবে তিনি নানাদিকে কুলিগণ কর্ত্তৃক ত্যক্ত স্তূপীকৃত যন্ত্রাদি দেখিয়া স্বতঃই বিস্মিত হইবেন। ইহারা উক্ত যৌথ কারবারের শোকাবহ পরিণাম ঘোষণা করিতেছে।

এরূপ বহুসংখ্যক উদ্যমে অকৃতকার্য্য হওয়ায় ভারতবাসীগণ যৌথ-কারবারে অর্থ ফেলিতে সাহস করেন না। কে বলিবে, কত কাচের ব্যবসায়, কত দেশলাইয়ের কল, কত কাগজের কল, এরূপ আরও কত নূতন উদ্যম দুই দিন না যাইতে যাইতেই অকালে কালের গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে! ভারতবাসিগণ এরূপ বারম্বার বিফল-মনোরথ হওয়ায়, যদি তাহাদের সমস্ত অর্থ সিন্ধুকের নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া রাখে বা গহনাদি রূপে ব্যবহার করে, অথবা ত্রিশ টাকা সুদের তেজারতি ব্যবসায় করে, তবে আর কি বলিব! কিন্তু ভারতবাসিগণ কেন এরূপ বিফল মনোরথ হয়, তাহার কারণ অনুসন্ধানে অনেক উপকার হইতে পারে। সুতরাং আমরা আবার তাহাই আলোচনা করিব।

আধুনিক কালে যে কয়টী ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বঙ্গদেশের সেই স্বর্ণ-খনি-বিভ্রাটই প্রধান। এই ব্যবসায়ে যাঁহারা অংশীদার ছিলেন, তাঁহারা কয়েকজন উদ্যমীদিগের বাক্যে বা তাহাদের দালালের

মধুময় বাক্যে মুগ্ধ হইয়াই টাকা দেন। কোথায় স্বর্ণ-খনি আছে তাহা আবিষ্কার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, এবং তাহা সম্পূর্ণ অনুমানের উপরেই নির্ভর করে। আবার স্বর্ণও একটী প্রয়োজনীয় ধাতু নয়, সুতরাং তাহাতে জগতের বিশেষ কোন উপকার হয় না। আপাততঃ এরূপ কার্য্যে টাকা ফেলিতে যাওয়া ভারতবাসীর পক্ষে আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। কোন্ খনিতে স্বর্ণ আছে, এবং তাহা কত পরিমাণ আছে, তাহা পূর্ব্বাহ্নে বলা একেবারেই অসম্ভব এবং তাহা সম্পূর্ণরূপেই অনুমান-সিদ্ধ। কয়লার খনি দেখিলেই জানা যায়, উহাতে কত পরিমাণ কয়লা আছে; কিন্তু স্বর্ণ খনি সম্বন্ধে সেরূপ কোন বিদ্যা খাটে না। উহা কত দূর বিস্তৃত এবং কোন্ দিক দিয়াই বা গিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সুতরাং যথেষ্ট উদ্যমের সহিত এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও অচিরকাল মধ্যে সে উদ্যম নষ্ট হওয়াই সম্ভব। স্বর্ণ খনির ব্যবসায় ঠিক জুয়াখেলার ন্যায়। মহীশূর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের স্বর্ণ-খনির কথা এ বিষয়ে বেশ সুন্দর সাক্ষ্য দেয়। ইহাদের কয়েকটীতে অংশীদারগণ বড় মানুষ হইয়া গিয়াছেন, আবার কয়েকটীতে বা একেবারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। 'চ্যাম্পিয়ন রিফ কোম্পানি' যখন প্রথম কার্য্যারম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রতি অংশের মূল্য দশ শিলিং ছিল; কিন্তু ১৯০৩ সালের ২৪ শে ডিসেম্বরে সেই অংশের মূল্য আট পাউণ্ড হয়। বালঘাট কোম্পানির প্রতি অংশের মূল্য প্রথমে এক পাউণ্ড ছিল, কিন্তু ১৯০৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে তাহার মূল্য আঠার শিলিং ছয় পেনী হয়। কাড়ুর মাইসোর কোম্পানির প্রতি অংশের মূল্য প্রথমে পাঁচ শিলিং ছিল, পরে ১৯০৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর তাহার দাম মাত্র তিন পেনী হয়। সুতরাং আবার বলিতেছি, স্বর্ণ-খনির ন্যায় কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, এমন কোন ব্যবসায়ে টাকা না ফেলিয়া যাহাতে বাস্তবিকই কোন লাভ আছে ও হয়, আপাততঃ এরূপ কোন ব্যবসায়ে টাকা ফেলাই ভারতবাসীর উচিত। সুতরাং কোন ব্যবসায়ের অংশ ক্রয় করিবার পূর্ব্বে তাহার পরিণাম মনোযোগের সহিত ভাবা উচিত; নতুবা উদ্যমীদিগের প্রলোভনীয় বাক্যে বা তাহাদের বাক্-সর্ব্বস্ব দালালের কথায় বিশ্বাস করিলে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইংরাজ-কবি সেক্সপীয়র তাঁহার 'কিং জন' নামক পুস্তকে দালালের সম্বন্ধে কেমন চমৎকার একটী কথা বলিয়াছেন :—

সে বড়ই চতুর! দালাল সে, সর্ব্বদাই সত্য লঙ্ঘন করে, প্রতিদিন তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা চাই-ই। সে সকলকেই ভুলায়—কি রাজা—মহারাজা, দরিদ্র-কাঙাল কি প্রবীণ, কি নবীন, কি সুন্দরী রমণী সকলেই তাঁহার কথায় মুগ্ধ। সে কত আশার কথা বলিয়া মানুষকে ভেড়া সাজায়।"

অবশ্য উদ্যমিগণের মধ্যে ভাল মন্দ উভয়ই আছে। যিনি অংশ কিনিবেন, তিনি ইহা বেশ করিয়া বুঝিয়া তবে টাকা ফেলিবেন। তাঁহার বিশেষরূপে জানা উচিত যে, প্রস্তাবিত ব্যবসায় উন্নতিকর ও উহার পরিণাম আশাজনক এবং উদ্যমিগণও যোগ্য ও বিশ্বাস্য। তার পর যদি তিনি ভাল বুঝেন, অংশ কিনিবেন। ভারতবর্ষের এই স্ত্রী-শিক্ষার দিনে, আমরা আশা করি যে, লেডী ম্যাক্‌বেথের ন্যায় ভারতবর্ষের রমণীগণ তাঁহাদের ভ্রষ্ট-সাহস স্বামীদিগকে উন্নতির জন্য উত্তেজিত করিবেন। অবশ্য তাঁহারা লেডীর ন্যায় ভীষণা হইবেন না। রমনীগণ শারীরিক দুর্ব্বলা হইলেও নব-উদ্যমে পুরুষগণ অপেক্ষাও উৎসাহশীল। এ উৎসাহ কু-দিকে নীত না হইলেই জগতের মঙ্গল। লেডী ম্যাক্‌বেথের কুবুদ্ধি না থাকিলে বলিতাম, তিনি অতীব উৎসাহশীলা ও বুদ্ধিমতী রমণী। তিনি যেমন তাঁহার ভীত স্বামীকে উচ্ছিষ্ট কার্য্যের পথে অগ্রসরের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন, ভারতের রমণীগণ তাঁহাদের স্বামিগণকে সেইরূপ উত্তেজিত করুন। ম্যাক্‌বেথ যখন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, লেডী তখন যে তেজে তাঁহাকে উৎসাহিত করেন, তাহা চিরকাল স্মরণীয়।

ম্যাক্।—যদি বিফল হই ?

লেডী। বিফল ? হই, হইব। কিন্তু সাবধান! কর্ত্তব্য হারাইও না, সাহসে হৃদয় বাঁধ, আমরা বিফল হইব না।

এরূপ বাক্যে ভীত ব্যবসায়েচ্ছুগণের মনে উত্তেজনা জাগরিত হউক। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যে সম্বন্ধে বহুদর্শিতালাভ করা প্রয়োজন, সে কার্য্যের 'খুঁটি-নাটি' সকলই জানিতে হইবে; উন্নতির সহজ পন্থা বুঝিতে হইবে; যাবতীয় অভাব পূরণের জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে হইবে। নতুবা সে কার্য্যে সফল-মনোরথ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। ভারতবর্ষে যে সমস্ত কাপড়ের কারবার, দেশালাইয়ের কল প্রভৃতি অকালে নষ্ট হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ,—এই গুণগুলির অভাব। কোন ব্যবসায়ে কিছু অর্থ ফেলিয়া সে সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে কোন জ্ঞানলাভ না করিয়াই সামান্য ভাবে কার্য্য করিতে

গেলেও উন্নতি সম্ভবপর নয়। বড় বড় কার্য্যালয়, বড় বড় গুদাম, বা বড় বড় কল কারখানা না হইলেই যে ব্যবসায়ে লাভ করা যায় না, তাহারও কোন অর্থ নাই। যে বিষয়ে কার্য্য করিতে হইবে, সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত; এবং কার্য্যাদি এমন সাবধানে ও পরিপাটীরূপে করা দরকার যে, যেন তাহা সহজেই লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে, ও যেন কোনরূপে লোকের তাহাতে অভক্তি না হয়।

চতুর্থ ও প্রধান কারণ এই যে, ভারতবাসিগণ পরস্পরকে বিশ্বাস করে না। কি নিম্ন শ্রেণী কি উচ্চ শ্রেণী, উভয়ের মধ্যেই এরূপ অবিশ্বাস বড়ই প্রবল। কেহ কাহারও সত্য কথায় বিশ্বাস না করায়, সকলেই অসত্যবাদী হইয়া পড়িতেছে। রাঁধুনী মনে করে, কর্ত্রীর নিকট বাজার খরচের সত্য হিসাব দেওয়া নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক। লোকে মনে করে, সকলেই যখন মিথ্যাবাদী, তখন যৌথ-কারবারের অধ্যক্ষ যে সাধুপুরুষ হইবেন, তাহার প্রমাণ কি? পরিচালকবর্গের যে কিছু কুঅভিসন্ধি নাই, তাই বা কে জানে? দেবালয়ের প্রতিভূগণের অসাধুতার কথা দৃষ্টান্ত স্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকে বলে, যদি দেবালয়ের অছিগণই অবিশ্বাসী হইতে পারে, কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করে, তবে আমি যে কারবারের জন্য টাকা দিব, তাহা নষ্ট হইবে না বলিয়া কিরূপে জানিব? লোকের মনে কি আছে কে জানে।—যদিও জনসাধারণের মধ্যে এরূপ ক্ষতিকর ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে, তথাপি ভারতে লক্ষ লক্ষ সাধু ও বিশ্বাসী ব্যক্তির অভাব নাই। এরূপ অবিশ্বাস যৌথ-কারবারের প্রধান প্রতিবন্ধক। ভারতবাসী পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শিখুন। তিনি যেন ইহা স্থির জানেন যে, যে ব্যবসায়ের পরিচালকগণ বহুদর্শী ও কার্য্যকুশল, সে ব্যবসায়ে তাঁহার টাকা বৃথা মারা যাইবে, ইহা অসম্ভব। দেবালয়ের ভার লওয়া আর ব্যবসায় চালান একরূপ নয়; প্রত্যুত উভয়ের মধ্যে তুলনাই হয় না। কোন ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ যদি বিশ্বাস্য, বহুদর্শী, ও কার্য্যকুশল হন, পরিচালকগণ সম্ভ্রান্ত ও যোগ্য ব্যক্তি হন, হিসাব-পরীক্ষকগণ কার্য্যের দায়িত্ব বুঝেন,—যদি সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করেন, তবে কার সাধ্য কিছু অন্যায় করে? আবার অংশীদারগণও হিসাব পত্রের নকল পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বার্ষিক বা ষাণ্মাষিক সভায় উপস্থিত হইয়া পরিচালকগণকে উপদেশ দিতে পারেন, অথবা মধ্যে মধ্যে অধ্যক্ষকে তাঁহার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেও পারেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার ভয় যে বৃথা, তাহা এখন সকলেই বুঝিয়াছেন।

এবার আমরা সাধারণ ব্যবসায়িগণের ও ক্রেতাগণের সম্বন্ধে কয়েকটী অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া আমাদের এ দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রাচ্য দেশে ক্রয় বিক্রয় প্রণালী বড়ই দূষণীয়। তাহা হইতে পরস্পর অবিশ্বাস জন্মান অসম্ভব নয়। যদি কোন ব্যবসায়ী কোন দ্রব্যের মূল্য প্রথমে কুড়ি টাকা চাহিয়া পরে তাহা পনের টাকায় দেন, তবে ক্রেতা স্বতঃই মনে করিতে পারেন যে, ব্যবসায়ী তাঁহাকে ঠকাইতে চাহিয়াছিল। সুতরাং ব্যবসায়ীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস কখনই অটল থাকিতে পারে না। ক্রেতা যদি অল্পবুদ্ধি বা সরল হন, তবে বিক্রেতা অনায়াসেই তাঁহাকে ঠকাইয়া ধনার্জ্জন করেন। কোন দ্রব্য চারি আনা পাইলে বিক্রয় করেন, অথচ ক্রেতাকে দেখিয়া হাঁকিলেন এক টাকা। সরল ক্রেতা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকাটি ফেলিয়া দিয়া জিনিষ লইয়া চলিয়া গেলেন। বিক্রেতাও কিছু উচ্চ-বাচ্য না করিয়া আস্তে আস্তে সেটী 'ট্যাঁকে' গুঁজিলেন বা 'পকেটস্থ' করিয়া ফেলিলেন। য়ুরোপ হইতে যে সকল ভদ্রলোক এদেশে আসেন, তাঁহারা প্রথম প্রথম এই রূপে ঠকিয়া শেষে "চালাক" হন। দুর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ দোষ কেবল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরই একচেটিয়া নয়, বড় বড় মহাজন ও ব্যবসায়ীরাও ইহাতে অভিযুক্ত। ইহা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই কলঙ্কজনক। উভয়েই পরস্পরকে ঠকাইতে যাওয়ায় এরূপ ঘটে। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের প্রাচ্য দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের বিবরণ দিবার কালে সলোমন বলিয়াছিলেন "ক্রেতা দ্রব্যের যে কোন দর শুনিবা মাত্র বলিয়া বসেন, 'না! ঠিক কত হ'লে দেবে বল।' তার পর দ্রব্যটী হয়ত সেই দরেই কিনিয়াই গর্ব্ব অনুভব করেন। একথা এত সত্য যে, যেন কোন ব্যক্তি গতকল্য হইল বলিয়াছেন, এরূপ ভ্রম হয়। কিন্তু জগতের সর্ব্বত্রই দেখুন, ভদ্র য়ুরোপীদের দোকানে দরাদরী হয় না। সমস্তই একদরে বিক্রীত হয়। ক্রেতার ইচ্ছা হয়, বিনা দরদস্তরীতে দ্রব্য লইবেন, না হয় না লইবেন, কোন কথা বলিবেন না। জোর এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন, 'দরটা বড় বেশী' এই মাত্র। এক মিনিটেই ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য সমাধা হয়। ভারতবর্ষীয় বাজারের সহিত ইহার একবার তুলনা করুন। কি প্রভেদ! একটী দ্রব্য বেচিতে বা কিনিতে কত সময়ের অপব্যবহার হয় ও কত মিথ্যা কথা বৃথা প্রয়োগ করিতে হয়, একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে পারিবেন। এক জন ক্রেতার একটী ছাতির প্রয়োজন। তিনি দোকানে গেলেন। দেখিলেন একেবারে ছাতি চাহিলে দর চড়িতে পারে, বলিলেন, 'তোমার ও ঘড়িটার

দর কত হে?' (মিথ্যা নং১)। তারপর দর শুনিয়া বলিলেন, 'না! দরটা বড় চড়া বোধ হচ্চে, আর জিনিষটাও তত ভাল নয়। (মিথ্যা নং২); তা, শীঘ্রই আমার একটা ছাতির দরকার হবে, তোমার ও ছাতির দাম কত? (মিথ্যা নং৩)। দোকানী বলিল, 'তিন টাকা।' ক্রেতা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'এক টাকায় পারবে?' দোকানীও নাক সিঁটকাইয়া বলিল, 'আড়াই টাকায় নেবেন? ওর এক পয়সা কম হবে না।' ক্রেতা বলিলেন, 'দেড় টাকা হয়ত দাও, আর এক পয়সাও বেশী হবে না, দেখ।' (মিথ্যা নং৪)। দোকানী—'না, মশায়! হবে না।' এই বলিয়া ছাতিটী একধারে রাখিল। যেন দরকার নাই,, এরূপ ভাণ করিয়া ক্রেতা দোকান ত্যাগ করিলেন। (মিথ্যা নং ৫)। উভয়ে বাহ্যতঃ এইরূপ ঔদাসীন্য দেখাইলেও ক্রয় বিক্রয়ে উভয়েই সমুৎসুক। ক্রেতা বাহিরে যাইতে না যাইতে দোকানী মনে করিল, 'খোদ্দের' বুঝি যায়। তাই অমনি হাঁকিল, 'দু' টাকায় নেবেন? ক্রেতার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল; কিন্তু বাহ্যতঃ ঔদাসীন্য দেখাইয়া (মিথ্যা নং ৬) বলিলেন, পৌণে দু টাকায় পারবে, বল্‌তে পার?' দোকানী দেখিল, পূর্ব্ব খরিদ্দার ১॥০ দেড় টাকা বলিয়া গিয়াছে, আর যথেষ্ট লাভও পাওয়া যাইতেছে, তখন বলিল, 'আচ্ছা নিন, কিন্তু এরকম শস্তায় আর কোথাও পাবেন না।' সামান্য একটি ছাতা কিনিতে ক্রেতা অন্যূন ছয়টী মিথ্যা বলিলেন, আর দোকানীও যে কত মিথ্যা বলিয়াছে, তাহার আর হিসাব কে রাখে! এরূপ ঘটনা বাজারে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। ইহাতে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস না জন্মিয়াই পারে না। যেখানেই ক্রেতা বিক্রেতার সম্বন্ধ, সেইখানেই অবিশ্বাস;—বন্ধু বন্ধুকে অবিশ্বাস করিয়া ফেলেন। ইংলণ্ডেও যে এরূপ দরাদরী একেবারেই নাই, তাও নয়। কি তেজারতি ব্যবসায়ে, কি পুরাতন জিনিষের দোকানে, আর কি ঘোড়ার ব্যবসায়ে ঐরূপ দরাদরী বেশ প্রবল। তবে সে সব ব্যবসায় সাধারণতঃ ছোটলোকেই করে। সুখের বিষয়; ভারতবর্ষীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী এরূপ কুপ্রথার বড়ই বিরোধী। তাঁহারা একদরে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের বড়ই পক্ষপাতী। যদি এই সুপ্রথা একবার ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, এবং লোকের মনে বদ্ধমূল হয়, তবে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস অনেকটা আপনই হ্রাস পাইবে, এবং অর্থ আদান-প্রদানে ও ব্যবসায়ে লোকের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইবে। এইখানে এই কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আধুনিক ভারতবর্ষের কি ধর্ম্মশিক্ষা কি নৈতিক শিক্ষা, উভয়ই লোক সাধারণের মধ্যে ঐক্য ভাব

আনয়নে অসমর্থ। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে, যে কোন সৎশিক্ষা পাইলাই মানুষের মন কোমল হয় ও সত্য কার্য্য করিবার আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়। সর্ব্ব দেশেই অসাধু লোক আছে। কোন দেশই একেবারে দেবভাবপূর্ণ নহে। সর্ব্ব দেশেই ব্যবসায়ে কু-চাতুরি ব্যবহৃত হয়, এবং অংশীদারগণকে মধ্যে মধ্যে ফাঁকী পড়িতে হয়, কোন স্থানই একেবারে শান্তিপূর্ণ নয়। সর্ব্বত্রই সাময়িক উপদ্রব ও অশান্তি আসিয়াই থাকে। কিন্তু তা বলিয়া সকলকে অবিশ্বাসী ও অসাধু মনে করা কখনই যুক্তিযুক্ত নয়।

যখন ভারতবর্ষের প্রতি নগরে প্রতি পল্লীতে শিল্পোন্নতির জন্য সবিশেষ আগ্রহ দৃষ্ট হইবে, যখন সর্ব্বত্র যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন লোকে নিজের আয়ের সঙ্গে দেশের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে শিখিবে, নিজের পরিবারের জন্য খাটিবার কালে দেশের জন্য খাটিতে শিখিবে, তখন ভারত-বর্ষের কি সুন্দর অবস্থা! আসুন, এই দিন আনিবার জন্য সকলে কায়মনো-বাক্যে চেষ্টিত হই।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

সাবান অনেক উপায়ে প্রস্তুত হইতে পারে ;—

১ম —সুরাসার প্রক্রিয়া (alcohal process) ; ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাতে স্বচ্ছ নির্ম্মল এবং উপকারী সাবান প্রস্তুত হয় ; সেই জন্যই এই উপায় অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য ইহা দ্বারা সাধারণ চলিত অল্পমূল্যের সাবান ফুটন্ত সুরাসারে গলাইয়া তরল ভাগ বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিলে, কলুষিত ও দূষিত পদার্থ সমূহ এবং অতিরিক্ত ক্ষারের ভাগ বিদূরিত হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বচ্ছ ও নির্ম্মল সাবানে পরিণত হয়।—

প্রথমে চর্ব্বি এবং তৈল একত্রে একটী পাত্রে অল্প উত্তাপে (১৮০-৯০ ডিগ্রি ফান) গলাইতে হয়। তার পর এই পাত্রটীর মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষার এর জল (caustic soda solution of 1. 3 sp. gr.) দিয়া বিশেষরূপে নাড়িতে হইবে, যে পর্য্যন্ত না উহা সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া উত্তমরূপ নরম এবং পিচ্ছিল পদার্থে পরিণত হয়। তারপর পাত্রটী বন্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ অধিকতর

উত্তাপে বসাইয়া রাখিতে হইবে; এই সময়ের মধ্যেই মিশ্রণ সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। এখন কতকটা গরম চিনির সরবৎ এবং গোটাকয়েক ক্ষারের (sodium carbonate) দানা ঐ পাত্রের মধ্যে দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে হইবে। শেষে সুরাসার (alcohol) উহার মধ্যে ঢালিয়া পাত্রটীর মুখ বন্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিলে পরিষ্কার সাবান উপরে ভাসিয়া উঠিবে এবং তাহা হাত দিয়া তুলিয়া সুগন্ধিযুক্ত ছাঁচের মধ্যে ফেলিতে হইবে—ইহার মধ্যে ২ দিবস থাকার পর টুকরা করিয়া কাটিয়া ছাপ বা টিকিট আঁটিয়া মোড়ক করিতে হইবে।

এই উপায়ে অল্প পরিমাণে সাবান প্রস্তুত করা সন্দেহ জনক। উত্তম সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষ যন্ত্র বৈজ্ঞানিক বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা নিতান্ত আবশ্যক।

২য়—শীতল প্রক্রিয়া (cold process) এই উপায়ে অল্পমূল্যের চলিত সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে।—

নারিকেল তৈল	... ...	৩৫ ভাগ
অভ্র (Talc)	... ...	১০ "
রেড়ির তৈল (পরিষ্কৃত)	... ...	৫ "
ক্ষারের জল (Cousti soda lye 37° B)		২৫ "
ক্ষারের জল (caustic soda lye 20 B)		২৫ "
ক্ষার (Potash 96 percent)	...	৫০ "
লবণ	... ...	৮ "
ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড (calcium chloride)		৭ "
ফুটন্ত জল (boilng water)	...	১৫০ "

গরম জলে প্রথমে ক্ষার (Potash) ও ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড গলাইয়া এরূপ ভাবে মিলাইতে হইবে, যাহাতে ১০ ডিগ্রির (সেণ্ট) অধিক উত্তাপ আবশ্যক না হয়। অন্য দিকে অভ্র, তৈল এবং অপর ক্ষার (caustic soda lye) একত্রে উত্তমরূপে নাড়িয়া তরল সাবান আকারে পরিণত করিয়া উহার সঙ্গে প্রথমের মিশ্রিত পদার্থ বিশেষরূপে নাড়িতে নাড়িতে মিলাইতে হইবে। শেষে গন্ধদ্রব্য ইচ্ছামত দিতে হইবে। তার পর ছাঁচে ঢালিয়া একঘণ্টা কাল খুলিয়া রাখিয়া পরে ভালরূপে ঢাকা দিলেই উত্তম সাবান প্রস্তুত হইবে।

সুগন্ধের জন্য সিট্রোনেলা তৈল	...	১২০ ভাগ
বার্গামট তৈল ...	...	৮০ „
মৃগনাভির অরক (Tinct musk)	...	১০ „

ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৩য়।—গ্লিসারিন প্রক্রিয়া (Glycerin Process) ইহাতে সুরাসারের পরিবর্ত্তে গ্লিসারিন ব্যবহৃত হয়। গ্লিসারিন দ্বারাও সাবান স্বচ্ছ নির্ম্মল ও কোমল হইয়া থাকে।

নারিকেল তৈল ২৬ আউন্স, চর্ব্বি ৩০ আউন্স এবং রেড়িরতৈল (পরিষ্কৃত) ৩৭½ আউন্স একত্রে একটী পাত্রে অল্পে অল্পে ১৫৬ ডিগ্রি (ফার্ণ) পর্য্যন্ত উত্তাপে গরম করিতে হইবে—তাহার পর ইহার সঙ্গে ৫৬ আউন্স ক্ষারের জল (caustic soda solution at a temp of 66 Fah) মিশ্রিত করিলে উহা যখন কথঞ্চিৎ কঠিন হইবে, তখন একটী জলপূর্ণ পাত্রে (water bath) ১৮০-৯০ ডিগ্রি উত্তাপে গরম করিতে হইবে, যে পর্য্যন্ত না উহা সম্পূর্ণরূপে নরম পিচ্ছিল ও স্বচ্ছ তরল সাবানে পরিণত হয়। অন্য একটী পাত্রে ২৬ আউন্স জলের সহিত ২৫ আউন্স চিনি ও ৩ আউন্স গ্লিসারিন মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া ১৯০ ডিগ্রি (ফার্ণ) উত্তাপে গরম করিয়া রাখিতে হইবে এবং ঐ সরবৎ প্রথম পাত্রের পদার্থের সহিত অল্পে অল্পে নাড়িতে নাড়িতে মিলাইতে হইবে। পরে উহার সঙ্গে ১০ আউন্স টাট্‌কা গুঁড়া ক্ষার (Sodium carbonate) নাড়িয়া নাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে মিলাইতে হইবে—এক্ষণে ঐরূপে মিশ্রিত পদার্থের কিয়দংশ একখণ্ড কাচের উপর বিস্তৃত করিয়া দেখিলে যদি কঠিন হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহা ঠিক প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে—যদি না হয়, তাহা হইলে উহাকে পুনরায় ১৪৫ ডিগ্রি (ফার্ণ) উত্তাপে গরম করিয়া যখন ঠাণ্ডা হইয়া ১৩৫ ডিগ্রি উত্তাপ থাকিবে তখন উহার সহিত আবশ্যকমত আরও ১ হইতে ২ আউন্স পরিমাণ গুঁড়া ক্ষার (sodium carbonate) মিশ্রিত করিলেই হইবে।

এই সাবান রীতিমত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল করিতে হইলে অত্যুৎকৃষ্ট এবং পরিষ্কার চর্ব্বি ও গ্লিসারিণ এবং বিশুদ্ধ জল (free from lime) ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

৪র্থ—উৎকৃষ্ট চর্ব্বি (Tallow)	২০ আউন্স
„ জলপাইতৈল (olive oil)	৪ „

„ নারিকেল তৈল	৮	„
ক্ষারের জল (solution caustic soda 38· B)	১৩	„
ক্ষারের জল (solution caustic potash 38· B)	১৩	„
উৎকৃষ্ট গ্লিসারিন (Glycerin c. p. 28· B)	১৩	„
সুরাসার (alcohol)	১৩½	„
জল	২½	„

গন্ধ দ্রব্য —

বার্গামটতৈল	৩০০	ফোঁটা।
জিরানিয়মতৈল	৫০	„
চন্দনতৈল	১০	„
দারুচিনিতৈল	২০	„
লবঙ্গতৈল	২০	„
পেটিট্‌গ্রেণতৈল (petit grain oil)	৫০	„
ল্যাভেণ্ডারতৈল	৫০	„
সুরাসার (alcohal 94 percent)	১½	আউন্স

চর্ব্বি ও তৈল গলাইয়া মিশ্রিত করিবে ; তৎপরে ছাঁকিয়া লইয়া ৭৫ ডিগ্রি (সেণ্ট) উত্তাপে গরম করিয়া উহার সঙ্গে গ্লিসারিণ ও উপরিলিখিত ক্ষারের জল সূক্ষ্মধারে ঢালিয়া মিলাইতে হইবে। ঐ মিশ্রিত পদার্থ নাড়িতে নাড়িতে গরম করিতে হইবে, যে পর্য্যন্ত উহা তরল সাবানের আকারে পরিণত না হয়। তার পর উহাকে ৮০ ডিগ্রিতে (সেণ্টি) ঠাণ্ডা করিয়া, উহার সহিত জল মিশ্রিত সুরাসার একত্র করিলে মিলিয়া যাইবে। শেষে সুগন্ধি মিলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া ঠাণ্ডা করিলে সাবান তৈয়ার হইবে।

৫ম।—

পশুচর্ব্বি	৪৫০	ভাগ
নারিকেলতৈল	৫০	„
ক্ষারের জল (caustic soda 36· B)	২৫০	„
লবণ	১০০	„
ভেসলিন	১৫০	„
পরিস্কৃত জল (distilled water)	১০০০	„

একটী পাত্র মধ্যে চর্ব্বি, তৈল ও ক্ষারের জল একত্র লইয়া ঐ পাত্রটীকে

অপর একটী জলপূর্ণ পাত্রের (water bath) মধ্যে রাখিয়া উত্তপ্ত করিলে উহা মিলিয়া যাইবে; তৎপরে লবণ ও vaselin উহার সহিত মিশাইতে হইবে শেষে জল দিবে। রং ও সুগন্ধি ইচ্ছামত দিবে।

চিনি ও ধুনার দ্বারাও সাবানের স্বচ্ছতা বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীকিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য, এল্ এম্ এস্।

পাট (JUTE)।

আজকাল বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই পাটের আবাদ হইতেছে। তন্মধ্যে রঙ্গপুর, গোয়ালপাড়া, ব্রহ্মপুত্রচর এবং গারো পার্ব্বত্য উপত্যকার পাট সর্ব্বোত্তম এবং প্রসিদ্ধ। ঐ সকল স্থলে ১০।১২ হস্তেরও অধিক দীর্ঘ পাট উৎপন্ন হয়।

উত্তমরূপ সারের বন্দোবস্ত ও সবিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রমের সহিত আবাদ করিলে প্রতি বিঘায় ২০ মণ পাট উৎপাদিত হইতে পারে। এবং অনেক স্থানেই উক্ত পরিমাণ দীর্ঘ এবং উত্তম পাট জন্মিতে পারে।

প্রতি বিঘা জমীতে ৪ সের বীজ বপন করিলেই যথেষ্ট হয়; ১ বিঘা আবাদ করিতে ১০ জন মজুর ও ১ জোড়া হালের আবশ্যক হয়। কিন্তু কর্ত্তনের ও ধৌতের সময় প্রতিদিন ১৫ জন মজুর না হইলে সুবিধা হয় না। আবাদ সহজসাধ্য কিন্তু ধৌত করার সময় অধিক লোকের আবশ্যক। ক্ষেত্র নির্ণয়ঃ— ইহা প্রায় সব মৃত্তিকাতেই উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু পলি কিংবা দোয়াস (আটালু এবং বালী মৃত্তিকা সমভাবে সংমিশ্রিত) মৃত্তিকাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চর জমী অর্থাৎ যেখানে বর্ষাকালের জল দ্বারা ৫।৬ ইঞ্চির অধিক নূতন পলি পড়ে, সেই স্থানে ইহা উত্তম জন্মে—বর্ষাকালে যে জমীতে ২।৩ দিনের অধিক জল আটকাইয়া থাকে, সেরূপ জমীতে ইহার আবাদ করা অনুচিত।

সারঃ—গো এবং মহিষের বিষ্ঠা ইহার উপযোগী সার তন্মধ্যে মহিষের বিষ্ঠার সারই প্রশস্ত।

জমীকরণঃ—আষাঢ় মাস হইতে চাষ দিতে আরম্ভ করা উচিত। তারপর প্রতি মাসে এক এক বার চাষ এবং উপযুক্ত মত সার দিতে হইবে। মাঘ

মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে অন্ততঃ ৫ বার উত্তমরূপ চাষ এবং সার দেওয়া আবশ্যক। তদনন্তর ঘাস আগাছা ইত্যাদি বাছিয়া এবং ঢেলা চূর্ণ করিয়া মই টানিয়া জমী সমতল করিয়া লইবে। এইরূপে জমী প্রস্তুত হইলে লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ ও বীজ বপন করিয়া মই দিতে হইবে।

মাঘ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বীজ বপনের সময় কখন কখন বৃষ্টি না হইলে বৈশাখ মাসেও বপন কার্য্য চলিতে পারে।

অঙ্কুরোউৎপন্নের ৩।৪ দিনের মধ্যে আর একবার চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। তারপর চারা ৩।৪ ইঞ্চ লম্বা হইবার আগেই মই দিয়া জাউনি দেওয়া হয় এবং তাহার ৩।৪ দিন পরে লাঙ্গল দিতে হয়; কিন্তু উপর্য্যুপরি বৃষ্টি হইয়া চারা বড় হইলে এ সকল কিছু আবশ্যক হয় না; চারা ঘন থাকা ভাল নয়। সেই জন্য ৫।৬ ইঞ্চ অন্তর একটী রাখিয়া অপর চারা ও ঘাস নিড়াইয়া ফেলা আবশ্যক। গাছের পূর্ণাবস্থার পূর্ব্বে আর কিছু করিতে হইবে না।

বৃক্ষে পুষ্প ও বীজ হইবার অগ্রেই কাটিয়া ফেলা উচিত, তাহা না হইলে পাট ভাল হয় না। গাছের অগ্রভাগ ফাটিতে আরম্ভ হইলেই কর্ত্তন কার্য্য আরম্ভ করার প্রশস্ত সময়। কর্ত্তন কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র শেষ করার জন্যই এই সময় অধিকসংখ্যক মজুরের প্রয়োজন। বীজ বপনের অগ্র পশ্চাৎ অনুসারে আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত কর্ত্তনের সময়। গোড়া কাটিয়া অগ্রভাগের সূক্ষ্মাংশ হইতে ১ হাত আন্দাজ অনাবশ্যক বিবেচনায় বাদ দিতে হয়।

গাছগুলি একত্র করিয়া ছোট ছোট আঁটি বাঁধিতে হয় এবং ঐ প্রকার ২০ আটি একত্র বাঁধিয়া উহার দুই প্রান্তে ও মধ্যে তিনটী বাঁশ দিয়া ভেলার মত জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। তাহার উপর অগ্রভাগগুলি ছড়াইয়া তদুপরি মাটির চাপ বা কলারগাছ এরূপ ভাবে দিয়া ভার দিতে হয় যে, যাহাতে প্রত্যেক বোঝার উপর ৬ ইঞ্চের অধিক জল না হয়—ইহাকে জাগ দেওয়া বলে; স্রোতের জলে জাগ দেওয়া উচিত নয়। ১০।১৫ দিন এই ভাবে জাগ দিলেই গাছ হইতে পাট পৃথক হইবার উপযুক্ত হয় এবং সেই সময় ধৌত করিয়া পৃথক করিতে বিলম্ব হইলে নষ্ট হইবার আশঙ্কা। সেই জন্যই এই সময় অধিক লোকের আবশ্যক।

গাছ হইতে পাট পৃথক করণ—

একটী গাছ জলের মধ্য হইতে তুলিয়া যখন দেখিবে উহার ছাল অনায়াসে

উঠিয়া যাইতেছে তখনই কিংবা ২।১ দিন পরে ধৌত করিয়া ফেলিবে। উপযুক্তরূপ না পচিলে পাট ভাল হয় না।

কয়েকটা করিয়া গাছ একত্রে লইয়া গোড়া হইতে আন্দাজ এক হাত বাদে উচ্চদেশে ভর দিয়া ভাঙ্গিতে হইবে এবং তৎপরে ঐ গোড়ার পাট গাছ হইতে ছাড়াইয়া উহা সজোরে জলে আছড়াইলেই কাঠিগুলি খসিয়া পড়িবে; তাহারপর পরিষ্কাররূপে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। এই সময় বৃষ্টির লক্ষণ দেখিলে সাবধান হইতে হইবে। এইরূপে পাট ২।৩ দিনের মধ্যেই শুকাইয়া যাইবে। পরে বস্তা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

চরকা এবং চরকার সূতা।

আমরা সাধারণতঃ সূতার কাপড়ই ব্যবহার করিয়া থাকি এবং নানা প্রকার যন্ত্র সহায়ে ইহার জন্য সূতা প্রস্তুত করিয়া লই। আমাদের দেশে সূতা কাটিবার প্রধান যন্ত্র চরকা। কলে সূতা কাটা প্রণালী বাহির হইবার পূর্ব্বে এই চরকাই আমাদের আবশ্যকীয় সূতা কাটিয়া দিত। কলে অল্প সময়ের মধ্যে পরিমাণে অধিক এবং সূক্ষ্ম সূতা কাটিয়া দেয়, এই কারণে আমরা চরকা ছাড়িয়া কল ধরিয়াছি। মোটা সূতা কাটিলেও চরকা আমাদের পৈত্রিক বন্ধু; অতএব আমাদের ইহাকে একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, বরং আমরা যেমন সভ্য হইয়া সূক্ষ্ম সূতার ব্যবহার শিখিয়াছি, তেমনি আমাদের চরকাকে উন্নতির পথে আনিয়া ইহা হইতে সূক্ষ্ম সূতা বাহির করিয়া লইতে চেষ্টা পাওয়া, আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মতম সূতা অপেক্ষা সাধারণ সূতার আমাদের অধিক প্রয়োজন এবং সেই সূতা যেমন কলে প্রস্তুত হইয়া আইসে, কাটিতে জানিলে ও তুলা ভাল হইলে চরকায়ও সেইরূপ কাটা যাইতে পারে। চরকায় সূতা কাটা বিশেষ অভ্যাস ও ধৈর্য্যের কার্য্য। চরকা ভাল হইলে ও সূতা কাটিবার লোক পারদর্শী হইলে প্রতিদিন ৭।৮ ঘণ্টা কাজ করিয়া অনায়াসে ৪০ হইতে ৭০নং সূতার দেড় ছটাক কাটিয়া দিতে পারে, ও তাহাতে দৈনিক চারি পাঁচ আনা উপার্জ্জন করিতে পারে।

ক্ষেত্র হইতে তুলা উঠাইয়া আনিয়াই একেবারে সূতা কাটা যায় না। প্রথমে ইহার বীজ বাহির করিয়া লইতে হয়; পরে তাহাকে পিঁজিয়া ধূনিয়া পাঁজ পাকাইয়া লইলে পর সূতা বাহির করা যাইতে পারে।

তুলার বীজগুলি তুলার আঁশের সহিত সংলিপ্ত থাকায় ইহাদের অতি সাবধানে বাহির করিয়া লইতে হয় এবং এই প্রণালীকে জনিং (Giening) কহে। এই সময়ে বিশেষ সাবধান না লইলে তুলার অধিকাংশ আঁশ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। বীজগুলি বাহির হইয়া আসিবার সময় ইহাদের পশ্চাতের তুলায় গাঁট পড়িয়া যায় এবং এই গাঁটগুলিকে দুই হাতের অঙ্গুলির দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়, ইহাকে তুলা পেঁজা কহে। এই প্রণালীই সূক্ষ্ম ও সমরূপ সূতা বাহির করিবার প্রধান উপায়। তুলা পেঁজা ভাল না হইলে ধূনিতে অধিক জোরের আবশ্যক হয় এবং সেই জোর সহ ধনুকের আঘাতে তুলার আঁশগুলিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, অথচ ইহার সকল গাঁটগুলিকে খুলিয়া দিতে পারে না। তুলার আঁশ ছিঁড়িয়া যাইলে সূতা সূক্ষ্ম হয় না; আর সূক্ষ্ম হইলেও সূতা শীঘ্র কাটিয়া যায়। তুলা ধূনিবার পর গাঁট থাকিয়া যাইলে সূতা সমরূপ হইতে পারে না।

একটী সূতার কলে নানাপ্রকার যান্ত্রিক শক্তির সংযোগ থাকা প্রযুক্ত ইহার মূল্য অধিক হইয়া থাকে এবং কার্য্যকালেও ইহার ব্যয় অধিক হয় এই কারণে সাধারণ লোকে কল বসাইয়া সূতা কাটিতে পারে না। একটী সাধারণ চরকার মূল্য ২৲ টাকার অধিক নহে সুতরাং তাহা অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও ক্রয় করিতে পারে। একত্রে অধিক লোক না হইলে একটী কল চলে না, কিন্তু চরকা প্রত্যেকে এক একটী চালাইতে পারে। ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা কলে কাজ করিতে যাইতে পারে না, কিন্তু ঘরে চরকা হইলে তাহারা তাহা হইতে সূতা কাটিয়া নিজেদের ভরণ পোষণ নিজেরাই চালাইতে পারে।

আমরা উপস্থিত যে চরকা ব্যবহার করি, ইহার টাকু একটী এবং সেই টাকু ইহার চরকীর সহিত একটী মালদড়ীর দ্বারা সংযোজিত থাকে। ইহাতে এক সময়ে কেবল একটী সূতা কাটা যাইতে পারে। কলে একসময়ে একত্রে অনেকগুলি সূতা বাহির হয় বলিয়া যে ইহার মূল্য কম তাহা নহে। একসের ৪০ নং সূতার মজুরী ধরিলে বোধ হয় ইহা আট হইতে দশ আনার কম নহে। সেইরূপ সূতা আমাদের একটী টাকুর চরকায় কাটিয়া দেখা

গিয়াছে যে, ইহাতে কেবলমাত্র কথঞ্চিৎ অধিক মজুরী পড়িয়া যায়। অতএব আমাদের এই পুরাতন চরকাতেই যদি আর একটী দ্বিতীয় টাকু বসাইয়া একত্রে একসময় দুইটি সূতা কাটিয়া লইতে পারা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কলের সূতাকে এই চরকাই পরাজয় করিতে পারিবে। অধুনা সূতার কলের অভাব নাই এবং তাহা হইতে আমরা পর্য্যাপ্ত সূতা ও সেই সূতার বস্ত্র পাইতেছি। শস্তায় ভাল সূতা কাটিতে পারিলে লোক কলের সূতা ব্যবহার করিবে না। চরকার কাটা সূতার মহৎ গুণ এই যে, ইহা শক্ত হয় ও ইহার বস্ত্রাদি স্থায়ী হয়।

আমি একটী নূতন চরকা প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা আমাদের সাধারণ চরকার কিঞ্চিৎ রূপান্তর মাত্র। সাধারণ চরকায় যে স্থানে একটী টাকু বসান থাকে, সেই স্থানের কাষ্ঠ পিড়িটি কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া তাহার উপর দুই ইঞ্চি ব্যবধানে তিনটী টাকু বসাইয়াছি। ইহার চরকীর ব্যাস ২৪ ইঞ্চি। চরকার মাল্‌দড়ীটীকে চরকী হইতে আনিয়া একাত্রক টাকুগুলির সহিত সংযুক্ত না করিয়া একটী স্বতন্ত্র রোলারের সহিত সংযোজিত করিয়াছি। রোলারটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত; ইহার ব্যাস ১ ইঞ্চি এবং ইহা লম্বে ৩½ ইঞ্চি। রোলারটী গর্ভ চরকীর দিকের শেষ টাকুটী হইতে ৩½ ইঞ্চি ব্যবধানে রাখিয়া অপর দুইটি কাষ্ঠদণ্ডের উপর বসান হইয়াছে। চরকীর ব্যাস ২৪ ইঞ্চি এবং এই রোলারের ব্যাস ১ ইঞ্চি; এই জন্য চরকী একবার ঘুরাইলে রোলারটী ২৪ বার ঘুরিয়া থাকে।

এই রোলারটী লম্বে ৩½ ইঞ্চি; এই কারণে ইহা এক দিকে চরকীর মাল্‌-দড়ীটি এবং অপর দিকে তিনটী টাকুর তিনটী স্বতন্ত্র মাল লইবার উপযোগী এবং চারিটী মাল কোন মতে পরস্পর মিলিত হইতে পারে না। টাকুগুলির সহিত এক একটী ছোট ছোট ¾ ইঞ্চি লম্বা ও অর্দ্ধ ইঞ্চি ব্যাসের কাষ্ঠ নির্ম্মিত চাকতী লাগান হইয়াছে * এবং তাহারা টাকুর সহিত দৃঢ় আঁটা থাকাতে ঐ রোলারটি ঘুরিলেই টাকুগুলি ঘুরিতে থাকে। টাকুগুলির চাকতী অর্দ্ধ

---

* এই চাকতিগুলির বিশেষ কোন প্রয়োজন বোধ হইল না। সাধারণ চরকার ন্যায় ইস্পাতের টাকুগুলির (Steel spindles) সহিত রোলারের মালগুলি লাগাইয়া দিলেই চলিতে পারে। টাকু ⅛ ইঞ্চি মোটা হইলে উপরোক্ত চরকার এক পাকে টাকুগুলি ১৯২ বার ঘুরিবে। আশা করি, কুলদা বাবু চাকতি না লাগাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। স্বঃসং

ইঞ্চি ব্যাসের এবং রোলারটী একবার ঘুরিলে টাকুগুলি দুইবার ঘুরে এবং এই হিসাবে চরকী একবার ঘুরিলে টাকুগুলি ৪৮ বার ঘুরিতে থাকে।

এই চরকায় আমি একত্রে এক সময়ের মধ্যে দুইটী করিয়া সূতা কাটিতেছি। ইহার সূতা কলের ৪০ নং সূতার মত সূক্ষ্ম হইতেছে। দুইটী টাকুতে সূতা কাটিতে একত্রে দুইটী পাঁজ হাতে লইয়া দুইটী টাকুর সহিত সংযোগ করিয়া লইতে হয়। বড় পাঁজ লইলে সেই পাঁজেরই দুই মুখ দুইটী টাকুর সহিত সংযোগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে সূতা কাটিবার সময় সূতা টানিবার ও গুড়াইবার ব্যবস্থা সকলই এক টাকুর চরকার মত করিতে হয়। তবে প্রভেদ এই যে, দুই টাকুর দুইটী সূতা পরস্পরে না মিলিয়া যাইতে পারে, সেই জন্য দুইটী সূতার মধ্যে মাঝের অঙ্গুলীটি ব্যবধান রাখিতে হয়।

আজ পর্য্যন্ত তিনটি টাকুতে একত্রে তিনটি সূতা বাহির করিতে পারি নাই। ইহা কেবল অভ্যাসের কার্য্য এবং আমার বিশ্বাস, তাহাতেও সত্বর সফল হইতে পারিব।

শ্রীকুলদানন্দন মুখোপাধ্যায়।

অবিকৃত দুগ্ধ (CONDENSED MILK)।

যে দেশে দুগ্ধ পাওয়া যায় না, সেই দেশের লোকের জন্যই Condensed Milk বা জমাট দুগ্ধের প্রয়োজন। আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে প্রতি টাকায় ১৬ সের হইতে প্রায় ২০ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ পাওয়া যায়, আবার কোথায়ও বা টাকায় ৪ সের দুগ্ধ পাওয়া যায় না। প্রথমোক্ত স্থান সকল হইতে জমাট দুগ্ধ চালান দিলে উভয় স্থানই উপকৃত হইতে পারে।

বিদেশের (Switzerland) জমাট দুগ্ধ, আমরা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, উহা প্রকৃতই দুগ্ধ নহে। ঐ দেশে দুগ্ধ বড়ই মহার্ঘ, সেই জন্য সামান্য দুগ্ধের সহিত, অথবা মোটেই দুগ্ধ না দিয়া গোল আলু বা সাদা আলু (যাহাকে এ দেশে সকরকন্দ আলু বলে) পরিষ্কার করতঃ জলে সিদ্ধ করিয়া মাখিয়া তরল করতঃ তাহার সহিত ফুটন্ত জল ও চিনি সংযোগে

উহা প্রস্তুত। সেই জন্য ঐ দুগ্ধের রং কিছু হলদে এবং খাইতেও কেমন কেমন লাগে। তবে চিনির ভাগ বেশী থাকায় তাহা ধরা কঠিন।

আমরা এই প্রক্রিয়ার পক্ষপাতী নহি। কারণ, ইহাতে সাধারণকে ঠকান হইবে; এই তথাকথিত দুগ্ধ গুরুপাক বলিয়া রোগী ও শিশুদের কুপথ্য এবং ইহাতে, আমরা যে উদ্দেশ্যে এই দুগ্ধ ব্যবহার করি, সেই উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া প্রবঞ্চকদিগকে প্রশ্রয় দিতেছি মাত্র।

আমরা নিজে নিম্ন প্রক্রিয়ামত জমাট দুগ্ধ তৈয়ার করিয়া কয়েকটি প্রদর্শনীতে গিয়া প্রথমশ্রেণীর প্রশংসা পত্র ও পুরস্কার পাইয়াছিলাম এবং উহা প্রকৃতই দীর্ঘকাল স্থায়ী ও বিদেশী জমাট দুগ্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সাধারণে উপকৃত হইবেন বলিয়া এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি। নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ামত দুগ্ধ প্রস্তুত হইতেছে শুনিলে আমরা সুখী হইব।

নিজ সাক্ষাতে গো-দোহন হইলে, ঐ দুগ্ধ জ্বাল দিয়া ঘন করতঃ তাহাতে পরিমাণমত (যাহাতে বেশ সুমিষ্ট হয়) দেশী চিনি মিশাইয়া গরম অবস্থাতেই আধসের বা এক পোয়া পরিমিত টিনের কৌটায় নিম্ন প্রক্রিয়া মত পূর্ণ করতঃ দেশ বিদেশে চালান দিয়া ও নিজেরা ব্যবহার করিয়া তথাকথিত বিদেশী দুগ্ধের হাত হইতে এড়াইতে পারি।

প্রক্রিয়া।—একটা বড় গামলায় টিনের কৌটা বসাইয়া ঐ কৌটার গলা পরিমাণ উচ্চ করিয়া ফুটন্ত গরম জল গামলায় ঢালুন। পরে ঐ গরম জলে কৌটা গুলি এমন ভাবে ডুবান, যেন কৌটার গলদেশ পর্য্যন্ত জল উঠে, অথচ মধ্যে জল না যায়। গরম জলের উত্তাপে কৌটা খুব উত্তপ্ত হইলে, উহার মধ্যে পূর্ব্বকথিতরূপে প্রস্তুত দুগ্ধ সাবধানে (যেন হাত না লাগে) ঢালিয়া কৌটার মুখ আটকাইলেই হইল। পরে ইচ্ছামত কৌটায় লেবেলাদি আঁটিয়া বিক্রয় জন্য চালান দেন।

বাতাসের মধ্যে সর্ব্বদা অসংখ্য পোকা আমাদের চক্ষুর আগোচরে উড়িয়া বেড়াইতেছে। ঐ গুলিই আমাদের খাদ্যাদির মধ্যে প্রবেশ করতঃ পচাইয়া দেয়, সেই জন্যই অনাবৃত খাদ্যাদি নষ্ট হয়। উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় টিনের কৌটা গরম হওয়ায়, কৌটার মধ্যস্থিত বাতাসও অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে, ইহাতে কীটাণুগুলি মরিয়া যায় অথবা, থাকিতে পারে না। গরম বাতাস উপরে উঠে বলিয়া, ঐ বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কীটাণুগুলিও উপরে উঠে অর্থাৎ কৌটার বাহিরে আইসে; সুতরাং এই অবস্থায় কৌটায় দুগ্ধ সাবধানে পুরিলে উহা

নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল অবিকৃত ভাবে স্থায়ী হইবে। আর দেশীয় চিনিতে কার্ব্বনের ভাগ অধিক থাকায়, ঐ ঘনীভূত দুগ্ধ শীঘ্র পচিতে পারে না।

বারান্তরে মোমবাতী, ইরেজার, দিয়াবাতী, গালা, সাবান প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীআশুতোষ রায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তুলা চাষের বর্ত্তমান অবস্থা।

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই অল্প বিস্তর তুলার চাষ হইয়া থাকে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে তুলার জমির পরিমাণ কত ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তুলা চাষের উন্নতির জন্য নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও সে সময়ের তুলনায় আধুনিক সময়ে তুলার জমির পরিমাণ যে কমিয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সরকারি কাগজ পত্র দেখিলে বোধ হয় যে, গত দশ পনের বৎসরের মধ্যে তুলা চাষ কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৮৮-৮৯ সালে তুলার জমির পরিমাণ ১৩,৯১৮, ৬৩৯ একার ছিল। মালসন সাহেব বলেন যে বর্ত্তমান সময়ে তুলার জমির পরিমাণ ১৪,০০০,০০০ হইতে ১৫,০০০,০০০ একার হইবে। যাহা হউক, তুলার চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও আমাদের তাহাতে বিশেষ সুবিধা হয় নাই। কারণ উৎপন্নের মাত্রার বৃদ্ধির সহিত রপ্তানির মাত্রাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৮৮-৮৯ সালে উৎপন্ন তুলার মাত্রা ৯,২১৯,৪৯৪ হন্দর; ইহার অধিকাংশই অর্থাৎ ৫,৩৩১,৯১৪ হন্দর রপ্তানি হয়। সুতরাং এতদ্দেশে ব্যবহারের জন্য ৩,৮৮৭,৫৮৯ হন্দর অবশিষ্ট থাকে। ইহাদ্বারা আমাদের যে অভাব মোচন হয় না, তাহা সামান্য বিবেচনায় বুঝিতে পারা যায়। "ইণ্ডিয়ান কটনষ্টেটিস্টীক্স্" নামক পুস্তক প্রণেতা অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষে ব্যবহারের জন্য বৎসরে অন্যূন ৯,১০৬,০০০ হন্দর তুলা আবশ্যক। এই অনুমান অনুসারে যদি সমস্ত উৎপন্ন তুলাই দেশে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের অভাব মোচন হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু তাহা না হইয়া দেশীয় কার্পাস যথেষ্ট রপ্তানি হইতেছে

এবং বিদেশীয় কলজাত কার্পাস বস্ত্রাদি দ্বারা দেশ প্লাবিত হইয়া পড়িতেছে। যখন রপ্তানি একেবারে বন্ধ করা বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার অসম্ভব, তখন তুলার অধিক পরিমাণে চাষ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

ভারতবর্ষের নানা স্থল হইতে তুলা বিদেশে রপ্তানি হয়। উৎপত্তির স্থান ভেদে এবং গুণের তারতম্যে এই সমস্ত তুলার নাম হইয়া থাকে। সুরাট, ব্রোচ, কাথিয়াবাড়, বরদারাজ্যে, কচ্ছ প্রভৃতি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত স্থানে এবং মধ্যপ্রদেশান্তর্গত উজ্জয়িনী, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত তুলা ধারবার, ব্রোচ, ঝারি, বানি প্রভৃতি নামে বিলাতী বাজারে পরিচিত। আপাততঃ বিশেষ আবশ্যক বোধ না হওয়ায় আমরা এই সমস্ত বাজার নাম সমূহের সমধিক উল্লেখ না করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতীয় কার্পাসের সমালোচনা করিতেছি।

তুলা উৎপাদনের জন্য বোম্বাই প্রদেশই ভারতবর্ষের মধ্যে এক প্রকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, এই প্রদেশোৎপন্ন তুলার পরিমাণ প্রায় ১ কোটি গাঁইট অর্থাৎ সমস্ত ভারতোৎপন্ন তুলার পরিমাণের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এবং জমির পরিমাণও তদ্রূপ অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি একার। বোম্বাই প্রদেশে আমেদাবাদ, সুরাট, ব্রোচ, আমেদনগর এবং সোলাপুর জেলা, খান্দেশ এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্রই উৎকৃষ্ট তুলা উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমেদাবাদ জেলায় প্রধানতঃ তিন জাতীয় তুলার চাষ হয়। রোজি, ওয়াগাদ এবং লালিও। রোজি এক প্রকার বহুবর্ষজীবী জাতি। ইহার গাছ ৬—৮ ফুট দীর্ঘ এবং ফুল হরিদ্রাবর্ণ। ইহা নরম মাটির উপযুক্ত এবং অন্যান্য ফসলের সহিত ইহার চাষ হইয়া থাকে। লালিওর গাছ খুব বড় এবং ইহা নরম মাটির উপযুক্ত। ওয়াগাদ তুলার গাছ ছোট এবং অপেক্ষাকৃত অনাবৃষ্টিসহ। আট মাসে ইহার ফসল পরিপক্ক হয়। সুরাট এবং ব্রোচ নামক জাতিই অধিক প্রচলন। স্থানে স্থানে 'গোঘরি' নামক জাতি উৎপন্ন হয়। ব্রোচ একটী উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস। জুন মাসে ইহার বীজ বুনিয়া মার্চ্চ মাসে ফসল উঠান হইয়া থাকে। ভাল ফসল হইলে একার প্রতি ৪০০-৫০০ পাউণ্ড তুলা হয়। ভারতবর্ষে যাবতীয় তুলার মধ্যে এই তুলা অনেকটা অবিমিশ্র ভাবে পাওয়া যায় এবং ইহার সূত্রও দীর্ঘ এবং বিশেষ শুভ্র। গোঘরি চুর্ণযুক্ত মাটিতেই ভাল হয়। পূর্ব্বোক্ত জাতির সহিত মিশ্রিত করিয়াই অধিকাংশ স্থলে ইহার চাষ হইয়া থাকে। খান্দেশ প্রদেশে উক্ত দুই জাতিরই চাষ হয়। আমেদনগর এবং সোলাপুর জেলায় এই দুই জাতির নাম

বিভিন্ন, কিন্তু উহাদেরই চাষ হয়। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে যে দুই জাতীয় তুলার চাষ হয়, তাহার নাম কুমতা ও মার্কিন ধারবার। ব্রোচের ন্যায় ধারবার জাতীয় তুলাতন্তুর উৎকর্ষতার জন্য অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। ইহা মার্কিন ও দেশীয় তুলার শঙ্কর।

যুক্তপ্রদেশের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থানে তুলা উৎপাদিত হয়। মিরট, আগ্রা, রোহিলখণ্ড, এলাহাবাদ, কাশী, ঝান্সি, লক্ষ্ণৌ, সীতাপুর, ফয়জাবাদ, রায়বেরেলি এবং তরাই। আমাদের দেশের ন্যায় ছোট জাতীয় তুলারই অধিক চাষ হয়। কয়েক বৎসর হইতে যুক্ত প্রদেশে বিদেশীয় জাতি সমূহ প্রবর্ত্তন করার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু চেষ্টা তাদৃশ ফলপ্রদ হয় নাই। ফলতঃ এই প্রদেশে দুই একটি প্রবর্ত্তিত জাতি ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার উল্লেখ যোগ্য জাতি দৃষ্ট হয়,না। এইরূপ প্রবর্ত্তিত জাতি সমূহের মধ্যে কানপুর পরীক্ষা ক্ষেত্রে অপ্‌ল্যাণ্ড জর্জ্জিয়ান নামক মার্কিন তুলার এতদ্দেশে উৎপাদন যোগ্য একটি জাতি বাহির হইয়াছে। উহার নাম কানপুর তুলা। ইহারই চাষের পরিসরের জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

যুক্তপ্রদেশের ন্যায় পঞ্জাব প্রদেশেও ছোট কার্পাসই অধিক। পঞ্জাব প্রদেশে স্থানে স্থানে নর্ম্মা নামক এক প্রকার জঙ্গলী কার্পাস পাওয়া যায়। ইহার ফুল লাল এবং বীজ হরিতাভ। কেহ কেহ বলেন যে, ২০ বৎসর পূর্ব্বে 'আপলাণ্ড আমেরিকান' নামক যে মার্কিন জাতীয় তুলার বীজ সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে বিতরিত হয়, নর্ম্মা সেই সমস্ত বীজোৎপন্ন বৃক্ষের বংশধর। কিন্তু বিশ বৎসর পূর্ব্বেও যখন এই কার্পাসের বিষয় কোন কোন লেখক উল্লেখ করিয়াছেন, তখন এই অনুমান তাদৃশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। নর্ম্মার সূত্র বেশ শুভ্র এবং গাছ বড়। ইদানীন্তন পঞ্জাবে বোম্বাই এবং মার্কিন তুলা প্রবর্ত্তনের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বিদেশীয় জাতির মধ্যে কানপুর আক্‌লামাটাইজ্‌ড এবং অন্য কয়েকটি জাতির উত্তমরূপ জন্মাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কৃষ্ণা, বেলারী, কুর্ন্দশ, আন্তপুর, কডাপ্পা, কোইম্বাটার, মাদুরা এবং টিনিভিলি এই কয়েকটী স্থানই মান্দ্রাজপ্রদেশে কার্পাস চাষের প্রধান স্থান। মান্দ্রাজ প্রদেশোৎপন্ন তুলা চারিটী প্রধান জাতিতে বিভক্ত। ইহাদের বাজার নাম (১) সালেম (২) কোকানদ (৩) টিনেভিলি (৪) ওয়েষ্টারনস্‌। স্থানীয় লোকেরা চারিটী জাতি বিভিন্ন নামে উল্লেখ করিয়া থাকে যথা

(১) উপ্পম (২) নদম (৩) তেল্লাপট্টি (৪) ইয়েরাপট্টি। ইয়েরাপট্টির তুলা লাল এবং উৎকৃষ্ট নহে। নদমের চাষ কঙ্কর যুক্ত স্থানে হয় এবং ইহার গাছ ৩-৫ বৎসর জীবিত থাকে। তুলাও বেশ সূক্ষ্ম এবং পাতলা কাপড় বুনিবার উপযুক্ত।

মধ্য প্রদেশে তুলার চাষ সমধিক না হইলেও স্থানে স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হইয়া থাকে। ওয়ার্দ্ধা, নাগপুর, ছিন্দওয়ারা নিমার এই সমস্ত স্থানের অন্তর্ভুক্ত। বাজারে যে জাতীয় কার্পাস হিঙ্গনঘাট নামে পরিচিত তাহাই মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ স্থলে উৎপাদিত হয়। এই প্রদেশে যে দুই জাতি কার্পাসের চাষ হয়, তাহাদের নাম বানি এবং ঝাড়ি। এতদুভয়ের মধ্যে বানিই উৎকৃষ্টতর, ইহার সূত্র দীর্ঘ এবং ভারতবর্ষজাত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাসের সমতুল্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার চাষ কমিয়া গিয়া এখন ঝাড়ির চাষই অধিক হইয়াছে। ঝাড়ির ফলন অধিক, ইহা অত্যন্ত অধিক মাত্রায় ইউরোপ এবং জাপানে রপ্তানি হয়। ইহার এত কাটতির কারণ এই যে, ইহা পশমের সহিত মিশান চলে। এই প্রদেশে যে সমস্ত বিদেশীয় কার্পাস প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল তৎসমুদয়ই প্রায় ফলদায়ক হয় নাই।

আসামের তুলা চাষ একটু স্বতন্ত্র ভাবের। কারণ এই প্রদেশে তুলা প্রায় পর্ব্বতেই জন্মিয়া থাকে। এবং 'গারো' নামক পার্ব্বত্য জাতিরই অধিক প্রচলন। 'গারো' জাতিয় তুলা প্রায় বস্ত্র বুননের জন্য ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঝাড়ি জাতীর ন্যায় ইহাও পশমের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে বলিয়া ইহার যথেষ্ট কাটতি। স্থানে স্থানে উপত্যকায়ও তুলা হয়, কিন্তু সেরূপ স্থান অতি বিরল। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থানে তুলা উৎপন্ন হয়—শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, ডারং, নওগাঁ, শিবসাগর, লক্ষীপুর এবং খসিয়া, গারো এবং নাগা পাহাড়।

বঙ্গদেশে সর্ব্বস্থলেই যে তুলার চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। ১৮৭৬-৭৭ সালের বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশে তুলার জমির পরিমাণ ১৬৫০০ একার। ১৯০৩-০৪ সালের বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের রিপোর্টে তুলার জমির পরিমাণ ৮০০০ একার। সুতরাং তুলার জমি যে অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম হইয়া গিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমান সময় অনেক জেলাতেই তুলার চাষ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত স্থানে আছে, সে সব স্থানেও জমির পরিমাণ যৎসামান্য। ১০০০ একারের অধিক পরিমাণ জমিতে কার্পাস চাষ হয় এরূপ জেলা অতি অল্প।

১৯০৩-০৪ সালের কৃষি বিবরণীতে যে সমস্ত অঙ্ক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী জেলাকে এই শ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায়। যথা—বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পাটনা, সারণ, চাম্পারণ, মোজাফরপুর, দ্বারবঙ্গ, সাওতাল পরগণা, কটক, আঙ্গুল, হাজারীবাগ, রাঁচি, পালামৌ, মানভূম এবং সিংভূম। পূর্ব্বে যে স্থানে সমধিক পরিমাণে কার্পাস চাষ হইত এক্ষণে সে সকল স্থানে চাষ একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে অথবা যৎসামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত,—ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলায় যে তুলার চাষ হইত, তাহার সূত্র হ্রস্ব হইলেও এত সূক্ষ্ম ও কোমল ছিল যে, সেরূপ সূত্র আর এক্ষণে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ঢাকার মসলিনের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সে তুলার চাষও উঠিয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশোৎপন্ন তুলার জাতি বিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। সারনই বঙ্গদেশের কার্পাস উৎপাদন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান স্থান। সারণ এবং তন্নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহের কার্পাসসমূহ সাধরণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে; বৈশাখী এবং ভাদুই। বৈশাখমাসে ফসল উঠান হয় বলিয়া প্রথম শ্রেণীর নাম বৈশাখী। তিনটী জাতি ইহার অন্তর্গত (১) ভাগথা (২) ভোকুরী এবং (৩) জাঠুয়া। ভাদুয়ের একটী জাতি, কোকটি। গয়া জেলায় তিনটি জাতি দৃষ্ট হয়—(১) বঙ্গ (২) বাড়ী এবং (৩) ভেকরী। প্রথম জাতিই উৎকৃষ্ট তুলা প্রসব করে কিন্তু অধিক ফসলের জন্য দ্বিতীয়েরই অধিক প্রচলন। মজঃফরপুরে দুইটি জাতি চাষ হয়—(১) ভোগলা এবং (২) ভোকবী। দ্বারবঙ্গে যে তিন জাতীয় তুলা চাষ হয় তাহার নাম—কোকটি, ভোয়েরা এবং ভোগলা। প্রথম জাতীয় সূত্রজাত কাপড় অত্যন্ত স্থায়ী বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। বৎসরে ইহার দুইবার বুনানী হয়—কার্ত্তিক এবং পৌষ মাষ। কটক জেলায় দুই জাতীয় তুলা উৎপাদিত হয়—আকুয়া এবং হলদি। প্রথমোক্ত জাতি অধিক তুলা প্রসব করে এবং নিচু জমিতে ইহার চাষ হয়। হলদিয়ার চাষ উচ্চ জমিতে কিম্বা বাস্তু ডাঙ্গায় হইয়া থাকে।

সারনের দেশী কার্পাস ৩-৬ ফিট উচ্চ হয় এবং তুলার বর্ণ উপরে শুভ্র এবং অন্তর্ভাগে ঈষৎ হরিতাভ হইয়া থাকে। ভোগলা কার্পাসের গাছ অনেকটা দেশীর ন্যায়; কাণ্ড 'দেশী' অপেক্ষা কম লোমযুক্ত, তুলার পরিমাণ অল্প। বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে এক প্রকার বহুবর্ষজীবী কার্পাস দৃষ্ট হয়। ইহার নাম রাম কার্পাস অথবা বুড়ী কার্পাস। আমাদের কৃষি-বিভাগ এই জাতীয় তুলার

চাষের পরিসরের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ঢাকা জেলাতেও এইরূপ গাছকার্পাস সাধারণতঃ ৬-৭ বৎসর ফলে। চাষ কতদূর লাভজনক হয় তাহা এখনও প্রমাণ ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। (সন্ধ্যা)

ভারতীয় শিল্পী।

বঙ্গদেশে "ভাস্কর" নামক এক জাতীয় শিল্পী মৃণ্ময় ও প্রস্তরময় নানাপ্রকার দ্রব্য, কোষ্ঠখোদাই, গজদন্তের বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী নির্ম্মাণ এবং তৈলচিত্রাদি অঙ্কন করিত। সার্দ্ধশতাব্দীকাল পূর্ব্বে পূর্ণতেজে তাহাদের ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতেছিল; কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের বিপুল প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের দুই একটি স্থানে দুই একজন ভাস্কর অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া থাকিলেও, তাহাদের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। মুর্শিদাবাদের ভাস্করগণ এখন কেবল গজদন্তের দ্রব্য প্রদর্শন দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। মুর্শিদাবাদে মুসলমান সিংহাসন যখন বেপথুমান, বঙ্গবিহারউড়িষ্যার নিজামত যখন বৈদেশিক বণিক পুঙ্গবগণের করালগ্রাসে কবলিত হইবার উপক্রম হয়, সেই ঘোর শঙ্কট সময়ে ভাস্করগণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গজদন্তের যে সকল দ্রব্য মুর্শিদাবাদের ভাস্করগণ বর্ত্তমান সময়ে প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তালিকা দৃষ্টেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তাহাদের নির্ম্মিত দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত। পূর্ব্বে তাহাদের সুদক্ষ হস্তচাতুর্য্যে নানাপ্রকার খেলনা, দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এবং আরও নানাশ্রেণীর দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত হইত এবং এখনও তাহাদের কেহ কেহ ঐ সকল দ্রব্যনিচয় প্রস্তুত করিয়া থাকে সত্য। পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যে একটির প্রতিমূর্ত্তি ভাস্করগণ বিক্রয় করে না, তাহা—শ্রীকৃষ্ণ। ভাস্করগণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত; কাজেই নিজের উপাস্য দেবকে, সেই বিরাট পুরুষকে, সামান্য কাঞ্চন-মূল্য-বিনিময়ে অপরের হস্তে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। দৈনন্দিন ব্যবহারের নানাপ্রকার দ্রব্য এবং রমণী সমাজের আদরের সর্ব্ববিধ অলঙ্কার তাহারা প্রস্তুত করিলেও, কেহ যেন মনে না করেন, ঐ সকল দ্রব্য প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। এই দ্রব্যনিচয়ের মধ্যে বালা ও চিরুণীর

কাটতি সর্ব্বাধিক,—পশ্চিম দেশীয় ও দাক্ষিণাত্যের রমণীগণ উহা অত্যধিক ব্যবহার করে। তদ্ধেতু মুর্শিদাবাদে গজদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদির কোন প্রকাশু বিপনী নাই। ভাস্করদিগের আবাসবাটীর একাংশই কারখানার স্বরূপ ব্যবহৃত হয় এবং যখন যে দ্রব্য তাহারা প্রস্তুত করে, তখন সেই দ্রব্য বাড়ীর প্রকাশু কোন স্থানে পথিপর্শ্বে তাহারা বিক্রয়ার্থ রাখিয়া দেয়। ইহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় না হইলেও খুব স্বচ্ছল নহে। এককালে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখা তাহাদের সাধ্যাতীত; একবার প্রস্তুত করিয়া তাহা বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা অপর দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে না। কোনও সহরে বা রাজধানীতে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া কারবার চালাইতেও তাহারা সক্ষম নহে।

মুর্শিদাবাদের ভাস্করগণ গজদন্তের নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে;—(১) বর্ণমালা; (২) লক্ষ্মী সরস্বতী ও কার্ত্তিক গণেশ সমভিব্যাহারে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গাপ্রতিমা; (৩) জয়া বিজয়া পার্শ্বস্থিতা, শিব বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা করাল বদনা কালীমূর্ত্তি; (৪) জগদ্ধাত্রী যে মূর্ত্তিতে বঙ্গদেশে অর্চ্চিতা হন, (৫) জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মিশিল; (৬) পাল্কী, বাহক ও অনুচরসহ; (৭) শতরঞ্জক্রীড়ক; (৮) হাতবাক্স; (৯) হস্তী; হস্তিযূথ এবং হস্তি-সিংহ-সংগ্রাম, (১০) উষ্ট্র, উষ্ট্র ও চালক; (১১) অশ্ব ও অশ্বারোহী; (১২) গো-যান; (১৩) ময়ুরপক্ষী; (১৪) সবৎসা গাভী; (১৫) কুক্কুর; (১৬) ভেড়া; (১৭) মহিষ; (১৮) কুম্ভীর; (১৯) হরিণ; (২০) লাঙ্গল, হল-স্কন্ধে কৃষক; (২১) চেন ও লকেট; (২২) ইয়ারিং; (২৩) স্ত্রীলোক, পুরোহিত, ধোপা, ভিস্তিওয়ালা, পিয়ন, কুম্ভকার, দর্জ্জি, সিপাই, ফকির, পুলিস প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি; (২৪) কাগজ-কাটা; (২৫) বালা, অনন্ত; (২৬) পাশা, দাবার বড়ী, সাবন দ্রব্য পিন, কটোরা, ফ্রেম, ছড়ি, চামর, চিরুনী ইত্যাদি।

দিল্লী ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানের গজদন্তের দ্রব্য হইতে মুর্শিদাবাদের দ্রব্যগুলিই সুন্দর এবং সাধারণের সমধিক চিত্তাকর্ষক। দিল্লীর শিল্প এতদপেক্ষা উত্তম বটে কিন্তু মূল্যও ঢের বেশী। অধ্যাপক, জে, এফ, রয়লি 'Lecture on the Arts and Manufactures of India' গ্রন্থে ভারতীয় ভাস্করগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—

"A variety of specimen of carving on ivory have been sent from different parts of India and are much to be admired, whe-

ther from the size or the minuteness, for the elaborateness of details, or for the truth of representation. Among these the ivory-carvers of Berhampore (Bengal) are conspicuous. They have sent a little model of themselves at work, and using, as is the custom from the drawings in Layard's "Ninevah" were excellent representations of what they could only have seen in the above work, showing that they are capable of doing new things when required, whilst their representation of the elephant and other animals are so true to nature, that they may be considered the works of real artist and should be mentioned rather under the head of fine arts than of mere manual dexterity" রয়লি সাহেবের এবম্প্রকার প্রশংসার কণিকামাত্রও অত্যুক্তি নহে।

বর্ত্তমানকালে মুর্শিদাবাদের ভাস্করের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক নহে;—গিরীশচন্দ্র ভাস্কর তাহাদের প্রধান। খাগড়া ও জঙ্গীপুরের নিকটবর্ত্তী এনাতুল্লাবাগে প্রধান প্রধান ভাস্করগণের বসতি। বহরমপুরের মধ্যে গিরীশচন্দ্র ও নিমাইচাঁদ এই দুইজন প্রধান শিল্পী এবং বড় বড় বায়না সাধারণতঃ ইহারাই পাইয়া থাকে। অনেকানেক প্রদর্শনীতে ইহারা মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কলিকাতার S. J. Tellery & Co, H. C. Ganguli & Co. প্রভৃতি ব্যবসায়িগণকে দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে। পূর্ব্বতন ভাস্করগণ সরকার বাহাদুর হইতে ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এবং ভারত ও ইউরোপের নানাদেশে দ্রব্য সরবরাহ করিবার বায়না পাইত। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কারণ বর্ত্তমান কালের প্রদর্শনীর নিমিত্ত শিল্পদ্রব্যাদি দেশের বড় বড় রাজা মহারাজাগণের নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। কাশিমবাজারের সেই সুখসৌভাগ্যের দিনে, কোম্পানী বাহাদুরের প্রতিষ্ঠিত কার্পাস ও রেশম কুঠির শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারিবৃন্দ যখন তথায় বাস করিতেন, তখন ভাস্করগণের অবস্থা উন্নত ছিল এবং তাহাদের ব্যবসাও স্বচ্ছলতার সহিত নির্ব্বাহিত হইত। বহরমপুর যৎকালে তৎপ্রদেশের প্রধান সৈন্যাবাস বলিয়া গর্ব্ব করিত, তখনও এই সকল শিল্পের অবস্থা উন্নত ছিল। কিন্তু বহরমপুরের সেই গৌরবের অবসান হইতে না হইতেই, এই শিল্প অবনতির নিম্নতর সোপানে অবরোহণ করিতে আরম্ভ করে। এবং যদি কলিকাতা ও বোম্বায়ের

সহিত রেলওয়ের সংযোগ না থাকিত, তবে কোন্‌দিন এ শিল্পগৌরবে ভারতের সর্ব্বংসহবক্ষ হইতে মুছিয়া বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমগ্নহইত। এই শিল্পাবনতির কথা চিন্তা করিবার সময়ে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, কলিকাতা হইতে বহরমপুর বহুদূরে অবস্থিত এবং রেলের প্রধান লাইন হইতে কিছু ব্যবধানে সংস্থাপিত এবং পূর্ব্বে রাজধানী ও সৈন্যাবাস থাকা কালে উহার যে গৌরব ছিল এখন তাহাও নাই। পূর্ব্বে উড়িষ্যার অনেকানেক সামন্ত নৃপতিবর্গ এবং বঙ্গ বেহারের ধনী ব্যক্তিগণ এই ভাস্করগণকে নির্দ্দিষ্ট বেতনে স্ব স্ব আলয়ে আশ্রয় দিতেন এবং তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া প্রায়ই তাহাদের পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের নিমিত্ত জায়গীর দান করিতেন। কিন্তু ইহা এক্ষণ অতীতের স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এরূপ হিতৈষী তাহাদের এখন আর কেহই নাই এবং সমুচিত উৎসাহ প্রাপ্তির আশায় এখন তাহারা বৈদেশিক পর্য্যটক ও মহাত্মা ব্যক্তিগণের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। এখন তাহারা স্বদেশ হইতে বিদেশেই প্রতিপন্ন হইবার চেষ্টা করিতেছে।

সাধারণ ছুতারমিস্ত্রীরা যে সকল অস্ত্রপাতি ব্যবহার করে, মুর্শিদাবাদের ভাস্করগণও সেই প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। শেষোক্তগণের কোন কোন অস্ত্র অতিশয় ক্ষুদ্র এবং কোন কোন অস্ত্র অতীব সূক্ষ্ম,—এইমাত্র প্রভেদ। তাহাদের অস্ত্র সকলের নাম—(১) নানা আকারের উখা (শলাকা) ইংরাজিতে যাহাকে ফাইল বলে। (২) করাত ; (৩) ছোট বাটালী,(৪) স্ক্রু বসাইবার যন্ত্র ; (৫) নানাপ্রকার তুরপুন (৬) নোয়ান-যন্ত্র; (৭) কম্পাশ ; (৮) সাঁড়াশী ; (৯) কাষ্ঠের মুদ্গর (হাতুড়ী) ; ১০) মাটাম স্কোয়ার (১১) লাঠি। এই সকল অস্ত্র খুব পরিষ্কার নহে। ভাস্করগণ ৭০।৮০প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকিলেও ২।৪টি মাত্রই প্রধান ; অবশিষ্ট গুলির পার্থক্য কেবল আকারে। অর্থাৎ একই অস্ত্র কোনটী অতি স্থূল, কোনটী অতি সূক্ষ্ম। কোনও নূতন আদর্শানুযায়ী কার্য্য করিবার সময় কোন যন্ত্র তৎকরণোপযোগী বলিয়া বিবেচিত না হইলে, তাহারা তখনই তদুপযোগী একটী অস্ত্র গড়াইয়া লয়। তাহাদের প্রস্তুত শিল্পের একটী প্রধান গুণ—তাহাতে জোড় থাকে না ; তাহারা জোড় দেওয়া পসন্দ করে না। একশত টাকার একখানি ছোট দুর্গা-প্রতিমা বা বড় প্রতিমার অর্দ্ধেক নির্ম্মাণ করিবে, তত্রাচ জোড় দিয়া বড় বা অপরার্দ্ধ প্রস্তুত করিবে না।

বলিয়াছি ত ভাস্করদিগের সংসারিক অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় নহে। তাহারা বৎসরে ছয় শত হইতে আট শত টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে। কিন্তু পরিবারের ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া বৎসরের শেষ অতি অল্পই উদ্বৃত্ত থাকে। যাহা কিছু থাকে তাহাও সামাজিক ক্রিয়াকলাপেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ভাস্কর গণের শিক্ষানবিশগণ ওস্তাদের নিকট হইতে খোরাকী পায় এবং স্থান বিশেষে কেহ কেহ দুই তিন আনা করিয়া প্রাত্যহিক পারিশ্রমিকও পাইয়া থাকে। দন্তশিল্পিগণ দিনে ৮।১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করে।

কলিকাতা আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দেও পার্ব্বতীয় ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাবনা এবং কটক জেলার নানাস্থানে হস্তিদন্তের শিল্পাদি প্রস্তুত হইত। কিন্তু তদবধি এই সময়ের মধ্যে উক্ত স্থান সমূহ হইতে উহা অন্তর্হিত হইয়াছে। বালেশ্বরে একটীমাত্র কারিকর এখনও চেন, ছড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারে; কিন্তু তাহার অবস্থা শোচনীয় বলিয়া পূর্ব্ব হইতে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারে না। বায়না দিলে সে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেয়। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত সে এখন অধিকাংশ সময় হাড়ের চিরুণী প্রভৃতি সুলভ দ্রব্য প্রস্তুত করতঃ বিক্রয় করে।

কলিকাতার বহুবাজারে হাড়কাটার গলিতে ৩টি দোকানে এখনও হাতীর দাঁতের ছোট ছোট দ্রব্য তৈয়ারী হয়। উহারা তিনজনই ছুতার ব্যবসায়ী এবং বোতাম, চেন, চিরুণী, হুকার মুখনল, ছড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করে। কারুকার্য্যখচিত কোনও দ্রব্য বা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের চেষ্টা তাহারা করে না,—কোনও প্রকারে পৈতৃক ব্যবসায়টী বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাহাদের দোকানেও অপর কোন কর্ম্ম নাই।

রংপুরের কুড়িগ্রাম মহকুমার অধীন নাংগা গ্রামে এখনও হাতীর দাঁতের কাজ হয়। এই গ্রামের শিল্পিগণকে খোন্দকার বলে,—তাহারা তদ্দেশের কৃষকদিগের সমশ্রেণীর এবং উহাদের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পাংগার রাজপ্রদত্ত জায়গীর উপভোগ করিত, কিন্তু এখন তাহা বাজেয়াপ্ত। তাহাদের হস্তপ্রসূত সেই সমৃদ্ধিশালী শিল্পসমূহ এখন উৎসাহের অভাবে মাটী হইতে বসিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে তথায় চারিজন মাত্র কারিকর আছে, যাহারা চিরুণী, ছুরি, পাশা, দরবার গুটি প্রভৃতি সাধারণ প্রয়োজনের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। এই খোন্দকার-গণের বর্ত্তমান ব্যবসা কৃষিকার্য্য। কেবল বায়না পাইলে বা অবসরকালে

তাহারা ঐ সকল শিল্পকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। সুন্দরমতি ও থাসানকুড়ার মেলার সময় তাহাদের কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই দ্রব্যাদি প্রস্তত করে। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ঐ সময় রংপুর জেলার অপর কতিপয় স্থানেও হস্তিদন্তের কারিকর বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এখন তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে দেশের লোকের মতি গতি যখন স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি ফিরিতেছে, তখন আশা করা যায় যে, এই সকল প্রাচীন শিল্পীরাও আবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিবে এবং পুনরায় তাহাদের হস্ত-চাতুর্য্য সন্দর্শন করিয়া সমগ্র জগৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবে।

শিল্প ও সাহিত্যে—

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

মাতৃ-পূজা

তোমাদের দেশ ভাই
ধন ধান্যে সুজলা সুফলা,
রাশি রাশি ঢালে অর্ঘ্য
ষড়-ঋতু হরষ-কুশলা ;
সোণা ফলে গাছে গাছে
শিলা-বুকে অমিয়ের ধারা,
তবে কেন ত্রিশ কোটী
পর পদে এত মাতোয়ারা ?
বিদেশীরে আনি ঘরে
করিয়াছ আপনার জন,
স্বদেশের তরে কই
এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন !

মুখে ডাক 'মা' বলিয়া
কিন্তু তাতে নাহি একাগ্রতা,
ডাকিবার মত করি
ডাক দেখি—জাগিবেন মাতা।
ভুলে যাও আত্ম পর
কোলাহল দ্বন্দ্ব ঘুচে যাক্,
ত্রিশকোটী এক হয়ে
একবার 'মা' বলিয়া ডাক।
আপনার দেশ-জাত
বেশ-ভূষা অঙ্গ আভরণ—
তুচ্ছ হোক্ ক্ষুদ্র হোক্
তবু সে যে আপনার ধন !

নিরন্না মায়ের ছেলে
  তোরা যে রে, কোথা পাবি বল
মহার্ঘ-ভূষণ ? আর
  কাঙ্গালের সাজে কি সকল !!
কাল হোক্—তুচ্ছ হোক্
  তবু প্রিয় আপন সন্তান,
তারি তরে কাঁদে দেখ
  জননীর আকুল পরাণ !
মোটা ভাত মোটা বস্ত্র
  তাও ভাল—সে যে আপনার,
হাসি মুখে তাই লও,
  তাই হবে যোগ্য দেবতার।
একখানি পট্টবাস
  দুইখানি শঙ্খ-আভরণ—
পরাইয়া দাও মায়ে,
  নিজ হাতে—মহার্ঘ ভূষণ ;
এর চেয়ে হতে পারে
  কিবা সুখ ? আর একবার—
—ভারতের একজন
  বল আমি, ভারত আমার !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

স্বদেশী।

প্রথম খণ্ড।] শ্রাবণ, ১৩১৩। [দশম সংখ্যা।

বন্দে মাতরম্।

ভারতে দুর্ভিক্ষ।

আমরা অষ্টম সংখ্যায় 'দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, দারিদ্র্যই এ দেশের দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। বাস্তবিক, ইহা আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয় যে, গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ, অসার যুক্তির আশ্রয় লইয়া, আপনাদের কুকীর্ত্তি-জনিত দুর্ভিক্ষের ভিন্নরূপ কারণ প্রদর্শন করিতে লজ্জা বোধ করেন না। পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, আর পূর্ব্ববাঙ্গালার লাট ফুলার সাহেবের মতে, স্বদেশী আন্দোলনই ইহার কারণ! কি অদ্ভুত যুক্তি! আমরা যতবারই এই যুক্তির কথা ভাবি, তত বারই আক্ষেপ মিশ্রিত হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে,এইরূপ হীনমস্তিষ্ক অনুদার-প্রকৃতিককেও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারূপ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে হইতেছে। ফুলার সাহেবের বুদ্ধি এতদূর প্রখর না হইলে, তিনি গরিব প্রজাদিগের প্রতি অযথা অত্যাচার করিয়া, ইংরাজ-রাজত্বকে লোকাপ্রিয় ও কলঙ্কিত করিবেন কেন? এরূপ উদারহৃদয় না হইলে, নিরস্ত্র, দুর্ব্বল ও শান্তিপ্রিয় প্রজাগণকে গুর্খা ও পিটুনি (punitive) পুলিশ

দিয়া উৎপীড়িত করিবেন কেন? দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইলে যে দুর্ভিক্ষ অসম্ভব হইবে, একজন সামান্যবুদ্ধি লোকও তাহা বুঝিতে পারে। ইংলণ্ডে আর দুর্ভিক্ষ হয় না কেন, ইহাও কি ইংরাজ রাজপুরুষগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? ভূমির পরিমাণ ও উৎপন্ন আহার্য্য দ্রব্যের সহিত লোকসংখ্যার অনুপাতে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা অনেক অধিক; কিন্তু ইংলণ্ডবাসিগণের আর্থিক অবস্থা, এ দেশের লোকের অবস্থা অপেক্ষা সহস্রগুণ ভাল, সেই জন্যই ইংলণ্ডের লোক অর্থাভাবে অনাহারে মরে না। এ দেশের শিল্পী, কৃষক ও শ্রমজীবিগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতিই স্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু ফুলার লাটের যুক্তিতে স্বদেশী আন্দোলনই দুর্ভিক্ষের কারণ। স্বদেশী আন্দোলন ছয় মাসের মধ্যেই কি প্রকারে দুর্ভিক্ষ আনিয়া উপস্থিত করিল, ফুলার লাট তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন নাই। তবে আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তিনি মনে করেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের প্রজাগণ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতেছে এবং সেই সকল দ্রব্য বিদেশী দ্রব্য অপেক্ষা মূল্যবান্, সুতরাং প্রজাদের আর্থিক অবস্থা হীনতর হওয়াতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ফুলারসাহেব একজন প্রাচীন সিবিলিয়ান্; তিনি এতদিন এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এদেশের সাধারণ লোক, বিশেষতঃ অবস্থাহীন লোক, বিলাতী জিনিষ আদৌ ব্যবহার করে না বলিলেই হয়। তাহারা যে মোটা কাপড় ব্যবহার করে, তাহা দেশীয় জোলা মুসলমান ও মুচিদের নির্ম্মিত; তাহাদের ব্যবহার্য্য করকচ লবণ লিভারপুল লবণ অপেক্ষা অল্পমূল্য; তাহারা কখন দেশী কিম্বা বিদেশী চিনি ব্যবহার করে না, চিরকালই দেশজাত গুড় ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই সকল লোকের গৃহে দুই একটীমাত্র দেশী পিত্তল কাঁসার বাসন আছে। স্বদেশী আন্দোলন যে কি প্রকারে সেই সকল লোকের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ করিল, ইহা ত আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা জানি যে, এদেশের সাধারণ লোক বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করে না। এই আধুনিক স্বার্থলুব্ধ অদূরদর্শী কর্ম্মচারিগণের শাসনগুণে কস্মিন্ কালেও তাহাদের সে ক্ষমতা সম্ভব হইবে না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে প্রসিদ্ধ মনরো সাহেব বলিয়াছিলেন,—"I do not think there would be any considerable increase of the demand for European commodities among the natives of India;" এ কথাটী এখনও বলা যাইতে পারে। ইহা

অবশ্য স্বীকার্য্য যে, স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে যাহারা বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণ ব্যবহার করিত, তাহাদের অনেকে দেশী মিলের কিম্বা তাঁতের মোটা কাপড় ও কর্কচ লবণ ব্যবহার করিতেছে; কিন্তু এই সকল জিনিষ বিলাতী জিনিষ অপেক্ষা মূল্যবান্ নহে; সুতরাং স্বদেশী আন্দোলনের সহিত দুর্ভিক্ষের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই।

আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকাতে,জমিদার ও প্রজার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কখনও প্রবল হইবে না। কিন্তু এ বিশ্বাস ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে। সন ১৮৯৮ সালে বিহার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইল, আবার পূর্ব্ববঙ্গেও ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলার জমি উর্ব্বরা, এবং কৃষিজীবী প্রজাগণও পূর্ব্বে অবস্থাপন্ন ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ প্রতিপাদন করিতেছে যে, পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রজাগণও অবস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে রাজপুরুষদের মতের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী অনেক ইংরাজ ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক আছেন। সেই সকল লোক নিরপেক্ষভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া থাকেন যে, ভারতবাসীর দুরবস্থাই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ; এবং ইংরাজ রাজত্বপ্রণালীই এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। বাস্তবিক, ইংরাজ রাজত্বের আমলে দুর্ভিক্ষ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া প্রজাক্ষয় করিতেছে। ১৮০০ ও ১৮২৬ সালের মধ্যে চারিটি এবং ১৮৭৫ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে ২২টি দুর্ভিক্ষ হইয়াছে; ইহার প্রত্যেকটীতে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ এবং ইহার সর্ব্বত্র শস্য, ফল, মূল প্রভৃতি নানাপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়। অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন কোন বৎসর সমগ্র ভারতের যে শস্য নষ্ট হইবে, ইহা একবারে অসম্ভব। প্রায় প্রতিবৎসরই কোন না কোন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইতেছে এবং অন্যান্য স্থানের উৎপন্ন শস্যাদি দুর্ভিক্ষগ্রস্ত স্থানে প্রেরিত হইতেছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষসত্বেও শস্যের রপ্তানি বন্ধ হইতেছে না। অতএব শস্যের অভাব জনিত যে দুর্ভিক্ষ হয় না, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন কারণে শস্য নষ্ট হইলে, ভক্ষ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়; সেইরূপ বর্দ্ধিত মূল্যের শস্য অপর দেশের লোক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এদেশের লোকে অর্থাভাবে সেরূপ অধিক মূল্যে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া অনাহারে মারা যায়। মহামতি সহৃদয় ডিগ্‌বি, ওয়েডারবরন, হাইণ্ডমান প্রভৃতি উদারনৈতিক

ইংরাজ এবং নরৌজি, রমেশ দত্ত প্রভৃতি খ্যাতনামা দেশীয় মহোদয়গণ ভারতবাসীর দুরবস্থাই দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মতে নিম্নলিখিত কারণে ভারতবর্ষের আর্থিক অবনতি হইয়াছে ঃ—

১ম—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। এদেশের প্রত্যেক লোকের বার্ষিক আয় ২০৲। ৩০৲ টাকা মাত্র ; ইহার প্রায় চতুর্থাংশ কর দিতে হয়।

২য়—এদেশের রাজস্বের প্রায় চতুর্থাংশ বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

৩য়—গবর্ণমেণ্টের সৈনিকবিভাগের খরচ অত্যন্ত অধিক ও অন্যায্য।

৪র্থ—এদেশের লোক উপযুক্ত হইলেও গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত না করিয়া, অধিক বেতন দিয়া ইংরাজগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ; সেই জন্য গবর্ণমেণ্টের আয়ের অনুপাতে খরচ অনেক বেশী হয় এবং তজ্জন্য প্রজার করভার বৃদ্ধি পাইতেছে।

৫ম—উপযুক্তরূপ স্বায়ত্ব শাসন প্রণালী প্রচারিত না হওয়াতে এবং গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিক্ষিত লোকগণকে বিশ্বাস না করাতে, বিচারের অসুবিধা হয় ও গবর্ণমেণ্টের অযথা ব্যয় হইয়া থাকে।

৬ষ্ঠ—দেশের শিল্প ও বাণিজ্য বিদেশীয়গণের হস্তগত হওয়াতে প্রচুর অর্থ বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

আমরাও এই সকল যুক্তির সমর্থন করি। আমাদের মতে, সমস্ত ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া উচিত এবং রেলওয়ে অপেক্ষা শস্যাবাদের জন্য কেনাল প্রভৃতি পয়ঃপ্রণালীর কার্য্যে রাজকোষ হইতে অধিক ব্যয় হওয়া কর্ত্তব্য। রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা বাণিজ্যের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু এই কৃষি-প্রধান দেশে রেলওয়ে অপেক্ষা পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা বিশেষ আবশ্যক। দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিনটী বিষয়ের উন্নতি হইলে যে, আর্থিক উন্নতি হইতে পারে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রাণ রক্ষার জন্য যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা প্রায়ই যথেষ্ট হয় না। আবার, অনেক সময়ে দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভে কোনরূপ বন্দোবস্ত না হওয়াতে, অনেক লোক অনশনে মারা যায়। পূর্ব্ববাঙ্গালার বরিশাল, ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলায় দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র কিছু কিছু তকাবি টাকা বিতরণ করিয়া ও স্বদেশী আন্দোলনের উপর দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

তকাবিঋণের সুদের হার অল্প হইলেও ঋণগ্রহীতাকে নানা প্রকার অসুবিধা সহ্য করিতে হয়। ঋণগ্রহণের দরখাস্ত আবশ্যক ও আমলাগণকে সন্তুষ্ট করা চাই, আর ঋণ পরিশোধের সময় হয়ত সার্টিফিকেট জারি হয় ও গোমহিষাদি বিক্রয় করিয়া টাকা পরিশোধ করিতে হয়। এই সকল অসুবিধার জন্য কৃষকেরা সহজে তকাবি ঋণ গ্রহণ করে না। দুর্ভিক্ষের সময় গবর্ণমেণ্ট রাস্তা নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যে সক্ষম লোকদিগকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু মজুরীর হার এত অল্প যে, অনেকে সেই সকল কার্য্য করিতে সম্মত হয় না।

আমরা আশা করি যে, স্বদেশী আন্দোলন সফল হইলে, দেশের কৃষি শিল্পের উন্নতি হইবে এবং দরিদ্রের দুরবস্থার কথঞ্চিৎ উপশম হইবে ও দুর্ভিক্ষের নিবৃত্তি হইবে। গবর্ণমেণ্টের অনুকম্পা ও সাহায্যব্যতীত কেনাল প্রভৃতি বহু ব্যয়সাধ্য পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত হওয়া সুকঠিন, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যাহাতে সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তদ্বিষয়ের প্রয়াস পাইতে হইবে। দেশের অনেক স্থানে আবাদের জন্য যে সকল পুষ্করিণী, বাঁধ, ইন্দারা প্রভৃতি আছে, সংস্কারাভাবে সেগুলি মজিয়া গিয়াছে; জমিদারগণের সে গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবেনা।

বাণিজ্য।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ॥

বাণিজ্যই যে অর্থাগমের সর্ব্বপ্রধান উপায়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাণিজ্যবলেই ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতি প্রভূত অর্থসংগ্রহ দ্বারা ক্ষমতাশালী হইয়া পৃথিবীর নানাদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। আর্থিক উন্নতি হইতেই জাতীয় উন্নতি হইয়া থাকে এবং বাণিজ্যই এই আর্থিক উন্নতির মূল কারণ। বাণিজ্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সাহায্য করে এবং মনুষ্যকে সাহসী ও উৎসাহশীল করে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ইংরাজ বন্যজন্তুর ন্যায় অসভ্য ও মূর্খ ছিল, সেই ইংরাজ কেবল বাণিজ্যবলেই পৃথিবীর সকল জাতির শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। এখন ইংরাজ সুসভ্য

ধনবান্ ও বুদ্ধিমান্ এবং প্রাচীন সভ্য জাতির উপর আধিপত্য করিতেছে। এখন ইংরাজ বণিকের জাহাজ সকল মহাসাগর, সাগর ও নদী বন্দরে সর্ব্বদা বিদ্যমান, এবং ইংরাজ অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিয়া জাতীয়গৌরব প্রচার ও বাণিজ্য বিস্তার করিতেছে। ফরাসী, ওলন্দাজ ও স্পেনীয়ার্ডগণও বাণিজ্যবলে এক সময়ে বিশিষ্টরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল; কিন্তু ইংরাজের নিকট পরাভূত হইয়া তাহারা হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মাণ ও আমেরিকাবাসী ইংরাজগণ বাণিজ্য বিষয়ে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজবণিকদের প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিয়াছে। পুরাকালে গ্রীস, রোম ও মিশরদেশীয়গণ বাণিজ্যপ্রভাবে বলীয়ান হইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সময়গতিকে তাহাদের গৌরব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে! এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আজ যে ইংরাজ ধনমদে উন্মত্ত, কালচক্রে তাহাকে যে গ্রীক ও রোমীয়দের দশায় উপনীত হইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" এই বাক্যটী যেমন কোন ব্যক্তিবিশেষে প্রযোজ্য, তেমনি জাতিবিশেষেও সমভাবে প্রযোজ্য, এবং ইতিহাস ইহা সপ্রমাণ করিয়া থাকে। যাহা হউক, এই প্রবন্ধে সেই সকল আধ্যাত্মিক বিষয়ের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দেশের বাণিজ্য বিদেশীয়গণের করায়ত্ত হওয়াতে, আমাদের দুর্দ্দশা কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কি উপায়ে সেই দুর্দ্দশার কথঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে, তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমরা ইংরাজের সৌভাগ্যের জন্য ঈর্ষা করি না।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানকার শিল্প জগদ্বিখ্যাত। এখানকার শিল্পজাত দ্রব্য চীন, আরব, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দূরদেশে এবং সিংহল যাবা প্রভৃতি দ্বীপে রপ্তানি হইত। অর্ণবযান ও নৌকার সাহায্যে এই বহির্বাণিজ্য পরিচালিত হইত। দেশের এক স্থানের উৎপন্ন কৃষি ও শিল্প দ্রব্য আবশ্যকমত অন্যস্থানে প্রেরিত হইয়া বিক্রীত হইত; তখন রেলপথ ছিল না। উষ্ট্র, বলদ ও গো-মহিষযান দ্বারা অন্তর্বাণিজ্য সমাহিত হইত। এ দেশীয়লোকই বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য কার্য্য চালাইত এবং তদ্দারা লাভবান্ হইয়া অবস্থাপন্ন ছিল। হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে দেশীয় লোক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া আপনাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিতে সমর্থ হইত। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

ইংরাজ ভৃত্যগণ দেশের বাণিজ্য হস্তগত করাতে ও বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী আরম্ভ করাতে, এ দেশের শিল্পী ও বণিকগণের দুরবস্থার সূত্রপাত হইল। ইংরাজ বণিকগণ প্রথম অবস্থায় নানাপ্রকার অসদুপায় অবলম্বন করিয়া আপনাদের কার্য্যোদ্ধার করিত; যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সংগ্রহ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল; সুতরাং যাহাতে এদেশের শিল্প বিনষ্ট হয় ও বাণিজ্য আপনাদের করায়ত্ত হয়, তজ্জন্য তাহারা নানাপ্রকার ঘৃণিত উপায়ও অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হইত না। এ দেশের রেশমের ব্যবসা লাভজনক দেখিয়া, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি আপনাদের হস্তে সেই ব্যবসাটী লইল; রেশম-শিল্পিগণকে বলপূর্ব্বক আপনাদের কারখানায় নিযুক্ত করিতে লাগিল এবং রেশম রপ্তানী ব্যবসাও তাহাদের দখলে হইল। নীলের চাষ ও ব্যবসা লাভ-জনক দেখিয়া ইংরাজ ব্যবসায়িগণ দেশীয়দের হস্ত হইতে তাহা কাড়িয়া লইল। ক্রমশঃ বিলাতে সূতা ও কাপড়ের কল করিয়াও এদেশী সূতা ও কাপড়ের উপর বিস্তর শুল্ক বসাইয়া, এদেশের বস্ত্র শিল্পনাশের আয়োজন করা হইল। বর্দ্ধমান, মানভূম, হাজারিবাগ জেলায় পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে এদেশের অনেক লোক সেই কয়লার ব্যবসা করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত, কিন্তু আজকাল অধিকাংশ কয়লার খনিই ইংরাজ কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত। লৌহ, অভ্র, সুরকী প্রভৃতি ধাতু খনিগুলিও ইংরাজ কোম্পানির করায়ত্ত। রালি ব্রাদার্স প্রভৃতি ইংরাজ কোম্পানি কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা হইতেও এদেশীয়দিগকে দূরীভূত করিয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি সহরের প্রধান প্রধান দোকানগুলি ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের সম্পত্তি। বাস্তবিক, যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই বিদেশীয়দের উন্নতি ও দেশীয়দের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে রেলওয়ের বিস্তার হইয়াছে ও হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই রেলপথ বিস্তারের পক্ষপাতী এবং ইহার জন্য রাজকোষ হইতে প্রচুর অর্থ-ব্যয় হয়। ইংরাজের মূলধনে ও ইংরাজ কোম্পানির দ্বারা এই সকল রেলওয়ে নির্ম্মিত ও পরিচালিত হইতেছে এবং এই সকল রেলওয়ে হইতে যে প্রচুর লাভ হয়, তাহার প্রায় সমস্তই বিদেশে চলিয়া যায়। বিদেশীয়দের বাণিজ্যের সুবিধা করাই রেলওয়ে বিস্তারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে আমরাও যে রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা উপকৃত হইতেছি না, একথা কথা বলা যায় না। আমাদের দেশে এখনও অনেক ব্যবসাদার রেলওয়ের সাহায্যে জিনিস আমদানী রপ্তানী করিয়া থাকে ও অর্থ উপার্জ্জন করে। রেলওয়ে, পোষ্টআফিস ও টেলিগ্রাফ হওয়াতে

ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশের আর্থিক অবস্থা মন্দ হওয়াতে মূলধনের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে দেশীয় শিল্প পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা যত্নবান্ হইয়াছি; এই সময়ে আমাদের বাণিজ্য বিষয়েও মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। বিদেশীদের হস্ত হইতে অন্ততঃ কতক পরিমাণেও বাণিজ্য আমাদের হস্তগত না হইলে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সম্ভবপর নহে। ইংরাজ কোম্পানির ন্যায় কতকগুলি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক; তাহা হইলে মূলধনের অভাব হইবে না। ব্যবসাতে লাভও হয় লোকসানও হয়; লোকসান হইলে হতাশ হইয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। একজনের মূলধন হইলে একবার লোকসানেই ব্যবসা বন্ধ হইতে পারে; কিন্তু কোম্পানির টাকা হইলে সে ভয় থাকে না।

এদেশের মধ্যবিত্ত লোক যেরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অচিরে ব্যবসা বাণিজ্যের বন্দোবস্ত না হইলে, তাহাদের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই শীঘ্র লোপ পাইবে। যাহাদের জমিদারী কিম্বা কৃষির আয় নাই, চাকরীই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চাকরীর সংখ্যা অত্যল্প, আর বড় বড় চাকরী ইংরাজ ও ফিরিঙ্গির একচেটিয়া বলিলেই হয়। বিশ পঞ্চাশ টাকা বেতনের কর্ম্মচারিগণের অধিকাংশই অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস যে, এদেশীয় লোকের পঞ্চাশ টাকা আয়ই যথেষ্ট; কিন্তু সে বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। পাশ্চাত্য জাতির মত এদেশের লোক স্বার্থপর নহে; বিশেষতঃ একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের মধ্যে উপার্জ্জনাক্ষমগণও ধর্ম্মতঃ প্রতিপাল্য; সুতরাং এক কিম্বা দুই জনের উপার্জ্জনে পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতে হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন খাদ্য দ্রব্যের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্প বেতনের কর্ম্মচারিগণের দুর্দ্দশা বাড়িতেছে। প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহুসংখ্যক যুবক সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া বাহির হইতেছে এবং চাকরির জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। গবর্ণমেণ্টও ইংরাজ বণিকদের আফিসে বহুসংখ্যক যুবক চাকরীর প্রত্যাশায় বিনা বেতনে চারি পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিয়া পরিশেষে তাড়িত হইয়া থাকে। ইহা কি সভ্য ও শিক্ষিত ইংরাজের অনুদার-হৃদয়তার পরিচায়ক নহে? আজকাল চাকর ও ভিখারীর অবস্থা যে প্রায় সমতুল্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের লোক চাকরির জন্য লালায়িত না হইয়া, যদি শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি

অবলম্বন করিতে পারে, তবেই দেশের মঙ্গলের সম্ভাবনা। জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া, প্রথমতঃ সামান্য ব্যবসা আরম্ভ করিতে হইবে এবং ক্রমশঃ তাহার উন্নতি করিতে হইবে। মাড়োয়ারিগণের যেরূপ ব্যবসা বুদ্ধি, বাঙ্গালীর সেরূপ নাই। যতদিন বাঙ্গালী মাড়োয়ারীর ন্যায় পরিশ্রমী, কষ্টসহ ও অধ্যবসায়শালী না হইবে, ততদিন বাঙ্গালীর দুরবস্থা ঘুচিবে না। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রতিযোগিতার প্রকোপে ব্যবসা এখন আর পূর্ব্বের মত লাভপ্রদ নহে। তথাপি আমাদের বিশ্বাস যে, চাকরি অপেক্ষা ব্যবসা সুখকর ও লাভজনক। যে দোকানদার মাসে ২০৲ টাকা লাভ করে, সে নিশ্চয়ই একজন কুড়ি টাকা বেতনের কেরাণি অপেক্ষা সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে; কারণ, স্বাধীন স্বত্ত্বাবলম্বী দোকানদারের মনে স্ফুর্ত্তি থাকে, গরিব পরাধীন কেরাণি নির্ম্মম মনিবের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত, তাহার মনের সুখ ও স্ফুর্ত্তি কোথায়? সামান্য ভুলের জন্য কেরাণিকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও দণ্ডিত হইতে হয়, কিন্তু ব্যবসাদারকে সে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আমলে আমাদের দেশের অর্থ প্রচুর পরিমাণে দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে; সুতরাং দেশের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ হীনতর হইতেছে। আমরা "ভারতের বহির্বাণিজ্য" প্রবন্ধে (স্বদেশী, দ্বিতীয় সংখ্যা দেখ) যে বাণিজ্য তালিকা প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে জানা যায় যে, এক বৎসরে (১৯০৪-৫ সালে) ৯৬ কোটী টাকার দ্রব্য বিদেশ হইতে এখানে আমদানী হইয়াছিল এবং ১৫৮ কোটী টাকার দ্রব্য এদেশ হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। এই আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা প্রায় সমস্তই বিদেশী বণিকগণ চালাইয়া অপরিমেয় লাভ করিয়া থাকে। আর সেই লাভের অধিকাংশই বিদেশে প্রেরিত হওয়াতে, আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা মন্দ হইতেছে, এবং ইহাই দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের একটী প্রধান কারণ। যাহাতে এই বহি-
[illegible]জ্য আমরাও যোগদান করিতে পারি, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে
[illegible] ও নেতাগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে সফলপ্রযত্ন
[illegible]ঃ কতকগুলি অর্ণবযান ভাড়া করিয়া চীন, জাপান,
পারস্য [illegible] দেশ ও ভারতীয় দ্বীপ সকলের সহিত বহির্বাণিজ্য চালাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, দেশের যে কতদূর মহৎ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় তাহা বর্ণনাতীত। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে এইরূপ কার্য্যপটু লোকের অভাব নাই; কেবল উৎসাহ ও অর্থের অভাবে সেই সকল

লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া কষ্টভোগ করিতেছে। সম্প্রতি বঙ্গদেশে অন্ততঃ একটী বহির্বাণিজ্য কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে, মধ্যবিত্ত লোকের দুরবস্থা ঘুচিবে না ও দুর্ভিক্ষের নিবৃত্তি হইবে না। আমাদের অনুরোধ যে, দেশের কৃতবিদ্য ও ধনী মহোদয়গণ কালবিলম্ব না করিয়া বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য বিষয়ে যত্নশীল হইয়া, অর্থব্যয় ও সুবন্দোবস্ত করেন এবং অবস্থাহীন ভদ্রবংশীয় যুবকদিগকে উৎসাহিত করেন।

সংসার-যাত্রা।

কর্ম্ম ও সফলতা।

রঙ্গভূমিতে যেমন কেহ বা রাজবেশে, কেহ বা তাঁহার অমাত্য, সেনাপতি বা শান্তিরক্ষক বেশে, আবার কেহ বা ভৃত্যাদি বেশে অভিনয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই বিশাল সংসার রঙ্গভূমিতেও সকলেই কিছু না কিছু অভিনয় করিতেছেন। রঙ্গভূমির অভিনেতৃগণের ন্যায় সংসার রঙ্গভূমিরও অভিনেতৃগণের অভিনয় সমরূপ হইতেছে না; কাহারও অভিনয় হৃদয়গ্রাহী ও সুমধুর, কাহারও মধ্যবিধ এবং কাহারও অপ্রীতিজনক ও কর্কশ; অর্থাৎ এই সংসারক্ষেত্রে কেহ বা সফলতার উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন, কেহ বা ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, আবার কেহ বা বিফলতার নিম্নতম গহ্বরে নিপতিত হইতেছেন। এইরূপ বৈষম্যের কারণ কি? সংসার ক্ষেত্রে কেনই বা একজন সফলতা প্রাপ্ত হন, আর কেনই বা একজন বিফল হইয়া পড়েন? এই সকল বিষয় বিবেচনা করা এবং সফলতা লাভের উপায় চিন্তা করাই এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পিতামাতার সুস্নিগ্ধ স্নেহ সলিল সেচনে বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্য যখন বাল্যকাল অতিক্রম করে, যখন সে যৌবন দশায় উপনীত হয়, যখন স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন সহকারে তাহাকে সংসাররূপ সমুদ্র যাত্রায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, তখন কিরূপে সেই ভয়সঙ্কুল সমুদ্রযাত্রায় সমর্থ হইবে, এই চিন্তাটী স্বতঃই তাহার মনে উদিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক সংসার সমুদ্রযাত্রায় উন্মুখ যুবকগণের পক্ষে এই চিন্তাটী যেমন গুরুতর, এমন আর কিছুই নাই।

বিদ্যালয়ের সর্ব্বাগ্রগণ্য বালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী যুবক, গণিত বা ব্যবহার শাস্ত্রে পারদর্শী ছাত্র, সকলেই এই সংসার মহার্ণবের পুরোভাগে দণ্ডায়মান। এই মহার্ণবে কত শত বিপজ্জনক পর্ব্বত লুক্কায়িত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কত প্রবল ঝটিকা ও উত্তাল তরঙ্গ আছে, তাহার সংখ্যা নাই; গন্তব্য পথ এবং স্থানেরও নির্ণয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ এই ভীষণ জলধির উপর লোকের অজ্ঞাতসারে একখানি সামান্য ক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ করিল, কেহ তাহার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, কেহ তাহার সন্ধান জানিল না, অথচ সে নির্ব্বিঘ্নে বিপজ্জাল অতিক্রম করিয়া নিরাপদে একটী বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল; আবার কেহ বা ধ্বজ-পতাকা-শোভিত সুচারু, সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ অর্ণবযানে মহাসমারোহে আরোহণ করিল, দর্শকগণের আনন্দ ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিয়ৎ দূর গমন করিতে না করিতে, তাহার সেই সুরম্য পোত বিপর্য্যস্ত ও জলমগ্ন হইল এবং ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন সকল সেই বিশাল সলিলে কিয়ৎক্ষণ ভাসমান থাকিয়া কোথায় বিলীন হইয়া গেল। এই সকল বিষয়ের কারণ অনুসন্ধান করিলে, সংসার সমুদ্র যাত্রায় উদ্যত যুবকগণের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে এবং অনেকে বিপদ অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য বন্দরে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

কেহ কেহ মনে করেন, সফলতা বিশেষ বাঞ্ছনীয় বস্তু নহে, অর্থাৎ ইহা সুখের স্বরূপ ও মূলীভূত কারণ নহে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কতদূর প্রামাণিক, তাহা বলিতে পারি না। সফলতা ব্যতিরেকে সংসারে আরও নানাপ্রকার ভোগ সুখের সামগ্রী থাকিতে পারে সন্দেহ নাই। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান না করিয়া, বেলা ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শায়িত থাকা অনেকে সুখের বিষয় মনে করিতে পারেন। বাতাতপ সহন পূর্ব্বক পরিশ্রম না করিয়া, নিশ্চেষ্টভাবে পরিবারবর্গের মধ্যগত হইয়া আমোদ প্রমোদ করা এবং রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর সুখাদ্য সামগ্রীর আস্বাদ গ্রহণ করাই অনেকের পক্ষে সুখের বিষয় হইতে পারে। যাঁহারা এরূপ প্রকৃতির লোক, সফলতা তাঁহাদের নিকট সুখের বিষয় না হইতে পারে। সফলতার পথ কখনই সুকোমল কুসুমময় ও সুগম নহে, উহা চিরকালই বন্ধুর ও দুরারোহ; বিশেষতঃ এই বিংশ শতাব্দীতে উহা আরও অধিক দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। লোক সংখ্যার সহিত সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় ও কার্য্যে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা সফলতা লাভ করিতে হইলে, সতর্কতা, কার্য্য-তৎপরতা, বিবেক, অধ্যবসায়, সাহস ও স্থির সিদ্ধান্ত এই সকল সদ্‌গুণের একাধারে আধিক্য নিতান্ত আবশ্যক।

কেহ কেহ বলেন, সফলতা সদ্‌গুণের পরিচায়ক নহে; এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক। কখন কখন অল্প-বুদ্ধি নির্গুণ মনুষ্যকেও এই সংসারে সফল হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সাধারণ নিয়ম এই যে, সংসারে উন্নতি, প্রতিপত্তি ও ধনলাভ করিতে হইলে, উপরিলিখিত সদ্‌গুণাবলীর প্রাচুর্য্য একান্ত আবশ্যক। উন্নতিশীল মনুষ্যের বিবিধ দোষ থাকিলেও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাঁহার ঐ সদ্‌গুণগুলিও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। আবার ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সফলতা লাভ করিবার পূর্ব্বে যতদূর, সুখের আশা করা যায়, কার্য্য সফল হইলে আর তাহাতে আশানুরূপ সুখানুভব হয় না। কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলে মনে হয়, কিয়ৎ দূর গমন করিলেই দিগ্বলয়ের নিকট উপস্থিত হইতে পারিব; কিন্তু এই আশায় যত অধিক অগ্রসর হই, দিগ্বলয় ততই যেমন অধিক দূরে সরিয়া যায়, সেইরূপ আমরা যতই সফলতা লাভ করি, সুখাশারূপ দিগ্বলয় ততই অধিক দূরবর্ত্তী হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি সফলতা সুখের কারণ নহে, বলিতে হইবে? অথবা সফলতা লাভের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে না? যাহারা মনুষ্যের সুখ ও সফলতা বিষয়ে এইরূপ চিন্তা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিতান্ত ভ্রান্ত। তাঁহারা মনে করেন, ইচ্ছার পরিপূরণ এবং পরিশ্রম বা চিন্তার অভাবই সুখের বিষয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। মনুষ্য স্বভাবতঃই দুরাকাঙ্ক্ষ; তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, কিছুতেই ইচ্ছার পরিতৃপ্তি হয় না; আবার পরিশ্রম বর্জ্জন ও কার্য্যের অভাব অতি বিষম ক্লেশ ও বিরক্তি-জনক। পরিশ্রম ও কার্য্যের অভাবজনিত ক্লেশ পরিশ্রম অপেক্ষা শতগুণ অসহনীয়। কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য কালে যে সকল প্রীতিকর ভাব ও সুখজনক আশা মনোমধ্যে সমুদিত হয়, তাহাই আমাদের কার্য্যের যথেষ্ট পুরস্কার, ইহা স্মরণ রাখা উচিত; কার্য্যে সাফল্য ততদূর প্রীতিজনক নহে। উদ্যানস্বামী উদ্যানস্থিত বৃক্ষগুলির যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সময়ে যাদৃশ প্রীতি লাভ করেন, ফলের উপভোগ কালে তাদৃশ সুখানুভব করেন কিনা, সন্দেহ-স্থল। পরিশ্রম ও ক্লেশ ব্যতিরেকে ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতে পারিবে

বলিয়া, মৃগয়ালোলুপ ব্যক্তির সম্মুখে মৃগযূথ ও দ্যূতাসক্ত ব্যক্তির নিকট অর্থ-রাশি উপস্থাপিত কর,তাহারা সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাক, প্রত্যুত তোমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করিবে। কোন ধনবান ব্যক্তি স্বীয় অমিতব্যয়ী উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে বলিয়াছিল—"প্রিয় পুত্র, আমি অর্থের উপার্জ্জন সময়ে যাদৃশ সুখানুভব করিয়াছিলাম, অর্থের অপব্যয়কালেও যদি তোমার তাদৃশ সুখানুভব হয়, তাহা হইলে অপব্যয় করিতে পার, তাহাতে আমার কোন কথাই নাই"। একজন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন—"অভ্যস্ত বিদ্যাসম্ভূত সুখ অপেক্ষা, বিদ্যা উপার্জ্জন-কালীন সুখই অধিকতর মনোহর।" মনোমধ্যে ইহার সঞ্চার মাত্রেই যদি উহার পরিপূরণ হইত, যদি মানবগণ নিজ নিজ বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিত, তাহা হইলে লোকে কার্য্য-তৎপর অথবা উদ্যমশীল হইতে পারিত না; সুতরাং স্রোতোহীন নদীর ন্যায় মনুষ্যজীবন এককালে পঙ্কিল ও নিরানন্দ-ময় হইয়া উঠিত। কার্য্যে অব্যাপৃত সময় অতি ভয়ানক ক্লেশজনক। অকর্ষিত অবস্থায় পতিত থাকিলে ভূমিতে যেমন কণ্টকবৃক্ষের বীজ অচিরে অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ কার্য্যে অব্যাপৃত থাকিলে আমাদের মনে ত্বরায় দুষ্প্রবৃত্তির সঞ্চার হইতে থাকে, এবং জীবন দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। ফলতঃ মনুষ্যজীবন একটী বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র; কুহকিনী আশা সেই কার্য্যক্ষেত্রের নায়িকা। আশা-নায়িকার মনোমোহন ইন্দ্রজালবলে মানবগণ নিরন্তর পরম সুখে সেই কার্য্যক্ষেত্রে ধাবমান হইতেছে। পাঠক কথামালার সেই গল্পটী তোমার স্মরণ আছে? কোন কৃষক মৃত্যুশয্যায় শয়নপূর্ব্বক তাহার পুত্রগণকে বলিয়া গেল, অমুক অমুক ভূমির নিম্নভাগে আমার যথেষ্ট গুপ্তধন প্রোথিত আছে। কৃষকের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণ ধনলোভে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও সেই সকল ভূমি হইতে ধন পাইল না বটে, কিন্তু সেই সকল ভূমি সুন্দররূপে কর্ষিত হওয়াতে প্রচুর শস্যশালিনী হইয়া কৃষক-তনয়গণকে আশাতীত ধন প্রদান করিয়াছিল। আশার কার্য্যও কৃষকের কার্য্যের অনুরূপ। আশার বিমোহন কুহকে প্রলো-ভিত হইয়া মানবগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কার্য্য সম্পন্ন হইলে যদিও তাহাদের আশানুরূপ সুখলাভ না ঘটুক, তথাপি কার্য্যকালে যে অনির্ব্বচনীয় বিমল আনন্দ মনোমধ্যে উদিত হয়, তাহাই তাহাদের কার্য্য ও পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

সে যাহা হউক, সফলতা সুখের কারণ না হইতে পারে, কিন্তু বিফলতা

কখনই সুখজনক নহে; প্রত্যুত ইহা যে নিরতিশয় ক্লেশকর, তাহাতে আর সংশয় নাই। যে কার্য্যের জন্য নিরন্তর প্রাণপণ করিয়া কঠোর পরিশ্রম করিলাম, যাহার জন্য অন্যান্য সাংসারিক সুখ বিসর্জন দিলাম, যামিনীযোগে নিদ্রার সময়েও যে বিষয়ের স্বপ্ন দেখিতাম, কায়মনোবাক্যে অহর্নিশ যে বিষয়ের জন্য চেষ্টা ও ধ্যান করিতাম, তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে যে নিদারুণ দুঃখ-সাগরে ভাসমান হইতে হয়, হৃদয় যে একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়, ইহা কে অস্বীকার করিবে? কোন সুমহৎ কার্য্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া অকৃত-কার্য্য হওয়া, বাস্তবিক নরক যন্ত্রণার তুল্য দুঃসহ। ধর্মশাস্ত্র-বিশারদ অথবা দর্শন শাস্ত্র-নিপুণ পণ্ডিত মহোদয়গণ বিফলতা গহ্বরে পতিত হইয়াও সুস্থির-চিত্ত থাকিতে পারেন বটে, কিন্তু সেরূপ লোক সংসারে অতি বিরল। সাধারণতঃ বিফলতা ও সুখের সামঞ্জস্য রাখা অসম্ভব, কয়জন লোক বিফল হইয়াও চিত্তের স্থৈর্য্য রাখিতে পারে? অতএব দেখা যাইতেছে, সফলতা সুখের স্বরূপ না হইলেও উহা সুখলাভের নিতান্ত উপযোগী।

সফলতা সুখের উপযোগী বটে, কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সফলতার কতকগুলি সর্ব্বোচ্চ আসন সকলের অধিকার যোগ্য নহে। সুনিপুণ ব্যবহারা-জীব উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান প্রাড়্‌বিবাক না হইতে পারেন, ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা পদ না পাইতে পারেন, বাণিজ্যকুশল বণিক সর্ব্বপ্রধান ধনী না হইতে পারেন, সহৃদয় কবি কালিদাস না হইতে পারেন এবং চিকিৎসা-বিদ্যা-বিশারদ খ্যাতি-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন প্রধান চিকিৎসক না হইতেও পারেন। সকলেই এই বিষয় অবগত আছেন; সুতরাং এখানে ইহার উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিলনা; কিন্তু একশ্রেণীর লেখক এবং বক্তা আছেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশোন্মুখ যুবকগণকে এইরূপ উপদেশে উৎসাহিত করেন, "যুবকগণ আপাততঃ যদিও তোমরা অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থাপন্ন রহিয়াছ, যদি সচেষ্ট হও, তবে তোমরা মহৎ লোক হইতে পার; তোমরা বর্ত্তমান নীচ ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণপণে দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা কর, অচিরেই তোমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে।" এই সকল লেখকের স্মরণ রাখা উচিত, যদি ভদ্রভাবে পরিচালিত হয়, তবে সকল ব্যবসায়ই তুল্যরূপ সম্মানজনক। কর্ম্ম অবনতির কারণ নহে, নীচ অন্তঃকরণই অবনতির মূলীভূত। ঘৃণার্হ নীচ ব্যবসায়সমূহও তত্তৎব্যবসায়াবলম্বী ব্যক্তিগণের সাধু ব্যবহার দ্বারা ভদ্রজনোচিত বলিয়া গণ্য

হইতে পারে। সামান্য কর্ম্মকারও শিষ্টাচার-সম্পন্ন ভদ্রলোক এবং কোটীশ্বরও নীচ-স্বভাব অসভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত লেখক ও বক্তাগণ যুবকগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক সময়ে সময়ে বলিয়া থাকেন, "যদি তোমরা অকিঞ্চিৎকর আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে দৃঢ়তর যত্ন সহকারে আত্মোন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হও, তবে গৌতম, ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, শঙ্করাচার্য্য, নিউটন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন এবং সেক্সপীয়র প্রভৃতির ন্যায় তোমরাও অচিরে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য ও সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল তারকার ন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া উঠিতে পার।" এই সকল লেখকের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহারা মনে করেন, মনুষ্যমাত্রেই জন্মাবধি কালিদাস অথবা নিউটন এবং উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলে ও কঠিন পরিশ্রম করিলেই লোকমাত্রেই শকুন্তলা রচনা এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক গূঢ়তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা জগৎ মুগ্ধ করিতে পারেন। কালিদাস, নিউটন, সেক্সপীয়র প্রভৃতি মহাত্মাগণের যে একটী ঈশ্বরদত্ত অসাধারণ প্রতিভা ছিল, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহারা কহেন, অসাধারণ প্রতিভা সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য বিশিষ্ট কঠিন পরিশ্রম ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। কি দর্শন বিদ্যা, কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, যে কোন বিদ্যা অথবা যে কোন বিষয়ে, যে কোন লোক মহত্ত্ব লাভ করিয়া জগতীতলে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, যদি আমরা তাঁহার জীবনী বিশেষ করিয়া পাঠ করি, যদি তাঁহার এতাদৃশ মহত্ত্ব-লাভের কারণগুলি সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, বিপুল অধ্যবসায় বা একান্ত একাগ্রতাই তাঁহার অলোক-সামান্য উন্নতির মূলীভূত কারণ; তাঁহার সমান পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শালী বা একাগ্রতাসম্পন্ন হইলে এবং তাঁহার ন্যায় সুযোগ ও অবস্থা ঘটিলে, ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার সমান প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত লেখকগণের মত এই যে, যদি লোক কঠিন পরিশ্রম ও দৃঢ় চেষ্টা করে, তাহা হইলে পৃথিবীতে এরূপ কঠিন মহত্ত্ব নাই, যাহা সে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু হায়! ঐ "যদি" শব্দটী কত গুরুতর? যদি পিতামহী পুরুষ হইতেন, তাহা হইলে পিতামহ হইতেন বটে। যাঁহারা নিউটনের ঈশ্বরদত্ত অসাধারণ প্রতিভার বিষয় অস্বীকার করেন, তিনি কেবল পরিশ্রম বলেই এতাদৃশ উন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, এরূপ তর্ক করেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, ধৈর্য্য-বিশিষ্ট অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতাই নিউটনের ঈশ্বরদত্ত অসাধারণ প্রতিভার

সারভুত ছিল। মনুষ্যের কর্ম্মই তাহার প্রকৃতির যথার্থ পরিচায়ক। অমুক ব্যক্তির মানসিক শক্তি অধিকতর হইলে গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে পারিত এবং অমুক ব্যক্তির শরীরে অধিকতর বল থাকিলে সে অধিকতর বলিষ্ঠ হইতে পারিত, এই উভয় উক্তিই একরূপ। কোন বাষ্পীয় পোতের বাষ্পাধার প্রশস্ততর হইলে উহা অধিকতর বেগে যাইতে সমর্থ হয় বটে। কোন লোক নিউটনের ন্যায় মানসিক শক্তি প্রাপ্ত হইলে সে নিউটনের ন্যায় মহৎকার্য্য সাধনে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই। সারমেয়গণ সিংহের বলবীর্য্য প্রাপ্ত হইলে, উহারাও সিংহের তুল্য ভীষণ ভাব ধারণ করিতে পারে; এইরূপ আবার সিংহেরাও সারমেয়গণের ন্যায় শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহা অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে যে, প্রতিভা ধৈর্য্য-বিশিষ্ট পরিশ্রম ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; কিন্তু যদিও পরিশ্রম প্রতিভার সারভূত বটে, তথাপি বলবতী ইচ্ছার বলে অথবা চেষ্টার আধিক্যে কেহ কি কখন প্রতিভার স্থান পরিপূরণ করিতে পারিয়াছেন? চেষ্টার আধিক্য কখন কি শক্তির আধিক্য বিধানে সমর্থ হয়? অত্যন্ত চেষ্টা করিলেও কচ্ছপ কি কখনও খেচর পক্ষীর ন্যায় শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে পারে? বানর কি কখনও হস্তীর বল প্রাপ্ত হয়? স্বল্পবুদ্ধি মনুষ্য বহু চেষ্টা করিয়া কখনও প্রতিভার কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না সন্দেহস্থল। মহৎলোকেই মহৎকর্ম্ম করিতে পারেন এবং তিনি তাহা সহজেই করিয়া থাকেন। শকুন্তলা ও রঘুবংশ পাঠ করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হয়, উহা কালিদাসের রসময়ী লেখনী হইতে অতি সহজেই বহির্গত হইয়াছিল। যেরূপ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বে কোন লক্ষণই জানা যায় না, অকস্মাৎ উহা হইতে অগ্নি উদ্গীরিত হইতে থাকে, যেরূপ সৌদামিনী সহসা প্রকাশিত হইয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ প্রতিভাশালীর প্রতিভাবহ্নি প্রকাশিত হইয়া কোন্ সময়ে অকস্মাৎ দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত করিবে, কে বলিতে পারে? কোন সুবিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, কস্মিন্‌কালে কেহ মহৎ হইবার ইচ্ছা করিয়া মহৎ হয় নাই। মহৎলোক নিজের অজ্ঞাতসারেই মহত্বপথে অগ্রসর হয়। বলবতী ইচ্ছা ও চেষ্টার বলে কেহ কি কখনও নিজ শরীরের স্বাভাবিক উচ্চতার বৃদ্ধি সাধনে সমর্থ হইয়াছেন? যথার্থই কবিকুলতিলক কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

মহৎকর্ম্ম মহত্ত্বের কারণ নহে, উহা মহত্ত্বের পরিচায়ক মাত্র। শরীর ও আত্মার যে সম্বন্ধ, মহৎকর্ম্ম ও মহত্ত্বে সেইরূপ সম্বন্ধ; অর্থাৎ প্রথমটী বাহ্য কিন্তু শেষোক্তটী আভ্যন্তরীণ।

কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমরা আলস্যের প্রশ্রয় দিতেছি? আমরা কি জনসাধারণকে পরিশ্রম ও চেষ্টায় বিরত হইতে বলিতেছি? কখনই নহে; মনুষ্য প্রতিভাশালী হউক, আর নাই হউক, পরিশ্রম ও চেষ্টা করা তাহার একান্ত কর্ত্তব্য। মনুষ্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন হউক অথবা অল্পবুদ্ধি হউক, তাহাকে প্রকাশ্য-ভাবে এবং অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতে হইবে, তাহা হইলেই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করা হয়। যদি পরিশ্রমকারী মহৎব্যক্তি হন, তবে তাঁহার কার্য্যকলাপও মহৎ হইবে। আর যদি তিনি সামান্য লোক হন, তবে তাঁহার কার্য্যও সামান্য হইবে। প্রযত্ন সহকারে ধীরভাবে পরিশ্রম করিলেই সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদিত হয়। আর চঞ্চল স্বভাব উচ্চাভিমান ব্যক্তির কার্য্য অন্তঃসারশূন্য ও ঘৃণার্হ হইয়া উঠে।

যেমন মনুষ্যগণের মধ্যে চিরকালই আকারগত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, সেইরূপ তাহাদিগের মধ্যে মানসিক বিভিন্নতাও বর্ত্তমান আছে সন্দেহ নাই। শিক্ষা, খাদ্যের নিয়ম প্রভৃতি কারণে কখনও কখনও এই বিভিন্নতার কিয়ৎ-পরিমাণে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যসমূহের মধ্যে মানসিক বিভিন্নতা আছে বলিয়া কি যুবকগণের উৎসাহশূন্য হওয়া উচিত? কখনই না। ঈশ্বর কাহাকে কিরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, মনুষ্য স্বয়ং তাহা অবগত নহে। সুতরাং পরিশ্রম সহকারে স্ব স্ব ক্ষমতার পরীক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ক্ষমতার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান না হইয়া, সকলেরই দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। পরিশ্রম তীক্ষ্ণবুদ্ধির উৎকর্ষ বিধান এবং বুদ্ধিহীনতার অভাব মোচন করে। যাহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ, পরিশ্রম করিলে তাহার বুদ্ধি অধিকতর মার্জ্জিত হয়, এবং যাহার বুদ্ধি অল্প, পরিশ্রম করিলে তাহার বুদ্ধির উপচয় হয় সন্দেহ নাই। যাহার বুদ্ধি ও ক্ষমতা যত অল্প, তাহার তত অধিক পরিশ্রম করা উচিত। আর কোন বিষয়ে চেষ্টা করিয়াও ফললাভ করিতে না পারিলে, চেষ্টার ত্রুটী না করিয়া পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে পরিশ্রম ব্যতিরেকে কিছুই

লাভ করিতে পারা যায় না। কোন মহৎ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন "পরিশ্রম বুদ্ধি ও ক্ষমতার অভাব পরিপূরণ করে; ধৈর্য্য ও কার্য্যতৎপরতা পর্ব্বত উৎপাটনেও সমর্থ হয়।" এই বিশাল পৃথ্বীতলে এমন কোন লোকই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, যে পৃথিবীর কোন না কোন উপকার করিতে সমর্থ না হয়। দীনজনের সামান্য পর্ণকুটীরে প্রবেশ কর, বা বাষ্পীয় শকটেই পরিভ্রমণ কর, বিশাল প্রান্তর মধ্যে নিরক্ষর কৃষকের সহিত কথোপকথন কর অথবা শিল্পজীবিগণের শিল্পাগারেই প্রবেশ কর, সর্ব্বত্রই তুমি কিছু না কিছু অননুভূতপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন বিরাজমান দেখিবে এবং সর্ব্বত্রই তুমি কিছু না কিছু নূতন বিষয় শিখিতে পারিবে সন্দেহ নাই। অনেকই বুদ্ধিহীনতার ওজর করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অকিঞ্চিৎকর। "বুদ্ধির অসদ্ভাব" ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, পরিশ্রম ও চেষ্টারই অসদ্ভাব হইয়া থাকে বটে।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন, পৃথিবীতে অসাধারণ সফলতা লাভ করিতে হইলে, অসাধারণ বুদ্ধির আবশ্যকতা আছে, কিন্তু ইহা কতদূর সত্য বলিতে পারি না। যেঁ সমস্ত মহাত্মা অসাধারণ কার্য্যদ্বারা জগতীতলে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে যাঁহাদের নাম জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, যাঁহারা নানাবিধ সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তক, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই যে অলোক-সামান্য বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন না, তাঁহাদের যে সাধারণ লোকের ন্যায় মধ্যবিধবুদ্ধি ছিলেন, ইহা উদ্যমহীন কাপুরুষগণ কখনই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। বাস্তবিক, সাংসারিক বিষয়ে যতই প্রবেশ লাভ করা যায়, ততই প্রতীত হইবে যে, সফলতা লাভ করিতে হইলে, মনুষ্যের একমাত্র অসাধারণ বুদ্ধিমত্তারই তাদৃশ প্রয়োজন নাই। পর্য্যবেক্ষণ কর বুঝিতে পারিবে, মধ্যবুদ্ধি লোকেরাও অনেক সময়ে অধিক সফলতা লাভ করিয়া থাকেন; এমন কি অনেক সময়ে প্রখর মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত হীনবুদ্ধি লোকেও অধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারেন। মনুষ্যসমাজের আবশ্যকতা বুঝিয়া তদুপযোগী কার্য্য করিতে পারিলে, লোকে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন না হইলেও খ্যাতি লাভ করিতে পারে। মনুষ্যসমাজে কোন কার্য্যের আদর অথবা অনাদর কার্য্যমত্তার বুদ্ধিসত্তার উৎকর্ষের উপর তাদৃশ নির্ভর করে না। প্রত্যুত উহা কার্য্যের সামাজিক উপযোগিতার উপরই বিশেষরূপ নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং লোকে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন না হইলেও যদি সুবিবেচনা, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে মনুষ্যসমাজের নিতান্ত

প্রয়োজনীয় কর্ম্ম করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও উন্নতি-লাভ করিতে পারেন। মধ্যবুদ্ধি লোকেরও সময়ে সময়ে অসাধারণ-বুদ্ধি ব্যক্তির অপেক্ষা পৃথিবীতে যে অধিকতর উন্নতি দেখা যায়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মধ্যবুদ্ধি ব্যক্তি দেশ-কালপাত্র দেখিয়া সুবিবেচনাপূর্ব্বক দৃঢ় অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে কার্য্য করাতে, ক্রমে ক্রমে উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছেন; কিন্তু অসাধারণ-বুদ্ধি ব্যক্তি হয় ত সেরূপ করেন নাই। পাঠক! কথামালার খরগস ও কচ্ছপের গল্পটী একবার স্মরণ করুন। খরগস স্বভাবতঃ দ্রুতগামী, কচ্ছপ মৃদুগমনশীল; কিন্তু কচ্ছপ অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে আলস্য-পরায়ণ খরগসকেও পরাস্ত করিয়াছিল। আবার দেখিতে পাওয়া যায়—কোন এক বিষয়ে অসাধারণ নিপুণ লোক বিষয়ান্তরে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যিনি এক বিদ্যা অথবা ব্যবসায়ে অদ্বিতীয়, সেই বিষয়েই তাঁহার সমগ্র মানসিক শক্তি প্রযুক্ত হয়, অন্যান্য সাংসারিক বিষয় তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে না। ফলতঃ সামান্য-বুদ্ধি মানব সদ্বিবেচক, শ্রমশীল, সুনীতিপরায়ণ ও সুশীল হইলে যে, সংসারের অনেক উপকারে আইসে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

আবার সুযোগ ঘটিলে ক্ষীণবুদ্ধি লোকেও সংসারে উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন। মহাত্মা বেকন বলিয়া গিয়াছেন, ক্ষমতাশালী ধনীলোকের অনুগ্রহ, অন্যের মৃত্যু, এবং ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ, এইগুলি অনেকের উন্নতির মূল। আবার ধূর্ত্ততা ও কৌশলে অনেকের উন্নতিলাভ হয়। হয়ত অনেকে দেশপ্রচলিত মত বিশেষের পোষকতা করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন, আবার কেহবা ক্ষমতাপন্ন সম্প্রদায় বিশেষের ছন্দানুবর্ত্তন করিয়া উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, প্রগাঢ় জ্ঞান অথবা প্রখর বুদ্ধি অপেক্ষা, দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া কার্য্য করিবার শক্তি সাংসারিক উন্নতির প্রবলতর কারণ। এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অন্যকে পরামর্শ দিতে পারেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনাদের কার্য্যকালে সম্পূর্ণ বিবেক-শূন্যতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অন্যকর্ত্তৃক চালিত হইলে তাঁহারা সংসারের অনেক উপকারে আসেন; কিন্তু অনন্যসহায় হইলে কর্ণবিহীন তরণীর ন্যায় সংসার সমুদ্রে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় পতিত হন। আবার কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত হীনবুদ্ধি হইলেও আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান লোক অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন; ঈশ্বর তাঁহাদিগকে কিরূপ

শক্তি দিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ তাহা ঠিক বুঝিয়া লইতে পারেন, এবং কখনও ক্ষমতার বহির্ভূত কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না; মনোযোগ সহকারে সফলতা লাভের উপায় চিন্তাকালে অন্যান্য প্রধান প্রধান বিষয়ে সফলতা লাভের উপায় অনুধ্যান বিষয়েও নিশ্চেষ্ট থাকেন না, অথচ এক বিষয়েই তাঁহাদের দৃঢ়তর লক্ষ্য থাকে। বিশেষতঃ দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া ইহাঁরা পরিশ্রমের হ্রাস বৃদ্ধি, কার্য্য নির্ব্বাচন এবং মতে অবলম্বন বা পরিবর্ত্তন করে, সুতরাং সৌভাগ্যলক্ষ্মী অচিরেই ইহাদের অঙ্কগতা হইয়া থাকেন।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ইহাঁরা বুদ্ধিসত্ত্বেও উদ্যমহীন, সুতরাং সংসারে উন্নতিলাভ করিতে পারেন না। ইহাঁরা মনে করেন, সংসার মধুক্রমে ইহাঁদের স্থান নাই; ইহাঁরা কল্পনা চক্ষে সংসার ক্ষেত্রের বিবিধ কার্য্য ও ব্যবসায় লোকপরিপূর্ণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাসঙ্কুল বলিয়া দেখিতে পান; সুতরাং মনে করেন, কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া উন্নতি লাভ করা তাঁহাদের অসাধ্য। যদিওবা ব্যবসায়বিশেষ তাঁহাদের নিকট অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তথাপি হয়ত কোন সুনিপুণ ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বেই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের আশানুরূপ ফললাভ ঘটিবে না, এই ভাবিয়া তাঁহারা কার্য্যে পরাঙ্মুখ হন। এইরূপ চিন্তা করিয়া উৎসাহশূন্য হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কর্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বহুজনাকীর্ণ মেলাস্থলে অনেকে সমবেত হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি কেহ সেই জনতার মধ্যে যাইতে পারিতেছে না? যে তথায় যাইবার ইচ্ছা করিতেছে, সে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছে। সেইরূপ সাংসারিক ব্যবসায় যতই দ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হউক না কেন, আগ্রহ ও চেষ্টা থাকিলে এবং গুণবত্তা প্রকাশ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। "পদং হি সর্ব্বত্র গুণৈর্নিধীয়তে" এই মহাবাক্যটী সকলেরই হৃদয়ে জাগরূক থাকা উচিত।

বন্ধুগণ! এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় সংসারে সফলতা লাভ বিষয়ে কখনই নিশ্চেষ্ট ও নিরুৎসাহ হইও না। উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে নিরন্তর চেষ্টা করিতে থাক, তোমার পরিশ্রম সফল হইবে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী" এই সুন্দর নীতিবাক্যটীর অনুসরণ করিতে থাক, যেরূপ কার্য্যে তোমার স্বাভাবিক আনুরক্তি আছে, সেইরূপ কার্য্য স্থির করিয়া তোমার যাবতীয় উৎসাহ সেই কার্য্যের প্রতি প্রয়োগ কর; সহিষ্ণুতা ও সতর্কতা সহকারে কঠিন পরিশ্রম করিতে থাক; সদা ন্যায়পর হও এবং সুযোগ অনুসন্ধান করিতে

থাক, তোমার অশাবরী আচিরেই ফলবতী হইবে, আর পূর্ব্বোক্তরূপ আচরণ করিয়াও দুর্ভাগ্যক্রমে যদিবা তোমাকে বিফল হইতে হয়, তাহা হইলে জীবনান্তকালেও যথাসাধ্য চেষ্টাজনিত সুপবিত্র আত্মপ্রসাদরূপ স্বর্গীয়সুখ উপভোগ করিতে পাইবে; তাহার অপেক্ষা যথার্থ সফলতা এবং পরিশ্রমের পুরস্কার আর কি হইতে পারে?

শ্রীসাতকড়ি গোস্বামী।

স্বদেশী আন্দোলনের ফল।

গতবৎসর ৭ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার টাউনহলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের মন্তব্য করা হয়। তৎপরে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সভা সমিতিতে বিদেশী দ্রব্য পরিবর্জ্জন প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে; অনেক হিন্দু দেব দেবীর সমক্ষে এবং মুসলমান মসজিদে প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্মতঃ সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই এক বৎসরের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের কিরূপ ফলাফল হইয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, বাঙ্গালা বিভাগ হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের উৎপত্তি; সুতরাং রাজপুরুষগণও এই আন্দোলনটীকে রাজদ্রোহিতামূলক বলিয়া ইহার প্রতিরোধের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন; বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে না পারে, সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট নানাপ্রকারের হুকুমজারি করিয়াছেন; পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ছাত্রকে পুলিষ নির্য্যাতন করিয়াছে ও অনেককে ফৌজদারী আদালতে দণ্ডিত হইতে হইয়াছে। রংপুর, ময়মনসিং, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের ভদ্র,সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত নেতাগণকে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছে। বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন বন্ধ করিবার জন্য রাজপুরুষগণ অবৈধ অত্যাচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। বাস্তবিক কয়েকমাস পূর্ব্ববঙ্গে যেন অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। কোথাও গুর্খাসৈন্যের উৎপীড়ন, কোথাও পিউনিটিভ পুলিষের যথেচ্ছাচার, আবার স্থানে স্থানে ডিটেক্‌টিভ পুলিষের অবৈধ অনুসন্ধান ও অপমানসূচক ব্যবহার। পশ্চিম বাঙ্গালার রাজপুরুষগণও সুযোগ ত্যাগ

করেন নাই। বর্দ্ধমান জেলার মানকর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার একজন মোদকের দোকান হইতে বিলাতী চিনি উঠাইয়া লওয়াইয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হন। মেদিনীপুর সহরে একটি চৌদ্দ পনর বৎসর বয়স্ক বালককে রাজদ্রোহী বলিয়া ফৌজদারী সোপরদ্দ করা হয়। এই সকল ঘটনা রাজপুরুষগণের মতিভ্রম ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। এই সকল অত্যাচার নিবন্ধন যে স্বদেশী আন্দোলন প্রবলতর হইয়াছে এবং রাজপুরুষগণের প্রতি সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে; তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ইংরাজ রাজপুরুষ ও ইংরাজ বণিকের প্রধান লক্ষ্য অর্থোপার্জ্জন। ইংরাজ রাজপুরুষগণ কয়েক বৎসর মাত্র এদেশে চাকরি করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বণিক কোম্পানীর অংশীদার; সুতরাং ইংরাজ ব্যবসাদার ও ইংরাজ রাজপুরুষ অভিন্নহৃদয়। রাজপুরুষগণ যখন দেখিলেন যে, স্বদেশী আন্দোলন কার্য্যে পরিণত হইলে ইংরাজবণিকের সর্ব্বনাশ হইবে, তখন তাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন এবং আইনকে পদদলিত করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করতঃ যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন।

রাজপুরুষগণের অত্যাচার স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে অমঙ্গলকর না হইয়া মঙ্গলকর হইয়াছে। সাধারণ লোকে বলে, ভগবান যা করেন ভালর জন্যই করেন। একথার সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। লর্ড কর্জ্জন বঙ্গবিভাগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে শত্রু মনে করি; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, তিনি আমাদের মিত্রের কাজ করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি বাঙ্গলা বিভাগ না করিয়া গেলে, আমাদের দেশের লোকের মনে স্বদেশী আন্দোলন আদৌ উত্থিত হইত না। দেশের শিল্প বাণিজ্য বিনষ্ট হইয়া যে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, বঙ্গবিভাগ না হইলে তাহা আমরা একবারও ভাবিতাম না। আমরা যে শিশুর ন্যায় সকল বিষয়ে পরের মুখ চাহিয়া আছি, তাহা আমরা এত দিনের পর বুঝিলাম। আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল; এখন দেখা যাউক এই একবৎসরের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের কিরূপ ফল হইয়াছে জানিতে হইলে, একবার কলিকাতা সহর পরিভ্রমণ করা আবশ্যক। এই সহরের স্থানে স্থানে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ের দোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক দোকানেই স্বদেশী বস্ত্রাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য পাওয়া যায় বোম্বাই, নাগপুর আহামদাবাদ, কাণপুর রাজ-

পুতানা প্রভৃতি স্থানের কাপড়ের কল হইতে প্রচুর পরিমাণে কাপড় প্রস্তুত হইয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আনীত হইতেছে; এই সকল কাপড় বেশ ব্যবহার্য্য; অল্পমূল্য কোট কামিজ প্রভৃতির উপযোগী নানাবিধ সুদৃশ্য ছিটের কাপড়ও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে; আবার আজকাল তাঁতের কাপড়েরও প্রচুর আমদানী দৃষ্ট হয়; মান্দ্রাজের ও বাঙ্গালার নানা স্থানে তাঁতের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে; এই সকল বস্ত্র বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা অধিক মূল্য নহে। দেশী কলের লংক্লথ ও জামার কাপড়, বিছানার চাদর ও অন্যান্য বস্ত্র বিলাতী লংক্লথ প্রভৃতি হইতে নিকৃষ্ট নহে। কলিকাতার বিডন উদ্যানে প্রত্যহ বৈকালে দেশী বস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে এবং সেই স্থানে ক্রেতাগণকে দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা আগ্রহের সহিত স্বদেশী দ্রব্য খরিদ করিয়া থাকে।

পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত, দেশী গামছা, রুমাল, তোয়ালে মশারির থান প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। স্বদেশী কাগজ, চিঠির কাগজ, খাম, কলম, কালি, পেন্‌সিল এবং যাবতীয় মনোহারী দ্রব্য—চিরুণী, কৌটা প্রভৃতিরও অভাব দেখা যায় না। আজকাল বিলাসীয় দ্রব্য—সাবান, সুগন্ধি প্রভৃতি কলিকাতা ও অন্যান্য প্রদেশে প্রস্তুত হইতেছে। কলিকাতায় সাবান ও দেশালাইএর কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঝিনুক, কড়ি, হাড় প্রভৃতি হইতে নানাবিধ বোতাম প্রস্তুত হইতেছে। বাস্তবিক, কলিকাতার সজ্জিত স্বদেশী দোকানগুলি দেখিলে স্বদেশ হিতৈষীকে পুলকিত হইতে হয়। এত অল্পদিনের মধ্যে যে স্বদেশী সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া আমাদের অভাব পূর্ণ হইবে, ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। স্বদেশী আন্দোলনে যে আশাতীত ফল ফলিয়াছে, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। বিলাতী বস্ত্রাদির আমদানী বন্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু এদেশীয় অনেক লোক সেই সকল দ্রব্যের ব্যবহার পরিত্যাগ করাতে তাহাদের বিক্রয় খুব কম হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, রালি ব্রাদার্স প্রভৃতি ইংরাজ কোম্পানীর বিশেষ লোকসান হইতেছে এবং অবিক্রীত বিলাতী কাপড় গুদামে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। বিলাতী কাপড়বিক্রেতা মাড়োয়ারি-গণও কারবার বন্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের-কল বাঙ্গালীদের সম্পত্তি হইল, ইহা আনন্দের বিষয় বটে, কিন্তু কাপড়ের কলের সংখ্যা যতই কম হয়, ততই

দেশের পক্ষে মঙ্গল। দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারই স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য, কলের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, কারণ তাহা হইলে দেশের তাঁতিদের দুরবস্থা ঘুচিবে না। আবার কলের মূল্যের জন্য প্রচুর টাকা বিদেশীয়দিগকে দিতে হইবে। আমরা কলের আবশ্যকতা প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কাপড়ের কলের পরিবর্ত্তে সূতার কল আবশ্যক।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান স্বদেশী আন্দোলনের ফল। এই বিদ্যালয় হইতে যে ভবিষ্যতে দেশের সমূহ মঙ্গল হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইংরাজ রাজপুরুষগণ আমাদের অবস্থা ও অভাব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এত দিন তাহাদের উপর আমাদের শিক্ষাভার ও বন্দোবস্ত অর্পিত থাকাতে শিক্ষাপ্রণালী দেশের উপযোগী হয় নাই। দেশের প্রধান প্রধান লোকের হস্তে শিক্ষার ভার ন্যস্ত থাকাই কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালের শিক্ষাপুস্তকের অনেকগুলির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তদ্বিষয়ে মনোযোগ দিতে সমর্থ হইবেন। এখন আর আমাদের বালক বালিকাগণের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষায় থাকিতে হইবে না। বর্ত্তমান ভারতে শিল্পশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা আমরা অন্যান্য দেশের সহিত শিল্প বাণিজ্যে প্রতিযোগী হইতে অসমর্থ হইব। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষার উপযুক্তরূপ বন্দোবস্ত হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

স্বদেশী আন্দোলন দেশের লোকের পক্ষে অন্যান্য প্রকারেও বিশেষ শুভকর হইয়াছে। সকলেরই মনে স্বদেশানুরাগ বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে, নতুবা আমাদের গত্যন্তর নাই, ইহা আমরা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি। আমাদের দোষে যে দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া আমরা স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। দারুণ স্বার্থপরতার স্থানে স্বার্থশূন্যতা আমাদের মন অধিকার করিয়াছে এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি ও সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়া একতা ও জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপনের সাহায্য করিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনে সমগ্র ভারতবাসীর সহানুভূতি আছে। কেবল অল্পসংখ্যক স্বার্থান্ধ কুলাঙ্গার এই আন্দোলনটীকে রাজদ্রোহমূলক মনে করিয়া রাজপুরুষদের ভয়ে নানারূপ বিভীষিকা দেখিতেছে ও এই স্বদেশ-হিতকর আন্দোলনে যোগপ্রদান না করিয়া ইহার

বিরুদ্ধাচরণ করিতে লজ্জাবোধ করিতেছে না। সেই সকল লোক যে, দেশের কণ্টক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, স্বদেশী আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। দেশজাত কাপড়, চিনি প্রভৃতির খুব কাটতি হইতেছে। তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কাঁসারি, চর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পিগণ অবলম্বন পাইয়া হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব কার্য্য চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং এই অল্প দিনের মধ্যে তাহাদের দুরবস্থার কথঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে। চাকরীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণও স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবসা করিতে আগ্রহসম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রবংশীয় যুবকগণ এখন আর ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হইতে লজ্জাবোধ করেন না। কলিকাতা প্রভৃতি সহরে এবং পল্লীগ্রামে স্বদেশী দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং স্থানে স্থানে নূতন নূতন স্বদেশী আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

ধর্ম্মঘট ও স্বদেশী।

আমাদের দেশে চারিদিকে আজকাল ধর্ম্মঘটের বিশেষ বাহুল্য হইতেছে। বরণ্ কোম্পানির আফিস হইতে সূত্রপাত হইয়া এই একবৎসরের মধ্যে মুদ্রা-বিভাগ, রেল বিভাগ, প্রভৃতি অল্প বেতন ভোগী কেরাণী-প্রধান স্থান সমূহে ধর্ম্মঘটের এত বাহুল্য কেন? ধর্ম্মভীরু, নির্ব্বিরোধী চাকরী-গত-প্রাণ বাঙ্গালীর হৃদয়ে এত সাহস কোথা হইতে আসিল? ইত্যাকার প্রশ্ন অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া, ইংলিসম্যান প্রভৃতি কতকগুলি অদূরদর্শী ইংরাজী সংবাদ পত্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া নানারূপ প্রলাপ বচনে তাহাদের বিকৃত মস্তিস্কের পরিচয় প্রদান করিতেছে; অল্পমতি, স্বার্থপর, হীনপ্রকৃতিক কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী, স্বদেশী আন্দোলন ইহার মূল কারণ, এবং এই আন্দোলনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণ প্রয়াসে, নিজ নিজ কূটমতি ও স্থূলবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু যাঁহারা দেশের আধুনিক অবস্থা সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, রত্নগর্ভা ভারতের ইদানীন্তন আর্থিক অবনতি যাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে এবং উগ্রস্বভাব মদমত্ত

কতিপয় উচ্চ কর্ম্মচারীর উৎপীড়ন ও যথেচ্ছাচার যাঁহাদের অবিদিত নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহার মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন।

পূর্ব্বে দেশের অবস্থা অনেক অংশে উন্নত ছিল, দ্রব্যাদির মূল্য অল্প ছিল এবং লোকের অভাবও এতাদৃশ প্রবল ছিল না—সেই জন্যই ১০৲।১২৲ টাকাতেই একটী ক্ষুদ্র সংসার সচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইত। এক্ষণে দিন দিন দ্রব্যাদি যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইতেছে, লোকের আনুসঙ্গিক অভাবও সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে যে পদগুলির বেতন ২০৲।২৫৲ টাকা ছিল, এক্ষণে তাহা ১০৲।১৫৲ টাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট দরিদ্রের সংখ্যাই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহারা মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য লালায়িত, এবং কিসে সেই অন্নের উপায় উদ্ভাবন করিয়া পরিবার-বর্গের ভরণপোষণে কৃতকার্য্য হইবে, সেই চিন্তাতেই সামান্য বেতনে কেরাণীগিরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ব্যবসা, বাণিজ্যে, এমন কি কৃষি, শিল্প প্রভৃতিতে যে পরিমাণে মূলধনের আবশ্যক, এই সম্প্রদায় লোকের সে সংস্থান নাই; সুতরাং চাকরী তাহাদের অপরিহার্য্য। কিন্তু চাকরী আজকাল যেমনই দুষ্প্রাপ্য, তাহার বেতনও তেমনই অত্যল্প; অধিকন্তু, কর্ত্তাদের জঘন্য অমানুষিক ব্যবহার। একদিকে পরিবারবর্গের ভরণপোষণে অপারগতা নিবন্ধন দারুণ মনোকষ্ট, অপরদিকে অনিয়মিত ও অত্যল্প আহার এবং অস্বাভাবিক পরিশ্রম-জনিত অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ; তাহার উপর, কর্ত্তৃপক্ষের সাহানুভূতি ও গুণগ্রাহিত্যের পরিবর্ত্তে যদি দুর্ব্যবহার ও অযথা উৎপীড়ন দ্বারা তাহাদের জীবন কণ্টকিত করা হয়, তাহা হইলে উভয়েরই পক্ষে পরিণাম যে ভয়াবহ হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? বাস্তবিক, আর্থিক অবনতি ও কর্ত্তৃপক্ষের অত্যাচার, হৃদয়শূন্যতা ও পক্ষপাতিত্বই ধর্ম্মঘটের প্রধান কারণ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ দেশীয় কর্ম্মচারীদের প্রতি যে প্রকার দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে এতদিন যে ধর্ম্মঘট হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা রেলওয়ের কেরাণীদের দুর্দশার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাহারা যে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে পদে অযোগ্য ফিরিঙ্গিকে ২০০৲ দুই শত টাকা বেতন দেওয়া হয়, সেই পদে একজন যোগ্য দেশীয় কর্ম্মচারীকে ৫০৲ টাকাও বেতন দেওয়া হয় না। যে পদে একজন ফিরিঙ্গি ষ্টেসন মাষ্টারকে ৩।৪ জন সহকারী দেওয়া হইয়া থাকে, সেই পদে দেশীয় ষ্টেসন

মাষ্টারের একজন কিংবা দুই জন সহকারী হইলেই যথেষ্ট মনে করা হয়। সময়ে সময়ে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে ফিরিঙ্গির অযথা কটূক্তিও সহ্য করিতে হয়। ছুটী সম্বন্ধেও দেশীয় কর্ম্মচারিগণকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, বিশেষ আবশ্যকতা দেখাইয়া আবেদন করিলেও ছুটী মঞ্জুর করা হয় না। দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে অতি জঘন্য বাসস্থান দেওয়া হয় এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে বিদায়ও পায় না; আবার রেলের ডাক্তারগণও তাহাদিগকে মনোযোগ পূর্ব্বক চিকিৎসা করেন না। সামান্য বেতনই তাহাদের একমাত্র জীবিকা; কিন্তু যখন তাহারা সেই একমাত্র জীবনধারণোপায় পরিত্যাগ করতঃ ধর্ম্মঘট করিতে ও চাকরী ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, তখন ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিলেই হয় যে, তাহাদের অভিযোগ কাল্পনিক নহে।

অতি অল্পদিন হইল, যখন আসেনসোলে রেলওয়ের ফিরিঙ্গি গার্ডগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, তখন রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণ, এমন কি বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পর্য্যন্ত, কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহাদের অধিকাংশ প্রার্থনা পূরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু দেশীয় কর্ম্মচারিগণের প্রকৃত অভিযোগে কর্ণপাতও করা হইল না। এ দেশীয়দের অর্থের দ্বারাই রেলওয়ে পরিচালিত হইতেছে ও রেল কোম্পানি বৎসর বৎসর বিপুল লাভ করিতেছে। এ দেশীয় কর্ম্মচারিগণ প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া এই অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিতেছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, রেলওয়ের কর্ত্তারা এতদূর মনুষ্যত্ব-বিহীন ও অকৃতজ্ঞ যে, তাঁহারা সেই দেশীয় কর্ম্মচারিগণের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না, এবং তাহাদের ন্যায়সঙ্গত ধর্ম্মঘট উপলক্ষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে অযথা গালি দিয়া আপনাদের জঘন্য বৃত্তির পরিচয় প্রদানে সঙ্কুচিত হন না।

ইংরাজের সহিত তুলনায় দেশীয়গণের অভাব অল্প সত্য; কিন্তু যখন চাকরী-দ্বারা সেই অভাবও অসম্পূর্ণ থাকে এবং ব্যক্তিগত মান, মর্য্যাদাও রক্ষিত হয় না, তখন তাহারা জীবন রক্ষা অপেক্ষা মৃত্যুই যে শ্রেয়ঃ মনে করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, ইহাই ধর্ম্মঘটের প্রকৃত তথ্য। যে সকল ইংরাজ স্বদেশী আন্দোলনকে ধর্ম্মঘটের কারণ মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। সরকারী ছাপাখানা ও বরণ কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ যে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, স্বদেশী আন্দোলন কি তাহারও মূলীভূত? রেলওয়ে গার্ডগণ স্বদেশী আন্দোলন দলভুক্ত নহে, তবে তাহারা ধর্ম্মঘট

করিয়াছিল কেন? বাস্তবিক, স্বদেশী আন্দোলনের সহিত রেলওয়ে ধর্ম্মঘটের কোনও সম্বন্ধ নাই। তবে স্বদেশী আন্দোলন ও ধর্ম্মঘট উভয়েরই কারণ এক এবং দেশের আধুনিক আর্থিক অবনতিই সেই কারণ।

সকল সভ্যদেশেই ধর্ম্মঘট হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেও মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মঘট উপস্থিত হয়, ও ব্যবসায়ীদের ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। ধনিগণ অধিক লাভের প্রত্যাশায় ব্যবসাতে টাকা ফেলেন এবং সেই ব্যবসা চালাইবার জন্য যে সকল লোকের আবশ্যক হয় তাহাদিগকে কিছু কিছু বেতন দিয়া থাকেন; সেই সকল কর্ম্মচারীকে যত অল্প বেতন দেওয়া যাইতে পারে, ধনীর লাভও সেই পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে, অধিক লাভ দেখিলে কর্ম্মচারিগণ বেতন বৃদ্ধির দাবী করে এবং তাহাদের সেই দাবী সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত হইলেও স্বার্থান্ধ ধনী তাহা গ্রাহ্য করিতে সম্মত হন না এবং সেই কারণে কর্ম্মচারিগণ ধর্ম্মঘট করিয়া মনিবকে আপনাদের বেতনবৃদ্ধি ও অন্যান্য সুবিধা করিতে বাধ্য করে। ধর্ম্মঘট যে স্বার্থপরতার প্রকোপ হ্রাস করে, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। জগতে স্বার্থপরতা একটী মহাপাপ; এই পাপ মনুষ্যকে নির্ম্মম, দাম্ভিক ও জ্ঞানশূন্য করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ধর্ম্মঘটে আমরা রেলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে এই মহাপাপে কলুষিত দেখিয়া বিস্মিত না হইলেও, আক্ষেপান্বিত হইয়াছি; তাঁহারা ধর্ম্মঘট হইবার পূর্ব্বে, কর্ম্মচারীদের কি কি অসুবিধা আছে, তাহা জানিবার ও প্রতীকার করিবার উদ্দেশ্যে আহ্বান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের সকল কথা না শুনিয়াই, যখন নির্ব্বোধের ন্যায় তাহাদের পদচ্যুত করিলেন, তখনই ধর্ম্মঘট অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সুতরাং রেলের অল্পবুদ্ধি কর্তৃপক্ষই এই ধর্ম্মঘটের জন্য দায়ী; স্বদেশী আন্দোলন ইহার জন্য দায়ী নহে।

আর যদি স্বদেশী আন্দোলনই ধর্ম্মঘটের জন্য দায়ী বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? স্বদেশী আন্দোলনকারিগণ তাহাতে দুঃখিত না হইয়া গৌরবান্বিত মনে করিবেন। স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ইংরাজের স্বদেশপ্রেম প্রবল, কিন্তু তাঁহার স্বার্থপরতা তদনুরূপ প্রবল বলিয়া, তিনি এ দেশীয়দিগের স্বদেশপ্রেমের উদ্রেক দেখিয়া, নিজের ক্ষতির আশঙ্কায় একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন এবং বাঙ্গালীকে শত্রুভাবে দেখিতেছেন। যদি রেলের অধ্যক্ষগণ ও তাহাদের পরামর্শদাতা ইংরাজগণ স্বার্থপরতার বেগ সম্বরণ করিয়া কথঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মঘটের নিবৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। ধর্ম্মঘটকারীদের মধ্যে কেহ কেহ

চাকরীতে পুনঃপ্রবেশ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশই এখনও পূর্ব্ববৎ দৃঢ়সংকল্প হইয়া আছেন।

রেলওয়ে ধর্ম্মঘটের জন্য সাধারণের বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে। যে যে ষ্টেশনে ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে, সেখানকার যাত্রিগণের নানাবিধ অসুবিধা; ফিরিঙ্গিরা অনেকেই অশিক্ষিত, উদ্ধতস্বভাব, দাম্ভিক ও বাঙ্গালীদ্বেষী। আবার, অনেক ফিরিঙ্গীর বাঙ্গালা ভাষা-জ্ঞান আদৌ নাই; "টিকিট দাও" বলিলে ফিরিঙ্গি মহাশয় খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন ও গালি বর্ষণ করিয়া তাড়াইয়া দেন—অনেক স্থলে এরূপও শুনিতে পাওয়া যায়। আবার, অনেক স্থলে সাহেবের পোষা কুকুরের ন্যায় পুলিস প্রহরী পশ্চাতে থাকাতে, ফিরিঙ্গিপুঙ্গব আরও তেজীয়ান হইয়াছেন।

রেল কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট যাহাতে অচিরে বিনষ্ট হয়, গবর্ণমেণ্টের ও রেলওয়ে বোর্ডের তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা দেখিয়া ব্যথিত হইলাম যে, মাননীয় ছোটলাট হেয়ার সাহেব এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কয়েক দিবস হইল, আমাদের দেশের নেতৃপ্রমুখ শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মান্যবর ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহোদয় ছোটলাটের নিকট গিয়াছিলেন এবং যাহাতে ধর্ম্মঘটকারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করেন, তদ্বিষয়ে উপায় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ছোটলাট বাহাদুর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কি ছোটলাটের কর্ত্তব্যজ্ঞান-হীনতার পরিচায়ক নহে? রেলওয়ের উপর গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে, ধর্ম্মঘটের নিমিত্ত সাধারণের সর্ব্ববিষয়ে অসুবিধা হইয়াছে; এবং সুদক্ষ লোক ও সুবন্দোবস্তের অভাবে গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষণ হইয়া অনেক জীবন নাশের সম্ভাবনা। ইহা গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ-যোগ্য গুরুতর বিষয় নহে?

ধর্ম্মঘট উপলক্ষে রেল কোম্পানির সুবিধার জন্য অনেক ষ্টেশনে পুলিশ কনষ্টেবল ও চৌকিদার প্রহরী নিয়োগ করা হইয়াছে। চৌকিদারগণ আপনাপন এলাকা ছাড়িয়া আসিয়া ষ্টেশনে রাত্রিদিন পাহারা দিতেছে, আর গ্রামবাসীরা তাহাদের বেতন যোগাইতেছে! পল্লীগ্রামবাসীদের ধন ও জীবন রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী বলিয়া, তাহাদের নিকট চৌকীদারী কর আদায় করা হইয়া থাকে। আজ একমাস কাল সেই সকল চৌকিদার রেলওয়ে কোম্পানীর

কার্য্যে নিযুক্ত। এই সময়ে পল্লীগ্রামে কোন অনর্থ ঘটিলে, কে শান্তি রক্ষা করিবে? ধর্ম্মঘটের জন্য যদি শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকে, তবে রেল কোম্পানির খরচে কেন স্পেশ্যাল পুলিশের বন্দোবস্ত না হইল? এই সকল অন্যায় আচরণ দেখিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, ইংরাজ বণিকদের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্টের অকার্য্য কিছুই নাই।

ধর্ম্মঘটকারীদিগের সকল প্রার্থনাই যে পূরণ করিতে হইবে, আমরা এমন কথা বলি না। এবং আমাদের বিশ্বাস, তাহারাও সেরূপ প্রত্যাশা করে না। আশার অর্দ্ধেক ফল ফলিলেও যে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মঘটে দেখা গিয়াছে যে, ধর্ম্মঘটকারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলে ও তাহাদের দুঃখ কতক পরিমাণে মোচন করিলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। এদেশীয়গণও বোধ হয় সেই রূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করে। কিন্তু সম্প্রতি ইংরাজদের মনে বাঙ্গালীদ্বেষ এত প্রবল হইয়াছে যে, তাঁহারা বাঙ্গালীদিগকে নির্য্যাতন করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছেন। ধর্ম্মঘট স্বাধীনতাসূচক বাঙ্গালীর মনে স্বাধীন প্রবৃত্তির বিকাশ দেখিয়া যে ইংরাজের বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা! যে ইংরাজ স্বাধীনতাকে বহুমূল্য জ্ঞান করেন ও যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ক্রীতদাসের ব্যবসা জগৎ হইতে উঠাইয়া দিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন; সেই ইংরাজবংশধরদিগের আচরণে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালীদ্বেষী, স্বার্থপর, নীচাশয় ইংরাজের সংখ্যা অধিক নহে। স্বদেশী আন্দোলন ও ধর্ম্মঘটের সহিত নিঃসন্দেহই অনেক উদারচেতা ইংরাজের আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

ফলতঃ এই ধর্ম্মঘটের সাফল্যের উপর বাঙ্গালী জাতির মান সম্ভ্রম অনেক পরিমাণে এবং দেশীয় রেল কর্ম্মচারিগণের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সম্ভ্রম সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, সুতরাং যাহাতে ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সে জন্য সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত। যে সকল সামান্য বেতনভোগী দরিদ্র কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়া বিপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সাহায্য করা নিতান্ত আবশ্যক। এবং "পোড়া পেটের দায়ে" যাহারা মনিবের পাদুকা লেহনে প্রবৃত্ত আছে, তাহাদিগকে নির্য্যাতিত না করিয়া শিশ চুমকুড়ি দিয়া ডাকিয়া ফিরাইবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ।

বঙ্গপ্রদেশে বাস্তবিকই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। বহু স্থান হইতে অন্নকষ্টের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহার প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, দেশে যে কি ভীষণ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। দেশের অনেকেই নিশ্চেষ্ট ও নিঃশঙ্ক। কলিকাতা প্রভৃতি কোন কোন স্থানে দুই একটী সভাসমিতি করিয়া চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা হইলেও অপর সকল স্থানে বিশেষ কোনরূপ আয়োজন হইতেছে না। এই সকল স্থানে যে পরিমাণে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে, তাহা নিতান্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক। ইহাতেই দেশের লোকের হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেশ সত্যই উৎসন্ন গিয়াছে; মানব নামে পরিচিতগণের অধিকাংশই পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের মনস্তুষ্টির জন্য যে কোন ব্যাপারে যে সময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইতে পারিত, দেশের লোকের অন্নকষ্টের নিদারুণ জ্বালা নিবারণের জন্য, দেশের লোকের জীবন রক্ষার জন্য, এ পর্য্যন্ত তাহার শতাংশের একাংশ পরিমাণ টাকাও সংগৃহীত হইল না; ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়!

দরিদ্রগণ অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, অন্নাভাবে পুত্র-কন্যাদির প্রাণসংহার করিতেছে; আর, তাহাদেরই স্বদেশবাসিগণ কোন্ প্রাণে আমোদ লইয়া ব্যস্ত আছে? কোন্ যুক্তিবশে বিলাসভোগে উন্মত্ত আছে? ইহারা কি তাহাদেরই স্বদেশী? ইহারই নাম কি স্বদেশী ভাব? ইহাই কি স্বদেশী আন্দোলনের ফল? তাহা হইলে এরূপ আন্দোলন উৎসন্ন যাউক, দেশ রসাতলে যাউক।

স্বদেশী আন্দোলনকারী নেতৃগণের জনকয়েক ভিন্ন আর সকলে কি নিদ্রিত? না, দুর্ভিক্ষ দমনের ভার গবর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত রাখিয়া নিশ্চিন্ত? কি লজ্জার কথা! ইহারই নাম কি আত্মপদে নির্ভর? পঙ্গুর পদ যে ইহাপেক্ষা সহস্রগুণে কার্য্যক্ষম। দেশের দারিদ্র্যনিবারণ-কল্পেই স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি; দেশের লোকের অন্নসংস্থানের পথ উন্মুক্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই নব স্বদেশানুরাগের উৎপত্তি; দেশবাসীর এই স্বদেশ প্রেমোন্মত্তাবস্থায় অন্নাভাবে একটী মানব জীবন বিনষ্ট হইলেও বাঙ্গালী জাতির কলঙ্কের

পরিসীমা থাকিবে না। এতদিন দেশবাসী নিদ্রিত ছিল, এক্ষণে জাগরিত হইয়াছে; জাগ্রতাবস্থায় চক্ষু নিমীলিত রাখা অপেক্ষা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকা শতগুণে বাঞ্ছনীয়।

দুর্ভিক্ষ প্রশমনের জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন; ইহাতে নেতার আবশ্যক নাই, বক্তৃতাশক্তির প্রয়োজন নাই, সামর্থ্য, অসামর্থ্যের কথা নাই; যাঁহার যতদূর শক্তি, তিনি সেইরূপ সাহায্য করিতে পারেন। ভিক্ষুকগণকে যেরূপ দৈনিক মুষ্টিভিক্ষা দিতে হয়, সেই পরিমাণ চাউলও প্রতিদিন সঞ্চিত রাখিয়া প্রতি সপ্তাহে তাহার মূল্য প্রেরণ করুন। ইহা "নামকা ওয়াস্তে" নহে, কিম্বা ভণ্ডামীর ভাণে নহে; ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, মনুষ্যের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। অবাধ বাণিজ্য নীতির দোহাই দিয়া, ভীষণ দুর্ভিক্ষের বৎসরেও গবর্ণমেণ্ট শস্যাদির রপ্তানী বন্ধ রাখেন না। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের অনেকেই "নেটিভ"দিগকে শৃগাল কুক্কুরাদির ন্যায় দেখিয়া থাকে। তাহাদের নিকট "নেটিভ" জীবনের মূল্য অতি যৎসামান্য, অথবা কিছুমাত্র মূল্যেরই উপযুক্ত নহে; সুতরাং এ অবস্থায় দেশবাসী দরিদ্র-গণকে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় মরিতে দিলে, আপনাদিগকেই এই পশুশ্রেণীর দলভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স (Bengal Chamber of Commerce) কর্ত্তৃক প্রেরিত দুর্ভিক্ষ সংবাদের উত্তরের শেষাংশে পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এই গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলনের নিতান্ত বিরোধী; সুতরাং এই নিদারুণ সময়েও স্বদেশীর বিরুদ্ধাচারের সুযোগ পরিত্যাগে বিরত হয়েন নাই। এই উত্তরাংশের প্রত্যেক অক্ষরে নীচাশয়তা, মূর্খতা ও হৃদয়হীনতা প্রকাশ পাই-তেছে। মনুষ্যজীবন রক্ষায় যথোপযুক্ত তৎপরতা দূরে থাক্, যাহাতে স্বদেশী আন্দোলন নির্ব্বাপিত হয়, ইহাই প্রধান লক্ষ্য। দেশী দ্রব্য ব্যবহারে যদি লোকের অধিক অর্থই ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে অর্থ দেশের লোকেরই হস্তে থাকিবে; তবে তাহারা অন্ন সংগ্রহের জন্য অপরের নিকট অর্থ ভিক্ষা করিবে কেন? দেশ তো অন্নের কাঙ্গাল নহে, অর্থেরই যে কাঙ্গাল। বঙ্গদেশে কি ধান্যের অভাব যে, লোক অর্থ দিয়াও ধান্য ক্রয় করিতে পারিতেছে না? তবে কোথা হইতে জাহাজ বোঝাই ধান্য বিদেশে প্রেরিত হইতেছে?

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যাহাদের অন্নকষ্ট উপস্থিত, তাহারা শিল্পী নহে বলিয়া, অপরের নিকট হইতে শিল্পজাত ক্রয় করিতে অর্থব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই অন্নক্লিষ্টগণ বিগত কয়েক মাসের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য মাত্রেই ক্রয় করিতে পারে নাই; বরং এতদিন তাহাদের ঘট বাটী প্রভৃতি তৈজসাদি বিক্রয় করিয়া কায়ক্লেশে দিন যাপন করিতেছিল, এক্ষণে তদভাবে নিরুপায় হইয়াছে। যদি দেশীয় শিল্পজাত ক্রয় করিবার জন্য সত্যই অধিক অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে, শিল্পিগণই এ সময়ে দরিদ্রগণকে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রতিপালন করিতে পারে। ইংলণ্ডের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে, কিন্তু এ দেশের শতকরা একজন লোকেরও অবলম্বনীয় শিল্প কোথায়? দেশীয় শিল্পের উন্নতি ভিন্ন আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষ দমনের আর অন্য পন্থা নাই; সেই জন্যই আমরা বিদেশী পণ্য বর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, বিবিধ লাঞ্ছনা প্রভৃতি স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হইয়াছি, দেশের লোকের মনেও এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু এক্ষণে এই অতিবুদ্ধিসম্পন্ন গবর্ণমেণ্ট তাহার নিরাকরণ প্রয়াসে এই অপরূপ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; ফুৎকার প্রদানে সে ভাব উড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ফলতঃ এই গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যে নিতান্ত অনুচিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বঙ্গের প্রতি স্থানে দুর্ভিক্ষ দমন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সরকারী বেসরকারী প্রত্যেক লোকেই এইরূপ সমিতিতে যোগদান করিতে পারেন; স্বদেশী সভায় যোগদান করিলে গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইবেন বলিয়া যাঁহারা ভীত হইয়া থাকেন, এরূপ সভায় তাঁহাদের সে আশঙ্কা নাই।

দেশী রং ও রং শিল্প।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের রং শিল্প বিখ্যাত। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বিবিধ রঙ্গিন বস্ত্রের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। রাজা, রাজমহিলা ও রাজপুরুগণ বিচিত্র মূল্যবান্ রঙ্গিন রেশমী ও কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন। বিবাহ প্রভৃতি উৎসবোপলক্ষে রং ও রঙ্গিন বস্ত্র ব্যবহারের পদ্ধতি ছিল। এখনও হিন্দু ও মুসলমানগণ পর্ব্বোপলক্ষে রং ব্যবহার করিয়া থাকে এবং রঙ্গিন বস্ত্রে বেশভূষা করে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই রং শিল্প কার্য্য সম্পাদিত হইত এবং শিল্পিগণ অবস্থাপন্ন ছিল। কিন্তু অন্যান্য শিল্পের ন্যায় রং শিল্পেরও অধঃপতন হইয়াছে এবং শিল্পিগণ দুরবস্থায় পড়িয়াছে। এখন ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে নানাপ্রকার রংএর আমদানী হওয়াতে দেশীয় রংএর আদর কমিয়া গিয়াছে এবং রং শিল্পজীবীর সংখ্যাও হ্রাস হইয়াছে। বাঙ্গালা ও বিহারে যখন রেশম শিল্পের অবস্থা উন্নত ছিল, তখন রং শিল্পেরও বিশেষ আদর ছিল। রেশমী সূত্র নানাবিধ রংএর দ্বারা রঞ্জিত করা হইত এবং রঙ্গিন সূত্রের বস্ত্রাদি বয়ন করা হইত। নানাপ্রকার রংএর ফুল, ফল, পত্র, পক্ষী প্রভৃতির চিত্র দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রাদি অতীব সুদৃশ্য মনোহর।

দেশী রংগুলি বৃক্ষ ও লতার বল্কল, ফল, মূল ও পত্র হইতে প্রস্তুত হয়; কোন কোন রং মৃত্তিকা ও ধাতু দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধিকাংশ দেশী রং স্থায়ী ও সুদৃশ্য। বিদেশী রং রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমুদ্ভূত এবং বাহ্য দৃশ্যে অনেক দেশী রং অপেক্ষা উজ্জ্বল হইলেও স্থায়ী হয় না। বিদেশী লাল রং, যাহাকে টর্কিরেড বলে, তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয়। মাজেণ্ট প্রভৃতি রং একবারে স্থায়ী হয় না। দারুহরিদ্রা, অপরাজিতা, বাবলা, বাকস, চাঁপা, ধাইফুল, গাব, গেঁদা, গুলার, হলুদ, হরিতকী, নীল, জবা, জাম, কমলা, কুসুমফুল, কাঁঠালছাল, খয়ের, কেশরাজ, দাড়িম্বফুল, লটকান, মঞ্জিষ্ঠা, পলাশ, রক্তচন্দন, শিমপাতা, লাক্ষা এইগুলি দেশী রংএর প্রধান উপাদান। এই সকলের যোগে নানাবিধ রং সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

রং শিল্পের অবনতি হইলেও এখন বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নানাস্থানে রং শিল্পী দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে

দেশী রং বিক্রীত হয় ও বস্ত্রাদিতে রং করিবার ও ছাপ দিবার কারুকর আছে; এই শিল্পীর সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার হইবে। বাকুড়া জেলার বাঁকুড়া সহরে ও বিষ্ণুপুর, সোনামুখী গ্রামের তন্তুবায়েরা রেশমী বস্ত্রে রং করিয়া থাকে। হুগলী জেলার লাহারিগণ লাক্ষার অলঙ্কার প্রস্তুত করে ও কার্পাস সূত্র ও রেশমী বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া থাকে। শ্রীরামপুরের রঙ্গিন রেশমী রুমাল বিখ্যাত; এই রুমাল রেঙ্গুণ, মান্দ্রাজ, বোম্বাই সহরে, এমন কি, বিলাতেও প্রেরিত হইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। মুরসিদাবাদ জেলার খাগড়া, বালুচর ও মিরজাপুর গ্রামের তন্তুবায়েরা রেশম সূত্রে রং করিয়া রঙ্গিন রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করে, এবং এই জেলার কয়েকজন মুসলমান লেপের কাপড়ে রং করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করে। রাজসাহী জেলার নানাস্থানে সূত্রধরেরা কাষ্ঠকে নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র রঞ্জিত করিয়া থাকে এবং এই জেলার মালাকার ও বৈরাগীগণ শোলায় রং করিয়া মনোরম ফুল ফলাদি নির্ম্মাণ করে। এই স্থানে বক্তব্য যে, বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই মালাকারগণ শোলায় রং দিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করে। শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসবে শোলানির্ম্মিত সুদৃশ্য ফুল পত্রাদির বিচিত্র শিল্প কার্য্য দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। হিন্দুর বিবাহে মূল্যবান্ বিচিত্র শোলানির্ম্মিত টোপর মালাকারের কারুকর্ম্মের পরিচায়ক।

রাজসাহী ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের রংপুর, বগুড়া, পাবনা, চট্টগাম জেলার স্থানে স্থানে রং শিল্পী বাস করে ও রেশম ও কার্পাস সূত্র রঞ্জিত করে। জলপাইগুড়ির অল্পসংখ্যক তাঁতি, মুসলমান ও মেচ এণ্ডিসূত্রে রং করে। পাহাড়ী ও ভুটিয়াগণ পশমে রং করিয়া বিচিত্র কম্বল প্রস্তুত করে এবং জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের মেলায় বিক্রয় করে।

বীরভূম সহরে কয়েকজন নরী জাতীয় লোক গালার ফল, ফুল, পক্ষী প্রভৃতি খেলনা নির্ম্মাণ করিয়া এরূপ সুন্দর রং দেয় যে, সেগুলিকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তাহারা গালা রং তৈয়ার করে। মানভূম জেলার প্রসিদ্ধ ঝালদাগ্রামে বাঁশের লাঠি ও গুপ্তীতেও গালার সুদৃশ্য লাল কাল প্রভৃতি রং করিয়া থাকে।

বিহার অঞ্চলের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ পাটনা, গয়া, চম্পারণ (মতিহারি) মজফরপুর ও ভগলপুর জেলায় রং শিল্পীর বাস আছে। তাহাদিগকে রংরেজ বলে। তাহারা সতরঞ্জী ও কাপড়ের সূত্র রঞ্জিত করে এবং পরিধান বস্ত্রও

রঞ্জিত করিয়া থাকে। এই সকল স্থানের তন্তুবায়েরা তসর প্রভৃতি রেশমী কাপড়েও রং দিয়া সুদৃশ্য করে।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, পঞ্জাব, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের স্থানে স্থানে রং শিল্পের এখনও প্রাদুর্ভাব আছে। বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থানীগণ বিশেষতঃ মুসলমানেরা রঙ্গিন বস্ত্র ব্যবহার করিতে ভালবাসে। বহুমূল্য বারাণসী কাপড়, বোম্বাই ও পার্শি সাড়ীকে নানাবিধ দেশী রং দিয়া সুদৃশ্য করা হয়। কাশ্মীর, অমৃতসর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে শাল, রুমাল, আলোয়ান প্রভৃতি পশমী বস্ত্রও দেশী রংএ রঞ্জিত করা হয়। এই সকল রং যেমন সুদৃশ্য, তেমনি স্থায়ী।

এ দেশের পটুয়ারা খেলনা ও দেব দেবীর মূর্ত্তিকে যে সকল রং দিয়া সজ্জিত করে সে সকলই দেশী রং। কাষ্ঠনির্ম্মিত ও মৃণ্ময় খেলানা ও মূর্ত্তি গুলি বিবিধ রংএ রঞ্জিত হইয়া দেশী রং শিল্পের উন্নতির পরিচয় দেয়। এ দেশের লোক সুন্দর সুন্দর দেশী রং পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় রং ব্যবহার করাতে দেশী রং শিল্পিগণ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক রং শিল্পী দেশী রংএর পরিবর্ত্তে বিদেশী রং ব্যবহার করিতেছে। বিদেশীয় রং শস্তা ও অনায়াসে প্রস্তুত হয়, সুতরাং ইহার ব্যবহার বর্দ্ধিত হইতেছে।

কিন্তু বিদেশী রংএর আমদানীতে দেশের টাকা বিদেশে যাইতেছে ও দেশী রং শিল্পিগণ দরিদ্র হইতেছে। প্রতি বৎসর ক্রোরাধিক টাকার বিদেশী রং এদেশে আমদানী হয়। ১৯০৪ – ৫ সালের বহির্বাণিজ্য তালিকা হইতে দৃষ্ট হয় যে, সে সালে এক কোটী আঠার লক্ষ টাকার রংএর দ্রব্য এ দেশে আনীত হইয়াছিল (স্বদেশী ২য় সংখ্যা দেখ)। চাখড়ি, সবেদা, সীসা প্রভৃতি অল্পমূল্য দ্রব্য বিদেশী রংএর উপাদান; এই সকল দ্রব্যই এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়, অথচ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে এইগুলি কলে গুঁড়া হইয়া আসিয়া এদেশে বিক্রীত হইতেছে ও দেশীয় রং শিল্পীদের অনিষ্ট করিতেছে। অট্টালিকার দরজা, জানালা প্রভৃতিতে রং দিবার জন্য বিলাতী রং বহুল পরিমাণে হইতেছে। যাহাতে এদেশে এই সকল রং প্রস্তুত হয়, অচিরে তাহার বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। আমরা এ বিষয়ে স্বদেশী আন্দোলনের নেতাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। দেশী রং কি প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, তাহা আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রকাশ করিব।

কাগজ মীনাহ করিবার প্রণালী।

নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায়ে কাগজ মীনাহ করিলে উহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না।

প্রথম ঃ—প্যারাফিন (Paraffin) একটী ধাতু কটাহে অগ্নি বা বাষ্প সাহায্যে গলাইতে হইবে। যখন উত্তমরূপে গলিয়া তরল হইবে, ততক্ষণ নাড়িতে হইবে তখন অগ্নি বা বাষ্প বন্ধ করিয়া উহাকে শীতল করিবে এবং যে পর্য্যন্ত না উহা পাত্রের গায়ে জমিয়া যাইতে আরম্ভ হয়। তাহার পর ৬ ভাগ শিলাতৈল (petroleum), ইথার (Ether) কিংবা বাইসলফাইড অফ কার্ব্বন (Bisulphide of carbon) মিলাইয়া নাড়িতে নাড়িতে উহা ক্রমে জমিয়া শক্ত হইয়া যাইবে।

২য় ঃ—Paraffin cake কাটিয়া খুব পাতলা ২ টুকরা করিয়া একটী পাত্রে এমন ভাবে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। ঐ প্যারাফিনের (Paraffin) ৫ গুণ আন্দাজ বাইসলফাইড অফ্ কার্ব্বন (bisulphide of carbon) ঐ পাত্রে ঢালিয়া ঃ দিবস আন্দাজ রাখিলেই উহা সম্পূর্ণ গলিয়া যাইবে। ইহাতে ঐ paraffin ও bisulphide of carbon সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া সাদা কর্দ্দমের মত হইয়া যাইবে।

১ম ও ২য় উপায়ে গলিত paraffin নিম্নলিখিত উপায়ে রংএর সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। ১১ হইতে ১৫ ভাগ শিরিস (glue or gelatine) প্রথমে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে; তাহার পর ১০০ ভাগ সাদা কাগজ এবং ইচ্ছামত রং একত্র করিয়া ঐ শিরিসের সঙ্গে মিলাইতে হইবে। পরে উহার সঙ্গে ১২ হইতে ১৭ ভাগ গলিত paraffin এবং ১২ ভাগ আন্দাজ মোম (wax) যাহা কাগজ মসৃণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, মিশ্রিত করিতে হইবে। যদি ঐরূপে রংএর মিশ্রিত পদার্থ অতিশয় ঘন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আবশ্যক মত ঈষদুষ্ণ জল মিলাইলেই উহা পাতলা এবং কার্য্যোপযোগী হইবে। লাগাইবার পূর্ব্বে উহাকে সূক্ষ্ম কেশনির্ম্মিত চালুনিতে ছাঁকিয়া লইলে ভাল হয়।

৩য় ঃ—না গলাইয়াও paraffin নিম্নলিখিত উপায়ে রংএর সহিত মিলাইতে পারা যায়,—প্রথমে paraff.ⁿ খুব পাতলা টুকরা করিয়া

রংএর সহিত মিশ্রিত করিতে হয় এবং ঐ মিশ্রিত পদার্থকে বিশেষরূপে নাড়িতে নাড়িতে ৪০ ডিগ্রি (সেণ্টি) পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিলেই ক্রমে উভয় পদার্থ সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া যাইবে।

প্রথম দুইটি প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম; কারণ, ৩য় প্রণালীতে paraffin মিশ্রণ সম্পূর্ণ না হইতে পারে।

উপরোক্ত উপায়ে মীনাহ করিলে কাগজ ধৌত করিতে পারা যায় এবং উহার বর্ণও উজ্জ্বল হয়। paraffinএর দ্বারা রংএর কোনও বিকৃতি হয় না। কিন্তু bisulphide of carbon এবং gelatine একত্র হইয়া অধিকক্ষণ থাকিলে যে sulphuretted hydrogen উৎপন্ন হয়, তাহাতে দোষ জন্মায়। সেইজন্যই রং ও ঐ পদার্থ একত্র করার পর যত শীঘ্র সম্ভব লাগাইয়া ফেলা উচিত; কারণ, কাগজের মধ্যে রং প্রবিষ্ট হইয়া একবার শুকাইয়া যাইলে আর কোনও দোষ ঘটিতে পারে না।

শ্রীকিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য।

কলার আঁশ।

আমাদের দেশের অনেক স্থানেই কলার আবাদ আছে; প্রধানতঃ ফল ও পাতার জন্যই এই সকল আবাদ। কিন্তু কলার আঁশও যে একটি মূল্যবান জিনিষ, তাহা অনেকেই জানেন না। কলার বাসনা (sheath) হইতে সহজ উপায়ে আঁশ বাহির করিতে পারিলে, ইহা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবসায় হইয়া উঠিতে পারে।

স্বদেশীর ষষ্ঠ সংখ্যায় কদলী প্রবন্ধে কলার আঁশ সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। কলাগাছের প্রায় প্রত্যেক অংশেই প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকে। উপরিভাগের বাসনাগুলির আঁশ মোটা ও দৃঢ় এবং ক্রমশঃ ভিতরের বাসনার আঁশ সূক্ষ্ম ও রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল। ঢাকা জেলায় তুলা ধুনিবার ধনুকের ছিলার জন্য কলার আঁশের দড়ি ব্যবহৃত হয়। কলার আঁশের অধিকাংশই সাধারণ দড়ির জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। ভারত-সাগরীয় দ্বীপের অধিবাসিগণ সাধারণ কলার আঁশের সূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করিত; মাদাগাস্কার দ্বীপনিবাসিগণও এইরূপ বস্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী জানে।

ভারতীয় কলাগাছ হইতেও যে প্রচুর পরিমাণে আঁশ পাওয়া যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একখানি প্রশস্ত প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠফলকের উপর কলার বাসনা রাখিয়া, শক্ত কাষ্ঠ দিয়া আঁচড়াইলে সহজেই ইহার আঁশ বাহির করা যাইতে পারে। লৌহ দিয়া আঁচড়াইলে আঁশের রং নষ্ট হইয়া যায়। মান্দ্রাজ শিল্প পত্রিকায় ('Madras Art Journal) ১০৮ ও ৩৭৬ পৃষ্ঠায় ডাক্তার হণ্টার সাহেব কলার আঁশ বাহির করিবার একরূপ প্রণালী লিখিয়াছেন। ইহা একটু ব্যয়সাধ্য হইলেও এই প্রণালীতে আঁশগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু লোহার আঁচড়া ব্যবহৃত হওয়ায় রং ময়লা হইতে পারে। লোহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠফলক ব্যবহারে সে ভয় থাকে না।

হণ্টার সাহেব বলেন—আঁশ বাহির করিতে হইলে, উপরের সঙ্কুচিত বাসনাগুলি পরিত্যাগ করিয়া, ভিতরের বাসনাগুলি লম্বালম্বি চিরিয়া লইতে হইবে। তাহার পর সেগুলি ছায়ায় রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার করিতে হইবে। একখানি কাষ্ঠ ফলকের উপর বাসনাগুলির ভিতরের পিট উপরের দিকে রাখিয়া, ভোঁতা লৌহফলক (Hoop Iron) দিয়া আঁচড়াইয়া শাঁস (pulp) বা কোমল অংশ উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। লৌহ ফলকটি একখানি কাষ্ঠের ফ্রেমের সহিত লম্বাভাগে আঁটিয়া লইলে ভাল হয়। কলাবাসনার ভিতরের পিঠেই অধিক শাঁস থাকে। এই পিঠ বেশ পরিষ্কার হইলে পর বাসনাগুলি উল্‌টাইয়া অপর পিঠ আঁচড়াইতে হইবে। অনেকগুলি আঁশ এইরূপে কতকটা পরিষ্কৃত হইলে পর, অবশিষ্ট যে শাঁস ইহাতে লাগিয়া থাকে, তাহা অধিকজলে খুব নাড়িয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। সোডাযুক্ত সাবানের জলে সিদ্ধ করিলে আঁশ শীঘ্র পরিষ্কার হইতে পারে; কিন্তু কলিচুণবিশিষ্ট সাবানের জলে সিদ্ধ করিলে আঁশ নষ্ট হইয়া যায়। আঁশগুলি বেশ ধৌত করা হইলে পর, হাওয়ায় রাখিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। রৌদ্রে শুকাইলে আঁশে একরূপ কটা রং হয়, তাহা সহজে উঠে না। শিশিরে রাখিলে এই রং কতকটা উঠিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে আঁশের জোর কমিয়া যায়।

জ্যামেকা প্রভৃতি দ্বীপে আখমাড়া কলের ন্যায় কলে পিশিয়া কিম্বা পচাইয়া কলার আঁশ বাহির করে। শেষোক্ত উপায় অনেকটা সহজসাধ্য; কেন না, আঁশ বাহির করিবার জন্য কলার বাসনাগুলি অন্যত্র বহিয়া লইয়া যাইতে হয় না; যেখানে গাছ কাটা হয়, সেইখানে গাছগুলি স্তূপীকৃত করিয়া

রাখা হয় ; এবং রৌদ্রের তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলার পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কয়েক মাস পরে গাছ পচিয়া গেলে সহজেই আশ পৃথক করা যায় ; কিন্তু ইহাতে আশ বিবর্ণ ও কম জোর হয়।

আমাদের দেশে ভোরে কলার মোচা ফেলিবার পর, কাঁচকলা পরিপুষ্ট হইবার পর, ও অপর কলা পাকিবার পর গাছ কাটা হয় ; কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপে ভাল আঁশ পাইবার জন্য কলা ফলিবার পূর্ব্বেই গাছ কাটিয়া থাকে।

আঁশ বাহির করিবার জন্য গাছগুলিকে জমি হইতে ছয় ইঞ্চি উপরে কাটিতে হয় ও গাছটীকে লম্বালম্বি চারিভাগে চিরিয়া থোড়টী পৃথক করিতে হয়। উপরের অপেক্ষাকৃত শক্ত বাসনা ও ভিতরের কোমল বাসনাগুলি পৃথক করিয়া রাখিলে, ভিন্ন ভিন্নরূপ আঁশ পাওয়া যাইতে পারে। পাতার ডাঁটাগুলি হইতে অধিক পরিমাণে আঁশ পাওয়া যায়। পাতা হইতেও আঁশ বাহির করা যাইতে পারে।

আঁশ বাহির করিবার যন্ত্র আখমাড়া কলের বা সূতার বীজপ্রভেদ করিবার থাউই যন্ত্রের ন্যায় দুইটী কাষ্ঠের রোলার মাত্র। রোলার তিন ফুট লম্বা ও এক ফুট ব্যাসের হইলে ভাল হয়।

প্রত্যেক গাছ হইতে প্রায় /২ দুই সের আঁশ পাওয়া যাইতে পারে। এই /২ সেরের মধ্যে পাতার ডাঁটাগুলিতেই প্রায় /॥০ আধসের আঁশ থাকে। ডাঁটা পৃথক পেষাই করা উচিত ; কেননা ডাঁটার আঁশ বাসনার আঁশ অপেক্ষা অধিক শক্ত।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অমৃতবাজার পত্রিকায় কলার আঁশ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নিম্নে এই প্রবন্ধের মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

"প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আমি আঁশ বাহির করিবার নানারূপ পরীক্ষা হইতে জানিতে পারিলাম যে, এদেশের সাধারণ কলাগাছের আঁশ হইতে ধনাগমের একটী নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই জন্য আমি কলার বাসনা হইতে কতক পরিমাণ আঁশ বাহির করিয়া লণ্ডনে নমুনা পাঠাইয়াছিলাম। আঁশের কার্য্যের একটী প্রধান দালাল সমিতি সেখান হইতে আমায় লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যেক টন ৩৫ হইতে ৪০ পাউণ্ড দরে চুক্তি করিতে পারেন।

কিরূপে আঁশ বাহির করিতে হয়, প্রতি বিঘা জমির কলাগাছ হইতে কত আঁশ পাওয়া যাইতে পারে, ইহার মূল্য ও আঁশ বাহির করিবার খরচ

প্রভৃতি বিষয় আমি বুঝাইয়া দিতেছি। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, কলার জন্য যে গাছ কাটা যায়, তাহার প্রত্যেক গাছ হইতে গড়ে তিন পোয়া পরিষ্কার, উজ্জ্বল, দীর্ঘ ও মূল্যবান আঁশ পাওয়া যায়। বাসনাগুলি সিকি ইঞ্চি আন্দাজ চওড়া করিয়া লম্বাভাগে চিরিবার জন্য, ছিন্ন আঁশগুলি একত্র করিবার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে আঁশগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিবার জন্য যদি একটী বালক সাহায্য করে, তাহা হইলে সপ্তাহ মাত্র শিক্ষা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে একজন যুবক প্রতিদিন ৮টী গাছের আঁশ ছাড়াইতে পারিবে। যুবকের দৈনিক ।০ চারি আনা ও বালকের ৴১০ দেড় আনা মজুরী ধরিলে ।৴১০ সাড়ে পাঁচআনা খরচে ৴৭ সাতসের (?) আঁশ পাওয়া যাইবে। পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হিসাবে ধরিলেও এবং আঁশ বাহির করিবার জন্য সুদক্ষ লোক নিযুক্ত করিলেও, ফলের জন্য যে সকল গাছ কাটা হয়, তাহা হইতে আঁশ বাহির করিতে প্রতি টনে ৫৫৲ টাকা খরচ পড়ে; ইহার উপর জাহাজভাড়া, দালালের কমিশন, বীমা খরচ, গাঁইট বাঁধা, গরুর গাড়ী খরচা প্রভৃতিতে টন প্রতি আরও ৪০৲ চল্লিশ টাকা খরচ ধরিলে, মোট ৯৫৲ টাকা অথবা মোটামুটি হিসাবে ১০০৲ টাকা খরচে এক টন আঁশ লণ্ডনে পৌঁছান যাইতে পারে। সেখানকার সর্ব্ব নিম্ন দর অর্থাৎ টন প্রতি ৩৫ পাউণ্ড হিসাবে ধরিলেও প্রত্যেক টনের দর ৩৫ × ১৬ = ৫৬০৲ টাকা হয় এবং ইহা হইতে ১০০৲ টাকা খরচা বাদ দিলে প্রত্যেক টনে ৪৬০৲ টাকা লাভ হয়।

বঙ্গদেশের এক বিঘা জমিতে প্রায় ৪০০ শত কলাগাছ জন্মে; সুতরাং এক বিঘা জমি হইতে ৯৴০ নয় মণ আঁশ পাওয়া যাইতে পারে; ইহাতে খরচ খরচা বাদে ১৫০৲ দেড়শত টাকা লাভ থাকে। এই দেড়শত টাকাই কলাচাষীর লাভ হইবে না; বিঘা প্রতি তাহার অন্ততঃ ২০৲ টাকা লাভ ধরা যাইতে পারে; কলা কাটিয়া লইলে যে গাছ জমীতে পড়িয়া থাকিয়া পচিয়া যাইত, তাহা হইতেই এই আয়; সুতরাং আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, ইহাতে কৃষকের ধনাগমের একটী নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইতেছে; এই অর্থে তাহারা আবাদ প্রভৃতির খরচ পোষাইয়া লইতে পারে। আঁশ বাহির করিবার কার্য্যের জন্য আর বিশেষ কোন খরচা লাগিবে না। এক বিঘা কলাগাছ হইতে যে ১৫০৲ টাকা আয়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইল, তাহা ফল ও পাতা হইতে আয় বাদে। গাছ প্রতি ৴০ আনা হিসাবে কিম্বা বিঘা প্রতি অন্ততঃ ২৫৲ টাকা আয় ধরিলে, দেড় বৎসরে কলাগাছের ফল পাওয়া যায় বলিয়া, এক বিঘা কলা

আবাদে বার্ষিক আয় $\frac{১৫০+১০০}{১\frac{১}{২}}$ = ১৬৬৲ টাকা (এক কাঁদি কলা ।৷০ আনা হইতে ৸০ আনার অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়)। ব্যবসার হিসাবে আরম্ভ করিতে গেলে, গাছ পুতিয়া ১৮ মাস অপেক্ষা না করিয়া, দেশের সর্ব্বত্র যে বিস্তর কলাগাছ আছে, সেই সকল গাছ হইতেই আপাততঃ কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। সেজন্য নানাস্থানের লোকদিগকে আঁশ বাহির করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতে হয়। যে সকল গাছের কলা কাটিয়া লওয়া হইবে, তাহারা তাহার বাসনা হইতে আঁশ বাহির করিয়া জম করিয়া রাখিতে পারে এবং প্রধান কার্য্যালয়ের দালালদিগকে বিক্রয় করিতে পারে। ইহাতেও কলা ও পাতা বাদে বিঘা প্রতি অন্ততঃ ২৫৲ টাকা মুনাফা থাকিতে পারে। এইরূপে যাঁহারই কলাগাছ আছে, তিনিই গাছ কাটিবার পর তাহা হইতে আঁশ বাহির করিতে উৎসুক হইতে পারেন, কলাগাছ হইতে আঁশ বাহির করিবার প্রণালী সহজ হইলেও, অনেকের পক্ষে নূতন; সুতরাং তাঁহাদিগকে ইহা শিক্ষা দিতে হইবে এবং আঁশ বাহির করিবার জন্য স্বল্প মূল্যের যন্ত্র সরবরাহ করিতে হইবে।"

উপরোক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবু আঁশ বাহির করিবার প্রণালীটি লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক কলাগাছের আঁশের পরিমাণ তিন পোয়া আন্দাজ স্থির করিয়াছেন। ডাক্তার হণ্টারও প্রায় এই পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন। সকল কলা গাছের আকার সমরূপ নহে; এবং ইহাঁরা বোধ হয় পাতার ডাঁটা ও উপরের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন; আঁচড়াইয়া আঁশ বাহির করিতে গেলে, আঁচড়ার সহিত যে ছিন্ন আঁশগুলি লাগিয়া যায়, সেগুলিও বোধ হয় পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে; কিন্তু সেগুলি কাগজ প্রস্তুতের জন্য ও গদির ভিতরে ছোবড়ার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, কলাপাতার ১/০ এক মণ ডাঁটা হইতে প্রায় /৬ সের আঁশ পাওয়া যায়। ডাঁটা ও উপরের বাসনার আঁশ মোটা; তাহার দর টনপ্রতি ৩৫ বা ৪০ পাউণ্ড হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভিতরের বাসনার সূক্ষ্ম আঁশ এক সময়ে আরও অধিক দরে বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনের বাজার দর পত্রিকায় (London Price Current) প্রকাশিত হয় যে, এইরূপ সূক্ষ্ম কলার আঁশ পাউণ্ড প্রতি ৬ হইতে ৮ পেন্স পর্য্যন্ত দরে বিক্রীত হইয়াছিল; ইহাতে টন প্রতি সে সময়ে ৫৬ হইতে ৭৫ পাউণ্ড দর উঠিয়াছিল।

সিঙ্গাপুরের একজন দেশীয় লোক সকল প্রকার আঁশ বাহির করিবার উপযোগী একরূপ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে কলাগাছের যে কোন অংশ হইতে সহজে আঁশ বাহির করা যায়। বিগত বর্ষের ৫ই জুন তারিখের "বাণিজ্য সংবাদ" (Commercial Intelligence) হইতে এই যন্ত্রের বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

এই যন্ত্রটী অতি উৎকৃষ্ট ও সরল। ইহার দুইটী অংশ। প্রথম অংশে ৮ হইতে ১২ ইঞ্চি ব্যাসের একটী চীনা লোহার (cast iron) রোলার থাকে ; এই রোলারের উপর সমান ব্যবধানে প্রায় ২ ইঞ্চি উচ্চ পিতলের বেড় সকল (Flanges) খাড়া ভাবে (at right angles) বসান থাকে। এই সমস্ত যন্ত্রটী একটী লৌহ আবরণের (Hood) ভিতর আবদ্ধ। ইহার পশ্চাতে পাতা বা বাসনা প্রবিষ্ট করাইবার জন্য একটু ফাঁক এবং শাঁস বা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ ও জল নির্গত করাইবার জন্য সম্মুখে একটু ফাঁক থাকে। বাষ্পীয় বা তৈল এঞ্জিন দ্বারা এই যন্ত্র চালিত হয়। এঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে, রোলারটী জোরে ঘুরিতে থাকে ও সেই সময়ে যন্ত্রের ভিতর বাষ্প (Steam) ও জল পশ্চাৎ দিক হইতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়। পাতা বা বাসনা ভিতরে আসিলেই রোলারের বেড়ে উহা লাগিয়া যায় এবং নিম্নস্থ একখানি লোহার প্লেটে ঘর্ষিত হওয়ায় শাঁস আঁচড়াইয়া তুলিয়া দেয়। জল ও ষ্টীমে এই শাঁস ধুইয়া লইয়া যায়। এ সময়ে পাতা বা বাসনাটী এক জন কুলি জোর করিয়া ধরিয়া রাখে। কয়েক সেকেণ্ডে উহার অর্দ্ধেক অংশ এইরূপে ঘর্ষিত হইলে উহা টানিয়া বাহির করিয়া অপরার্দ্ধ প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়। ইহাতে খুব মোটা মুর্গা (Aloe) পাতারও আঁশ বাহির করা যায়। ইহার একটী ছোট যন্ত্রে একজন কুলি দিন দুই হন্দর (২৸০ মণ) আঁশ বাহির করিতে পারে। এই যন্ত্র বড় আকারেরও হয় ও তাহাতে এক সঙ্গে অনেক কুলি কাজ করিতে পারে। ইহা হইতে নিষ্কৃত হইলে আঁশ ভিজা থাকে ; সেজন্য আঁশগুলিকে রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হয়। পরদিন এই শুষ্ক আঁশগুলিকে দ্বিতীয় যন্ত্রে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। এই যন্ত্রটীর রোলার ও বেড় (flanges) কাষ্ঠনির্ম্মিত। এই দ্বিতীয় যন্ত্র ব্রসের (brush) ন্যায় কার্য্য করে এবং আঁশগুলি পরিষ্কার ও কার্য্যোপযোগী করিয়া দেয়।

ঝিনুক।

আমাদের দেশের খানা, ডোবা, বিল, পুষ্করিণীতে 'বেঁশো ঝিনুক' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পাড়াগাঁয়ে ইহার মূল্য নাই বলিলেই চলে। অথচ এইগুলি সুসংস্কৃত করিয়া লইলে, ইহাদের দ্বারা নানাপ্রকার কারুকার্য্য করা যায়। আগ্রায় দেখিয়াছি, এই শ্রেণীরই একপ্রকার বড় ঝিনুক—বোধ হয় সমুদ্রের ঝিনুক হইবে—কাটিয়া, চাঁচিয়া ছুলিয়া পাৎলা করিয়া,তাহার তলদেশে নানাপ্রকার রঙ সংযুক্ত করিয়া, কোনও গুলির বা উপরিভাগ মুক্তাশুক্তির ন্যায় রঞ্জিত করিয়া, তদ্দ্বারা শ্বেত প্রস্তরের তৈজসাদির উপর বিচিত্র ফুল, লতা, পাতা, পাখী প্রভৃতি চিত্রিত করে। আমাদের বিশ্বাস, দেশীয় বেঁশো ঝিনুক, প্রক্রিয়া বিশেষে সুরঞ্জিত করিয়া লইলে, এ গুলিও নানাবিধ শিল্পকার্য্যে, ও সৌখিন দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে প্রযুক্ত হইতে পারে। আবলুশ প্রভৃতি কাষ্ঠের উপর খোদাই করিয়া সুরঞ্জিত বিচিত্র বর্ণের লতাপাতা প্রভৃতির চিত্র সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলে অতি সুদৃশ্য হয়। জাপানী বাক্স, ব্র্যাকেট প্রভৃতিতে এই প্রকার চিত্রবৈচিত্র্য বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন ছোটখাট নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করণার্থ ও ছুরি প্রভৃতির বাঁট করিতেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ঝিনুকগুলিকে শিল্পকার্য্যার্থ ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য তৎসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রক্রিয়া নিম্নে প্রকটিত হইল ঃ—

ঝিনুকাদি রঞ্জিত করিবার প্রক্রিয়া। সামান্য ল্যাকৃডাই (লাক্ষাখণ্ড) জলে সুসিদ্ধ করিয়া থিতাইতে দাও। পরে উহাতে জল মিশ্রিত টিন্ ক্লোরাইড্ যোগ কর। ঝিনুকাদি সুপরিষ্কৃত করিয়া ইহাতে ডুবাইয়া রাখ। ইচ্ছানুরূপ রঙ্ হইলে তুলিয়া লও।

ঝিনুকাদি স্বর্ণ ও রৌপ্যবর্ণে রঞ্জিত করা। স্বর্ণ বা রৌপ্যের তবক গঁদের জল দিয়া মাড়িয়া আবশ্যকমত ঘন করিয়া লও। ঝিনুকের পাৎলা ফলকের পৃষ্ঠে এই মণ্ড পাৎলা করিয়া মাখাইয়া দিলেই হইল।

ঝিনুকাদির বোতাম প্রভৃতি রঞ্জিত করা। সামান্য উত্তপ্ত (ক্ষার) পটাশের জলে প্রথমে সেগুলি ধুইয়া লও। পরে ইচ্ছামত যে কোন উদ্ভিজ্জ রঙ্ গাঢ় করিয়া জলে গুলিয়া তাহাতে ১৫ দিবসকাল দ্রব্যগুলি ডুবাইয়া একটি গরম স্থানে রাখিয়া দাও।

ঝিনুকের কাজ। দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণার্থ বিলাতে দুই প্রকার ঝিনুক ব্যবহৃত হয়। এক প্রকার সাতিশয় কঠিন (Porcelainous) এবং উপযুক্ত যন্ত্রবিশেষের দ্বারা কর্ত্তিত ও গঠিত হয়, অন্য গুলি শুক্তি জাতীয় (Nacreons) এবং সহজে ছেদিত ও গঠিত হইয়া থাকে। প্রথমে সাধারণ চাকীযন্ত্র দ্বারা গঠিত করিয়া কুঁদ বা ভ্রামী যন্ত্রের সাহায্যে কুঁদিয়া সূক্ষ্ম ঝামা (পিউমিস্ ষ্টোন্) ও জল দ্বারা ঘষিয়া মসৃণ করিবে। পরে সামান্য জল মিশ্রিত সাল-ফিউরিক্ য়্যাসিডে পচা পাথরচূর্ণ আর্দ্র করিয়া পশমী বস্ত্র সাহায্যে ঘষিয়া পালিশ করিবে। প্রথমোক্ত জাতীয় ঝিনুক মণিকারের চক্রযন্ত্রাদির সাহায্যে দ্রব্যবিশেষে পরিণত করিতে হয়; উহা স্বতঃই মসৃণ, সুতরাং কোন ঘর্ষণের প্রয়োজন হয় না। পালিশ করিবার জন্য ফেল্টহুইল এবং টিন্‌পর্ অক্সাইড ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঝিনুকগুলির মধ্যে যে গুলি নিতান্ত সমতল, সে গুলি কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ডের উপর জল দিয়া ঘষিয়া সমান করিয়া লইয়া, অথবা উহা দ্বারা ঘষিয়া লইয়া ঈপ্সিত দ্রব্যটির মোটামুটি আকৃতি গঠিয়া লইয়া, পরে আবশ্যকমত কুঁদযন্ত্রের সাহায্যে প্রকৃত দ্রব্যটি প্রস্তুত করিলে ভাল হয়। তৎপরে ফেল্ট্ চর্ম্মবিশিষ্ট চক্রযন্ত্রোপরি জল মিশ্রিত ঝামা চূর্ণ দিয়া অথবা হাতপালিশ দ্বারা ঘষিয়া ঠিক করিয়া লইয়া শেষে রটন্ ষ্টোন্ চূর্ণ দ্বারা ঘষিয়া পালিশ সমাপ্ত করিতে হয়।

কৃত্রিম ঝিনুক। শৃঙ্গাদি দ্বারা ছোট ছোট দ্রব্য গড়িয়া, প্রথমে ঐগুলি সুগার অব্ লেড্ (সীস্ শর্করা) মিশ্রিত জলে ফুটাইয়া পরে জল মিশ্রিত হাইড্রো ক্লোরিক্ য়্যাসিডে ফেলিবে।

স্বদেশ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট ফুলার সাহেব পদত্যাগ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন; লর্ড কর্জ্জনও বিড়ম্বিত হইয়া পদত্যাগে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। দাম্ভিকগণের এইরূপ পরিণামই স্বাভাবিক। এখন আর তাঁহাদের সে বিপুল কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিতে পারে না। ক্ষমতাসত্ত্বে জগতের হিতসাধনে বিরত ছিলেন বলিয়া, এখন কি ইহাঁদের অনুতাপ উপস্থিত হইবে না? ইহাঁদের কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের অনিষ্ট সাধিত হইলেও, ভগবান সেই অনিষ্টের মধ্য

হইতে এ দেশের মঙ্গলোপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন। ফুলার সাহেবের বিরহে ঢাকার নবাব নাকি নিদারুণ সন্তপ্ত হইয়া দিবানিশি অশ্রু পরিত্যাগ করিতে-ছেন। শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেব এই সন্তপ্ত নবাবকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারিবেন কি? তাহা না হইলে, নবাব সাহেবও হয় ত বর্দ্ধমান মহারাজের পন্থানুসরণ করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রীরামপুরে যে বয়ন বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ছিল, তাহা শ্রীরামপুরে না হইয়া চুঁচুড়ার ব্যারাকে স্থাপিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে; কিন্তু এ সঙ্কল্প কতদিনে কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের অন্নক্লিষ্ট লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতের সকল প্রদেশের লোকই যত্নবান হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশেও এই উদ্দেশ্যে সভাসমিতি হইতেছে। ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার লিখিয়াছেন যে, ফরিদপুর জেলায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রার্থনা করি, অপর সকল স্থানের দুর্ভিক্ষও সত্বর তিরোহিত হউক। এখন হইতে লোকে সাবেক ধরণে কিছু কিছু ধান্য গোলাজাত করিয়া রাখিবার অভ্যাস শিক্ষা করিতেছে দেখিলে, এ দুর্ভিক্ষেও আমরা লাভবান হইয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি। দেশের বর্দ্ধিষ্ঠ সম্প্রদায় এখনও কি এদেশে ধর্ম্মগোলার নিতান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই? ধর্ম্মগোলা স্থাপনে মূলধনের প্রয়োজন নাই। সততা, উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগই ইহার প্রকৃত মূলধন। উপস্থিত দুর্ভিক্ষে অনেকে এই সকল সদ্‌গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন; সর্ব্বত্র ধর্ম্মগোলা প্রতিষ্ঠিত হইলে দুর্ভিক্ষের উপস্থিতিরও আশঙ্কা থাকিবে না।

বিগত ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে শ্রীরামপুরের কাপড়ের কলটি "বঙ্গলক্ষ্মী" কটন মিল" নাম ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গালীর সম্পত্তি হইয়াছে। প্রথমে বাঙ্গালী কোম্পানি কর্ত্তৃক এই কল স্থাপিত হয়; এই কয়েক বৎসরে কয়েক হাত ফিরিবার পর দেশের নেতৃগণ ইহা ক্রয় করিলেন। আমরা সর্ব্বান্তঃ-করণে এই কলের উন্নতি কামনা করি; ইহার চরকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে বিশেষ মনোযোগী না হইয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই আপাততঃ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এক্ষণে সূতরাই যে বিশেষ অভাব, ইহা যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন। আমরা আশা করি, এক্ষণে স্বদেশী কাপড়ের অধিক কাটতিতে বিশেষ লাভবান হইয়া, লভ্য অর্থের অধিকাংশই চরকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে নিয়োজিত হইবে।

বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের পাদরী সাহেবগণ বিলাতী লবণ ও কাপড়ের আড়ত করিয়া বাজার দর অপেক্ষা শস্তা দরে বিক্রয়ের আয়োজন করিতেছে। ধর্মধ্বজিগণের মহিমা অপার; ইহাদের এরূপ আচরণ নূতন নহে, সুতরাং বিস্ময়ের কোন কথাই নাই। আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মৌলবী মহোদয়গণ স্বধর্ম্মিগণকে বিলাতী ব্যবহারে বিরত রাখিবার জন্য সচেষ্ট থাকুন; খ্রীষ্টান পাদরী মাটীর দরে বিলাতী পণ্য বিক্রয় করিতে চাহিলেও যেন তাহা অবিক্রীত থাকে।

বিগত ১৫ই শ্রাবণ ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে একটী জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; ইহাতে নানাবিধ শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প হইতেছে জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। মফঃস্বলের এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা যত অধিক হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ৭ই আগষ্ট দেশের নানাস্থানে স্বদেশী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল সভায় বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্বার গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর এইরূপ সভার অধিবেশন ও এই প্রতিজ্ঞার স্মরণ নিতান্ত আবশ্যক। বহুদিনের বিজিত জাতি দুর্ব্বলহৃদয় ও ক্ষীণমস্তিষ্ক হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত পুষা কৃষিকলেজের সহিত একটী উদ্যান স্থাপনেরও সঙ্কল্প হইয়াছে। আঁশ বাহির করিবার উপযোগী বিবিধ উদ্ভিদ এই উদ্যানে রক্ষিত হইবে ও এই সকল বৃক্ষাদি হইতে আঁশ বাহির করিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বিগত বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্ট মেদিনীপুর কেনালের জলকরের হার বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়ায় প্রজাগণের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। অনেকে বর্দ্ধিত হারে কবুলিয়ত দিতে অস্বীকৃত হইতেছে। অল্প পরিমাণ জল দিয়া অধিক কর আদায় করিবার অভিপ্রায় হইতেই এই করবৃদ্ধির সঙ্কল্প। আশা করি খ্যাতনামা সহযোগিগণ এ বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিয়া প্রজাগণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।

শান্তিপুর দেশীয় ভাণ্ডার সমিতি শান্তিপুরে একটী বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। শান্তিপুরের বস্ত্রশিল্প বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ; এখানে এরূপ একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় আমরা আহ্লাদিত হইলাম। এই বিদ্যালয়ে সাধারণ ও ফ্লাইসাটল উভয় তাঁতের কার্য্যই শিক্ষা দেওয়া হইবে।

এ বৎসর বঙ্গদেশের ৩১,৩৬২ একার (প্রায় এক লক্ষ তের হাজার বিঘা) জমীতে তুলার চাষ হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর তুলাচাষের জমীর পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার বিঘা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

বরোদার মহারাজা স্বীয় রাজ্যমধ্যে রেশম শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন; সেজন্য তিনি শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়কে বরোদায় লইয়া গিয়াছিলেন। নৃত্যগোপাল বাবু সেখানকার জলবায়ু ও রেশম শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বরোদারাজ্যের দক্ষিণাংশের জলবায়ু রেশম শিল্পের ও রেশম গুটি চাষের বেশ উপযোগী।

কলিকাতা ৭৫ নং লোয়ার সাকুর্লার রোডের শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মজুমদার সাধারণ মাটীর বাসনে এনামেল দিয়া জলাভেদ্য করিবার একটি প্রণালী আবিষ্কার করিয়া তাহার পেটেণ্ট লইয়াছেন।

ভারতের বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষা বিবর্দ্ধনী সমিতির (Association for the Advancement of scientific and Industrial education of Indians) কেন্দ্র সভার (central council) অভিমতানুসারে দুই লক্ষ টাকা মূলধনে একটী কোম্পানি স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। দিয়াশলাই, পেন্‌সিল, বোতাম, কাচের দ্রব্য, রং ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা হইবে। ইহার কোন শিল্পেই এক লক্ষ টাকার অধিক মূলধন লাগিবে না বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে; কোন কোনটী ১৫.২০ হাজার টাকা মূল ধনেই আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই কোম্পানি বেশ সতর্কতার সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে অভিলাষ করিয়াছেন। প্রথমে ২।৩টীর অধিক শিল্প গৃহীত হইবে না। এতগুলি কার্য্যের প্রত্যেকটীতেই যে লোকসান হইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মোটের উপর কোম্পানীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। আমরা এইরূপ শিল্পের উন্নতি কায়মনে প্রার্থনা করি।

স্বদেশী।

প্রথম খণ্ড।]   ভাদ্র, ১৩১৩।   [একাদশ সংখ্যা।

বন্দে মাতরম্।

ধর্ম্ম ও স্বদেশানুরাগ।

লক্ষ্য এক না হইলে সমাজ বা দেশ হিতকর কোন কার্য্যেই সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর নহে। যে সকল কার্য্যে অনেকের সহায়তা ও সহানুভূতির আবশ্যক, সেই সকল কার্য্যের তাৎপর্য্য ও তজ্জনিত সুফল তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আজ কাল অনেকে ধর্ম্ম ও জাতীয়তার সম্বন্ধ বিষয়ে কূটতর্ক উত্থাপন করিয়া স্বদেশানুরাগ পরিবর্দ্ধনের বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন। শিবাজী উৎসব জনিত অবশ্যম্ভাবী সুফল ধর্ম্মধ্বজিদিগের কূট মীমাংসার স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ত্রিশকোটী ভারতবাসীর একতা কতদূর সম্ভবপর—এই চিন্তাও অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রথম হইতে ভগ্নোৎসাহ হইলে কোনও কার্য্যে সফলতা লাভ করা যে দুঃসাধ্য, ইহা তাঁহাদের বিবেচনার বিষয়।

দেশের ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়, যাঁহারা ভগবৎকৃপায় অর্থ ও বিদ্যা উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়া উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন, এবং সকলে স্বতঃই যাঁহাদিগকে সমাজের এবং দেশের নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে—

যাঁহাদিগের সহানুভূতি ব্যতীত দরিদ্র সম্প্রদায়ের উন্নতির অন্যতর উপায় নাই, রাজা হৃদয়হীন হইলেও যাঁহাদের সহযোগিতায় সুফল অবশ্যম্ভাবী—দেশের এই নিদারুণ দুরবস্থার সময় তাঁহাদের মতের বিভিন্নতা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। জাতীয় জীবন গঠনের জন্য বিবিধ উপাদানের আবশ্যক সত্য, কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে দরিদ্র সম্প্রদায়ের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় উদ্ভাবন না করিয়া, একেবারে কবি-কল্পনার উপযোগী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর (ideal) জাতীয়তা গঠন করিবার প্রয়াস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অতএব এক্ষণে কাল্পনিক জাতীয়তা (nationality) কথাটী ভুলিয়া ও তাহার প্রথম সোপান, দেশের আর্থিক উন্নতি, অর্থাৎ দেশীয় শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির পুনরভ্যুত্থান বিষয়ে কৃতসংকল্প হওয়া একান্ত আবশ্যক। ক্রমশঃ অন্যান্য উপাদানগুলির বিষয়ে যত্নশীল হওয়া যাইতে পারে। অগ্রে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্বদেশবাসীর উদ্ধারের উপায় না করিয়া গুরুতর বিষয়ের আলোচনা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে, প্রকৃত কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। অগ্রে ক্ষুন্নিবৃত্তি না করিয়া, অনশনক্লিষ্ট অবয়বের বলবৃদ্ধির উপায় না করিয়া, মস্তিষ্ক স্থিরীকরণের ব্যবস্থা না করিয়া, মনুষ্য দ্বারা কোনও কার্য্যের আশা বাতুলতা মাত্র। অতএব স্বদেশবাসী ত্রিশকোটী লোকের আহার সংস্থান চেষ্টাই ধর্ম্ম ও লক্ষ্য, এবং এই লক্ষ্যই সকলের কেন্দ্রস্থল হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি পরিবার-বর্গের ভরণ-পোষণ, তাহাদের সুখ শান্তির উপায় উদ্ভাবন চেষ্টা আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ হয়, তবে ভারতবাসী ত্রিশকোটী পরিবারের মঙ্গলসাধনও ধর্ম্ম হইতে পারে না কেন? আমাদের ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে কেহ অনশনে থাকিলে যখন সকলেই অনুতাপিত হয়, তখন এই সুবৃহৎ পরিবারের মধ্যে শতকরা ৯০ জনকে অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট দেখিয়াও কি আমাদের প্রাণে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিতে পারে না! আর সেই আঘাতে ব্যথিত প্রাণ হইয়া আমরা ত্রিশকোটী ভারতবাসী দেশের মঙ্গল সাধনে বদ্ধ পরিকর হইতে পারি না! এই ভারতে শতকরা ৯৯ জন দরিদ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং ইহাদের উপর দেশের আশা, ভরসা সকলই নির্ভর করে; অতএব যদি দেশের উদ্ধার সংকল্পে কোন অনুষ্ঠানে প্রয়াস পাইতে হয়, তবে অগ্রে ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় উদ্ভাবনই প্রধান কার্য্য, এবং সেই সংকল্পেই এই স্বদেশী আন্দোলনের অভ্যুত্থান হইয়াছে। অগ্রে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া অপরাপর গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করা ন্যায় সঙ্গত। লক্ষ্য এক না হইলে জাতীয়তা বন্ধন দুরূহ। এই ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। অন্নের জন্য

দেশময় হাহাকার পড়িতেছে। পূর্ব্বে যে সংসার ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক ১০৲। ২০৲ টাকা হইলেই যথেষ্ট হইত, এক্ষণে সেই স্থলে ১০০৲। ২০০৲ টাকাতেও কুলান হইতেছে না!—পৃথিবীর মধ্যে ভারত হীনতম!—এই মর্ম্মভেদী জ্বলন্ত চিত্র সম্মুখে রাখিয়া সকলের সমভাবে প্রতিকার চেষ্টায় দৃঢ় সংকল্প হওয়া আবশ্যক। আমাদের মোহনিদ্রা এখনও সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গে নাই। সকলের প্রাণে দেশের আধুনিক দৈন্যদশার চিত্র এখনও সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় নাই, তাহাই যদি হইত, সকলেই যদি দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইত, তাহা হইলে তুচ্ছ স্বদেশীদ্বেষী কূটপ্রশ্ন উত্থাপিত না করিয়া সকলেই সমপ্রাণে এক লক্ষ্যে প্রতিকার চেষ্টায় দৃঢ় সংকল্প হইত। কেন না, দেশের দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, ইহা কখনই কোনও ধর্ম্মের বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। ইহা যখন সকল জাতি এবং ধর্ম্মেরই সর্ব্ববাদিসম্মত মত, তখন সেই মাতৃভূমি উদ্ধারের চেষ্টা যে একটা প্রধান ধর্ম্ম, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ নাই। আর এই ধর্ম্ম পালনের জন্য ভারতবাসীর সার্ব্বজনীন সহানুভূতিই—জাতীয়তা। অতএব ব্যক্তিগত ধর্ম্ম ও জাতিগত ধর্ম্ম সম্বন্ধ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত নহে; কেন না, সকল ধর্ম্মেরই নীতি শিক্ষা সমান, ধর্ম্মচর্চ্চা দ্বারা মনের সঙ্কীর্ণতা ও জড়তা দূর করে, পরদুঃখকাতরতা, পরহিতৈষিতা, সহৃদয়তা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর পরিস্ফুরণ করে; অতএব জাতীয়তা, একতা, স্বদেশহিতৈষিতা, উদারতা, সহৃদয়তা ইহার মূলই ধর্ম্ম, ইহা ধর্ম্মচর্চ্চার একটী অঙ্গ, ফল বা উপদেশ। অতএব কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বুদ্ধ, কি খ্রীষ্টিয়ান সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মের অনুশীলন করিলেই স্বদেশানুরাগ ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। এবং সেই জন্য এই স্বদেশানুরাগ ধর্ম্ম ব্যক্তিগত বা জাতিগত ধর্ম্মের কোনও ক্ষতি না করিয়া শ্রীবৃদ্ধি সাধনই করিতে পারে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যে জাতীয়তা গঠন অদ্ভুত নহে। জাপানের লোক সংখ্যার মধ্যে রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট, বৌদ্ধ প্রভৃতি কত প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশবাসীর ধর্ম্মও এক নহে, তথাপি তাহাদের জাতীয়তা কি সুন্দর। অতএব ব্যক্তিগত ধর্ম্মের জাতীয়তা বা একতার বিন্দুমাত্র বিরোধ থাকিতে পারে না। বরং স্বদেশানুরাগরূপ ধর্ম্মকে যে হীনমতি ধর্ম্মবিরোধের প্রশ্নস্থলে উপস্থিত করে,

স্বধর্ম্মে নিশ্চয়ই সে নিতান্ত আস্থাহীন। স্বধর্ম্মে যিনি প্রকৃত আস্থা সম্পন্ন তিনি দেশবাসিগণের স্বদেশানুরাগ ধর্ম্ম যাহাতে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্ম নিশ্চয়ই আন্তরিক যত্নবান হইবেন। এই স্বদেশানুরাগ ধর্ম্মই অন্যান্য সভ্য-জাতির একতার মূল কারণ। অতএব "বন্দে মাতরম্" বীজমন্ত্র সকল ধর্ম্মের পক্ষেই সমান। কারণ, স্বদেশানুরাগ ধর্ম্ম, স্মৃতি পথে সতত জাগরিত করিয়া দিবার ইহা উত্তম উপায়।

শ্রীকিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য।

আমাদের স্বাস্থ্য।

আমাদের দেশের লোকের প্রায় কাহারও স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নাই; ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। শরীর রক্ষা যে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে সকলেই যেন ভ্রমান্ধ হইয়া পড়িয়াছে। দেশের দারিদ্রতা যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, লোকের হিতাহিত জ্ঞানও সেই পরিমাণে হ্রাস পাইয়া যাইতেছে; আহার অন্বেষণের চেষ্টা যত প্রবল হইতেছে, শরীর রক্ষার যত্নও ততই লয় পাইতেছে। কিন্তু দেশবাসীগণের শরীরের কল্যাণের উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করে। উৎসাহ, মস্তিষ্কের চালনাশক্তি এবং বিবিধ মনোবৃত্তি শরীরের অবস্থার উপর সন্নিহিত। সেই জন্ম এই স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয় অভ্যুত্থানের সহিত যাহাতে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

রাজার সানুকূল দৃষ্টি ও প্রজার নিজের যত্ন না থাকিলে, প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে এই দুইটীরই সম্পূর্ণ অভাব। রাজা বৈদেশিক, প্রজার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ সহানুভূতি পরিলক্ষিত হয় না; এবং অনেক স্থলে শুদ্ধ মৌখিক সহানুভূতি বা আইন গঠন ব্যতীত প্রকৃত কার্য্যানুষ্ঠানের কোনও সুবন্দোবস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথাও বা স্বার্থপর রাজপুরুষগণ কেবল নিজ নিজ বাসভূমি ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ম দরিদ্র প্রজার কঠোর পরিশ্রমার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হন না। কলিকাতা প্রভৃতি কতিপয় মহানগরীর ইংরাজটোলা, দেশীয়লোকের

আবাসস্থান অপেক্ষা কতদূর স্বাস্থ্যকর! পথ, ঘাট, মাঠ প্রভৃতিও কি সুন্দর এবং মনোরম! সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার অধিকাংশই যে কেবল এই সকল স্থানে ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জল, খাদ্য, ব্যায়াম ও জলনির্গমের উপায় প্রভৃতি কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় মনুষ্যের আয়ত্তাধীন। কিন্তু ইহার কোনটীরই প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই।

১। জল।—আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে নদী, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতির জলই পান করা হইয়া থাকে; এবং অনেক বড় সহরে এক্ষণে কলের জল হওয়াতে তদন্তর্গত স্থানসমূহের লোকের পানীয় জলের অভাব অনেকাংশে দূর হইয়াছে। গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ লোক গঙ্গাজল পান করে; কিন্তু উহার তীরস্থিত কলসমূহ দ্বারা ঐ জল বিশেষ পরিমাণে দূষিত হইয়া লোকের স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতিসাধন করিতেছে। হাড়কল, কাগজকল, পাটকল প্রভৃতি হইতে নিঃসারিত অপরিস্কৃত জল যখন গঙ্গাজলের সহিত মিলিত হয়, তখন এই জলের অবস্থা যে কি ভয়ানক হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ আধুনিক (septic tank) সেপ্টিক ট্যাঙ্ক প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে গঙ্গার জল যে ক্রমশঃ পানের অযোগ্য হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। septic tankএর ময়লা গঙ্গায় ফেলিবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে পরিষ্কার করণের জন্য গবর্ণমেণ্ট উত্তম উত্তম আইন গঠন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু ঐ সকল আইন কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা বিশেষ সন্দেহ স্থল। প্রত্যেক কল হইতে প্রত্যহ ৪।৫ হাজার লোকের মলমূত্রাদি গঙ্গার জলের সহিত মিলিত হইবে। যদি কোন কারণবশতঃ দৈবাৎ একবারও ঐ মলমূত্রাদি বিশিষ্টরূপে পরিস্কৃত না হইয়া পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে গঙ্গাতীরবাসীর আর বিপদের সীমা থাকিবে না। কলের সংখ্যা যে পরিমাণে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ septic tank প্রতিষ্ঠার জন্য যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এই আশঙ্কা দূরসাপেক্ষ বলিয়া বোধ হয় না।

বর্ষাকালে নদীর জল স্বভাবতঃই এতদূর ময়লা হয় যে, উহা পরিষ্কার করিয়া না লইলে পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠে। আমাদের দেশে

অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে; কিন্তু নানা কারণে তাহার অধিকাংশই জলশূন্য; এবং অবশিষ্টের মধ্যে অনেকগুলির জল অত্যন্ত অপরিষ্কার।

যে সকল স্থানে নদীর জল দুষ্প্রাপ্য, তথাকার লোকে কূপ বা পুষ্করিণীর জলই পান করিয়া থাকে। কূপের অবস্থা বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই শোচনীয়। এদেশে একটা কূপ প্রায়ই অধিক কাল স্থায়ী হয় না। এবং অধিক অর্থব্যয় করিয়া তলদেশ হইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে গাঁথুনি করিয়া কূপ খনন করিবার সম্পত্তিও অতি অল্প লোকের আছে।

পুষ্করিণীর অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। সর্ব্বত্রই গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ পুষ্করিণীতেই জল দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং অল্পসংখ্যক যে গুলিতে সামান্য জল থাকে, তাহার অবস্থা এতদূর কদর্য্য যে, গো-মহিষাদিও সেই জল পান করিলে ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তদ্দেশবাসী লোকসমূহ অপর পানীয়ের অভাবে ঐ জলেই পান, আহার প্রভৃতি সকল কার্য্য করিতে বাধ্য হয়।

কোন কোন স্থানে গবর্ণমেণ্ট খাল কাটাইয়াছেন বলিয়া সেখানকার লোকের আজকাল জলকষ্টের অনেক হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বর্ষা-কাল ভিন্ন অপর সময়ে অনেক স্থানেই, এমন কি পানীয় জলের জন্যও হাহাকার পড়িয়া যায়।

পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের এ বিষয়ে কোনও লক্ষ্য নাই। গৃহস্থলোকে নানারূপ সহজ উপায়ে জল বিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারে।

১ম।—জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলে জলের দূষিত পদার্থ অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়।

২য়।—কলসী ফিল্‌টার। ইহা প্রত্যেক বড় গৃহস্থেরই ২।১টী করিয়া রাখা আবশ্যক। ইহাতে কয়লা ও বালি দ্বারা জল পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু ঐ কয়লা ও বালি মধ্যে মধ্যে বদলাইতে বা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

ফট্‌কিরি বা নির্ম্মালি দ্বারা জল থিতাইয়া পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু উহা দ্বারা জল বিশুদ্ধ হয় না।

অধিক দিন কোনও পাত্রে পানীয় জল রাখিতে হইলে, ঐ পাত্র মধ্যে মধ্যে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া শুকাইয়া লওয়া উচিত।

অবগাহন স্নান, কাপড় ধোয়া, মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি নানাকারণেও জল

দূষিত হয়, এবং ইহা হইতেই সময়ে সময়ে বিসূচিকা, উদরাময়, বসন্ত প্রভৃতি রোগ স্থানে স্থানে প্রাদুর্ভূত হয়।

পানীয় জলের পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতির নিকটে গোশালা, পাইখানা প্রভৃতি প্রস্তুত করা কিংবা উহার মধ্যে নর্দ্দামা বা ড্রেনের জল নিঃসরণের পথ রাখা নিতান্ত গর্হিত। কারণ, ঐ সকল পদার্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জলকে দূষিত করে, এবং সেই জল ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে।

পানীয় জল প্রভৃতির অভাব দূর করণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে গবর্ণমেণ্ট এদেশে রোডসেস নামক একটী করের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; এবং ঐ অর্থে জেলাবোর্ড স্থানে স্থানে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা প্রায় কার্য্যে পরিণত হইল না। দেশের জমীদারগণের অনেকে বিলাস ও উপাধি লালসায় লালায়িত। প্রজার সুবিধার জন্য নূতন পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দিবার কল্পনা দূরে থাক, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রতিষ্ঠিত জলাশয়াদি পঙ্কোদ্ধারের অভাবে মজিয়া গেলেও সেদিকে তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন না। সুতরাং দেশের লোকের জলকষ্ট নিবারিত হইবার এখন আর আশা নাই।

২। খাদ্যদ্রব্য।—আহারের অনিয়ম এবং অত্যাচারও স্বাস্থ্যভঙ্গের একটী প্রধান কারণ। আমাদের দেশে এ দুইটীই বর্ত্তমান। সুতরাং উদরাময়, অজীর্ণ, অম্লরোগ প্রভৃতির মাত্রাও অত্যন্ত অধিক। এখানকার লোকের আহারের কোনও নিয়ম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ লোকের যথেষ্ট পরিমাণ আহারের উপায় নাই; এবং অবশিষ্ট যাহাদের উপায় আছে তাহাদের সময়, পরিমাণ বা খাদ্যের গুণাগুণের প্রতি কোনও বিশেষ দৃষ্টি নাই।

ঘৃত ও দুগ্ধ বাঙ্গালীর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু আজকাল উহা যেমনই দুর্মূল্য তেমনই বিকৃত। মাতার শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন স্তন্য দুগ্ধের অসদ্ভাব; সুতরাং দুগ্ধপোষ্য শিশুগণকে কেবল গোদুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে হয়; তাহাও দুষ্প্রাপ্য বা দূষিত; সুতরাং প্রথম হইতেই স্বাস্থ্যভঙ্গের সূচনা হইতে থাকে। আজকাল এই বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবজনিত কুফল প্রতি গৃহেই পরিলক্ষিত হয়। শিশুরোগ ও অকাল মৃত্যুর সংখ্যা এই জন্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। উদরাময়, যকৃতের বিকৃতি ও ক্ষয়রোগে কত শত শিশু প্রতি সহরে, বিশেষতঃ কলিকাতাতে, অকালে প্রাণ হারাইতেছে!

অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ স্থলে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবই ইহার প্রধান কারণ।

বিশুদ্ধ ঘৃতও এদেশের অধিকাংশ স্থানে দুষ্প্রাপ্য। বাজারের ঘৃত নানাবিধ দূষিত তৈল, চর্ব্বি প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত থাকায় অনেক স্থলে উহা আহারের অনুপযুক্ত; এবং এই ঘৃতে প্রস্তুত মিষ্টান্ন ও অপরাপর খাদ্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করা হয় বলিয়াই, আমাদের দেশে অজীর্ণ ও অম্লরোগের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আজকাল আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইয়া উঠিয়াছে। এই ভারতবর্ষে দরিদ্রের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক এবং সমস্ত লোক সংখ্যার মধ্যে শতকরা ৫০জনেরও অধিক অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট। প্রতি বৎসর কত লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে! খাদ্যের অনাটন হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব সত্য; কিন্তু যাহাদের সে অভাব নাই তাহারাও যে স্বাস্থ্যের প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখে না, ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। ইহার ফলে, দেশের লোকের শারীরিক অবস্থা যে ক্রমশঃ হীনতর হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিয়মপূর্ব্বক যথা সময়ে আহার, এবং পরিপাক-শক্তির তারতম্যানুসারে লঘু ও অল্প পরিমাণ ভোজনই, আহার সম্বন্ধে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান উপায়। ইহা অধিকতর ক্লেশকর নহে, এবং শরীর রক্ষার জন্য আমাদের সকলেরই ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দেশের জল বায়ুর উপরও খাদ্যের বিচার নির্ভর করে। আমাদের দেশে বিলাতী খানা বা অধিক পরিমাণ মাংস সহ্য হয় না। অনেকে অনুকরণ প্রবৃত্তি বা দুষ্প্রবৃত্তির বশে এইরূপ খানার পক্ষপাতী; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। এদেশের, এমন কি ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অনেক সাহেবও আজ কাল মদ্য, মাংস প্রভৃতি অধিক পরিমাণে খাইতে সঙ্কুচিত হন।

ব্যায়াম।—শরীর রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম নিতান্ত আবশ্যক। এই পরিশ্রমের পরিমাণ কিন্তু শরীরের উপযোগী হওয়া উচিত; তাহা না হইলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। যদি দুর্ব্বল শরীরে অধিক পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করা হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা শরীর সবল না হইয়া আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এক দিকে আবার সবল শরীরে পরিশ্রমের অভ্যাস না থাকিলেও শরীর নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের

দেশে আজকাল ব্যায়াম শিক্ষার অভ্যাস ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, এবং দেশের লোকের শরীরও সেই জন্য দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

৮।১০ বৎসর পূর্ব্বেও বালকদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার কত সুবন্দোবস্ত ছিল, এবং গবর্ণমেন্টও ইহার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। প্রতি বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষক নিয়োগ করা হইত, এবং প্রত্যেক বালক প্রত্যহ নিয়মিতরূপে জিমনাষ্টিক প্রভৃতি বিবিধ ব্যায়াম অভ্যাস করিতে বাধ্য হইত। পূর্ব্বে প্রতি মাঠে বা খোলা যায়গায় কপাটী, ধাপসা প্রভৃতি কত শত ব্যায়ামের প্রাদুর্ভাব ছিল। একত্রে অনাবৃত স্থানে আনন্দবর্দ্ধক ক্রীড়া দ্বারা বালকগণের মনোমধ্যে কত স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইত, পরিপাকশক্তি বৰ্দ্ধিত হইত এবং তাহাদের শরীর কত বলিষ্ঠ থাকিত; সেই সঙ্গে তাহাদের মানসিক বৃত্তি সকলও উত্তেজিত হইয়া পাঠাধ্যায়নে উৎসাহ দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিত। বাল্যকালের পরিশ্রমের ফলের উপর জীবনের ফলাফল নির্ভর করে, ঐ সময়ে শরীরকে যে ভাবে গঠিত করা হয়, শুদ্ধ নিয়মিত রূপে চলিলেই সেইভাবে চিরকাল শরীরের অবস্থা থাকে।

কিন্তু আজকালকার বালকদিগের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিদ্যালয়ে বিলাতী ধরণের ড্রিলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহাতে শারীরিক পরিশ্রম হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু ইহা স্কুলের পাঠাভ্যাসের আনুসঙ্গিক থাকাতে,আনন্দদায়ক নহে, সুতরাং ইহার ফল ততদুর সন্তোষজনক হইবে কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। ইদানিং বালকদিগের মধ্যে সে স্ফূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা প্রায়ই অলস স্বভাব ও জড়তাপূর্ণ, এবং সেইজন্য তাহাদের শরীর রুগ্ন, শিথিল, ও পরিপাক শক্তির তেজ নাই। ইহাদের মনোবৃত্তি সমূহ সেরূপ প্রখর বলিয়া বোধ হয় না; অতএব ইহাদের ভবিষ্যৎ সুখকর হইবে বলিয়া অনুমান হয় না। কিন্তু ইহারাই ভারতের ভবিষ্যৎ আশার স্থল। আজ কাল কর্ত্তৃপক্ষগণও তাঁহাদের বালকদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিকাংশ স্থলে উদাসীন; ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়।

আমাদের যুবক ও প্রৌঢ়দিগের মধ্যেও নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব জনিত কুফল সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই কেরাণি শ্রেণীয়। তাঁহারা প্রাতঃকালে উঠিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষিপ্রতা সহকারে প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিয়া ৮টা না বাজিতে অৰ্দ্ধ চর্ব্বণে মুষ্টিমেয় আহার করিয়াই দৌড়াইয়া ট্রেন ধরেন; তাহার

পর বেলা ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত আফিসের কার্য্য করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহাদের সেই শ্রান্ত ও ক্লান্ত অবস্থা কি শোচনীয় হয়! একদিকে পুষ্টিকর ও নিয়মিত রূপ খাদ্যের এবং শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, ও অন্যদিকে মানসিক পরিশ্রমের আধিক্য, এই উভয় কারণে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই অজীর্ণরোগ ও মানসিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন অকালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। তাঁহাদের এই অল্প সময়ের মধ্যেও যদি তাঁহারা যথাবিধি ব্যায়াম ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে জীবন সুখকর বলিয়া বোধ হইতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ব্যায়াম অনুশীলনই যে এই স্বাস্থ্যোন্নতির একটী প্রধান সোপান সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ নাই। বিশেষতঃ ইহা আমাদের আয়ত্তাধীন। ইহা দ্বারা আমাদের উপস্থিত কোন মঙ্গল না হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে যে উপকার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য অনেক স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয় সম্বন্ধে বীতরাগ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদের এই ব্যক্তিগত প্রধান উপায়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। বাঙ্গালী ভীরু বলিয়া যে অপবাদ আছে, আমাদের নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের অভাবই ইহার মূলকারণ। অতএব আমরা যদি এই অপবাদ মোচনার্থ এখন হইতে যত্নশীল হইতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালী নিশ্চয়ই একটী জাতিতে পরিগণিত হইবে।

পয়ঃপ্রণালী (Drainage)।—জলনির্গমের উপযুক্ত উপায়ের অভাবও এখানকার স্বাস্থ্যহানির একটী প্রধান কারণ। বর্ষাকালে জলনির্গমের পথ না থাকাতে উদরাময়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতিপয় রোগে দেশের সমূহ ক্ষতি সাধন করিতেছে। কত শত সুবৃহৎ পল্লী ম্যালেরিয়ার প্রকোপে একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। কত নগর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এতদিনেও গবর্ণমেণ্ট ইহার কোনও বিশেষ প্রতিকার সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এই ম্যালেরিয়া এখনও অনেক স্থানে সমভাবে প্রাদুর্ভূত; এবং বর্ষার শেষভাগ হইতেই ইহার প্রকোপ পূর্ণমাত্রায় অনুভূত হয়। বর্ষাকালের বৃষ্টি ও বন্যার জল নির্গমের পথ সকল বন্ধ হইয়া যাওয়াতে ঐ জল গ্রামে ও নগরে অনেকদিন জমিয়া থাকে, এবং ইহাতে উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থ পচিয়া দেশের জলবায়ু দূষিত করে;

সুতরাং দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট প্রজাকুল প্রথমেই উহার ফল উপভোগ করিতে থাকে।

রেল বিস্তারের দ্বারা আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থলে জল নির্গমের পথ সকল রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখনও রেল হইতে সুদূরবর্ত্তী অধিকাংশ প্রদেশ অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল স্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এক্ষণে রেল হওয়াতে তাহার অধিকাংশেরই অধঃপতন হইয়াছে। আমাদের দেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বা খাল আছে; পূর্ব্বে বর্ষা ও বন্যার জল ইহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইত। কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই আজকাল মজিয়া গিয়াছে, সুতরাং জলনির্গমের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, যে সকল নদী বা খালের সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ঐ সকল স্থানে রুদ্ধগতি বা শুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছে, এবং সেই জন্যই তাহাদের উপরিভাগের শাখা প্রশাখা গুলিও অল্পায়তন বা একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। ফলতঃ তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের জল নির্গমের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়াছে।

অনেকস্থলে রেলের লাইন উভয় পার্শ্বস্থ জমী অপেক্ষা অনেক উচ্চ হওয়াতে এক দিকের জল অপর দিকে যাইতে পারে না, সুতরাং পার্শ্বস্থ স্থান সমূহে জল আবদ্ধ হইয়া সেখানকার স্বাস্থ্য নষ্ট করে। যদিও স্থানে স্থানে রেলের নিম্নদেশ দিয়া জল নির্গমের জন্য সেতু হইয়াছে, কিন্তু এগুলি এরূপ সঙ্কীর্ণ যে, প্রয়োজনমত জল নির্গমের অনুপযোগী।

অতএব রেল দ্বারা যে দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমূহ ক্ষতি সাধিত হইতেছে, ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিষয় লইয়া ছোটলাট বাহাদুরের সদস্য সভায় দুই একবার প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন বিশেষ উত্তর দেন নাই বা প্রতিকার বিধানে যত্ন করেন নাই। রেলওয়ের ন্যায় ভেড়ী বাঁধও (embankment) দেশের উপরোক্তরূপ সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

প্রজার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী। কিন্তু এদেশে স্বাস্থ্যরক্ষা না করিয়া তাঁহারা স্বাস্থ্যহানির কারণ হইয়া উঠিয়াছেন। ভেড়ীবাঁধ ও রেল প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিবার সময় সরকার বাহাদুর দরিদ্র প্রজার অমূল্যরত্ন স্বাস্থ্য বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি রাখেন না, ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। রেলে তাঁহাদের বা তাঁহাদের দেশবাসী ধনীর লাভ হইবে ইহাই যথেষ্ট! দরিদ্র ভারত-

বাসীর আবার স্বাস্থ্য কি? যাহাদের আহারের সংস্থান নাই তাহারা আবার স্বাস্থ্য লইয়া কি করিবে! কিন্তু প্রজা রক্ষা না করিলে, রাজ্য লইয়া কি ফল হইবে? তাঁহাদের প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি যদি লক্ষ্য থাকিত, তাহা হইলে আমাদের দেশে রেল বিস্তারের এতাদৃশ আয়োজন না করিয়া অধিক পরিমাণে খাল কাটাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন। রেলের পরিবর্ত্তে খালের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যও ভাল হইত, এবং দেশ অন্যান্য অনেক অংশে উন্নতিলাভ করিতে পারিত। এখনও যদি এই অনুষ্ঠানে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে দেশের উপকার হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সে অনুরাগ কোথায়? এখনও খাল অপেক্ষা রেলে তাঁহাদের সমধিক যত্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

মিউনিসিপালিটীর দ্বারাও আমরা স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ উপকার পাই না। স্থানীয় কমিশনারগণ স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে প্রায় সর্ব্বত্রই উদাসীন। নতুবা কর আদায়ের জন্য যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করা হয়, অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাহার কিছুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না কেন? প্রায় সকল মউনিসিপালিটীরই ড্রেন সকল অতি কদর্য্য এবং কোথাও বা নাম মাত্রে বর্ত্তমান আছে। চারিদিকে জঙ্গল, অস্বাস্থ্যকর জলাশয় প্রভৃতিও সর্ব্বত্র বিরাজমান। এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, অনেক সময়ে কমিশনরগণ হয়ত অর্থের অনাটন বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু স্বাস্থ্যোন্নতি যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য এবং ইহার দ্বারা যে দেশের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা তাঁহাদের উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই এরূপ অসঙ্গত উত্তর দানে সঙ্কুচিত হন না। কোথাও বা স্বাস্থ্যোন্নতির কঠোর বিধান সকল কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে পাছে করদাতাগণকে উৎপীড়িত করা হয়, সেই আশঙ্কায় তাঁহারা গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিরুৎসাহ হইয়া থাকেন। এইরূপ হিতাহিত কর্ত্তব্যবিহীন বলিয়াই আমরা এই শোচনীয় দশায় পতিত হইতেছি।

আমরা দেখিয়াছি অনেক মিউনিসিপালিটীর এলাকায় জল নিকাশের আদৌ কোন বন্দোবস্ত নাই। রাস্তা প্রভৃতির জন্য মিউনিসিপালিটী প্রায়ই নূতন জমী ক্রয় করেন না। গ্রামের পুরাতন রাস্তাগুলিই তাঁহাদের সম্পত্তি। *অনেক স্থলে পূর্ব্বে এই সকল গ্রাম্যপথ গ্রামের পয়ঃপ্রণালীর কার্য্য করিত;* কোথাও বা সঙ্কীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে গভীর ড্রেন থাকায়, ঐ ড্রেন দিয়া অবাধে

জল প্রবাহিত হইত, আবার কোথাও বা স্থানে স্থানে নিম্নস্থান দিয়া জল বহিয়া যাইত। ইহাতে লোকের যাতায়াতের অসুবিধা ছিল বলিয়া মিউ-নিসিপালিটী ঐ সকল রাস্তা উচ্চ ও প্রশস্ত করিয়া দিয়া জলনালী এককালে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ বা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে লোকের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, এমন কি অনেকের সদর দরজায় গাড়ী আসিয়া লাগিতেছে; কিন্তু ইহাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, লোক চলৎশক্তি বিহীন হওয়ায় গাড়ী ভিন্ন অনন্য গতি হইয়া পড়িতেছে। আমরা সেই জন্যই বলি, আধুনিক সভ্যতায় অভাব প্রতীকারের প্রণালী গুলি এরূপ চমৎকার যে, তাহাতে কাল্পনিক অভাব বিদূরিত করিতে যাইয়া নানাবিধ প্রকৃত অভাবের সৃষ্টি করিয়া ফেলে।

এই সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত উদাসীনতারও কতকটা আভাস দেওয়া উচিত। প্রথমেই বলা হইয়াছে, আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য নাই। আমরা স্ব স্ব আবাস বাটী ও তাহার চারিদিক এরূপ অপরিষ্কার রাখিয়া থাকি যে, তাহাতে স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। ইষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত উপলক্ষে প্রতি বৎসর পল্লীর মধ্যভাগে যে কত ছোট ছোট ডোবা খনন করিয়া ফেলি এবং ঐগুলি আবর্জ্জনা পূর্ণ থাকিয়া যখন বর্ষার শেষে পচিয়া উঠে, তখন গ্রামের অবস্থা কি কদর্য্য হয়! ঐ সব ডোবা পূরণ করিবার বা পরিষ্কার রাখিবার সামর্থ্য নাই, কিংবা সামর্থ্য থাকিলেও আগ্রহ নাই; তথাপি উহার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; আর দেশের জল বায়ুও সঙ্গে সঙ্গে আরও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালায় এই সব ডোবা এত অধিক যে, ইহার সংখ্যা করা কঠিন। ইহাদের মধ্যস্থিত বৃক্ষ, লতা, পাতা প্রভৃতি বর্ষাশেষে পচিলে জল এত দুর্গন্ধযুক্ত ও অপরিষ্কার হয় যে, কোনও জন্তুতেও সহজে তাহা পান করিতে চাহে না।

তাহার পর, আবাস বাটীর নর্দ্দমা অনেক স্থলে অতিশয় কদর্য্য। গৃহ কর্ত্তার এ দিকে প্রায়ই দৃষ্টি পতিত হয় না। অধিকাংশ স্থলে তাহার নির্গমের বিশেষ কোনও পথ থাকে না, এবং যদিও থাকে, তাহা এতাদৃশ সঙ্কীর্ণ বা রুদ্ধপ্রায় যে, তাহা জল নির্গমের নিতান্ত অনুপযোগী। সুতরাং বাটীর মধ্যে সর্ব্বদা দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ থাকে।

গোশালা আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলে আবাস বাটী সংলগ্ন। এই গোশালাগুলির পরিষ্কার অবস্থা কচিৎ কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রায়ই

স্থানে স্থানে স্তূপাকার গোময় থাকাতে পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়, এবং গোমূত্র নির্গমের সুবন্দোবস্ত না থাকাতে, উহা বাটীর পার্শ্বে বা কিঞ্চিৎ দূরে জমিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ সমস্ত বায়ু দূষিত করিয়া থাকে, কিংবা কোন কোন স্থলে পুষ্করিণীর মধ্যে নির্গমের ব্যবস্থা থাকায় ঐ পুষ্করিণীর জল দূষিত হইয়া উঠে। গোশালা বাসবাটী হইতে দূরে এবং পরিষ্কার অবস্থায় রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য, এবং উহার জল বা গোমূত্র কোনও মতে পুষ্করিণীর মধ্যে আসিতে দেওয়া উচিত নহে।

এখানকার প্রায় অধিকাংশ পল্লীগ্রামেই বাটীর চতুঃপার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল বা আগাছা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা গৃহের মধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ বা বিশুদ্ধ বায়ু গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। সূর্য্যকিরণ প্রবেশ ও বায়ু সঞ্চালনের উপায় না থাকিলে, আবাসভূমি সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে ও গৃহস্থের শরীর চিররুগ্ন হয়। পার্শ্বস্থ স্থান সমূহের মধ্যেও সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে না পারায়, সে স্থানের সঞ্চিত জল শুষ্ক হইতে বিশেষ বিলম্ব হয়, এবং উহা পাতা ও জঙ্গলের সংস্পর্শে দূষিত হইয়া গৃহস্থের স্বাস্থ্যহানি করে। কিন্তু আমাদের দেশের লোক জঙ্গল প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া বাসস্থানের উৎকর্ষ সাধনে কেন যে যত্নবান হয় না, তাহা বলা যায় না। এই প্রকার জঙ্গলের দ্বারা তাহাদের কোনও লাভ নাই, বরং বিশেষ ক্ষতি হয়। ইহা অল্পায়াসেই পরিষ্কার করিতে পারা যায়। অর্থবল না থাকিলেও গৃহকর্ত্তা স্বয়ং প্রত্যহ অল্প পরিমাণে মনোযোগ দিলেই শারীরিক পরিশ্রমও হয়, এবং বাটীর স্বাস্থ্যরক্ষাও হইয়া থাকে। কিন্তু আলস্য ও ঔদাসীন্য তাহাদিগকে সে সুখে বঞ্চিত করিয়াছে।

লোকের স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে দেশের জল বায়ুরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নানাবিধ বিভিন্ন জাতির সংসর্গে অনেক ভিন্ন প্রকারের ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এ দেশের লোকের মধ্যে ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ প্রভৃতি রোগের প্রকোপ ছিল না। তাহাদের স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল ছিল, এবং পরমায়ুও অধিক ছিল। কিন্তু এক্ষণে এই সকল নূতন ব্যাধির আবির্ভাবে দেশের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অতএব এখন হইতে বিশেষ মনোযোগী না হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ সুখের আশা ভরসায় যে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীকিশোরীমোহন ভট্টাচার্য্য।

কৃষক ও কৃষি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেহ কেহ বলেন, ম্যাঞ্চেষ্টর যেমন এ দেশের তন্তুবায়গণের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, ভারতের কৃষি সম্বন্ধে সেরূপ বিদেশীয় প্রতিযোগিতার আশঙ্কা নাই। কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। বিদেশীয়গণ এ দেশে আসিয়া স্বহস্তে হলচালন, কিম্বা স্বীয় স্কন্ধে ভার বহন করিয়া ভারতীয়গণের সহিত প্রতিযোগিতায় এখনও ইচ্ছুক না হইতে পারে, কিন্তু বিদেশীয় কৃষির উন্নতি নিবন্ধন ইতিমধ্যেই এ দেশের কৃষকগণ যে, কোন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। আমেরিকা ও মিসর দেশ হইতে কার্পাস বীজ আনাইয়া এ দেশের তুলাচাষের উন্নতির জন্য চেষ্টা হইয়াছে সত্য,কিন্তু উক্ত দুই দেশের দীর্ঘ আঁশ তুলা বহুল পরিমাণে মিলের কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ায়, ও সেই তুলায় প্রস্তুত বস্ত্র এ দেশে আমদানী হওয়ায়, ভারতীয় তুলার আদর এবং অনেক স্থানে তুলাচাষের পরিমাণও কমিয়া গিয়াছে। বিদেশজাত শর্করার আমদানিতে এ দেশের ইক্ষু চাষের বিস্তর অবনতি হইয়াছে। অপর দেশের রাজার উৎসাহ, অধিবাসিগণের সহানুভূতি সমুৎপন্ন বিবিধ কৃষি যন্ত্রাদির সৃষ্টি, সারের উৎকর্ষ বিধান চেষ্টা, জল সেচনের ব্যবস্থা, নানারূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল, এবং কৃষকগণের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে কৃষক ও কৃষির ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হইতেছে। আর আমাদের দেশের কৃষকগণ, তাহাদের উন্নতি বিধায়ক এই সকল উপাদানের প্রত্যেকটী হইতে বঞ্চিত থাকায়, ক্রমশঃ দুর্ব্বল, দরিদ্র, অশিক্ষিত, উৎসাহশূন্য ও কার্য্যাক্ষম হইয়া আসিতেছে। তাহারা প্রায় প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির আক্রমণে রুগ্ন; সুপথ্যের সম্ভাবনা দূরে থাক, উদরান্ন বিহনেই শীর্ণ; পরিশোধের উপায় বা আশা বিহীন হইয়া তাহারা চির-ঋণ-জালে জড়িত, সুতরাং কার্য্যে ভগ্নোৎসাহ; এবং দেশের শিক্ষিতগণের নিকট হইতে সহানুভূতি প্রাপ্তি বা তাহাদের কৃষির উন্নতির কল্পনা দূরে থাক, জমীদার, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি শিক্ষিতগণ কর্ত্তৃক অর্থ শোষণে তাহারা কাতর। সুতরাং কৃষির উন্নতি বিধায়ক প্রায় প্রত্যেক উপায় হইতেই কৃষকগণ বঞ্চিত। কৃষি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ভিন্ন

তাহাদের আর অন্য সম্বল নাই। অর্থ, সামর্থ্য, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, উৎসাহ, আশা, সাহস ও সহানুভূতি প্রভৃতি উন্নতি সূচক প্রত্যেক উপাদানেরই তাহাদের অভাব। এইরূপ অবস্থায় কৃষকগণ কর্তৃক কৃষির উন্নতি সাধিত হয় নাই বলিয়া তাহারা দোষী হইতে পারে না; এবং এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে, এদেশের কৃষির উন্নতি নিতান্ত অসম্ভবপর।

কৃষির উন্নতি বিষয়ে উদাসীন হওয়ায় বিদেশীয়গণ এদেশে আসিয়া ক্রমশঃ কৃষি কার্য্যে লিপ্ত হইতেছে। কৃষক ও কৃষির উন্নতির উপর জমিদার-গণের উন্নতি যে প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাঁহারা তাঁহাদের এই প্রকৃত স্বার্থ বিস্মৃত হওয়ায় বিদেশীয়গণ ক্রমশঃ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। জমিদারগণের দারিদ্র্য ক্রমাগত যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কালক্রমে বিদেশীয়গণ জমিদারের স্থানে, দেশের লোক যেরূপ অবস্থাহীন হইয়া পড়িতেছে ও ফিরিঙ্গিগণ যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে, তাহাতে ফিরিঙ্গিগণই কৃষকের স্থানে, এবং গো মহিষাদির সংখ্যা যেরূপ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে দেশের লোক বলীবর্দ্দের স্থানে নিযুক্ত হইবার অসম্ভাবনা নাই। আমাদের এরূপ উক্তি অনেকের নিকট নিতান্ত কাল্পনিক বা বিদ্রূপাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, স্থানে স্থানে কতকগুলি সাহেব কোম্পানি ইতিমধ্যেই বিস্তৃত জমিদারী অধিকার করিয়াছে। বিগত ১৯০০ সালে বেরার প্রদেশে দুর্ভিক্ষের সময় গো মহিষাদির অভাবে দুর্ভিক্ষক্লিষ্টগণ তাহাদের স্থানে নিযুক্ত হইয়াছিল। বিদেশীয় সভ্যতায় পশু ক্লেশ নিবারণের প্রতি যেরূপ লক্ষ্য আছে, মনুষ্য ক্লেশ নিবারণে সেরূপ লক্ষ্য নাই; সুতরাং দুর্ব্বল বলীবর্দ্দের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দুর্ব্বল মনুষ্য কর্তৃক তাহাদের কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লইবার কল্পনা নিতান্ত বিচিত্র হইবে না। এই সময় হইতে সাবধান না হইলে ভবিষ্যফল উপরোক্ত রূপ শোচনীয় হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা।

জেম্‌স সাহেব এ দেশের কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য লিখিয়াছেন ঃ—

"If European farmers take up Indian land, with capital to back them up, then indirectly will the poor native cultivator be benefited, then he may be rescued from the hands of the village money lenders; but until this is done, no system of real agricultural reform can take place, because the ryots are

ground down by debts, and can not afford to farm even up to the knowledge they have !'

ভাবার্থঃ—"যদি ইউরোপীয় কৃষকগণ উপযুক্ত মূলধন আনিয়া ভারতের জমী গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রকারান্তরে এ দেশীয় কৃষকগণ উপকৃত হইবে, ইহাতে তাহারা গ্রাম্য মহাজনগণের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবে; কিন্তু যত দিন তাহা না হয়, তত দিন কৃষির বাস্তবিক উন্নতি সূচক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না; কারণ, প্রজাগণ ঋণভারে এরূপ নিষ্পেষিত যে, তাহাদের জ্ঞানের পরিমাণ মত কৃষিকার্য্যেও তাহারা অক্ষম।"

সুতরাং বিদেশীয় কৃষক আনাইয়া দেশের কৃষকগণকে তাহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য বা কুলির ন্যায় প্রতিপালন করিতে না পারিলে, বোধ হয় আমাদের দেশের কৃষককুলের উদ্ধারের আর আশা নাই। কিন্তু নীলকর, চা-কর প্রভৃতি কৃষকগণ (Planters) কর্ত্তৃক এ দেশের কৃষকের যে কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলেই যেরূপ বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাহাতে দেশের সর্ব্বত্র সেরূপ অভিনয় দেখিতে, বোধ হয়, আর তাঁহাদের সাধ নাই; এবং দেশের কৃষককুল উৎসন্ন গেলে আপনাদের অন্ন সংস্থানের পথও যে রুদ্ধ হইবে, তাহাও দেশের লোক বুঝিতে পারেন; সুতরাং জেম্‌স সাহেবের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে, তাঁহারা দেশীয় কৃষকগণের উন্নতির ভার আপনাদের হস্তেই নিহিত রাখিতে ইচ্ছুক হইতে পারিবেন।

কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য দেশের জমীদারগণেরই বিশেষ আগ্রহসম্পন্ন হওয়া নিতান্ত বিধেয়। ইহা যে তাঁহাদেরই একান্ত কর্ত্তব্য, এবং ইহাতে উদাসীন হওয়া যে তাঁহাদের ন্যায় ও ধর্ম্ম বিগর্হিত, যতদিন তাঁহাদের অন্ততঃ এ জ্ঞান না জন্মে, তত দিন কৃষির উন্নতি আশা সুদূর পরাহত। জমীদারগণের মধ্যে যাহারা অশিক্ষিত, স্বার্থপর এবং নীচাশয়, অথবা বিলাস, উপাধি বা রাজানুগ্রহ মাত্রই যাহাদের একান্ত লক্ষ্যনীয়, তাহাদের দ্বারা দেশের বিন্দুমাত্র উপকারের সম্ভাবনা দূরে থাক, তাহারাই দেশের প্রকৃত কণ্টক। প্রজাগণ যেমন তাহাদের অর্থাগমের যন্ত্র বিশেষ, তাহারাও রাজা এবং বিদেশীয়গণের অর্থাগমের সেইরূপ যন্ত্র বিশেষ মাত্র। ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিগণের হস্তে প্রজাপালন ও শাসনভার অনেক পরিমাণে নিহিত ছিল। যখন ইংরেজ রাজ প্রজার শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, জমীদারগণ সেই সঙ্গে প্রজাপালনভারও পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন। এ ভার

এক্ষণে কাহার হস্তে নিহিত, তাহা আমরা এখনও সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমরা বুঝি, প্রজা জমীদারকে খাজনা দেয় বলিয়া, তাঁহাকেই রাজা বলিয়াই জানে; শাসনভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিলেও অনেক জমীদারই এখনও অনেক বিষয়ে প্রজার শাসন কর্ত্তার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং আমাদের মতে জমীদারগণের প্রজাপালন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হওয়া নিতান্ত ন্যায় বিগর্হিত। কিন্তু এই কর্ত্তব্য চিন্তা স্বপ্নেও অনেকের মনে স্থান পায় না। কিরূপে প্রজা শোষণ ও প্রজার সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে, এই চিন্তাতেই অনেকে ব্যতিব্যস্ত। যে সকল জমীদার বাস্তবিক শিক্ষিত, উদার-হৃদয় ও দয়াবান, প্রজাগণের মঙ্গলসাধন তাঁহাদের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কৃষির উন্নতির জন্য এই নিতান্ত প্রয়োজনের সময় ইহাঁদের সংখ্যা এ দেশে অতি বিরল। যাঁহারা বাস্তবিক শিক্ষিত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত, পৈত্রিক সংস্কার দোষে নিতান্ত সঙ্কীর্ণচেতা; যাঁহারা পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় উদারহৃদয়, তাঁহাদের অনেকেই হয়ত অশিক্ষিত ও বিলাস-প্রিয়। সেই জন্যই এদেশে কৃষির উন্নতি সম্প্রতি অতি দুঃসাধ্য।

অনেকস্থলে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিলে জমীদার-গণ তাঁহাদের প্রজাবর্গের ও তৎসহ পরিণামে আপনাদেরই প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। গোচরভূমি রক্ষা, পুরাতন জলাশয়াদির জীর্ণ সংস্কার ও নূতন জলাশয়াদির প্রতিষ্ঠা, জলসেচনের সুব্যবস্থা, অল্প সুদে ঋণদান, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, ধর্ম্মগোলা ও কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন, পল্লীগ্রামের সংস্কার প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় অনেক কার্য্যই অপর সাধারণের অপেক্ষা জমীদারগণেরই অনায়াসসাধ্য। কলিকাতার জমীদার সমিতি (Land Holder's Association) কর্ত্তৃক কৃষির উন্নতি বিধায়ক কোন কার্য্য হয় কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি। আমাদের বিবেচনায় কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য এই সমি-তিরই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃগণ যদি দেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারে প্রকৃতই আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা শিল্পোন্নতির সহিত কৃষিরও উন্নতি বিষয়ে অবশ্য মনোযোগী হইবেন। ইহার প্রত্যেকটীই গুরুতর কার্য্য। এই কার্য্যগুলি সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক জেলাতে এক একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হয়। সভার সভ্যগণ পল্লীগ্রাম সকল পরিদর্শন করিয়া কৃষক ও কৃষির অবস্থা এবং স্থানীয় জমীদারের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন,

জমীদারের সহিত পরামর্শ করিয়া কি উপায়ে গ্রামের স্বাস্থ্য ও কৃষির উন্নতি হইতে পারে, তাহা স্থির করিবেন এবং কৃষকগণকে ও জমীদারকে তদনুরূপ পরামর্শ দিবেন। সভ্যগণের মধ্যে কৃষিবিদ্যাবিশারদ সভ্য থাকা আবশ্যক। প্রত্যেক গ্রামের যে যে অভাব আছে, তাহা যতদূর সম্ভব ক্রমশঃ পূরণ করিতে হইবে। এই সকল সভার কার্য্য পর্য্যালোচনার জন্য কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে এক একটী প্রধান সভা সংস্থাপিত হওয়া উচিত। জাতীয় ধন ভাণ্ডারের অর্থ হইতে এই সকল সভার আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে। একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে সভার কার্য্য বিবরণ ও পল্লী-গ্রামের সংবাদ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ প্রণালীতে কয়েক বৎসর কার্য্য চলিলে আশানুরূপ কতক ফললাভের সম্ভাবনা। জাতীয় মহাসমিতিতে ও প্রাদেশিক সমিতিগুলিতে কৃষি ও শিল্পোন্নতি বিষয়ক মন্তব্য ও সমালোচনা হইলে বড়ই ভাল হয়।

আমরা কৃষকগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থ সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহাদের গো মহিষাদি ও ভূমির অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছি। এই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটীর উন্নতি সাধিত না হইলে, কৃষির উন্নতি কোনও ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারেনা।

কৃষকগণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পল্লীগ্রাম সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন। পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার ও তাহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা আবশ্যক, গ্রামের জলনিকাশের জন্য যাহাতে সুব্যবস্থা হইতে পারে সে জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু গ্রামের সংস্কারের সহিত কৃষকগণের অন্নাভাব মোচনের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভবপর হইবে না; অন্নাভাবই স্বাস্থ্যের অবনতির মূল কারণ। জমীদার-গণের আন্তরিক সহানুভূতি ভিন্ন এ অভাব কোনও ক্রমেই বিদূরিত হইতে পারেনা। খাজনা ও দেনার দায়ে কৃষকগণ উৎপন্ন শস্য অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে। জমীদারগণ যত্নপরায়ণ হইলে যাহাতে তাঁহাদের প্রজাসংখ্যার অন্ততঃ সাম্বৎসরিক খাদ্যের উপযোগী শস্য জমীদারীর মধ্যে থাকিতে পারে, এবং এই পরিমাণ শস্যের উদ্বৃত্ত ভিন্ন অধিক পরিমাণ যাহাতে জমীদারীর বাহিরে রপ্তানী হইতে না পায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারেন। পল্লীগ্রামের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য ধর্ম্মগোলা স্থাপন আমাদের বিবেচনায় প্রকৃষ্ট উপায়। ফলতঃ কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকগণের বাহুতে বল সঞ্চারের

ব্যবস্থা প্রথম কর্ত্তব্য, এবং সে জন্য তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণ চেষ্টাই সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বাগ্রে বিধেয়।

কৃষকগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তিকে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত করাই প্রধান উপায়। কৃষি একটী কার্য্যকরী বিদ্যা। পুস্তক পাঠে যে জ্ঞান লাভ হয়, কার্য্যক্ষেত্রে সহজেই তাহার অধিক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। কোন গ্রামে কেহ একরূপ নূতন প্রণালীতে চাষ করিয়া লাভবান হইতেছে দেখিলে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের কৃষকগণ স্বল্পকালের মধ্যেই তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে; এই উপায়েই আমাদের দেশে দুই একটী বিদেশী ফসলের আবাদ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। আমরা এই জন্য এইরূপ শিক্ষারই বিশেষ পক্ষপাতী। আমাদের দেশের কৃষকগণ গ্রাম্য পাঠশালায় যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পক্ষে সেই শিক্ষা আপাততঃ একরূপ যথেষ্ট; ইহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিক শিক্ষিতগণের অনেকে উকীলের মুহুরি, টাউটার প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে, এবং উচ্চ শিক্ষিতগণের অনেকে চাকরিকেই একমাত্র জীবনোপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিলাত ফেরত কয়েকজন কৃষিবিদ্যাবিদের মধ্যে কেহ বা ভাষা কিম্বা বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেছেন, এবং কেহ কেহ সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত আছেন। প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে সামান্য বা অধিক শিক্ষিতগণের প্রায় কাহারও সাক্ষাৎ নাই; অর্থাৎ কৃষকগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য একজনও অগ্রসর হয়েন নাই। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষিতগণ স্থানে স্থানে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইলে, তাঁহাদের শিক্ষার ফল কৃষক সাধারণের অনায়াসলভ্য হয়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, অনেকস্থলে জমীদারগণই এই প্রকৃষ্ট প্রণালীর বিরোধী; ইহাতে প্রকারান্তরে যে তাঁহারা বিশেষ লাভবান হইতে পারেন, ইহা তাঁহারা বুঝেন না। এমন অনেক জমীদার আছেন, যাঁহারা শিক্ষিত প্রজার নামেই সশঙ্কিত হইয়া উঠেন; পাছে শিক্ষিত প্রজা তাঁহাদের কুকীর্ত্তির কথা প্রকাশিত করিয়া ফেলে, কিম্বা অশিক্ষিত প্রজগণকে কুশিক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহাদের অবাধ্য করে, এইরূপ নানা কারণে তাঁহারা শিক্ষিতগণকে প্রজা করিতে ইচ্ছা করেন না। আবার কোন কোন জমীদার এরূপ সঙ্কীর্ণমনা যে, স্বয়ং সরকারের নিকট হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতি সুবিধার জন্য লালায়িত হইলেও, প্রজাকে সেরূপ সুবিধা প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না। প্রজা পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া জমীর উন্নতি সাধন করিবে এবং

তাহার পরীক্ষার ফলে অপর প্রজাগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, ইহাতে তাহাকে সাহায্য করা দূরে থাক, যাহা তাহার বিবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, সেজন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকেন। চাকরীর বাজার মহার্ঘ্য হওয়ায় ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আজকাল অনেক শিক্ষিত যুবক কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে; কিন্তু জমীদারগণ তাহাদিগকে সাহার্য্য না করিলে, তাহারা কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেনা।

বিগত কয়েক মাস হইতে গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া বিতরণ করিতেছেন। এ দেশের কৃষকগণ অশিক্ষিত, অথবা অনেকেই নিরক্ষর; সুতরাং এরূপ চেষ্টার ফল অতি যৎসামান্য হওয়াই সম্ভব; তথাপি কৃষির উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু স্মৃতি মন্দির, নাচ, গান, তামাসা প্রভৃতি বিষয়ে চাঁদা প্রদানে সমুৎসুক জমীদারগণকে রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধি ভূষণে ভূষিত করিবার প্রথা তিরোহিত হইয়া, যদি—গবর্ণমেণ্ট ও বণিক সম্প্রদায়ের আয়ের প্রধান পন্থা—কৃষির উন্নতির জন্য যত্নপরায়ণ জমীদারগণ সম্মানিত হইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলেই গবর্ণমেণ্ট কৃষির উন্নতির জন্য প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। রাজসম্মান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় অনেক অনুদার, লঘুচেতা জমীদারও প্রকৃত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

কৃষকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিকার্য্য সহায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করে; সুতরাং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অর্থে প্রধানতঃ এই শ্রেণীর লোকের অর্থোন্নতির কথাই বুঝিতে হইবে। কৃষকগণ নিতান্ত দরিদ্র বলিয়াই দেশে দুর্ভিক্ষের এইরূপ প্রাচুর্য্য। ইহারা ঋণ ও খাজনার দায়ে আপনাদের জীবন ধারণোপযোগী খাদ্য সঞ্চিত রাখিতে না পারিয়া, উৎপন্ন শস্য অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে। যখন তাহাদের বহুশ্রমার্জ্জিত ধান্যাদি জাহাজে বোঝাই হইয়া বিদেশে যাইতে থাকে, সে সময়ে তাহারা উদর জ্বালায় হাহাকার করিতে করিতে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়। দারিদ্র্যবশতঃ তাহারা পুরা ফসলের বৎসরেও উদরপূর্ত্তির উপযুক্ত খাদ্য

পায় না। ইহাতে কৃষককুল ক্রমশঃ হীনবল হইয়া আসিতেছে। উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রাদি সংগ্রহ বা নূতনরূপ ফসল আবাদের পরীক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় ও সময়ক্ষেপ করা দূরে থাক, অর্থের অনাটনে তাহারা জমীতে উপযুক্তরূপ সার দিতে পারে না, কৃষির উপযুক্ত গো মহিষাদি প্রতিপালন করিতে পারে না, এবং কৃষির প্রয়োজনীয় জল সেচনাদিরও ব্যবস্থা করিতে পারে না।

সকল সভ্যদেশে কৃষির ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হইতেছে, কিন্তু দারিদ্র্য নিবন্ধন আমাদের দেশের কৃষি ক্রমাগত অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতি বিঘা জমীতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, আমাদের ভারতমাতা স্বর্ণপ্রসূ হইলেও, এখানকার জমীতে তাহার অর্দ্ধেক ফসল উৎপন্ন হয় না। ঐ সকল দেশের একজন কৃষক অক্লেশে যে পরিমাণ জমী চাষ করিতে পারে, দারুণ পরিশ্রম করিয়াও আমাদের দেশের পাঁচজন কৃষকও সে পরিমাণ জমী চাষ করিতে পারে না।

কৃষির অবনতিতে আমাদের দেশ বিবিধ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। পৃথিবী অল্প শস্যশালিনী হইতেছেন দেখিয়া আমাদের দেশের লোক যুগ-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। ভারতভূমিই তাহাদের নিকট পৃথিবী; সুতরাং অপর দেশ যে ক্রমশঃ কিরূপ অধিক শস্য উৎপাদনে সক্ষম হইতেছে, তাহারা তাহার সংবাদ রাখে না। বিদেশীয়গণ অর্থ বলে আমাদের নিকট হইতেই যে ভূমির সার অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেশের লোক উপলব্ধিই করিতে পারে না। অপর দেশের লোক তাহাদের কৃষকগণের উন্নতির জন্য তৎপর, আর আমরা পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভাবে আমাদের কৃষকগণের সর্ব্বপ্রকার অবনতির কারণ হইতেছি। এখন যে পরিমাণ শস্য দেশ মধ্যে উৎপন্ন হইতেছে, যদি তাহার দেড়গুণ শস্যও উৎপন্ন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে দেশে এ দুর্ভিক্ষাতঙ্ক থাকে না। এদেশের অপেক্ষা অনুর্ব্বর ভূমিতে যদি দ্বিগুণ পরিমাণ শস্য অল্পায়াসে জন্মিতে পারে, তাহা হইলে চেষ্টা করিলে ভারতভূমিতে দেড়গুণ পরিমাণ শস্য উৎপাদনের আশা নিতান্ত কাল্পনিক নহে। কিন্তু চেষ্টা করে কে?

কৃষকগণ দারিদ্র্যবশতঃ জীর্ণ, শীর্ণ ও নিরন্ন। সুতরাং তাহাদের দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা দেশের লোকের একান্ত বিধেয়।

কৃষকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য প্রত্যেক গ্রামে ধর্ম্মগোলা

ও স্থানে স্থানে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন প্রথম কর্ত্তব্য। প্রয়োজনের সময় তাহারা যদি এই সকল গোলা হইতে বীজ ধান্য প্রভৃতি, ও কৃষি ব্যাঙ্ক হইতে অল্পসুদে টাকা ধার পায়, তাহা হইলে তাহাদের গ্রাম্য মহাজনগণের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া সমূহ উপকার করা হয়। আমাদের বিশ্বাস, ধর্ম্মগোলাগুলির কার্য্য প্রকৃত ধর্ম্মগোলার ন্যায় চালিত হইলে কালক্রমে দেশের দুর্ভিক্ষাতঙ্কও বিনষ্ট হইতে পারে।

বস্তুতঃ কৃষির উন্নতি করিতে গেলে, কৃষকের বাহুতে বল সঞ্চারের আবশ্যক, বৃষ মহিষাদির উন্নতি সাধন, সার ও জলসেচনের এবং বীজ রক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত বিহিত; নচেৎ কৃষি বিভাগ, কৃষি বিদ্যালয়, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি প্রদর্শনী মাত্র স্থাপনে কৃষকের বিন্দুমাত্র প্রকৃত উপকার করা হয় না।

শিল্প-প্রদর্শনী।

পাঠকের স্বতঃই মনে হইতে পারে,—ব্যবসায়ীর স্বদেশ-প্রেম না থাকিলে দেশীয় শিল্পের হিতসাধন করা দুরূহ, এবং যৌথ কারবার না হইলে, কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায় না বা কোন ব্যয়সাধ্য শিল্প রক্ষা বা উদ্ধার করা যায় না; সুতরাং সকলেই এ বিষয়ে মনোযোগী হউন ইত্যাদি বাক্য শুনিতে বা বলিতে বেশ; কিন্তু ইহার কার্য্যতঃ উপকারিতা কোথায়? বিশেষতঃ পল্লীবাসিগণ যখন পুরুষ-পরম্পরা-জ্ঞাত কতিপয় শিল্প ব্যতীত অপরাপর শিল্পের কথা আদৌ জানে না, তখন বক্তৃতায় কি হইবে? তাহারা চাষ করিতে, ধান ভানিতে, গো রক্ষা করিতে, তৈল প্রস্তুত করিতে, সূত্রধর প্রভৃতির সামান্য কার্য্য করিতেই জানে। তাহারা এই সব সামান্য অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয় শিল্পের কথাই বেশ জানে ও বেশ বুঝে। অন্য শিল্পের কথা বলিলে, তাহারা স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে পারে—"আবার কি শিল্প চাও! এগুলি ব্যতীত আবার কি শিল্প থাকিতে পারে?"

পাঠক! আপনার পল্লীবাসী বন্ধুকে একবার আগামী শিল্প প্রদর্শনীতে লইয়া যাইবেন। তাঁহাকে প্রদর্শনীর প্রত্যেক অংশ ভাল করিয়া দেখাইবেন। প্রদর্শনী একটী শিক্ষালয়। সেখানে অনেক বিষয় শিখিবার ও জানিবার

থাকে; নানা শিল্পের অবস্থা জানা যায়; কত নূতন শিল্পের সহিত পরিচিত হওয়া যায়; এবং কত অভিনব শিল্পের আভাসও পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে 'জাতীয় মহা সম্মিলনী' (National Congress) যে কয়টি হিতকর কার্য্য করিয়াছে, তন্মধ্যে বার্ষিক রাজনৈতিক সভার সহিত শিল্প-প্রদর্শনীর অধিবেশন একটি।

সভার সহিত প্রতি বৎসর এই প্রদর্শনী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অধিবেশিত হওয়ায় দেশের বিবিধ লোকের শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে। এরূপ শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও শুভপ্রদ।

ভারতবর্ষের শিল্প প্রদর্শনীসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের শেষ কয়বর্ষকে ভারতবর্ষের 'শিল্পযুগ' বলা যাইতে পারে। বড় লাট লর্ড ডেলহৌসি লোকহিতকর অনেকগুলি কার্য্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আমলে ভারতবর্ষে বহু নব শিল্পের আবির্ভাব হয়। ১৮৫৩ সালে ভারতবর্ষে প্রথম রেলের সৃষ্টি হয়; এবং তাহা সমুদ্রোপকূলের কিয়ৎ ক্রোশ ব্যাপিয়া অর্থাৎ বোম্বাই হইতে টান্না পর্য্যন্ত বসে। ১৮৫৪ সালে পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের সৃষ্টি হয়; গ্যাঞ্জেস কেন্যাল দিয়া সর্ব্বপ্রথম নৌকাদি যাতায়াত করে। ১৮৫৫ সালে কলিকাতা ও মান্দ্রাজে রেল খোলা হয়। এই বর্ষে যখন ভারতবর্ষের রাজধানী সমূহে সরকারের পরিচালনায় ও স্থানীয় লোকের সাহায্যে প্রথম শিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়, তখন কেহই স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, অচিরকালমধ্যে ভারতবর্ষে লোমহর্ষণ সিপাহি বিদ্রোহ ঘটিয়া ভারতীয় শিল্প সমূহের নব অভ্যুদয়ে সাময়িক বাধা প্রদান করিবে। এই প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষের বহু প্রদর্শক আসিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের জন্য বিশেষজ্ঞ পরিদর্শকগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেবল পুরস্কার বিতরণ করাই ইহাদের একমাত্র কার্য্য ছিলনা, প্রদর্শনীর রিপোর্ট বা বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাঁহাদের একটি প্রধান কার্য্য ছিল। ইহাঁদের লিখিত বিবরণ এখনও আছে। আজ এই অর্দ্ধ শতাব্দীর পরেও সেই সব বিবরণীতে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় পাওয়া যায়।

শিল্প প্রদর্শনী দেশের যাবতীয় শিল্পের একটি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত প্রতিচিত্র এবং তাহার বিবরণী একটি মূর্ত্তিমান ফটোগ্রাফ স্বরূপ।

উপরোক্ত প্রদর্শনী বিবরণী পাঠে আমরা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের ভারতীয় শিল্পের জলন্ত চিত্র দেখিতে পাই। তাহাতে বুঝিতে পারি যে, আধুনিক

কালে ভারতবাসীগণ যদিও তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ হইতে শিল্প বিষয়ে বিশেষ উন্নত নহেন, তথাপি তাঁহাদের শিল্প বিষয়ে জ্ঞান ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবাসিগণ উক্ত প্রদর্শনী সমূহে তাঁহাদের পিত্তল নির্ম্মিত, মৃত্তিকা নির্ম্মিত, হস্তে প্রস্তুত কারুকার্য্যময় বস্ত্রাদি ও ঐরূপ অন্যান্য অতীব সুন্দর অথচ বহুপ্রকারত্ব বর্জ্জিত যে সকল দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শণ বা প্রমাণ পাই না। ১৯০৩-৪ সালে মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসম্মিলনীর শিল্প প্রদর্শনীর যে অধিবেশন হয়, তাহার সহিত অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের প্রদর্শনীর তুলনা করিলে যথেষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি হইবে। এই পরবর্ত্তী প্রদর্শনীতে ভারতবাসিগণ যাবতীয় প্রকারের ভালমন্দ বহুসংখ্যক দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলেন। লৌহনির্ম্মিত সুদৃঢ় সিন্দুক হইতে রেশম নির্ম্মিত স্প্রিংয়ের সুদৃশ্য গহনাধার, কারুকার্য্যময় বৃহৎ যান হইতে খেলিবার গাড়ী, সুগন্ধের অতি মনোহর আধার হইতে মিউনিসিপালের ময়লা নাশের দ্রব্যাদি, পনীর পাত্র হইতে কালীর বোতল পর্য্যন্ত সমুদায় দ্রব্যই প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৮৫৫ সালে এই নগরে যে প্রদর্শনী হয়, তাহাতে স্থাপত্য শিল্পের পরিদর্শকগণ (ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই মান্দ্রাজ রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন) ভারতবাসীগণের উক্ত শিল্প আদৌ না পাঠাইবার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া বিবরণীতে লিখেন যে, ভারতবাসিগণ পূর্ব্বাপর যে সকল যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, তখনও তাহাদের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না হওয়ায় এবং দেশের কুসংস্কার ও আরও কয়েকটি কারণে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, "যে সকল কারণ ভারতবর্ষে উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়াছে, শিক্ষা ও ব্যক্তিগত উদ্যমে সে সমুদায় ক্রমে লোপ পাইবে।"—১৮৫৫ সালের প্রদর্শনীতে যে অনেক সুফল ফলিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৮৫৭ সালে—সিপাহি বিদ্রোহের ঠিক তিন মাস পূর্ব্বে—মান্দ্রাজে যে একটি প্রদর্শনী বসে, তাহাতে পরিদর্শকগণ স্থাপত্য-শিল্পের অনেক উন্নতি দেখেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন ঃ—

"এই মান্দ্রাজের ও যে সকল স্থানে য়ুরোপীয় প্রণালীতে কার্য্যাদি হয় তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসিগণ য়ুরোপীয় প্রণালীর উৎকর্ষ ও আধুনিক বিজ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিতেছে। এই প্রদর্শনীতে ভারতবাসিগণ যে সকল দ্রব্য পাঠাইয়াছেন, তৎসমুদয়ই ইহার প্রমাণ স্থল। য়ুরোপীয় প্রণালীর অনুকরণে অনেক শিল্প কতক কৃতকার্য্য হইয়াছে, আবার কতক বা অসম্পূর্ণ

রহিয়াছে। যদি ভারতবাসিগণ উৎসাহ পাইতে থাকেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে য়ুরোপীয় যন্ত্রাদির বহুল প্রচার হয়, তবে কয়েকবর্ষ মধ্যে তাঁহারা যে স্থাপত্য বিদ্যায় (বিশেষতঃ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে) যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন; তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই।”

এই সকল পরিদর্শকগণের কেহই বোধ হয়, আজ জীবিত নাই। তাঁহারা যদি ১৯০৩—৪ সালের মান্দ্রাজের প্রদর্শনী দেখিতে পাইতেন, তবে বলিতে পারিতেন, ভারতের বৃহৎ নগরীসমূহে যেরূপ ভাবে কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে তাঁহারা যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। আজকাল বৃহৎ নগরী সমূহে যেরূপ শিল্পোন্নতি হইতেছে, তৎসমুদয় যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রদর্শনী সমূহের একটি ফল, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই।

অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বে যেমন শিল্প প্রদর্শনী বসিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ কৃষি-প্রদর্শনীও বসিয়াছিল। কয়েক বর্ষ ধরিয়া এরূপ প্রদর্শনীর অনেকগুলি অধিবেশন হয়। কিন্তু ইহা বড়ই ব্যয়সাধ্য বোধে পরবর্ত্তী সিবিলিয়ণগণ ইহার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন। কয়েকজন বড়লাট ভারতবর্ষের কয়েকটি উপকার করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু লর্ড ডেলহৌসির ন্যায় তাঁহাদের যথেষ্ট সাহস না থাকায় তাঁহারা কৃষিপ্রদর্শনীর তিরোধানের অল্পবিস্তর সাহার্য্য করিয়াছেন। মান্দ্রাজে যে কৃষিপ্রদর্শনীর শেষ অধিবেশন হয়, তাহাও আজ বিশ বৎসর পূর্ব্বে।

১৮৬০ সালে ল্যাঙ্কেসায়ারের তুলার কারবার একেবারে বন্ধ হওয়ায় বোম্বায়ে তুলার কারবার হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্গে আরও অনেক শিল্পের উন্নতি হইতে থাকে। এজন্য বোম্বাইবাসিগণ একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর অধিবেশন করিবার অভিলাষ করেন। কিন্তু আবার ল্যাঙ্কে-সায়ারের তুলার কারবার বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈরামজি কামা নামা জনৈক ধনী পার্শীর ত্রিশ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের অধিক অর্থ ক্ষতি হয়। এইরূপ আরও অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইহাতে ব্যবসায়িগণের দুর্দ্দশা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ঈপ্সিত প্রদর্শনীর অধিবেশনের বাসনা একেবারে পরিত্যক্ত হয়। ১৮৮৪ সালে কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর একটি অধিবেশন বেশ সাফল্য লাভ করে। ১৯০৩ সালে দিল্লী দরবারের সহিত একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। এই সকল প্রদর্শনী যে অনেক শুভফল প্রসব করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে, জাতীয় মহাসম্মিলনীর

সহিত প্রতি বৎসর শিল্প প্রদর্শনীর অধিবেশন হওয়ায় দেশীয় শিল্প সম্বন্ধে সরকারের অতিরঞ্জিত ও অসত্য বিবরণ প্রকাশিত না হইয়া প্রকৃত সত্য বিবরণ পাওয়া যাইবে। এরূপ উদ্যম খাঁটী ভারতীয় এবং ভারতবাসীর আত্মশক্তির একটি নিদর্শন। মহাসম্মিলনীর প্রদর্শনী ১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রথম খোলা হয়। ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন ১৯০২ সালের ডিসেম্বরে আমেদাবাদে ও তৃতীয় অধিবেশন ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে মান্দ্রাজ সহরে হয়। দেশীয় শিল্প যে ক্রমশই উন্নতিলাভ করিতেছে, এই তৃতীয় অধিবেশনে তাহা সকলে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। মান্দ্রাজের অধিবেশনটি অন্যান্য অধিবেশন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। আমরা আশা করি, এরূপ অধিবেশন প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া ভারতবাসীর শিল্পোন্নতির সহায়তা করিতে থাকিবে। ১৯০৫—৬ সালে কাশীতে যে অধিবেশন হয়, তাহা মান্দ্রাজের অধিবেশন অপেক্ষাও পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহাতে ভারতবাসীর স্বাধীন প্রচেষ্টার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। আশা করি ১৯০৬-৭ সালের কলিকাতার অধিবেশনে আমরা বাঙ্গালী শিল্পীর নব নব স্বাধীন চেষ্টার প্রমাণ পাইব।

প্রদর্শনী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে, তাহাকে প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত করিতে হয় (১) স্থাপয়িতৃগণ (Organisers), (২) প্রদর্শক ও (৩) দর্শক। প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা একে একে বলিতেছি।

স্থাপয়িতৃগণের প্রতি এই বক্তব্য যে, প্রদর্শনীর অধিবেশন করা স্থিরীকৃত হইলেই যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। যাঁহারা ইহার একবার অধিবেশন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহাতে কত অধিক পরিশ্রম ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। শেষ মুহূর্ত্তে প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি আসিয়া পৌঁছিলে কি বিপদে পড়িতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। প্রদর্শনী সুন্দররূপে সজ্জিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা উহার উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়। আবার কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে অযথা বিলম্ব হইলে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য; সুতরাং কার্য্যারম্ভের বৃথা বিলম্ব করা অতীব অন্যায়। প্রাদেশিক শিল্পীদিগকে উহার অধিবেশনের কথা জানাইতেও যথেষ্ট সময়ের দরকার। সুতরাং তাহাদিগকে বিলম্বে সংবাদ দিলে যথাসময়ে প্রদর্শনীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া উঠে না, কাজেই তাড়াতাড়ি করিতে হয় ও শেষ মুহূর্ত্তে দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়, আবার অনেক দ্রব্যও বা যথাসময়ে পৌঁছিতে পারে না। ১৮৫১ সালে লণ্ডননগরে যে মহতী

প্রদর্শনীর অধিবেশন হয়, তাহার কার্য্য দুই বৎসর পূর্ব্বে আরব্ধ হয়। ১৮৪৯ সালে স্থিরীকৃত হয় যে, লণ্ডনে একটি প্রদর্শনী বসাইতে হইবে। তাহার পর ইহার কয়েক মাস পরেই অর্থাৎ ১৮৫০ সালের ৩রা জানুয়ারি হইতে চাঁদা আদায় আরম্ভ হয়, এবং তাহার ঠিক ষোল মাস পরে অর্থাৎ ১৮৫১ সালের ৩রা মে প্রদর্শনী খোলা হইল। এই প্রদর্শনী ছয় মাস খোলা ছিল। কাজেই যদি ইহার কোন অসম্পূর্ণতা থাকাও সম্ভব ছিল, তবে তাহা সংশোধন করিবার অনেকটা সময় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে যে সকল প্রদর্শনী বসে, তৎসমুদয় কয়েক দিন মাত্র খোলা থাকে; সুতরাং ইহার সমস্ত অসম্পূর্ণতা পূর্ব্বাহ্নে না সংশোধন করিলে, অধিবেশন বিফল হইয়া যায়। সে জন্য যত শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করা যায়, ততই মঙ্গল। আর এক কথা, দর্শকের সুবিধার জন্য শিল্প সমূহের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী করিয়া বিজ্ঞাপনে (বা সাইনবোর্ডে) ইংরাজী ও দেশী বড় বড় অক্ষরে সেই সেই শ্রেণীর নাম লিখিয়া রাখা উচিত। যেমন তাণ্ডব শিল্পের শ্রেণীতে "তাণ্ডব শিল্প", স্থাপত্য শিল্পের শ্রেণীতে "স্থাপত্য শিল্প", এইরূপ প্রতি শ্রেণীতে তাহার নাম লিখিয়া দিলে দর্শকের বিশেষ সুবিধা হয়। শিল্প-সমূহের যে তালিকা বাহির হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ বিবরণী বা মনোরম টিপ্পনী থাকা প্রয়োজন; কিন্তু তাহা যত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই ভাল। ১৯০৩—৪ সালের মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতে শিল্পসমূহ বেশ সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল, এবং সাধারণে যে তালিকা বিক্রীত হয়, তাহাতে প্রদর্শিত প্রত্যেক শিল্পের নাম ছিল। ২৭ পৃষ্ঠা হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

রেজিষ্টার্ড নং।	প্রেরকের নাম।	দ্রব্য বিবরণী।	ধারাবাহিক নং।
৪৬৭	ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স লিমি কলিকাতা	১ জোড়া মোজা	২৮৩৪
৪৬৭	ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স লিমি কলিকাতা	১ সোয়েটার (পশমী)	২৮৩৫
৪৬৭	ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স লিমি কলিকাতা	৬ জেরসে (পশমী)	২৮৩৭
৪৬৭	ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স লিমি কলিকাতা	৩ বালাক্লাভা ক্যাপ (পশমী)	২৮৩৮
৪৬৭	ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স লিমি কলিকাতা	২ জোড়া পশমী দস্তানা	২৮৩৯

তিন পৃষ্ঠা ধরিয়া এই প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর প্রদর্শিত দ্রব্যের বিস্তৃত তালিকা ছিল। যাবতীয় তাণ্ডব শিল্পের ১২ পৃষ্ঠা তালিকা ছিল। এরূপ বিস্তৃত তালিকার কিছু প্রয়োজন ছিল না। ইহা অনেকটা বস্ত্র ব্যবসায়ীর বা নিলামে বিক্রেয় দ্রব্যের তালিকার ন্যায়। ইহা অতি সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। তিন পৃষ্ঠার ব্যাপার একছত্রেই সারা যায়ঃ—

রেজিষ্টার্ড নং।	প্রেরকের নাম।	দ্রব্যের বিবরণী।	ধারাবাহিক নং।
৪৬৭	ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স লিমি কলিকাতা	পরিচ্ছদ প্রভৃতি	২৮৩৪ ৪১১১

তালিকা এরূপ সংক্ষিপ্ত হইলে, যে সকল শিল্প দেখিলে সহজে তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় না, এরূপ শিল্প সমূহের জ্ঞাতব্য বিবরণী প্রকাশের অনেকটা স্থান পাওয়া যায়। অবশ্য প্রতি দ্রব্যেই টিকিট মারিতে হইবে। অনুসন্ধিৎসু দর্শক যাহাতে তালিকা পুস্তক হাঁটকানের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, এজন্য সে টিকিট গুলি প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণের সহিত পরিষ্কার অক্ষরে লিখিত হওয়া প্রয়োজন। প্রদর্শিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অবশ্য একটি বিস্তৃত তালিকার প্রয়োজন আছে; কিন্তু তাহা সাধারণে বিক্রয় না করাই ভাল। আর এক কথা, যে সকল শিল্প অসিদ্ধ, যে সকল আবিষ্ক্রিয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ও যে সকল চিত্র সুকুমার শিল্প হিসাবে মূল্যহীন বোধ হইবে, সে সমুদয় অপকৃষ্ট দ্রব্য প্রদর্শনীতে রক্ষিত হওয়া কখনই বাঞ্ছিত নহে। প্রদর্শনীতে যে সকল দ্রব্য রক্ষিত হইবে, তাহা সকলের আদর্শ-স্বরূপ হওয়া আবশ্যক। কারণ, অপকৃষ্ট শিল্প প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও স্বার্থকতা নষ্ট করে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত দ্রব্যসমূহ একেবারে নির্দ্দোষ বা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। কারণ, এ দেশের লোকে এখনও প্রদর্শনীর মূল্য বুঝে নাই। পাছে ভবিষ্য প্রদর্শকগণ সাহস হারাইয়া ফেলেন, পাছে প্রদর্শনী অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে স্থাপয়িতৃগণ অনেক অপকৃষ্ট দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। প্রদর্শনীর এরূপ একটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, ইহা দেশীয় ব্যক্তিগণের স্বীয় স্বীয় শক্তি ও বুদ্ধি প্রকাশের সহায়তা করে। কিন্তু প্রদর্শকগণের বুঝা উচিত যে, তাঁহাদের দ্রব্য উৎকৃষ্ট হইলে প্রদর্শনীতে গৃহীত হইবে, এবং তাহাতে তাঁহাদের সম্মান বোধ হওয়া দরকার; তাঁহাদের ইহাও বুঝা উচিত যে, তাঁহাদের প্রেরিত দ্রব্য গৃহীত না হইলে, নিশ্চয়ই তাহাতে কোন দোষ আছে, সেজন্য তাঁহাদের লজ্জা বোধ হওয়া দর-

কার। আর একটা কথা, লোক শিক্ষার্থ যত অধিক সম্ভব লোক আকর্ষণ করা প্রদর্শনীর একটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। তবে শিক্ষনীয় বিষয়ে লোকে যত আকৃষ্ট না হয়, আমোদের বিষয় সকলে তত আকৃষ্ট হয়। কল-কব্জা ইত্যাদি শিক্ষনীয় বিষয়ের সহিত অবশ্য আমোদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তবে ইংলণ্ডের পল্লী গীর্জ্জার সম্বন্ধেই একটা কথা আছে --

"যে আমোদ করিতে আসিয়া ভজনা আরম্ভ করে, সে ব্যক্তি নির্ব্বোধ।" সুতরাং যাহারা কেবল আমোদ করিতে প্রদর্শনীতে আসে, তাহারা কল-কব্জা দেখিয়া তাহার প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সমূহ জানিয়া ঐরূপ নির্ব্বোধ সাজিলেও সাজিতে পারে। আর একটা কথা এই যে, যে সকল দ্রব্য আদৌ শিক্ষনীয় নহে, সে সমুদয় প্রদর্শনীতে গৃহীত না হওয়াই উচিত। আবার যে সকল বহু-মূল্য দ্রব্য অল্পেই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সে সমুদয় প্রদর্শনীতে প্রেরণ করা তত যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, প্রদর্শনী-গৃহ তেমন সুন্দররূপে প্রস্তুত হয় না। এজন্য বহুমূল্য দ্রব্যাদি বড়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকে। প্রতিদিন যে হাজার হাজার দর্শক আসেন, তাহাদের মধ্যে অসাধু থাকাও সম্ভব। এই সকল ব্যক্তি দিনে যাহা দেখিলেন, রাত্রে যে সে সমুদায়ে হস্তক্ষেপণ করিবেন না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? সেজন্য প্রদর্শনী-গৃহ নির্ম্মান একটি দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্য। তাহা এমন ভাবে নির্ম্মিত হওয়া দরকার, যেন তন্মধ্যে বৃষ্টি না পড়িতে পারে। কারণ, হঠাৎ যদি বৃষ্টি হয়, এবং তাহা মসলিন প্রভৃতির ন্যায় সুদৃশ্য ও বহুমূল্য অথচ অল্পে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা এরূপ দ্রব্যে পতিত হয়, তবে সে সমুদয় নষ্ট ত হয়ই, অধিকন্তু প্রদর্শকের যথেষ্ট ক্ষতি হয় ও সেই শিল্পের উন্নতির পথেও বাধা দেওয়া হয়। সেই জন্য প্রদর্শনী গৃহ বৃষ্টির অভেদ্য হওয়া দরকার, আবার সেই সঙ্গে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাতের হাত হইতে উদ্ধারের উপায় পূর্ব্বাহ্নে করিয়া রাখাও প্রয়োজন।

স্থাপয়িতৃগণের প্রতি আমাদের এই শেষ বক্তব্য যে, সুশৃঙ্খলায় কার্য্য করা তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহাদিগের মধ্যে যত অধিক সংখ্যক সভ্য হয়, ততই ভাল; কারণ তাহাতে প্রয়োজনের সময় চাঁদা আদায়ের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য সংখ্যা যত কম হয়, কার্য্যের ততই সুবিধা হয়। এমন কি একজনের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়া অপরে তাঁহার আদেশানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার লইলে, কার্য্য অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হয়। আর প্রদর্শনীর ন্যায় এরূপ একটি বৃহৎ ব্যাপারে প্রধা-

নতঃ একজনের হাত থাকা প্রয়োজন; এবং তাহাতে তিনি মনোমত করিয়া কার্য্যটি করিতে পারেন। অধিবেশনের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, কার্য্যের মাত্রা ততই বাড়িয়া যায়, শেষে এমন হয় যে, কথা কহিবারও সময় থাকে না। এরূপ সময়ে দশজনের সহিত পরামর্শের আদৌ সময় থাকে না; সুতরাং পুর্ব্বাপর একজনের আদেশমত কার্য্য করিলে এ সময় বিশৃঙ্খলের কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রদর্শনী একটি বৃহৎ ও মহৎ ব্যাপার। ইহাতে এইরূপ কার্য্যবিভাগ বিশেষ প্রয়োজন। আধুনিক কালের দেশীয় নেতৃবর্গের এ বিষয়টি একবার ভাল করিয়া বুঝা উচিত।

প্রদর্শকগণের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, তাঁহাদের প্রদর্শিত দ্রব্য উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবার জন্য প্রদর্শনী খোলা হয় নাই, পরন্তু ভারতবর্ষে শিল্প কত উৎকৃষ্ট অথচ কত সস্তা হইতে পারে, ইহা জন সাধারণের নিকট বিজ্ঞাপনের জন্য প্রদর্শনী অধিষ্ঠিত হয়। সত্য প্রদর্শনীতে অনেক দ্রব্যই বিক্রয় হইয়া যায়; কিন্তু তাহা বলিয়া কতকগুলি দ্রব্য উচ্চ মূল্যে না বিক্রয় করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য কত সস্তায় বিক্রীত হইতে পারে, তাহাই লোককে জানান উচিত। ইহাতে তাঁহাদের উপকার ভিন্ন অপকার নাই। কিন্তু অনেকেই এ কথাটা একেবারেই ভুলিয়া যান। তাঁহাদের ইহাও মনে রাখা উচিত যে, অধিকাংশ লোকে দ্রব্যাদি কেবল দেখিতেই আসে কিনিতে আসে না। এরূপ অবস্থায় যাহাতে দ্রব্যের মূল্য-হীনতায় ও সৌন্দর্য্যে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহাই চেষ্টা করা প্রতি প্রদর্শকেরই উচিত। আরও একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন, প্রতি দ্রব্যের কেবলমাত্র নাম না লিখিয়া তৎসম্বন্ধে যথাসম্ভব জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়া রাখা উচিত। মনে করুন যদি সাইন বোর্ডে কেবল এই টুকু লেখা থাকে, 'কাষ্ঠ' তবে লোকে তৎপ্রতি আদৌ আকৃষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু যদি লেখা থাকে, "কাষ্ঠ—২৫ ফিট ২ ইঞ্চি পরিধি" তবে গাছটা কত বড় ছিল, তাহার আভাস পাইবার জন্যও একবার কাষ্ঠটা দেখিবার আগ্রহ জন্মিতে পারে। আবার দর্শকগণের নির্দ্দোষ মন্তব্য শুনিয়া প্রদর্শকগণের কর্ত্তব্য শিক্ষা করা উচিত। যখন তাঁহারা প্রদর্শনীর দ্রব্যের নিকট দাড়াইয়া থাকেন, তখন কেহই তাঁহাদিগকে প্রদর্শক বলিয়া চিনিতে পারে না; সুতরাং দর্শকগণ অহঙ্কারে স্বীয় স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন। এরূপ মন্তব্য শুনিয়া বাস্তবিক তাঁহাদের কিছু কর্ত্তব্য আছে কিনা, সরল মনে তাহা ভাবা উচিত, এবং যদি কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে, তাহা সংশোধনের চেষ্টা করাও উচিত।

অধিকাংশ দর্শকগণের প্রতি আমাদের বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। ১৯০৩।৪ সালের মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতে একটী বেশ আমোদজনক ব্যাপার ঘাটিয়াছিল। মান্দ্রাজ পাগলা গারদের একটি পাগল তাহার একটি দ্রব্য প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিল। এই দ্রব্যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য কিছু ছিল না। কিন্তু তৎপ্রতি সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে একটি কাষ্ঠ ফলকে একটি ব্রাহ্মণ ও একটি ব্রাহ্মণীর মূর্ত্তি আঁকিয়া আনিয়াছিল। তুলা পরিষ্কার করিবার বিচিত্র কল লোককে যত না আকৃষ্ট করিয়াছে, ময়লা ফেলিবার গাড়ীর প্রতি লোকের যত না লক্ষ্য হইয়াছে, কারুকার্য্যময় অতি সুন্দর যান দেখিতে লোকে যত না আগ্রহ দেখাইয়াছিল, সেই পাগলের দ্রব্য দেখিবার জন্য বাস্তবিকই সকলে ততোধিক পাগল হইয়াছিল। রমণীগণ আমাদের জন্য আসেন। তাঁহারা ভিড় ঠেলিতে বিচিত্র দ্রব্য দেখিয়া হাঁ করিয়া থাকিতে, এবং পাগলের কার্য্য দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিতে বড়ই মজবুত। আমাদের পল্লীবন্ধু কিন্তু স্ত্রীলোকদের ন্যায় কেবল আমোদ করিবেন না। তিনি কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি বেশ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করুন; বুঝুন, কোন শিল্পটি তাঁহাদের গ্রামে বা জিলায় বেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে। তাঁহার যেন সর্ব্বদা মনে থাকে, "আমি যে এখানে আসিয়াছি, তাহা কেবল আমার নিজের আমোদের ও নিজের শিক্ষার জন্য নয়। আমি আমার পল্লীর ও বসবাসীর উপকারের জন্য আসিয়াছি।"

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

চীনদেশের ব্যবহারের নিমিত্ত তুলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

জাতি।—বঙ্গদেশে নানা জাতির তুলার চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতির তুলা, মিশর দেশীয় তুলা, মার্কিন দেশের তুলা এবং কোন কোন দ্বীপের তুলা; ওই সমস্ত রকমের তুলারই চাষ করিয়া দেখা গিয়াছে। কিন্তু এ প্রদেশে এ পর্য্যন্ত বিদেশী তুলার চাষ সম্বন্ধে যে সমস্ত পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে হয় একেবারেই কোন ফল পাওয়া যায় নাই,

বা যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা তেমন সন্তোষজনক নহে। এই বিভাগ চাষীদিগকে ঐ সকল বিদেশী তুলার চাষের কাজে হাত দিবার পরামর্শ দিতে পারিতেছেন না। কিন্তু দুই রকমের তুলার চাষ করিয়া ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে, এবং ঐ দুই রকম তুলার চাষ করিবার পরামর্শ দিতে পারা যায়। এই দুই রকমের তুলার নাম—

(১) বুড়ী কার্পাস। এক্ষণে সিংভূম, মানভূম এবং অপর কয়েকটী জিলায় এই তুলার চাষ হইতেছে। এবং

(২) বঙ্গদেশে জন্মান ধারওয়ার।

এই দুই জাতির তুলারই বেশ ফসল হয় এবং লম্বা আঁইস হয়; এবং ঐ তুলা ভারতবর্ষ ও বিলাত এই দুই দেশের সূতার কলেই বিক্রয় হইতে পারে।

২। বুড়ী কার্পাসের গাছে সচরাচর একর প্রতি ৪০০ পৌণ্ড তুলা ও বীজ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু যত্ন করিয়া চাষ করিলে ৮০০ হইতে ৯০০ পৌণ্ড পর্য্যন্ত জন্মান যাইতে পারে। সম্প্রতি উড়িষ্যায় বঙ্গদেশে জন্মান ধারওয়ার তুলার চাষ করিয়া একর প্রতি ৬ মণেরও অধিক, অর্থাৎ প্রায় ৫০০ পৌণ্ড তুলা ও বীজ পাওয়া গিয়াছে। এই যে ফসল জন্মিয়াছে ইহা কেবল একটু সামান্য গোবরের সার দিয়া পাওয়া গিয়াছে। কটকের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে এই জাতির তুলার চাষ করিয়া একর প্রতি প্রায় ৮০০ পৌণ্ড বীজ ও তুলা পাওয়া গিয়াছে।

৩। জমী।—জলনিকাশের যদি ভাল বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে প্রায় সমস্ত জমীতেই বুড়ী কার্পাস জন্মায়। ধারওয়ার তুলা যে কোন এঁটেল বা দোআস মাটিতে জন্মায়; কিন্তু জল নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত থাকা চাই। চাষীকে বুঝিতে হইবে যে, জমীর জলনিকাশের ভাল বন্দোবস্ত করাই সকলের অপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথা। মাটী ভিজা থাকিলে তুলার গাছ নষ্ট হইয়া যায়। জমীর জলনিকাশের যদি ভাল বন্দোবস্ত না থাকে, তাহা হইলে উহাতে আইল তুলিয়া ঐ আইলের উপর বীজ বুনিতে হইবে; দুইটী আইলের মাঝে এক একটী জল বাহির হইবার নালা থাকিবে। ক্ষেত যদি গড়েন জমীতে না হয়, তাহা হইলে আইলগুলি এক হাত উঁচু করিতে হইবে। ছোটনাগপুরের উঁচু জমীতে, অথবা ছোটনাগপুর বা সাঁওতালপরগণার পাশের জিলাগুলিতে পাহাড়ের তলায় বুড়ী কার্পাসের বেশ চাষ হইতে পারে। এই সকল অঞ্চলে এমন অনেক বড় বড় জমী পড়িয়া আছে যাহাতে তুলার চাষ করিলে বেশ লাভ হইতে পারে।

৪। পাইট।—তুলার গাছের শিকড় মাটীর ভিতর অনেক দূর নীচু পর্য্যন্ত যায় বলিয়া গভীর করিয়া লাঙ্গল দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। সচরাচর জমীর উপরিভাগ আঁচড়াইয়া বীজ বুনা হয়, ইহা যথেষ্ট নহে। জমীতে এধার ওধার করিয়া ৬ বার বা ৮ বার লাঙ্গল দিয়া মাটী সম্পূর্ণরূপে গুঁড়াইয়া ফেলিতে হইবে। জমী যদি গড়েন হয় তাহা হইলে ভালই। জমী যদি গড়েন না হয় তাহা হইলে ৩ ফুট অন্তর অন্তর এক হাত উঁচু করিয়া আইল করিয়া দিতে হইবে। দুইটী আইলের মধ্যে একটী জল বাহির হইবার নালা থাকিবে।

৫। সার দেওয়া।—গোবর ভাল করিয়া পচাইয়া সারের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। উহার সঙ্গে ছাই ও চূণ মিশাইতে হইবে। শেষ বার লাঙ্গল দিবার, এবং বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সার দিতে পারিলেই ভাল হয়। যদি কেবল তুলারই চাষ করা হয়, তাহা হইলে যে সারি ধরিয়া বীজ বুনা হইবে কেবল সেই সেই সারি ধরিয়া সার দিলে সারের অপচয় হইবে না। তুলা তুলিয়া লইবার পর গাছগুলির শিকড় ডাঁটা ও পাতা মাটীতে চষিয়া ফেলা যাইতে পারে। চাষীর যদি কৃত্রিম সার ব্যবহার করিবার সঙ্গতি থাকে তাহা হইলে উপদেশের নিমিত্ত কৃষিবিভাগে প্রার্থনা করিবেন।

৬। বুনা। গোবর, মাটী ও জল মিশাইয়া কাদার মত করিয়া সেই কাদায় বীজ মিশাইয়া, বীজ বুনার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাতে যে কেবল অঙ্কুর বাহির হইবার সুবিধা হয় তাহা নয়। ইহাতে বুনিবারও সুবিধা হয়, কেননা ঐরূপ না করিলে বীজগুলি একত্র জমাট বাঁধিয়া যায়। এক একর জমিতে ৬ পৌণ্ড বা ৩ সের বীজ, বা বাঙ্গালা এক বিঘা জমীতে ১ সের বীজ বুনিলেই যথেষ্ট হইবে। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে এপ্রিল মাসের শেষে বা মে মাসে বীজ বুনিতে হইবে। অন্ততঃ বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বুনিতে হইবে। মাটী যদি বেশী শুষ্ক হয় তাহা হইলে ছেঁচ দিতে হইবে। বীজ ভাল করিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। তিন ফুট অন্তর অন্তর দুই তিনটী বীজ এক সঙ্গে বুনিতে হইবে। গাছ বাহির হইলে ফাঁক ফাঁক করিয়া দিতে হইবে। যেখানে বীজ বুনা হইয়াছিল সেইখানে খুব তেজাল গাছগুলি রাখিয়া দিয়া, অন্যান্য গাছগুলি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। চারাগাছগুলি ছোট থাকিবার সময় সহজেই নষ্ট হইয়া যায়, এবং পোকা লাগিয়া বা বেশী বৃষ্টি হইয়া ঐগুলির হানি হইতে পারে। যে চারাগাছের হানি হইয়াছে বা যে বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই, তাহার পরিবর্ত্তে নূতন বীজ বুনিতে হইবে।

৭। দোকর ফসল তোলা।—চাষী যদি তুলার সঙ্গে আর কোন রকম ফসল জন্মাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি কুলথি, উরিদ, মুগ, অরহরিয়া সেম, শণ্ বা ধইঞ্চা জন্মাইবেন; কারণ ঐ সকল ফসল জন্মাইলে জমীতে তুলা-গাছের খাদ্যের উপযোগী জিনিস বাড়ে।

৮। নিড়ান ও কোদলান —ছোট চারাগুলি সাবধানে নিড়াইতে হইবে, এবং উহাদের মাঝখানকার মাটী একবার কি দুইবার কোদলাইতে হইবে। গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাঝখানকার জমীতে শেষ একবার লাঙ্গল দিতে বা উহা কোদলাইতে হইবে।

৯। ছেঁচ দেওয়া।—সামান্য চাষীর পক্ষে ছেঁচ দেওয়া সম্ভব নহে। দরকার হইলে বীজ বুনিবার সময় জল দেওয়া যাইতে পারে। দরকার হইলে গাছগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া বসাইবার ঠিক পরেও জল দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বীজ বুনিবার অন্ততঃ এক মাস পরে ইহা করিতে হইবে। ইহার পরও একবার কি দুইবার জল দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সাবধান হইয়া দেখিতে হইবে যে, গাছগুলির শিকড়ের চারিধারে জল জমিয়া থাকে।

১০। তুলা তোলা।—ফলগুলি সম্পূর্ণ পাকিয়া ফাটিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত তুলা যেন তোলা না হয়। কিন্তু তৈয়ারি হইলেই উহা তুলিতে হইবে। তুলা মাটীতে পড়িতে বা বাতাসে উড়িয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। মজ্ঞিত করিবার পুর্ব্বে তুলা রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। তুলার গাছ ভরিয়া ফল বাহির হইলে ক্ষেতের যে গাছগুলি সকলের অপেক্ষা তেজাল দেখা যায় এবং যাহাতে সকলের অপেক্ষা বেশী ফল হইয়াছে দেখা যায়, সেইগুলি বাছিয়া তাহাতে দাগ দিতে হইবে। এই সকল গাছ হইতে যে বীজ পাওয়া যায়, তাহা পর বৎসর বুনিবার নিমিত্ত সাবধানে আলাহিদা করিয়া রাখিতে হইবে। চাষীকে যে সকল বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে, তাহার মধ্যে এই গাছ বাছাইয়ের কাজটী একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। চাষের উন্নতি করিবার এবং ফসল বৃদ্ধি করিবার ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায়।

১১। পোকা লাগা।—গাছে কোন পোকা দেখা গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিতে হইবে। ছোট ছোট বালককে পোকা ও ডিম তুলিয়া ফেলিবার কাজে নিযুক্ত করিলে বিশেষ সুবিধা হইবে। পোকা ও ডিমগুলি কেরোসিন তেলপূর্ণ একটি পাত্রে রাখিয়া সহজে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারা যায়।

১২। চাষের খরচা ও ফসল।—সার দেওয়া সুদ্ধ পুরা চাষের কাজে একর প্রতি ২০ বা ২৫ টাকা অর্থাৎ বিঘা প্রতি ৭ বা ৮ টাকার বেশী খরচ হওয়া উচিত নহে। কোন চাষী যদি চাষের কাজে রীতিমত মনোযোগ দেয়, তাহা হইলে একর প্রতি ৮ মণ বা তাহারও বেশী বীজ ও তুলা না হইবার কোন কারণ নাই। ইহাতে প্রায় ৩মণ তুলা পাইবার কথা। প্রচলিত বাজার দর ধরিলে ইহার মূল্য ৭০৲ টাকা বা তাহার বেশী হয়। বীজও ২৲ হইতে ২॥০ টাকা মণ হিসাবে বিক্রয় করা যাইতে পারে। চাষীদের এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে, বীজগুলি পিশিয়া দামী ও স্বাস্থ্যকর তেল পাওয়া যায়, এবং তেল বাহির করিবার পর যে খইল থাকে, তাহা গরু মহিষ প্রভৃতি জন্তুর একটী বিশেষ ভাল খাদ্য, এবং তুলার গাছের একটী বিশেষ ভাল সার।

১৩। সাধারণ কথা। চাষীদিগকে বিশেষ করিয়া পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যে সময়ে বীজ বুনিলেন, জমীতে যে সার দিলেন, যত বার জল দিলেন, যে তারিখে ফুল ধরিল এবং যে তারিখে তুলা তুলিবার কার্য্য আরম্ভ ও শেষ হইল, তাহা যেন লিখিয়া রাখেন। উপরে যে দুই রকমের তুলার নাম করা গেল, যে সকল ব্যক্তি বাকুড়া,সিংভূম, মানভূম, রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, সাওতাল-পরগণা জিলার অথবা উড়িষ্যা বিভাগে সেই দুই রকম তুলার চাষ করেন, তাঁহারা যে কোন পরামর্শ চাহিবেন বঙ্গদেশের কৃষিবিভাগ আনন্দের সহিত তাহা দিবেন এবং তাঁহাদের সাধ্যমত সাহার্য্য করিবেন।

একলপ্ত ৫০০ একর জমীতে এই দুই রকমের তুলার চাষ করিলে, এই বিভাগ উৎপন্ন ফসলের বিক্রয় বিষয়ে সাহার্য্য করিবেন।

বঙ্গদেশের কৃষিবিভাগ,

১৯০৬ সালের ৫নং পুস্তিকা।

চরকার উন্নতি-চেষ্টা।

আমরা এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিয়াছি, আমাদের বস্ত্রের জন্য সূতাই উপস্থিত অধিকতর আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; কারণ যতপ্রকারেরই উন্নত তাঁত হউক না কেন, সূতা না হইলে বয়ন কার্য্য চলিতে পারে না, এবং সেই সূতা আমরা কাটিতে জানি না, যাহা জানি তাহা কলের সূতার সহিত তুলনা করিলে মোটা ও অসংস্কৃত, এবং তাহাতে আমাদের আধুনিক সময়ের ব্যবহারোপযোগী সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে না। বিলাতী বা দেশী কলের সূতা কিনিতে আমরা বুঝিতে পারি যে, তুলার দাম অপেক্ষা সূতা কাটার মজুরী ২।৩গুণ অধিক। অতএব এই সূতা যাহাতে আমরা নিজে কাটিতে পারি, সেই চেষ্টাই আমাদের যে উপস্থিত নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চরকার সূতা কাটা আমাদের দেশ হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে; তথাপি আজ পর্য্যন্ত কোন কোন স্ত্রীলোক ভাল সরু সূতা কাটিতে পারেন; কিন্তু তাহার পরিমাণ এত কম যে, তাহার উপর ভরসা করিয়া কোন কার্য্য করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে আমাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে চরকায় সূতা কাটা একটী বিশেষ গুণপনার কার্য্য বলিয়া খ্যাত ছিল। ইহা হইতে এমন কি, গৃহস্থ ভদ্র ঘরের অনেকানেক অসহায়া বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহ কার্য্য চলিয়া যাইত। কিন্তু অধুনা সেই চরকায় সূতা কাটা একটী নীচ কার্য্য বলিয়া লোকের মনে ধারণা হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ, আমাদের যে সমস্ত পুরাতন চরকা আছে, তাহাতে সূতা মোটা হয় এবং মোটা সূতার কাপড় ভাল হয় না বলিয়া, তাহার মজুরী অতি কম। আমাদের পুরাণ ধরণের চরকার সূতার মজুরী বোধ হয় প্রত্যেক সের তিন আনা হইতে পাঁচ আনার অধিক নহে, এবং সেই একসের সূতা কাটিতে একটী স্ত্রীলোকের ৬।৭ দিন লাগিয়া যায়। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে, আমাদের দেশীয় চরকার বিশেষ উন্নতির আবশ্যক, এবং তাহা হইলেই আজ আমাদের দেশের যে সমস্ত গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকগণ কেবল তাস খেলিয়া নাটক পড়িয়া থিয়েটারের গান সাধিয়া সময় নষ্ট করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পুনরায় ঐ উন্নত চরকা ধরিয়া নিজেদের পাছাপেড়ে কাপড়ের সূতা

নিজেরাই কাটিয়া দিতে তৎপর হইবেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত বাবুদের মধ্যে অধিকাংশ বাবুই ডেলি পেসেঞ্জার (daily passenger)। তাঁহারা দুই বেলা গাড়ী ধরিতে (train catch করিতে) যথার্থই সময় পান না; তবে যাহা কিছু পান, তাহা তাঁহাদের তাসেই নষ্ট হয়। আমাদের আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময়ক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই এক মনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। এখন নিজের চরকায় নিজে তৈল দান করুন; তাহা হইলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের দেশে আর কলের সূতার কাপড় বুনিতে হইবে না। কলের সূতা সূক্ষ্ম, সেই জন্য তাহার মজুরীও বেশী। হাতে চরকা কাটিয়া সরু সূতা বাহির করিতে মজুরী অধিক পড়িলেও, ইহাতে এখনও দুই তিনগুণ লভ্যাংশ (margin) আছে। কাপড় বুনিবার মজুরী এবং তুলার দাম, এই দুই একত্র করিলেও, সূতা কাটিবার মজুরী তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক, এবং তাহা স্বদেশী বস্ত্র-শিল্প প্রবন্ধটী স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছে। অতএব আমাদের চরকাই আমাদের শুভ ফল দিবে। পূর্ব্বে সূতার কল ছিল না, এই চরকাই আমাদের উদ্ধার করিত।

'স্বদেশী'র চতুর্থ সংখ্যার ১৮১পৃষ্ঠায় যে এক ১৬ টাকুর চরকার বিষয় উল্লেখ আছে তাহার জন্য খুলনা জেলাস্থ নলধা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ বাবুকে আমাদের বিশেষ অনুরোধ, তিনি এই চরকা যত শীঘ্র পারেন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করুন। প্রথম তাঁহার এই চরকার চিত্র ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর বিবরণ স্বদেশী পত্রে প্রকাশ করুন, তাহা হইলে ইহা লোকের মন আকর্ষণ করিবে ও ইহার বিক্রয় পথ প্রশস্ত হইবে। এইরূপে উন্নতধরণের চরকা যে অতিশয় ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমি যে তিন টাকুর নূতন চরকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহার বিষয় গত আষাঢ় মাসের 'স্বদেশী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ে চরকার অনেক অংশ অসম্পূর্ণ ছিল। এক্ষণে এই চরকায় তিনটি টাকু দ্বারা একত্র তিনটী সূতা কাটিতেছি; এবং সাধারণের নিকট তাহাদের কার্য্য প্রণালী পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছি। চরকার অংশ সমুদায়ের কার্য্য প্রণালী সহজ ভাবে বুঝিবার জন্য 'স্বদেশী' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একটী মোটামুটী ভাবের (rough sketch) নক্সাও পাঠাইলাম।

চরকা।—চরকার চরকীর নাভি হইতে নেমা পর্য্যন্ত যে দণ্ড বা পাকিগুলি আছে তাহাদের কাষ্ঠাংশের ব্যাস ২৪ ইঞ্চি। এই পাকিগুলি দড়ী দিয়া

বাঁধা এবং সেই দড়ীর উপর মাল দড়ীটী ২২২ ইঞ্চি ব্যাসের সহিত ঘূর্ণিত হয়; এই জন্য কার্য্য করণের প্রকৃত ব্যাস ২২২ ইঞ্চি। টাকুগুলির নিকটবর্ত্তী চরকার দিকে যে রোলারটি বসাইয়াছি, তাহা ১ ইঞ্চি ব্যাসের; সেই জন্য চরকা একবার ঘুরিলে, সেই রোলারটি ২২২ বার ঘূর্ণিত হয়।

টাকু।—টাকুগুলি ইস্পাতের, ইহাদের উপর মালগাড়ী পিছলাইয়া যায় বলিয়া, তাহারা ঠিক সমভাবে ঘুরিতে পায় না। এই কারণে আমাদের পুরাতন চরকার টাকুতে এই স্থানে সুতা জড়ান থাকে। কিন্তু তাহাতে সময়ে সময়ে মাল জড়িত হইয়া যায় ও ঘর্ষণ (friction) অধিক হয়; এই দেখিয়া টাকুগুলির এই স্থানে পূর্ব্বে কাষ্ঠপুলি (pulley) বসাইয়াছিলাম, এবং সেই কাষ্ঠপুলি গুলি যাহাতে ঘর্ষণে শীঘ্র ফাটিয়া যাইতে না পায়, সেই জন্য তাহাদের ব্যাস কিঞ্চিৎ মোটা রাখায়, টাকুগুলির ঘূর্ণন (revolutions) কম হইত। উপস্থিত সেই কাষ্ঠপুলির স্থানে ½ ইঞ্চি ব্যাসের পিতলের ঢালা পুলি বসাইয়াছি। [পিতলের পুলি সংগ্রহ করা একটু ব্যয় সাধ্য। যাঁহারা ইহাতে অসমর্থ হইবেন, তাঁহারা মালদড়িতে একটু "আল" (ধূনা ও তৈল একত্র গরম করিয়া লইলে প্রস্তুত হয়) লাগাইয়া লইলে মাল পিছলাইয়া যাইবে না। স্বঃসং]

ইহাদের মধ্যস্থলে অল্প খাঁজ কাটা (ground) এবং সেই স্থানে মালদড়ি পরান হয়। এক্ষণে টাকুগুলির ঘূর্ণন ঘর্ষণে কিঞ্চিৎ ক্ষয় পাইয়া, ইহারা চরকা একবার ঘুরিলে প্রত্যেকে প্রায় ১১০ হইতে ১১২ বার করিয়া ঘুরিয়া থাকে।

টাকুগুলি লম্বে ১০ ইঞ্চি এবং ইহাদের গর্ভ ব্যবধান ২ ইঞ্চি করিয়া রাখিয়া কাষ্ঠদণ্ডের উপর চর্ম্মখণ্ড মধ্যে ছিদ্র করিয়া বসান হইয়াছে। চর্ম্মখণ্ডগুলি পুরাতন জুতার তলা প্রভৃতি হইতেই মাপমত কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। টাকুর পুলিগুলি এক রেখা ভুক্ত নহে। যে স্থানে রোলারের মালদড়ী সোজা আসিয়া টাকুর সহিত সংযোজিত হইত পারে, সেইরূপ স্থানেই ইহারা বসান হইয়াছে। এই কারণে মালদড়ীগুলি একে অপরের সহিত মিলিত হইতে পায় না।

রোলার।—ইহার ব্যাস ১ ইঞ্চি ও লম্বে ৩½ ইঞ্চি। ইহার দুইদিকে চারিটী মালদড়ী আইসে, চরকার দিকে একটী আর মাকুগুলির দিকে তিনটি, এবং তাহাদের জন্য ইহার উপর চারিটি খাঁজ আছে। এই মালদড়ীগুলি বদলাইবার সময় তাহাদের সমভাবে গাঁট দওয়া যায় না, অথচ তাহারা সমজোরে বাঁধা না

হইলে টাকুগুলি সমভাবে ঘূর্ণিত হইতে পায় না; এই কারণে রোলারটি যে দুইটি কাষ্ঠ দণ্ডের উপর বসান হইয়াছে, তাহাদের নিম্নদেশ একটি লম্বমান ¼ ইঞ্চি ব্যাসের বোল্ট দ্বারা কথঞ্চিৎ শিথিল ভাবে চরকার নিম্নদণ্ডের সহিত বাঁধা হইয়াছে। আবশ্যকমত ঐ দণ্ডগুলির মস্তকে সামান্য আঘাত বা ঠোকা মারিলেই রোলারটী অগ্র পশ্চাৎ হইয়া মালদড়ীগুলিকে সমটানে আনিয়া দেয়। রোলারটী কোঁদা কাষ্ঠের। ইহার দুইদিকে দুইটি সরু লোহার গোল পেরেক মারা, এবং তাহারা কাষ্ঠদণ্ডের উপর চর্ম্ম খণ্ডের মধ্যে ঘূর্ণিত হইয়া রোলারকে ঘুরাইয়া থাকে।

তুলার বাক্স।—চরকার সূতা কাটিতে আমরা পাঁজটীকে হাতে ধরিয়া টাকুর সহিত সংযুক্ত করি, এবং সেই সময়ে টাকু ও হাতের অঙ্গুলি সকল পরস্পর আপন আপন কার্য্য করিয়া থাকে। টাকু ঘুরিবার সময় তুলার আঁশগুলিকে ধরিয়া পাকদিতে থাকে, এবং সেই পাকের সহিত পাঁজের মুখে এমন একটী গতি উৎপন্ন হয়, যাহাতে ঐ পাঁজটী নিজেই টাকুর দিকে অগ্রগামী হইতে চেষ্টা পায়; কিন্তু এই সময় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটী পাঁজের উপর জোর দিয়া চাপিয়া ধরে ও সেই সঙ্গে ঐ অঙ্গুলীই আবার আবশ্যকমত পাঁজের তুলাকে টাকুর দিকে যোগাইয়া দেয়। এই কারণে এই বৃদ্ধাঙ্গুলিটী যেমন অবরোধক, তেমনি আবার পোষকের (feeder) কার্য্য করে। অতএব এই বৃদ্ধাঙ্গুলির এই দুইটী কার্য্যই, সূতা কাটিবার প্রধান রীতি বলিয়া মানিতে হইবে। এবং সূতা কাটিতে হইলেই এই দুইটী রীতির অনুসরণ করিতে হইবে।

আমার এই চরকার টাকু তিনটী। এক হাতে এই তিনটী টাকুর তুলা ধরা, এক বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে তাহাদের মুখে তুলা জোগান এবং সূতা বাহির হইয়া আসিলে সমভাবে তাহাদের টাকুগুলির উপর গুড়ান, এতগুলি কার্য্য একত্র সম্ভবপর নহে দেখিয়া,উপরোক্ত সাধারণ রীতির অনুগামী হইয়া, একটি নূতন ধরণের বাক্স প্রস্তুত করিয়াছি, এবং তাহার সাহায্যে একত্রে তিনটি সূতা কাটিতেছি।

বাক্সটির বহির্দেশের আকার ৫″×৩″×২ ½″ ইঞ্চি, এবং ইহার তক্তাগুলি ¼ ইঞ্চি মোটা। বাক্সের দুই কিনারা ও তলা একত্রে বাঁধা এবং ডালাখানি একবারে স্বতন্ত্র। ডালাখানি লম্বে ৪¾ ইঞ্চি ও কিঞ্চিৎ গোলাকার। ইহা বাক্সের দুই কিনারার মধ্যে দুইটি আল দ্বারা আলগা বা অবদ্ধ ভাবে বসান

হইয়াছে এবং এই আল দুইটি ডালাখানির কবজার কার্য্য করে। ডালাখানির উপরিভাগে লম্বভাবে পাতলা ইস্পাতের পাতের একটি ইস্প্রিং (spring) বসান আছে, এবং ইহা সূতা কাটিবার সময় ডালাখানিকে সমভাবে খুলিতে ও বন্ধ করিতে সাহার্য্য করে। বাক্সটির ভিতর ঘর তিনটি, এবং সেই তিনটি ঘরের মধ্যে তিনটি টাকুর তুলা আলাদা আলাদা রাখা হয়; এই কারণে ইহাদের মধ্য হইতে সূতা বাহির হইয়া আসিবার সময় সূতাগুলি একটি অপরের সহিত জড়াইয়া যাইতে পারে না ও সূতা টাকুতে গুড়াইবার সময় কোন অসুবিধা হয় না। বাক্সের মুখে যে স্থান হইতে সূতা বাহির হয়, সেই স্থলের তক্তাকে একভাবে পাতলা করিয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে মোটা সূতা বাহির হইতে পারে না। সূতা বাহির হইবার স্থানগুলি নলের মত গোল ছিদ্রাকার নহে, তাহা হইলে একেবার তুলার ভিতর পর্য্যন্ত পাক পড়িয়া যায় দেখিয়া ইহার মুখ চাপটা রাখিয়াছি, এবং ইহাদের এইরূপ চাপটা রাখাতে তুলাকে পাঁজ পাকাইয়া বাক্সের মধ্যে রাখিতে হয় না। সূতা কাটিবার সময় বাক্সটী হাত মুঠা করিয়া ধরিতে হয়, এবং এই সময়ে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি বাক্সের ডালার উপরে থাকে ও সেই অঙ্গুলির চাপ ও ডালার উপরিস্থ ইস্প্রিংটির সাহার্য্যে বাক্সের ডালাখানি আবশ্যক মত বন্ধ করা ও খুলা যায়। সূতা কাটিতে কাটিতে তুলার বাক্সটী লইয়া হাত ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, এবং এই হাতটী যত সোজা উঠে ততই সূতাগুলিকে সমান্তরালে রাখিয়া ইহাদের সমসূত্রও সমপাকবিশিষ্ট করিতে সমর্থ করে। সূতা যে সূক্ষ্ম বা মোটা হয়, তাহা কেবল হাতের অভ্যাস মাত্র।

আমি এই সাহার্য্যে আজ প্রায় একমাস হইল তিন টাকুতে সূতা কাটিতেছি। সূতা তিনটিং উত্তমরূপ সমভাবে বাহির হইতেছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সময়ের বিশেষ সাশ্রয় করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস কেবলমাত্র কিছুদিন অভ্যাসের পর তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে। কিন্তু অভ্যাস কালীন অধিক সময় লাগিলে শিক্ষার্থীদিগের পাছে ধৈর্য্য না থাকে, এই আশঙ্কায় ইহাতে আরো সূক্ষ্মতম ভাবের উন্নতির আবশ্যক মনে করিতেছি।

এই প্রণালীতে সূতা কাটিতে আজ পর্য্যন্ত সময়ের সাশ্রয় না হইবার বিশেষ কারণ এই যে, সূতা কাটিয়া যায় আর কোন অসুবিধা নাই, তবে অবশ্য যত শীঘ্র সূতা কাটিত, এক্ষণে আর তাহা হয় না।

আমি এই কলটীতে (machine) কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি

না। বাক্সের মুখে যেখান হইতে সূতা বাহির হয়, কেবল সেই স্থলেই যদি সূতা কাটিত, তাহা হইলে তাহাকেই গুণনীয়ক বা factor মনে করিতাম ও সেই মুখের উপর রবার বা নরম চামড়া লাগাইয়া পরীক্ষা করিতাম। টাকুগুলি অসমান ভাবে ঘূর্ণিত হইলেও মনে করিতাম ন্যূনাধিক পাক সমাবিষ্ট হইয়া সূতাকে কাটিয়া দেয়। সাধারণের নিকট প্রার্থনা, যদি কেহ ইহার উন্নতি বা অন্য কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন ও তাহা স্বদেশী পত্রিকায় ছাপাইয়া দেন, তবে উপকৃত মনে করিব। আমি এখন হইতেই সূতা কাটিতেছি, এবং দেখিতেছি ক্রমে সূতা কাটিয়া যাওয়ার পরিমাণ অনেক কমিয়া আসিতেছে।

আমি এই তিন টাকুর চরকার অপর একটী বিষয় পরীক্ষা করিয়া জানিলাম যে, ইহাতে অতি সহজে সূতার পাক দেওয়া ও তাহা হইতে দর্জ্জির কার্য্যের গুলি সূতা এবং ছুতার ও রাজ মিস্ত্রীদিগের ব্যবহারের সূতা অনায়াসে অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হইতে পারে। চরকা বড় হইলে এবং টাকুগুলি মোটা হইলে সুতলীও পাকান যাইতে পারে।

এই চরকার প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে একজনে তিনজনের কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। চরকাটী এইরূপ ভাবের হইয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে কেবল একটী বা একত্রে দুইটী টাকুতেও কার্য্য করিতে পারা যায়। আমাদের দেশে শিল্প বিদ্যালয় হইয়াছে, এবং নূতন নূতন শিল্প কারখানা হইতেছে। আমার এই সমস্ত কারখানার অধ্যক্ষদিগের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা এই চরকা প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করেন এবং ইহার প্রণয়নে অনুমোদন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু পিয়ারী লাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়, যাঁহার কারবার কে, এল, মুখার্জী কোং (K. L. Mukerjee & Co) নামে খ্যাত, তাঁহার সালকিয়া ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সুবৃহৎ কারখানা আছে ; তাঁহাকে আমার অনুরোধ তিনি এইরূপ কতকগুলি চরকা প্রস্তুত করাইয়া নমুনার স্বরূপ শিল্প বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে বিতরণ করেন। এই চরকার প্রণয়নে দেশীয় তুলায় দেশী সূতা হইবে, এবং তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশী কাপড়ে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিতে পারিব বলিয়া মনে করিব।

শ্রীকুলদানন্দন মুখোপাধ্যায়।

মানুষ না রাক্ষস?

আমেরিকা হইতে নানাপ্রকার খাদ্য টিনের কৌটায় করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র সরবরাহ হইয়া থাকে। য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশের সুসভ্য ব্যক্তিরা এই সব খাদ্য পরম উপাদেয় মনে করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষেও উহা প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। ভারতপ্রবাসী পাশ্চাত্যদেশবাসীরা এই সব খাদ্য বিশেষ আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় লোকদের মধ্যে যাহারা সাহেবী চা'লে চলেন, আহারের কালে এই সব খাদ্য তাঁহাদের টেবিলেও শোভা পায়। কিন্তু এই সব খাদ্যে যে সকল দ্রব্য থাকে বলিয়া শুনিতে পাই, তাহাতে যুগপৎ ভয় ও বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়। মনে হয়, এই খাদ্য না খাইয়া যদি চিরকাল অসভ্য নামে অভিহিত হইতে হয়, তবে তাহাও শ্রেয়ঃ।

এই সকল টিন কৌটায় নানাপ্রকার মৎস্য ও মাংস থাকে। আমরা এইরূপ খাদ্য কখনও দেখি নাই; কিন্তু সমজদার ব্যক্তিরা বলেন, টিন কৌটায় দ্বিবিধ মাংস থাকে। প্রথমতঃ রক্ষিত মাংস, অর্থাৎ কাঁচা মাংসে এমন কোন উপকরণ (যথা Boracic Acid) লাগান থাকে, যাহাতে উহা সহজে পচিয়া যায় না। এই প্রকার মাংস যে কোন প্রকারে ইচ্ছামত রন্ধন করিয়া লইয়া খাইতে পারা যায়। দ্বিতীয় পক্ক বা রন্ধন করা মাংস। ইহা কৌটা খুলিয়া খাইবার সময় ঢালিয়া লইলেই হইল। খাইবার উপযুক্ত করিয়া একেবারে প্রস্তুত করা থাকে। এতদিন এই সব বস্তুর খাদকের ধারণা ছিল—ইহাতে কোন প্রকার দূষিত পদার্থ মিশ্রিত করা হয় না, বিশুদ্ধ টাটকা মাংস দ্বারাই প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। কিন্তু সংপ্রতি এই সম্বন্ধে নানা কথা উঠায় মিষ্টার ও মিসেস লুর নামক এক দম্পতী আমেরিকার চিকাগো নগরে যাইয়া ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের অনুসন্ধানের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহা শুনিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। মনে হয়—এমন বীভৎস কাণ্ড বুঝি পৃথিবীর আর কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় না। পাঠক ব্যাপারটা শুনুন।

তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, যে সকল গর্ভবতী গাভী মরিয়া

যায়, ব্যবসায়ীরা ভাগাড়ে গিয়া তাহাদের পেট চিরিয়া সেই সব মৃত বাছুর লইয়া আসে, এবং তাহা কৌটায় পূর্ণ করতঃ কুক্কুট মাংস বলিয়া দেশ বিদেশে চালান দেয়। পাঠক দেখিয়াছেন, খাঁচায় ঠাসাঠাসি করিয়া পুরিয়া মুরগী চালান হয়। এইরূপে দূরদেশে পাঠাইলে খাঁচার ভিতর অনেক মুরগী মরিয়া যায়। আমেরিকায় এই মরা মুরগী ফেলা যায় না, পচিয়া যাইলেও মশলা সংযোগে দুর্গন্ধ নাশ করিয়া টিনে পুরিয়া চালান দেওয়া হয়। এইরূপ যে সকল গবাদি পশু রোগে মারা যায়—তাহাদিগকে ভাগাড়ে না ফেলিয়া, তাহাদের মাংসের দ্বারা নানাপ্রকার সুস্বাদু (অবশ্য খাদকদের রুচি অনুসারে) খাদ্য প্রস্তুত করা হয়, এবং তাহাও দেশ বিদেশের খাদকদের জন্য টিনের কৌটায় পোরা হয়।

পাঠক, ইহাপেক্ষাও বীভৎস ব্যাপার আছে শ্রবণ করুন। ব্যবসায়ীরা মৃত পশু বা ভ্রূণস্থ পশুর মাংস দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। তাহারা মনুষ্য জাতির আহারের জন্য মনুষ্য মাংসেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকে। অবশ্য পশু মাংস বলিয়াই তাহা বিক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু তথাকথিত অনেক পশু মাংসের কৌটায় যে নরমাংস থাকে, তাহা মিষ্টার আপ্টন সিনক্লেয়ার নামক এক ব্যক্তি অনুসন্ধানের দ্বারা জানিয়াছেন।

আমাদের দেশে আখের বা খেজুরের গুড় জাল দেওয়ার সময় বড় বড় লোহার কড়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। আমেরিকার বা ইউরোপের স্থান বিশেষে শূকরাদি পশুর চর্ব্বি প্রস্তুত করিবার জন্যও এইরূপ বড় বড় কড়া বা ডেগচি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সব পাত্র এত বৃহদাকারের হয় যে, ইহার ভিতরে একজন মানুষ যদি হঠাৎ পড়িয়া যায়, তবে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন এই সব চর্ব্বি প্রস্তুত করা হয়, তখন চর্ব্বি-প্রস্তুতকারীদের দুই একজন ইহাতে পড়িয়া মারা যায়। সিন্‌ক্লেয়ার সাহেব প্রমাণ সহকারে আমেরিকার কমিশনরদিগকে জানাইয়াছেন দুইজন চর্ব্বি-প্রস্তুতকারী হটাৎ এইরূপে ডেগচী বা কড়ায় পড়িয়া মারা যায়, এবং ব্যবসায়ীরা জানিয়া শুনিয়াও হত মনুষ্যদ্বয়ের সিদ্ধ মাংস চর্ব্বির সহিত মিশ্রিত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়াছিল।

ইহার পর আর একটি বীভৎস ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল টিনের কৌটায় আবদ্ধ সু-পক্ক মাংস বা রন্ধন করিবার উপযোগী মাংসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, বিলাতের কোন লোক আহারকালে তাহার

এক কৌটা খুলিয়া একখানি মনুষ্যপদ পাইয়াছিলেন! এইরূপ ভয়ানক খাদ্য না খাইলে কি "সভ্য" হওয়া যায় না, বা 'হীদেন' নাম দূরীভূত করা যায় না? যে সকল বাবুরা বা দেশীয় সাহেবেরা বিলাতী বা মার্কিণ খাদ্যকে উপাদেয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে কি বলেন?

আম্বালায় কাচের কারখানা।

(আপার ইণ্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কস্।)

আম্বাল্লায় যে একটী কাচের কারখানা আছে, তাহা অনেকেই বোধ হয় জানেন না। তবে যাঁহারা দেশীয় শিল্পের রীতিমত সন্ধান রাখেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এই কারখানার নাম শুনিয়া থাকিবেন। এই কারখানায় প্রস্তুত কাচের শিশি এমন সুন্দর যে, বোধ হয় শীঘ্রই ভারতবর্ষের কাচের জিনিসে য়ুরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিব। এই কারখানার সত্বাধিকারী লালা পান্নালালের একান্ত ইচ্ছা, এই কারখানার সাহায্যে দেশের যুবকেরা কাচ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আগামী ১লা নবেম্বর হইতে দুই জন করিয়া ছাত্রকে প্রতিবর্ষে এই কারখানায় শিক্ষানবীশরূপে গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। অবশ্য ভারতবর্ষে কাচ প্রস্তুত ব্যবহার অবস্থা যেরূপ, তাহাতে দুই বৎসর এই কারখানায় কাজ করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে এরূপ আশা করা যায় না। তবে দুই বৎসর এখানে শিক্ষালাভ করিবার পর এক বৎসর ইউরোপ আমেরিকা বা জাপানে যাপন করিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে অনেক সময় ও অর্থব্যয় কম হইবে, এ কথা নিশ্চিত। বিশেষতঃ ভারতবাসীর পক্ষে বিদেশে শিল্প শিক্ষা করা ক্রমশঃ বড় কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। কারখানাওয়ালারা বিদেশী বলিয়া ভারতবাসীকে যে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখে, তাহা শ্রীযুক্ত ওয়াগেল মহোদয়ের মুখেই প্রকাশিত হইয়াছে। তবে কিছু শিখিয়া গেলে সেখানে অন্ততঃ মজুরীও মিলিতে পারে, এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা কম সুবিধার কথা নহে। এই কারখানায় প্রবেশ করিতে হইলে শিক্ষার্থীর বয়স কুড়ি বছরের নীচে না হয়। দুই বছর শিখিতে হইবে। তার মধ্যে আঠার মাস কাচের কাজ

শেখান হইবে, বাকী ছয় মাস আফিসের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহাদের বাসস্থান বিনামূল্যে দেওয়া হইবে, এবং প্রতি ছাত্রকে প্রথম বর্ষে ২০ হইতে ৫০ টাকা ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। উপযুক্ত বোধ করিলে দ্বিতীয় বর্ষে এই বৃত্তির পরিমাণ বাড়াইয়া ৪০ টাকা করা যাইতে পারে। কাজ শেখা শেষ হইলে, যাহাকে কারখানার কর্তৃপক্ষ পছন্দ করিয়া কাজে নিযুক্ত করিবেন, তাহাকে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর কাজ করিবার জন্য লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে। এই কর্ম্মচারীকে মাসে ৬০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি বর্ষে দশ বা ততোধিক টাকা বেতন বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারখানায় শিক্ষালাভ করিয়া যাহারা নূতন কারখানা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অম্বলা হইতে ১০০ মাইলের মধ্যে কারখানা স্থাপন করিতে পারিবেন. না, এরূপ একটি সর্ত্তে বাধ্য থাকিবেন। আরও দেশের উন্নতির জন্য তাঁহারাও প্রতিবর্ষে দুইটি করিয়া ছাত্রকে বিনামূল্যে শিক্ষা দিতে বাধ্য থাকিবেন। এই দুইটী সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তাঁহাকে ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী করা হইবে। এই কারখানায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করা চাই। অম্বলা সিটি, অপার ইণ্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কসের সম্পাদক শ্রীযুত আলোকধারীর নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

স্বদেশী শিল্প-প্রসঙ্গ।

গুঁড়া কালী।—আমরা শ্রীযুক্ত এস, মিত্র, ইণ্ডিয়ান স্বদেশী কেমিকাল ওয়ার্কস, তাঁতি বাজার, ঢাকা মহাশয়ের নিকট হইতে দুই পুরিয়া গুঁড়া কালী উপহার পাইয়াছি। ব্যবহারে দেখিলাম কালী বেশ হইয়াছে।

ফাইন্ টয়লেট্ পাউডার্।—বিলাতী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিলাতী বেশভূষারও অনুরাগী হইয়াছে। আজকাল অনেকেরই মুখে একটু পাউডার না লাগাইলে অঙ্গরাগ সম্পূর্ণ হইল বলিয়া মনে হয় না। আর, গি এণ্ড কোংর ফাইন্ টয়লেট্ পাউডার্ এ সকল লোকের সে অভাব পূর্ণ করিবে বলিয়া

আশা করি। প্রাপ্তিস্থান—স্বদেশী নিকেতন, ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হোল্‌ডার—চেষ্টা ও সাধারণের উৎসাহদ্বারা ভারতবর্ষীয় "কালা আদমীর" হস্ত যে শিল্পাদি সম্বন্ধে শ্বেত হস্তের সমকক্ষ হইতে পারে, দি কন্‌ট্রী পেন ইণ্ডিস্‌ট্রিয়াল কোম্পানীর হস্তের হোল্‌ডার তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। এই হোল্‌ডার কোনও অংশে বিলাতী হোল্‌ডার অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে এবং অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। সোল এজেণ্টস্ স্বদেশী নিকেতন, ৩৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড, বিডন স্কোয়ার, কলিকাতা।

"নমঃ হিন্দুস্থান" মার্কা বিড়ী।—শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সরকার ৯১ নং বিডন ষ্ট্রীটে একটী বিড়ী কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের প্রস্তুত বিড়ি ধুমপায়ীগণের উপাদেয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। সিগারেটের মত কাগজের প্যাকেটে এই বিড়ি বিক্রীত হইতেছে। স্বদেশী সিগারেটের আবরণে বিদেশীয় মাল মসলা বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। ধুমপায়ীগণ সিগারেটের পরিবর্ত্তে বিড়ী পান করিতে পারেন না?

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা—আমরা শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঠাকুর মহাশয়ের "সংসার"নামক একখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, মূল্য ১৲ টাকা। আকণ্ঠ মিষ্টান্ন ভোজনের পর যেমন চাটনীর আবশ্যক হয়, তদ্রূপ সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর অনেকেই ইহার আবশ্যকতা বোধ করিবেন। প্রাপ্তিস্থান—স্বদেশী নিকেতন, ৩৪৪নং, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

৪৫ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ক্ষেত্রমোহন দে এণ্ড কোম্পানির পরিচালনায় দেড় লক্ষ টাকা মূলধনে "ত্রিপুরা কোম্পানি" নামে একটী লিমিটেড কোম্পানি সংগঠিত হইতেছে। ইহারা কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিবিধ শিল্পকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। প্রথমতঃ বস্ত্র-শিল্পের জন্য ইহাঁরা মনোযোগী হইয়াছেন। কোম্পানির সাফল্যে আমরা

বিশেষ আনন্দিত হইব। যৌথকারবার যদি সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, তাহা হইলেই দেশের মঙ্গলের সম্ভাবনা। ইহাঁরা প্রথমতঃ সূতার কল স্থাপনেই উদ্যোগী হইলে দেশের বিশেষ উপকার করা হইবে। এক্ষণে দেশে সূতারই বিশেষ অভাব। রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ দেশের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের উদ্যোগে "দি ওরিয়েণ্ট্যাল ম্যাচ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানি" নামে একটী কোম্পানি গঠিত হইয়া দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প হইতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। কারখানা বাটী নির্ম্মাণের জন্য জমী ঠিক হইয়াছে। শীঘ্রই বাটী আরম্ভ ও কলের অর্ডার দেওয়া হইবে।

৫০।১ নম্বর ক্রশষ্ট্রীট বড়বাজারের পান্নালাল হুজুরীমল নামক একজন মাড়োয়াড়ী বস্ত্রব্যবসায়ী বিলাত হইতে বিনা ট্রেড্‌মার্কের কাপড় আনাইয়া তাহাকে আহাম্মদাবাদ মিলের কাপড় বলিয়া বিক্রয় করিতেছিল। ধরা পড়িয়া এই ব্যক্তি পুলিষে অভিযুক্ত হন। পুনর্ব্বার এরূপ প্রতারণা করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়ায় তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশে স্বদেশদ্রোহীর অভাব নাই, নতুবা আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন?

ভারতের ভাগ্যবিধাতা এ বৎসর এদেশের প্রতি সত্যই নিতান্তই প্রতিকূল। দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনে দেশের লোকের দুর্গতির একশেষ হইতেছে, মহামারীরও নানাস্থানে প্রাদুর্ভাব; রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচার স্থানে স্থানে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে; তাহার উপর দেশের সুসন্তানগণের কয়েকজনও একে একে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের মুখোজ্জলকারী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বদরুদ্দীন তায়েবজী ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ এ বৎসরে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। এরূপ শিক্ষানুরাগী ও পরহিতব্রতিগণের অভাব সহসা বিদূরিত হইবার নহে।

প্যারিস্ নগরের বিখ্যাত "টেম্পস" পত্রিকা বঙ্গচ্ছেদের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। বিলাতেরও উদারনৈতিক দলের অনেকগুলি পত্রিকা এজন্য ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছিলেন। বিদেশী বর্জ্জন নিবন্ধন স্বার্থে আঘাত না লাগিলে বঙ্গবাসীর জীবন মরনে ইহাঁদের ভ্রূক্ষেপও থাকে না।

স্বদেশী

প্রথম খণ্ড।] আশ্বিন, ১৩১৩। [দ্বাদশ সংখ্যা।

বন্দে মাতরম্।

"স্বদেশীর" প্রথম বৎসর।

"স্বদেশীর" এক বৎসর পূর্ণ হইল। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য মানবের পক্ষে এ কার্য্যভার যে কিরূপ গুরুতর, তাহা প্রথমে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, ভগবানের বিশেষ কৃপাব্যতীত নিয়মিত ভাবে প্রথম খণ্ড শেষ করিবার আশামাত্র নাই। তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হই নাই ভাবিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি; এবং তাঁহার চরণ কমলে সহস্র প্রণাম করিতেছি।

কৃতবিদ্য মহোদয়গণ বলিবেন—এরূপ একখানি সামান্য মাসিক পত্রিকার কার্য্য পরিচালনে এত উদ্বেগ কেন? এবং এক বৎসর মাত্র শেষ হইতেই এত আনন্দ কেন? কিন্তু যাহার ব্যথা, সেই জানে; আর জানেন সেই ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। "স্বদেশী" নাম রূপ যে "সিন্দূরে মেঘ" নিঃশঙ্ক স্বদেশ ভক্তের নিকট নিতান্ত প্রীতিপ্রদ, তাহাতে গর্জ্জনের সম্ভাবনামাত্র না থাকিলেও, অনেকের হৃদয়ে যে কি বিষম ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়, তাহা বর্ণনাতীত। ইহার প্রথম সংখ্যা "মেঘের" আবির্ভাব দর্শনেই এক একজনকে "ত্রাহি ত্রাহি" শব্দে আর্ত্তনাদ করিতে শুনিয়াছি। সেই ভয়-বিহ্বল

জনগণের সমক্ষে দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত "স্বদেশী" মেঘের আবির্ভাব প্রদর্শন নিতান্ত দুঃসাহসিকতা-সূচক নহে কি? ইহা ব্যতীত উদ্বেগের আরও কারণ আছে।

প্রারম্ভে যেরূপ উৎসাহ, আবেগ ও বিচিত্র কল্পনা লইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, এই স্বল্পকালে তাহার প্রভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে; কোন বিষম দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, বিশেষ কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই, অথবা এমন কোন অভিনব কারণই দেখিতে পাই না, যাহা নিরুৎসাহ আনয়ন করিতে পারে; বরং প্রবীণ সহযোগিগণ সকলেই এক-বাক্যে যেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে "স্বদেশীর" দীর্ঘ জীবনে এক বারও সন্দিহান হইতে পারি নাই। তথাপি এইরূপ ভাব বিপর্য্যয়ের মূলীভূত কি?

মানবের বাল্যে চাঞ্চল্য, যৌবনে উৎসাহ এবং বার্দ্ধক্যে নৈরাশ্য ইহাই প্রায় সাধারণ নিয়ম। লক্ষ্য স্থির না থাকায়, বালকের মন নানা বিষয়ে ধাবিত হইতে থাকে; যুবকের মন এক একটী লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হয়; সংসারের আবর্ত্তনে উদ্দিষ্ট পথ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, বৃদ্ধের হৃদয়ের মনোরথ গুলি যখন একে একে বিলীন হইতে আরম্ভ হয়, তখন সে নৈরাশ্য সাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকে। ভাগ্যবান পুরুষ ব্যতীত, অপর কেহ এই সাধারণ নিয়ম অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

বৃদ্ধের নৈরাশ্য তাহার অভিজ্ঞতার ফল। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনাবশে বালক বা যুবক যে শিক্ষালাভ করে, অনেক বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষেও সেরূপ শিক্ষার সুযোগ উপস্থিত হয় না। পিতা ও বিমাতার অনাদরে ব্যথিত প্রাণ বালক ধ্রুব অতি স্বল্প কালেই মহাশিক্ষা লাভে সক্ষম হইয়াছিল; শুভ মুহূর্ত্তে ভিখারি কর্ত্তৃক উচ্চারিত "বেলা গেল, পারে যেতে হবে," এই সামান্য উক্তিই লালা বাবুর চিত্তে মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়াছিল।

স্বল্পকাল হইলেও বিগত এক বৎসর আমাদের দেশের একটী স্মরণীয় কাল; বিবিধ ঘটনাস্রোত বশে এই বৎসর বঙ্গবাসিগণের নানা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক ভ্রমাত্মক ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় বিবিধ সুলক্ষণ দেখিয়া, হৃদয়ে কত অভিনব আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা বিলুপ্ত হইতেছে। বাক্-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী এইবার প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে ভাবিয়া যাহারা

আশ্বান্বিত হইয়াছিল, অতি সামান্য-সংখ্যক মাত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও, বাক্-যুদ্ধের আড়ম্বরই বহু পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, তাহারা নিরুৎসাহিত হইতেছে। সপ্তকোটী বাঙ্গালীর জাতীয় ধন ভাণ্ডারে একলক্ষের অধিক মুদ্রা সঞ্চিত হইল না দেখিয়া, অনেকে হতাশ্বাস হইতেছে; জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ে একশতের অনধিক ছাত্র সমাবেশ দেখিয়া অনেকে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতেছে; রেলওয়ের ধর্ম্মঘটে একতার অভাব দেখিয়া, অনেকে বিস্মিত হইতেছে; দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণকে সাহার্য্য প্রদানে তৎপরতা থাকিলেও, দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার কোনরূপ বন্দোবস্ত না দেখিয়া অনেকে সশঙ্কিত হইতেছে; শিল্পোন্নতি-প্রয়াস-সম্ভূত বিপুল উৎসাহ দুই চারিটী নগণ্য বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন ও একটী প্রচলিত কাপড়ের মিল ক্রয়েই পর্য্যবসিত হইবার উপক্রম দেখিয়া অনেকে বিশেষ দুঃখিত হইয়াছে। কিন্তু অপরদিকে বক্তৃতা স্রোতের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও, সংবাদ পত্রাদিতে বাক্-বিতণ্ডা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ বিগত বর্ষের স্বদেশী আন্দোলন-সম্ভূত কার্য্য কলাপ বাঙ্গালী জাতির ভীরুতা, কাপুরুষতা, স্বার্থ-প্রিয়তা প্রভৃতি বিগুণ রাশিই পরিস্ফুটিত করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু অশিক্ষিতগণের স্বদেশপ্রীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ অনেক স্থলে শিক্ষিতগণকে লজ্জাপ্রদান করিয়াছে। গাড়োয়ান, কুলি, মজুর, জেলে, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি স্থানে স্থানে যেরূপ একতা, সৎসাহস ও স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা শিক্ষিতগণের নিতান্ত শিক্ষণীয়। শিক্ষিতগণ এই নিম্ন শ্রেণীর পন্থা অনুসরণ করিয়া যদি আপনাদের কুশিক্ষা বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে দেশে সুশিক্ষার পথ প্রশস্ত হইতে পারে। কিন্তু আধুনিক কুশিক্ষা বিষ তাহাদের অস্থি মজ্জা জর্জ্জরিত করিয়াছে; কুশিক্ষিত হইলেও শিক্ষাভিমান, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ, ধর্ম্মহীনতা প্রভৃতি বিবিধ দোষ তাহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। দৈবশক্তির অনুকম্পা ভিন্ন এ সকল দোষ বিদূরিত করিবার আর অন্য উপায় নাই।

মাসিকপত্র সম্পাদনরূপ গুরুকার্য্যভার মস্তকে লইয়া আমরাও এক বৎসরে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইয়াছি, এবং সেই অভিজ্ঞতা আমাদের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ নৈরাশ্য উপস্থিত করিয়াছে। যাহাদের নিকট যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, তাহার শতাংশের একাংশও পূর্ণ হয় নাই; যাহাকে একান্ত দেশ-হিতৈষী ভাবিয়াছিলাম, তাহাকে "বিষকুম্ভঃ পয়োমুখঃ"

নিতান্ত স্বদেশদ্রোহী অথবা হৃদয়হীন জড়পিণ্ডবৎ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি; যাহাকে শিক্ষিত বলিয়া জানিতাম, তাহার শিক্ষা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিতে পারিয়াছি; যাহাদের অতুল উৎসাহ হৃদয়ে কত আশার সঞ্চার করিয়াছিল, আতসবাজীর ন্যায় সে উৎসাহ-বহ্নি অচিরেই ভস্মমাত্রে পরিণত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু যে স্থান হইতে সহানুভূতির কল্পনামাত্র অনুভব করিতে পারি নাই, এরূপ কয়েক স্থান হইতে আন্তরিক সহানুভূতি প্রাপ্তে সমর্থ হইয়াছি; যে স্থান হইতে বাধা বিপত্তির নিশ্চয় আশঙ্কা করিয়াছিলাম, সে স্থান হইতেও কোন বাধা উপস্থিত হয় নাই।

"স্বদেশীর" বাল্যাবস্থা; সুতরাং ইতিমধ্যে ইহাকে উপযুক্ত গুণগ্রামে ভূষিত করিতে পারি নাই। কালসহকারে "স্বদেশী" যাহাতে স্বদেশ-বাসীর নিকট সত্যই আদৃত হইতে পারে, সেজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ক্রটী করিব না; কিন্তু এই সাধের পরিমাণ অতি যৎসামান্য ভাবিয়া সময়ে সময়ে নিরাশ হইতে হয়। বিশেষতঃ যাঁহাদিগকে ইহার আশ্রয়দাতা ও পৃষ্ঠপোষক বলিয়া বুঝি, তাঁহাদিগকে ইহার উন্নতিকল্পে অমনোযোগী, কিম্বা উন্নতি-বিধায়ক পরামর্শ প্রদানেও পরাঙ্মুখ দেখিলে বাস্তবিক দুঃখিত হইতে হয়। তাঁহাদের প্রতি বিনীত নিবেদন, যেন তাঁহারা "স্বদেশীর" ক্রটী বা ভ্রম প্রদর্শন রূপ আশীষ বচনে ইহার ভবিষ্যৎ জীবনের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।

শিল্পাদি-বিষয়ক প্রবন্ধ সাধারণের নিকট আদৃত হওয়ার সম্ভাবনা অতি বিরল; বিশেষতঃ আমাদের দেশের শিক্ষিতগণের অনেকেই শিল্পাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ; দেশের কৃষক ও শিল্পিগণের সহিত তাঁহারা প্রায় সাক্ষাৎ সংশ্রবশূন্য; কেহ কেহ মনে মনে দেশীয় শিল্পের উন্নতির বাঞ্ছা করিলেও, কার্য্যতঃ সেজন্য পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিতে সম্পূর্ণ পশ্চাৎপদ। শিল্পিগণ স্বীয় চেষ্টায় যদি দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে আপ্যায়িত বোধ করিতে পারেন, এবং দেশোদ্ধার কার্য্যে মৌখিক সাহার্য্য করিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে অগ্রসর হইতে পারেন। সেই জন্য আমরা স্বদেশী বিষয়ক অপর প্রবন্ধও প্রকাশ করিয়া সেই সকল গ্রাহকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা পাইয়া থাকি। কিন্তু অসাধারণ অধ্যবসায়-সম্পন্ন অনেকের নিকট স্বদেশী বিষয়ক প্রসঙ্গও ইতিমধ্যেই কটুস্বাদ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহা-দিগকে গ্রাহকশ্রেণী হইতে অবসর প্রদান করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি; কারণ,

তাহাতে আমাদের আর্থিক ক্ষতি। তাঁহাদের মনোমত প্রসঙ্গের সহিত তাঁহারা দুই একটা কাজের কথাও দেখিলে অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন, এই ভাবিয়া, আমরা আগামী বৎসর হইতে "স্বদেশী"তে কৃষি শিল্পাদির সহিত অপর প্রসঙ্গও সন্নিবেশিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। আশা করি, এইরূপে "স্বদেশী" ক্রমশঃ সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জনে সক্ষম হইতে পারিবে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় এক একটী বিষয়েই রাশি রাশি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু আমাদের দেশে যে কয়েকখানি মাত্র মাসিক পত্রিকা আছে, তাহার গ্রাহক সংখ্যা অতি নগণ্য; তাহাতে আবার, আধুনিক শিল্পজগতে ভারতের স্থান প্রায় সর্ব্বনিম্নে; অধিকন্তু বঙ্গবাসিগণ সাধারণতঃ বঙ্গভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। সুতরাং এদেশে শিল্পাদিমাত্র বিষয়ক-বাঙ্গালা মাসিক পত্রের পরিচালন কার্য্য অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্বদেশী আন্দোলনের সাহার্য্য না পাইলে আমাদের পত্রিকা এদেশে স্থান পাইত কিনা, তাহা সন্দেহ স্থল। সেই হেতু, বহুদিন পূর্ব্ব হইতে এরূপ একখানি পত্রিকা প্রকাশের অভিলাষ থাকিলেও, স্বদেশী আন্দোলনের সূচনার সহিত ইহার প্রকাশে সাহসী হইয়ছি।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, "স্বদেশী" নামটী স্বদেশভক্তগণের নিকট মধুর হইলেও অপরের নিকট "সিন্দূরেমেঘ।" এই শেষোক্তগণের অনেকে কেবলমাত্র কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে সাহস করে নাই। তাহাদের সাহানুভূতি বিষবৎ পরিত্যজ্য বলিয়াই বোধ করি; কিন্তু গুণহীন হইলেও "স্বদেশী"র প্রতি প্রথমোক্তগণ চিরদিনই সাদরে দৃষ্টিপাত করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি; তাঁহাদের গুণেই "স্বদেশী" লোকপ্রিয় হইতে পারে; এবং তাঁহাদের দোষেই "স্বদেশী" বিগুণ বা অকালমৃত্যু কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইবে।

ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব।

১ম প্রবন্ধ।

প্রায় দেড়শত বৎসর হইল ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এ দেশে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষাপ্রণালী, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি

সকল বিষয়েরই সম্পূর্ণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ দেশীয় দিগের আর্থিক এবং নৈতিক অবস্থারও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কোন্ কোন্ বিষয়ের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং সেই পরিবর্ত্তন দ্বারা দেশীয় সাধারণ লোকের অবস্থার উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহার সমালোচনা করা যাইবে।

ইংরাজ রাজত্বের সমালোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ সংক্ষেপে ইংরাজের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড-বাসী ইংরাজগণ এতদূর অসভ্য ছিল যে, তাহারা বন্যপশুর ন্যায় ফল, মূল, মাংস ভক্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত। অশিক্ষিত অসভ্য মনুষ্য পশু হইতে কোন অংশে উন্নত নহে; তৎকালীন ইংরাজের তদ্বৎ অবস্থা ছিল। তৎপরে যখন রোমীয়-গণ ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া রাজ্য বিস্তার করিল, ইংরাজগণ সভ্যতার আলোক পাইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিল, তাহাদের নবজীবন হইল। অতি অল্পকালের মধ্যে ইংরাজগণ শিক্ষিত ও সভ্য হইয়া বাণিজ্যে মনোযোগ দিল। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড একটী দ্বীপ মহাসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং স্বভাবতঃ এই দ্বীপবাসিগণ সাহসী, এবং বাণিজ্যই ইহাদের উপযোগী বৃত্তি। অর্ণবযান প্রস্তুত করিয়া এই দ্বীপবাসিগণ দূরদেশের সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করিল এবং ইহাদের প্রচুর ধনাগম হইয়া ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল। বাণিজ্যের নিমিত্তই ইংরাজ ভারত-বর্ষে আগমন করেন, এবং ক্রমশঃ রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হওয়াতে ছলে, বলে, কৌশলে এ দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করেন। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একটী ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় প্রথমতঃ এ দেশে পদার্পণ করিয়া তাৎকালিক মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বাণিজ্যের অনুমতি গ্রহণ করেন। মুসলমান রাজত্বকালে এ দেশের লোকের নানাবিধ অসুবিধা ছিল, সুতরাং অনেকেই বিশেষতঃ হিন্দুগণ, সেই রাজত্বের উচ্ছেদ কামনা করিতে-ছিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ উপযুক্ত সময় ও সুযোগ বুঝিয়া প্রধান প্রধান হিন্দুগণকে হস্তগত করিলেন, এবং তাঁহাদের সাহার্য্যে এ দেশে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভৃত্যগণ বাণিজ্য ও রাজ্য-বিস্তার আরম্ভ করিল এবং এ দেশের শিল্প বিনাশের আয়োজন করিতে লাগিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষ বাসী আর্য্যগণ সুসভ্য ও সুশিক্ষিত, এবং এ দেশের নানা প্রকার শিল্প বিখ্যাত। রেশমী, পশমী ও কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত সরু, মোটা

নানাবিধ বস্ত্র অতি প্রাচীনকাল হইতে এ দেশে প্রস্তুত হইতেছে, এবং পূর্ব্বে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের প্রারম্ভে বঙ্গদেশে রেশম শিল্পের অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত ছিল। কোম্পানির ভৃত্যেরা রেশমের ব্যবসাটী লাভজনক দেখিয়া একচেটিয়া করিবার বন্দোবস্ত করিল এবং স্থানে স্থানে রেশমের কুঠি স্থাপন করিল। শিল্পীদিগকে বলপূর্ব্বক সেই সকল কুঠিতে নিযুক্ত করা হইত। নীলের চাষের জন্য ইংরাজ বণিকেরা বাঙ্গালা বিহার প্রভৃতি স্থানে জমি জমা লইয়া দেশীয় প্রজাদিগের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। ভগবানের ন্যায় বিচারে সেই স্বার্থপর নিষ্ঠুর নীলকর আজ একবারে হীনবল, তাহার সম্পূর্ণ অধঃপতন হইয়াছে। এই নশ্বর জগতে মনুষ্যের দর্প ক্ষণস্থায়ী মাত্র। দাম্ভিক নীলকরের ভবলীলার অবসানে দরিদ্র প্রজাগণ শান্তিলাভ করিয়াছে। বিহার অঞ্চলে এখনও নীলের আবাদ হইতেছে; কিন্তু অনতিবিলম্বে যে তাহারও ধ্বংস অনিবার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোম্পানীর ইংরাজ ভৃত্যগণ দেশীয়দের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিত; তাহারা উৎকোচগ্রাহী ছিল, এ দেশ হইতে অর্থসংগ্রহই তাহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমশঃ যখন কোম্পানীর রাজত্ব বদ্ধমূল হওয়ায় বিলাতের ডিরেক্টর সাহেবেরা ও মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দিতে লাগিলেন, তখন হইতে কতক কতক সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। মহানুভব লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর হইয়া আসিয়া বাঙ্গালা বিহারের জমিদারদিগের সহিত রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই ইংরাজ গবর্ণমেন্টের কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যান্য প্রদেশে এই বন্দোবস্তটী স্থগিত রাখা হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকাতে বাঙ্গালার জমীদার ও প্রজা অপেক্ষাকৃত সুখ স্বচ্ছন্দে আছে। অন্যান্য প্রদেশে মধ্যে মধ্যে রাজস্বের বন্দোবস্ত হয় এবং প্রতি বন্দোবস্তেই কররৃদ্ধি করিয়া প্রজাবর্গের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করা হয়। বন্দোবস্তের সময় তাহাদিগকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইতে হয়। সরকারী কর্ম্মচারিগণের সন্তোষের কারণ বিনামূল্যে কিম্বা অল্পমূল্যে রসদ যোগাইতে হয়, কেহ কেহ অনুগ্রহ প্রদর্শনের ছলে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকে। রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারিলেই কর্ম্মচারিগণের যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া হয় ও পদোন্নতি হইয়া থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভাবে বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের প্রজাগণ ক্রমশঃ

দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহারা করভারাক্রান্ত ও জমির উন্নতি করিতে অসমর্থ। ঐ সকল প্রদেশে চির দুর্ভিক্ষ বিরাজমান।

গবর্ণর ক্লাইব, ওয়ারেণ হেষ্টিংস, লর্ড হেষ্টিংস ও লর্ড ডালহৌসী ক্রমশঃ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে ইংরাজ শাসনাধীন করিয়া যান, এবং লর্ড ডফরিণ বর্ম্মা পর্য্যন্ত অধিকার করেন। কয়েকটীমাত্র দেশীয়রাজা এখনও বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা নামমাত্র স্বাধীন; কার্য্যতঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন। প্রত্যেক রাজার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণার্থ এক এক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী আছেন; তাঁহারাই রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। ফলকথা, দেশীয় রাজগণকে একপ্রকার নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেই তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারেন। বাস্তবিক, দেশীয় রাজগণের অবস্থা সাধারণ প্রজার অবস্থা অপেক্ষা শোচনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গবর্ণর জেনরেল লর্ড বেণ্টিকের রাজত্ব কালে কতকগুলি হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। এদেশে সতীদাহ ও শিশু-হত্যা এই দুইটী নিদারুণ কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। লর্ড বেণ্টিক এই দুটী প্রথা রহিত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি ঠগ প্রভৃতি দস্যুগণের ভীষণ অত্যাচার নিবারণেরও সুবন্দোবস্ত করিয়া দেশে শান্তি সংস্থাপন করেন। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দস্যুতা, নরহত্যা প্রভৃতি পাপস্রোত প্রবাহিত হইত। কেহই জল ও স্থলপথে নিরাপদে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইত না। ডাকাতির সংখ্যা অধিক ছিল; ইংরাজ রাজত্বে এই সকলেরই সমুচিত প্রতিবিধান হওয়াতে লোকে নির্ভয়ে জীবন যাপন করিতে ও সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং তজ্জন্য ইংরাজ রাজত্ব লোকপ্রিয় হইয়াছে। লর্ড বেণ্টিকই এদেশীয় শিক্ষিত যোগ্যলোকদিগের ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত করেন, এবং সেই পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদে দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, আজকাল শিক্ষিত দেশীয় লোকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অল্প সংখ্যকমাত্র শিক্ষিত লোককে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, এবং ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের তুলনায় দেশীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদিগকে অত্যল্প বেতন দেওয়া হয়। গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান পদগুলি ইংরাজের একচেটিয়া এবং তাহাদিগকে প্রচুর বেতন দিতে হয় বলিয়া অনর্থক গবর্ণমেণ্টের অর্থব্যয়ও অধিক হইয়া থাকে। এইটী দেশীয়দের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ ও অসন্তোষের প্রধান কারণ

হইয়াছে। ইহা যে একটী পক্ষপাতী রাজনীতি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কোন সভ্য গবর্ণমেণ্টেরই এরূপ রাজনীতি অবলম্বন করা বিধেয় নহে।

ক্রমশঃ যখন ইংরাজেরা অত্যাচারী হইয়া উঠিল, যখন তাহাদের হিন্দু ধর্ম্মনাশের মতলব অনুভূত হইল, তখন হিন্দু সৈনিকগণ বিদ্রোহী হইয়া স্থানে স্থানে ইংরাজহত্যা আরম্ভ করিল। খৃষ্ট ১৮৫৭ সালে এই সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; দেশীয় অনেক রাজা ও ধনী লোক সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, আবার অনেকে ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। এই বিদ্রোহ দমন হইলে পর, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতবর্ষ খাস রাজ্য করিয়া লয়েন এবং তাঁহার বিখ্যাত ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণা পত্র মহারাণীর ন্যায়-পরতা, উদারতা ও মহানুভবতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই ঘোষণা পত্র দ্বারা তিনি তাঁহার ভৃত্যগণকে ভারত-বর্ষীয় প্রজাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে আদেশ করেন, যোগ্যতানুসারে তাহাদিগকে উচ্চপদে নিয়োগের অনুমতি দেন এবং সকল বিষয়ে ইংরাজ ও দেশীয়দিগের প্রতি সমদর্শী হইতে অনুজ্ঞা করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তাঁহার ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ এতাবৎকাল এই উদার নীতিক ঘোষণা পত্রের আদেশ উপেক্ষা করিয়া আপনাদের স্বার্থপরতা পক্ষপাতিত্ব ও নীচাশয়তার পরিচয় দিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন এ প্রকার প্রকাশ্য ভাবে বলিয়া গেলেন যে, মহারাণীর ঘোষণা পত্র একটী রাজনীতিক শঠতা মাত্র, ভারতবর্ষীয়দিগকে স্তোক্‌ দিবার জন্যই উহা প্রচারিত হইয়াছিল, গবর্ণ-মেণ্ট ইহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য নহে। লর্ড কর্জ্জনের মত আর একটী রাজ প্রতিনিধিকে এদেশে প্রেরণ করিলে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের যে সমূহ অমঙ্গল ঘটিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি এ দেশীয়দের উন্নতির পথ অবরোধের নিমিত্ত নানা প্রকার রাজনৈতিক অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। এ দেশীয়দের উচ্চ শিক্ষা ও স্বায়ত্ব শাসন তাঁহার চক্ষুশূল হইয়াছিল এবং সেই জন্য এই দুইটীরই উচ্ছেদের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীরা বুদ্ধিমান্‌ এবং উচ্চশিক্ষা পাইয়া উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষা করে ও রাজনীতি বিষয়ের তীব্র সমা-লোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করে। সুতরাং তিনি বাঙ্গালাকে দ্বিখণ্ড করিয়া বাঙ্গালীদের একতা নাশের বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। এ দেশীয়দিগকে যোগ্য বিবেচনা করিয়া সরলপ্রকৃতিক উন্নতমনা রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপণ এদেশে স্বায়ত্ব শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া যান; কিন্তু লর্ড কর্জ্জন স্বায়ত্ব

শাসনের বিরোধী ছিলেন; সুতরাং তিনি ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রয়াস পাইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে নির্ব্বাচিত দেশীয় সভ্যের সংখ্যা অধিক ছিল, তাঁহারা সহরের স্বাস্থ্য প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কার্য্যে মনোযোগ দিতে সমর্থ হইতেন; কিন্তু লর্ড কর্জ্জন আইন পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশীয় নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যার হ্রাস ও সরকারী ইংরাজ সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়া, কার্য্যতঃ স্বায়ত্ব শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ করিয়া গিয়াছেন। লর্ড কর্জ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও একটী সরকারী বিভাগে পরিবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের উন্নতির মতলবে লর্ড রিপণ ও লর্ড ডফারিণ যে সকল হিতকর রাজনীতির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছিলেন, লর্ড কর্জ্জন সেই সকল নীতির পরিবর্ত্তে অনুদার নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে লোকপ্রিয় করিয়া গিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, লর্ড কর্জ্জন ও তাঁহার চেলা পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার সাহেব না আসিলে, বাঙ্গালীদের ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ হইত না। যে স্বদেশী আন্দোলন লইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আন্দোলিত হইয়াছে, যাহার স্রোত অন্যান্য প্রদেশেও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, লর্ড কর্জ্জনই এই শুভকর আন্দোলনের মূলীভূত কারণ। তিনি আমাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গদেশ বিভাগ না করিলে স্বদেশী আন্দোলনের কথা আমাদের মনে আদৌ উত্থিত হইত না। স্বদেশী আন্দোলনে দেশের বিনষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার হইতেছে এবং ক্রমশঃ দেশীয়দের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে আমাদের ইংরাজ রাজনীতি বিষয়ের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ)

ভারতীয় শিল্প।

বহু সহস্র বৎসর হইতে ভারতের শিল্পজাত এসিয়াখণ্ডের অন্যান্য দেশে ও ইউরোপে নীত হইত। ভারতীয় বণিকগণ এ দেশ হইতে বহুবিধ দ্রব্যাদি লইয়া নানাস্থানে গমন করিত। বহুকালাবধি ভারতের শিল্পজাত পৃথিবীতে অতুলনীয় ছিল; শিল্প ও বাণিজ্যে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিল;

ভারতের ঐশ্বর্য্যও সেই জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ" এ কথার সৃষ্টিও সেই সময়েই হইয়াছিল।

এই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে লুব্ধ হইয়া বিদেশীয় বণিকগণ এ দেশে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল; এবং বিবিধ সূত্রে ক্রমশঃ স্থানে স্থানে এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সময়ে এ দেশের শিল্পজাত বিবিধ দ্রব্যই বিদেশীয়গণ আপনাপন দেশে লইয়া ব্যবসা করিত, এখনকার ন্যায় কৃষিজাত দ্রব্য এরূপ বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইত না। এই ব্যবসায়েই বিদেশীয় বণিকগণের প্রচুর ধনাগম হইতে লাগিল; সুতরাং এ দেশের শিল্প-বিনাশ তাহাদের লক্ষ্য ছিল না; বরং তাহারা এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য অভিলাষ করিত। কিন্তু কালক্রমে এ অভিলাষ বিলুপ্ত হইয়া গেল; বিদেশীয়গণ আপনাপন দেশের শিল্পোন্নতির জন্য সচেষ্ট হইল। এই স্বার্থ-প্রণোদিত চেষ্টাই ভারতের শিল্প-বিনাশের কারণ।

নিঃসহায় অশিক্ষিতগণের হস্তেই ভারতের শিল্প নিহিত; তাহারা বিদেশীয় প্রতিযোগিতার প্রবল প্রকোপ সহ্য করিতে পারিল না। সে প্রতিযোগিতা সাধারণ বা সরল ভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই; কিন্তু তাহা অতি কুটীল, অতি কাপুরুষোচিত ও অতি নীচাশয়তা-মূলক। ভদ্রপদবাচ্যগণ দেশের শিল্পরক্ষায় সচেষ্ট হওয়া দূরে থাক, সে সময়ে বিদেশীয়গণেরই সাহায্যে তৎপর হইয়াছিল; সুতরাং অশিক্ষিত, অসহায় ও সরল স্বভাব ভারতীয় শিল্পিগণ যে সহজেই পরাজিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

এক্ষণে ভারতের শিল্প প্রধানতঃ বিদেশীয়গণের করায়ত্ত এবং কৃষিই এক্ষণে ভারতবাসিগণের প্রধান অবলম্বনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কৃষিকার্য্য সহায়ে সমগ্র ভারতবাসীর গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি বিবিধ অভাব পূর্ণ হয় না। দেশ ক্রমশঃ ঘোর দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হইতেছে। ভারতীয়গণের অনেকেরই দুই বেলার উপযোগী আহার্য্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে; অনশন বা অর্দ্ধাশনে তাহারা জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া উঠিতেছে ও তজ্জনিত বিবিধ ব্যাধি কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইতেছে; মহামারী লোকসংখ্যার হ্রাস করিতেছে; পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষের ভীষণ আক্রমণে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে।

দেশের শিক্ষিতগণ এতদিন পরে ভারতের শিল্প-বিনাশজনিত ক্ষতি কতক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। কেহ মানের দায়ে, কেহ বা প্রাণের দায়ে, বিনষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার ও নূতন শিল্পাদির প্রতিষ্ঠা কল্পনা করিতেছেন।

যাঁহাদের মানের দায়, তাঁহারা বলিতেছেন—এখন হইতে আমরা আত্মপদে নির্ভর করিতে শিখিব, সকল বিষয়ে বিদেশীয়গণের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিব, ইত্যাদি। যাহাদের প্রাণের দায়, তাহারা ভাবিতেছে—এইবার আমাদের দুই বেলার উপযোগী অন্ন সংস্থানের পথ উন্মুক্ত হইবে।

বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই উভয় দলের লক্ষ্য একরূপ নহে; একের যশঃ সম্মান ও ঐশ্বর্য্য, এবং অপরের ক্ষুন্নিবৃত্তি মাত্র লক্ষ্য। ইহারা পরস্পর সহানুভূতি-শূন্য; প্রথম দল আত্মস্বার্থ সংস্থাপনের জন্য শেষোক্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেও তাহাদের আন্তরিক ভাব ভিন্ন-রূপ। কিন্তু শেষোক্ত অর্থাৎ অশিক্ষিত ও দরিদ্রগণের সংখ্যাই এ দেশে প্রচুর; ভারতের উন্নতি ইহাদের অবস্থার উন্নতির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রথম বা শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় সংখ্যায় সামান্য হইলেও অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাপন্ন; কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই আত্মস্বার্থ লইয়া এরূপ ব্যতিব্যস্ত যে, অপরের অভাব বুঝিতেও প্রায় অক্ষম; এরূপ হৃদয়হীন যে, অপরের অভাব কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিলেও তাহার প্রকৃত প্রতীকার চেষ্টায় পরাঙ্মুখ; এবং এরূপ অল্পবুদ্ধি যে, আপনাদের প্রকৃত স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া স্বীয় সংকীর্ণ অকিঞ্চিৎকর স্বার্থের জন্য উন্মত্ত। যতদিন এই ভাবের পরিবর্ত্তন না হয়, শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় যতদিন প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন না হয়, দেশের কল্যাণ বুঝিতে সমগ্র ভারতবাসীর অবস্থার প্রতি যতদিন তাহাদের দৃষ্টি নিপতিত না হয়, এবং যতদিন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও নির্ধন এক লক্ষ্য-বিশিষ্ট না হয়, ততদিন ভারতের শিল্প কি, কোন একটী মাত্র বিষয়েরও উন্নতি সাধিত হইতে পারে না।

ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক শিল্পোন্নতি প্রভৃতি সমৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইবার পূর্ব্বে, কিম্বা তাহাদের সমকক্ষ হইবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে, তাহাদের এ উন্নতির মূলীভূত কি। ইংলণ্ডে যে সমস্ত কয়লার খনি আছে, তাহাতে দশ সহস্র বৎসরের অধিক কাল কার্য্য চলিতে পারেনা দেখিয়া সে দেশের মনীষিগণ ভাবিয়া আকুল এবং এই সুদীর্ঘকাল পরে কয়লার পরিবর্ত্তে কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, এখন হইতে তাহার উদ্ভাবনে নিযুক্ত; আর, আমাদের দেশের এক বৎসরের উপযোগী অন্নের সংস্থানও দেশে রাখিয়া উদ্বৃত্ত অন্ন রপ্তানি হইতেছে কিনা, দেশের একজনও সে সংবাদ রাখেন না। একজন এদেশীয় ভদ্রলোক ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দর্জ্জিদিগের দ্বারা আসাম এণ্ডির

একখান কাপড়ের পোষাক প্রস্তুত করাইতে চেষ্টা করিয়া বিফল হন ; একজন দর্জ্জি তাঁহাকে বলে "মহাশয়! আপনার এ চেষ্টা বৃথা ; এ দেশের কোন দর্জ্জি এই বিদেশীয় কাপড়ে পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিবেনা ; কেননা. ইহাতে আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের ক্ষতির সম্ভাবনা।" স্বদেশী আন্দোলনে দেশীয় বস্ত্রের বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া আমাদের দেশেরই কোন কোন বস্ত্র ব্যবসায়ী বিলাতী কাপড়ে দেশীমিলের ছাপ বসাইয়া ক্রেতাগণকে প্রতারিত করিতেছে ; সম্প্রতি মেদিনীপুরের ছাত্রগণ বাজারে সমবেত হইয়া ক্রেতাগণকে বিলাতি বস্ত্রাদি ক্রয়ে নিবারণ ও দেশীয় দ্রব্য ক্রয়ের জন্য অনুরোধ করিতেছিল ; এই অপরাধে (?) দোকানদারগণ দলবদ্ধ হইয়া ছাত্রদিগকে বিষম প্রহার করিয়াছে! ডাক্তার বোণ্টনের চিকিৎসায় সাহ সুজার কন্যা রোগমুক্তা হইলে সুজা যখন তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদানে উদ্যত হইলেন, তখন ডাক্তার বলিলেন, "আমার অপর পুরস্কারের প্রয়োজন নাই ; যাহাতে আমার দেশীয়গণ এ দেশে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়, তদনুরূপ ফার্ম্মান প্রদান করুন।" পুরস্কারের জন্য প্রকাশ্য ঘোষণা বা আশ্বাস না থাকিলেও তাহার কাল্পনিক আশাতেই মুগ্ধ হইয়া এ দেশীয় সরকারী ও বেসরকারী অনেক শিক্ষিত (?) লোক আধুনিক এই শিল্পোন্নতির প্রয়াসে যৎপরোনাস্তি বাধা প্রদানে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই! মেদিনীপুরের উপরোক্ত ঘটনায় অপরাধী দোকানদারগণ যতদিন না তাহাদের পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্তে সম্মত হয়, ততদিন সহরের ডাক্তারগণ তাহাদের চিকিৎসায় বিরত থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন কৃতবিদ্য (?) ডাক্তার নাকি ২।৪ দিনের মধ্যেই সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বসিয়াছেন! এরূপ অসংখ্য ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, এ দেশের অধিকাংশ লোকই অত্যন্ত স্বার্থপর,অপরিণামদর্শী ও হৃদয়হীন ; আবার নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক শিক্ষিত নামাভিহিতগণের অধিকাংশই এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বার্ক, শেরিডান প্রভৃতি মহাশয় ইংরাজগণ তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি প্রদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; আর,আমাদের দেশের দারোগা প্রভৃতি শ্রেণীর কাহাকেও আমাদের দেশেরই লোকের উপর নিতান্ত পৈশাচিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত দেখিলেও, দেশের লোক প্রায়ই তাহার কোনরূপ প্রতীকার চেষ্টা পায় না ; বরং অনেক সময় তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনেও ত্রুটি করে না। বস্তুতঃ আধুনিক

ভারতীয়গণ পরস্পর যেরূপ সহানুভূতি শূন্য, তাহাতে এ দেশের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত।

সম্প্রতি স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশের নিম্নশ্রেণীর অবস্থার প্রতি ক্রমশঃ দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া বোধহয়; কিন্তু দেশের উন্নতি কল্পনা হইতে উদ্ভূত, প্রত্যেক কার্য্যে এই শ্রেণীর উন্নতির প্রতিই প্রধান লক্ষ্য না থাকিলে,আমরা তাহাকে দেশহিতকর কার্য্য বলিয়া বোধ করিতে পারিনা। সেই জন্য প্রথম সংখ্যায় "কলকারখানার আবশ্যকতা" প্রবন্ধে আমরা বিশদ ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, দেশে কাপড়ের মিল স্থাপনে দেশের বিন্দুমাত্র উপকার না হইয়া অপকারই সাধিত হইবে। গৃহস্থগণের অবলম্বনীয় প্রত্যেক শিল্পেরই জন্য কলকারখানা কেবল অনাবশ্যক নহে, অধিকন্তু নিতান্ত অনিষ্টকর। অবলম্বনের অভাবেই দেশের লোক দরিদ্র; সুতরাং যাহাতে তাহাদের অবলম্বন বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ কার্য্য নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত; যাহাতে তাহারা অবলম্বন পাইয়া উদরান্নের উপায় করিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থাই দেশের কল্যাণকর এবং দেশ-হিতৈষিগণের উপযোগী।

মনে করুন, কোন একস্থানের এক সহস্র সংখ্যক লোক ধান্য ভানিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে; সেখানে ধানভানার কল স্থাপিত হইয়া যদি তাহাদের দশজন মাত্র লোক লইয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট ৯৯০ জন লোক জীবনোপায় বিহীন হইবে না কি? অনেকে উত্তর করিতে পারেন, তাহারা অপর চেষ্টা করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবে; কিন্তু এ দেশে এই অপর চেষ্টার পথ যে কিরূপ সংকীর্ণ, তাহা অনেকেরই অবিদিত। প্রায় যে কোন পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া একটী পুষ্করিণী খননের প্রস্তাব করুন; দেখিবেন, দলে দলে মজুর আসিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। ইহারা অবলম্বন বিহনে অর্দ্ধাশনে বা প্রয়োজনের চতুর্থাংশ মাত্র আহারে দিনাতিপাত করিতেছে। অধিকাংশ গ্রামেই এক কিম্বা দুই ঘর কামারের বাস; গ্রামের লোকের লাঙ্গল প্রভৃতি শাণিত করিয়া দেওয়াই ইহাদের অবলম্বন; অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, এই সকলস্থানে পূর্ব্বে আরও কয়েক ঘর কামারের বাস ছিল; কিন্তু উদরান্নের অভাবে তাহারা লোপ পাইয়াছে। এক কিম্বা দুই জনের অর্দ্ধাশনের উপযোগী শিল্প বর্ত্তমান আছে বলিয়াই তাহারা কামার বংশের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। একবার একটী পল্লীগ্রামের

সন্নিকটে স্থানে স্থানে বিস্তর লৌহ প্রস্তরের মল (Slag) স্তূপীকৃত রহিয়াছে দেখিলাম ; গ্রামের লোকে বলিল,এই সকল স্থানে বহু পূর্ব্বে বিস্তর লোহারের বাস ছিল ; তাহারা লৌহ বাহির করিয়া লইয়া লৌহমল ফেলিয়া রাখিয়াছে। এই সকল লোহারের বংশ লোপ পাইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের বাসস্থানের নিদর্শন স্বরূপ এই লৌহ-মল মাত্র অবশিষ্ট আছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড রাস্তা মেরামতের কার্য্যে সময়ে সময়ে এগুলি ব্যবহার করিতেছেন ; সুতরাং আর কয়েক বৎসর পরে এই বিলুপ্ত লোহার বংশের আদিম অস্তিত্ব-সূচক চিহ্ন-মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবেনা।

পূর্ব্বে এ দেশে কাচ প্রস্তুত হইত। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে কাচের বহুল উল্লেখ আছে। দর্পণের ব্যবহারও এদেশে বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত। এক সময়ে এদেশে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সভায় দুর্য্যোধন কোনস্থান জলময় ভাবিয়া প্রতারিত হইয়াছিলেন ; কোন স্থান অনবরুদ্ধ ভাবিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া দেয়ালে বাধা পাইয়াছিলেন ; এই সকল কারুকার্য্যে কাচ ও দর্পণ ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এ শিল্প এ দেশে লোপ পাইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিদেশীয় অনুকরণে সম্প্রতি দুই এক স্থানে পুনরায় ইহার অভ্যুত্থান হইতেছে।

দেশের বহুস্থানেই নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র ও অপর অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। এক্ষণে তাহার অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে ; কয়েকটী স্থানে এই শিল্প নাম-মাত্রে অবশিষ্ট আছে।

এ দেশে হর্ম্ম্য শিল্পের যে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিব, নানাস্থানের প্রাচীন মন্দিরাদিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ।

তন্তুবায়কুলের কিয়দংশ বর্ত্তমান থাকিয়া এ দেশের বহু প্রাচীন উৎকৃষ্ট বস্ত্রশিল্প কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিতেছে।

নৌশিল্পী, রংশিল্পী, ভাস্কর, চিত্রকর, লেপক (দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণকারক) প্রভৃতি বিবিধ শিল্পিগণেরও এক্ষণে প্রায় নামমাত্র বর্ত্তমান আছে।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বেও এ দেশে কাগজের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, এবং দেশের কতক লোক কাগজ প্রস্তুত করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত। এক্ষণে দুই একটী স্থান ভিন্ন অপর সর্ব্বত্রই এই শিল্প বিলুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ অনেকগুলি ক্ষুদ্র শিল্প এককালে লোপ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

দেশের লোকের অপরিণামদর্শিতা ও উদ্যমহীনতা এবং পরস্পর সহানু-

ভূতির অভাবই দেশীয়শিল্পের এইরূপ অবনতির ও তৎসহ দেশব্যাপী দারিদ্র্যের মূল কারণ।

সহযোগী অমৃতবাজার লিখিয়াছেন :–

"India may take a lesson from America. Tea was almost as necessary to the Americans as milk is to the Hindus. Yet in one day the thirteen Colonies resolved to give up tea! This is called genuine patriotism, because it is based upon sacrifce."

ভাবার্থঃ—"ভারতবর্ষ আমেরিকা হইতে একটী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। হিন্দুদিগের দুগ্ধ যেরূপ প্রয়োজনীয়, আমেরিকানদের চা প্রায় সেই রূপ প্রয়োজনীয়; তথাপি ১৩টী উপনিবেশের লোক একদিনে চা'র ব্যবহার পরিত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল! ইহাকেই প্রকৃত স্বদেশপ্রীতি বলে, কেননা ইহা স্বার্থত্যাগ রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।"

কিন্তু চা'র সহিত আমেরিকানদের যে সম্পর্ক, বিদেশজাত শিল্পের সহিত আমাদের তদপেক্ষা অতি গুরুতর সম্পর্ক। বিদেশীয় চা'র আমদানীতে আমেরিকানদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু দেশীয় একটী শিল্পের পরিবর্ত্তে বিদেশীয় শিল্পগ্রহণে আমাদের দেশের সেই শিল্পজীবী অসংখ্য লোকের বিনাশ প্রায় অবশ্যম্ভাবী। বিদেশ হইতে আমদানী হওয়ায় বিশেষ ক্ষতি না থাকিলেও, পরমুখাপেক্ষী হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া আমেরিকানগণ কর্তৃক বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুরও ব্যবহার পরিত্যাগ যদি নিতান্ত প্রশংসনীয় হয়, দেশীয় দ্রব্য পরিত্যাগে বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিলে, আমাদের শিল্পি-শ্রেণীর উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে কুণ্ঠিত না হওয়া নিতান্ত নিন্দনীয় বা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক নহে কি? অথবা এই আত্মবিনাশে আশঙ্কা-মাত্র-বিহীন হইলে আমাদের অল্পবুদ্ধিতাই প্রতিপন্ন হয় না কি? দেশের শিল্পিকুল উৎসন্ন যাউক, তথাপি আমরা একটুমাত্র অসুবিধাও ভোগ করিতে প্রস্তুত নহি; যতদিন আমাদের এই পশুকুলোচিত সংকীর্ণ স্বার্থময় প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত না হয়, ততদিন আমরা দেশের বিন্দুমাত্র উন্নতির আশা করিতে পারিনা। দেশমধ্যে কলকারখানাই স্থাপিত হউক, দেশের অভাব দেশোৎপন্ন দ্রব্যেই পূর্ণ হউক, এবং সকল বিষয়েই যদিও আমরা আত্মপদে নির্ভর করিতে শিখি, যতদিন আমরা দেশের আপামর সাধারণের জীবিকা উপার্জ্জনের উপযোগী পন্থা উদ্ভাবনে আগ্রহ-সম্পন্ন না হইতে পারি,

যতদিন তাহাদের পরিশ্রমোচিত বিত্ত উপায়ের ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট না হইতে পারি, ততদিন দেশের উন্নতি শব্দের অর্থ—আকাশ-কুসুম বা বন্ধ্যাসন্তান শব্দের প্রতিরূপ মাত্র।

দেশী রং ও রং-শিল্প।

নীল, হরিদ্রা, লাক্ষা, কুসুমফুল, বকম, সিংঘাড় অর্থাৎ সিউলিফুল, কমলা, পলাস, লটকান, থাল অর্থাৎ দারুহরিদ্রা এইগুলি দেশী রংএর প্রধান উপাদান। বৃক্ষের ফল, মূল, ফুল, বল্কল, বীজ, পত্র ও কাষ্ঠ, এবং মৃত্তিকা ও কোন কোন পতঙ্গ হইতে দেশী রংএর উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়। রংকে পাকা অর্থাৎ স্থায়ী করিবার জন্য গাব, বাবলাছাল, হরিতকী, আমলা প্রভৃতির কস ব্যবহৃত হয়।

চট্টগ্রামে কোন কোন রং-শিল্পী দেশী নীলরং প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। অন্যত্র ইউরোপের, ইংলণ্ড, জর্ম্মাণী, প্রভৃতি হইতে আনীত নীলরং ব্যবহৃত হয়। কাপড়কে নীলবর্ণ করিতে হইলে কতক পরিমাণ নীলরংকে জলে গুলিতে হয়; তাহার পর কিছু সাজিমাটি মিশাইতে হয়। কিছুক্ষণ পরে সাজিমাটির গুঁড়া, চুণ ও চিটাগুড় মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িতে হয়। তিন চারি দিবস রাখিয়া মধ্যে মধ্যে নাড়িলে নীলরং প্রস্তুত হয়। যে বস্ত্রখানি রং করিতে হইবে, সেখানি বেশ পরিস্কার শুভ্রবর্ণ হওয়া আবশ্যক। বস্ত্রখানিকে একবার মাত্র আস্তে আস্তে নীল রং প্রস্তুত জলে ডুবাইয়া না নিঙ্গড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিলে আসমানী বা আকাশের রং করা হয়। কাপড়খানিকে ঘোর নীল করিতে হইলে রংএর জলে চারি পাঁচ বার ডুবান আবশ্যক।

লাক্ষা হইতে লালরং উৎপন্ন হয়। লাক্ষারং প্রস্তুত প্রণালী এইঃ—কতকটা লাক্ষা লইয়া একটী পাথরের পাত্রে জলে ঘষিতে হয়; তাহার পর অধিক পরিমাণে জল দিতে হয় ও কিছু সাজিমাটি উত্তমরূপ মিশাইয়া ছাঁকিতে হয়। তৎপরে কতক লোধছালের গুঁড়া মিশাইয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিতে হয়। প[illegible] বস্ত্রখানি রঙ্গিন করিতে হইবে, সেইখানিকে এই জলের সহিত বেশ করিয়া মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে গরম করিয়া রৌদ্রে দিলে পাকা লালরং হইবে। [illegible] রেশম সূত্রকে গালার রংএ রঞ্জিত করা হইয়া থাকে। একসের

রেশমকে রং করিতে হইলে চারি সের লাক্ষার আবশ্যক এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিও লাক্ষার সহিত যোগ করিতে হইবে :— লোধছাল এক পোয়া, ফটকিরি আধ পোয়া, হলুদ এক ছটাক, তেঁতুল এক পোয়া, জল ছয় সের। প্রথমে লাক্ষাকে অল্প জলে ঘষিয়া পরে অধিক জল মিশাইতে হয়, এবং ক্রমশঃ অন্যান্য উপাদানগুলি দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। রংএর জল যখন অগ্নিতে ফুটিতে থাকিবে, তখন রেশমগুলিকে অন্ততঃ পনর মিনিট কাল রাখিয়া উঠাইয়া লইতে হয় ও জলে কাচিয়া শুকাইতে হয়। কাষ্ঠ নির্ম্মিত ও মৃণ্ময় খেলানা প্রভৃতিতে গালার রং দেওয়া হয়। গালার লাল রঙ্গের সহিত নীল, কাল প্রভৃতি রংও মিশ্রিত করা হইয়া থাকে, এবং চাকচিক্যের জন্য রঙ্গিন দ্রব্যের উপরে টার্পিন তৈল ও গর্জ্জন তৈল লাগান হয়। হিন্দু স্ত্রীলোকগণ যে আলতা ব্যবহার করেন, তাহা লাক্ষারং মিশ্রিত তুলা মাত্র। কিন্তু আজকাল তুলাতে বিলাতী মাজেণ্ডার রং লাগাইয়া আলতা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

হরিদ্রা বা হলুদ পীতবর্ণ বা হলদে রংএর প্রধান উপাদান। কুসুমফুল ও কাঁঠাল কাঠ হইতেও হলদে রং পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমানগণ হলুদ ব্যবহার করিয়া থাকে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে হরিদ্রা মর্দ্দন ও হরিদ্রা বস্ত্র পরিধানের প্রথা আছে। উড়িষ্যাবাসিগণ অধিক পরিমাণে হলুদ মর্দ্দন করে। হলুদের স্বাস্থ্যকর গুণ আছে, এবং শরীরের ময়লা ও কীটাদি বিনষ্ট করে বলিয়া আমাদের দেশে ইহার এত আদর। হলুদ গুঁড়া করিয়া জলে মিশাইয়া তাহাতে কিছু সাজিমাটি ও ফটকিরি কিম্বা লেবুর রস দিতে হয়, ও সেই জলে কাপড় ভিজাইয়া রৌদ্রে দিলে সুন্দর হলদে রং হয়। এক ছটাক হলুদে এক গজ মাত্র বস্ত্র রং করা যাইতে পারে। হলুদের সহিত সিউলিফুলের গুঁড়া ও ফটকিরি মিশাইলে বসন্ত রং তৈয়ার হইয়া থাকে।

কুসুমফুল হইতে মনোরম পীত ও লোহিত বর্ণ প্রস্তুত হয়। বিহার অঞ্চলের কৃষকেরা গম ও যবের ক্ষেত্রে কুসুমফুলের আবাদ করিয়া থাকে। ফুলগুলি ছায়াতে শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হয়। আধ পোয়া গুঁড়া দুই সের জলের সহিত চটকাইয়া ধুইয়া একখণ্ড কাপড়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে পীতবর্ণ জল নির্গত হয়। তাহার পর কাপড়ে যে ফুলের অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাতে এক তোলা আন্দাজ সাজিমাটি মিশাইয়া চূর্ণ করিলে [illegible] রং প্রস্তুত হয়। ইহাকে অল্প জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া [illegible]ইলে তরল আলতার মত রং হয়।

বকমগাছ হইতে প্রধানতঃ লাল রং পাওয়া যায়। কটক জেলাতে বকম-গাছ প্রচুর উৎপন্ন হয়।. এই গাছের কাষ্ঠ হইতে লাল রং এবং বল্কল হইতে হলদে রং প্রস্তুত হয়। সুঁটি গাছের মূল ও বকমের কাঠ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিলে আবির অর্থাৎ ফাগ তৈয়ার হয়। হিন্দুদের দোল পর্ব্বে আবিরের ব্যবহার প্রচলিত। আবির মাখিলে শরীর স্নিগ্ধ হয় ও চক্ষু শীতল হয়। ইহা যে একটী স্বাস্থ্যপ্রদ দ্রব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, আজকাল প্রকৃত সুঁটি ও বকমের আবির দুষ্প্রাপ্য ; বিলাতী রং সংযোগে আজকাল আবির প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সেই আবির উপকার না করিয়া অপকার করিয়া থাকে। চারিসের জলে এক পোয়া বকম কাষ্ঠ পাঁচ সাত ঘণ্টা সিদ্ধ করিলে আবশ্যকীয় রং প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সেই রঙ্গিন জলে কাপড় রং করিতে হয়।

একসের সূত্রকে লাল রং করিতে হইলে, বকম কাঠ দেড়সের, ফটকিরি আধ পোয়া, হলুদ এক ছটাক ও জল পাঁচ সের একত্র করিয়া দু-তিন ঘণ্টা সিদ্ধ করিতে হয়। এই জলে সুতাকে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে শুকাইয়া লইতে হয়।

সেফালিকা বা সিউলি ফুলের পীতবর্ণ ডাঁটাগুলিকে শুষ্ক করিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিলে সুন্দর কমলালেবুর রং প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রং পাকা নহে। এই রং অন্যান্য রংএর সহিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লটকান গাছের ফলের বীজ হইতে হলদে ও কমলালেবুর রং করা যায়। দেড় পোয়া লটকান বীজ পনর সের জল ও আধসের সাজিমাটির সহিত সিদ্ধ করিয়া তাহাতে রেশম রং করিলে পীতবর্ণ হয়। একটী মৃণ্ময় পাত্রে বাবলাছাল সিদ্ধ করিয়া তাহাতে একখানি সূতার কাপড় ২৪ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিতে হয় ; তাহার পর রৌদ্রে শুকাইয়া ১২ ঘণ্টা লটকান সিদ্ধ জলে রাখিতে হয়, এবং আবার শুকাইয়া ছয় ঘণ্টা কাল বাবলা ছালের জলে ভিজাইয়া উঠাইলে কাপড় খানিতে সুন্দর কমলালেবুর রং হইয়া থাকে। কাপড়খানি শুকাইয়া জলে ধৌত করা আবশ্যক। এই রং স্থায়ী।

আল হইতে লাল রং পাওয়া যায়। যে কাপড়খানি রঙ্গিন করিতে হইবে তাহাকে হরিতকীর জলে ভিজাইয়া শুকাইতে হয়। তৎপরে চারিভাগ হলুদ, [illegible]রি ভাগ লোধ ছাল ও একভাগ ফটকিরির জলে কাপড় খানিকে ডুবাইতে

এক পোয়া আন্দাজ আল কাঠ গুঁড়া করিয়া ছয় সের জলে তিন চার

ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে এক ছটাক আন্দাজ ধাঁইফুল মিশাইতে হয় এবং সেই জলে কাপড় খানি রং করিলে সুদৃশ্য পাকা লাল রং হয়।

মঞ্জিষ্টা, মেন্‌দি, তুন কাঠের গুঁড়া প্রভৃতিও দেশী রংএর উপাদান।

বাঙ্গালা দেশে তসর ও গরদ কাপড়ে বহুবিধ রং করিয়া থাকে। প্রধান প্রধান রংগুলি এই—নীল, লাল, হলুদ, সবুজ, বেগুণে, পীতাম্বরী, সোনালি, হীরামন কণ্ঠি, ময়ুর কণ্ঠি, ধূপছায়া, আসমানি। রেশমকে রঙ্গিন করিয়া বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। লাল সুতার টানা ও ঈষৎ হলদে সুতার পড়েন হইলে পীতাম্বরী রংএর কাপড় হয়। সবুজ রংএর টানা ও কমলালেবু রংএর পড়েন সুতায় সোনালি রংএর কাপড় হয়। সবুজের টানা ও লালের পড়েন সুতায় হীরামনকণ্ঠি এবং লালের টানা ও সবুজের পড়েন সুতায় ময়ূরকণ্ঠি কাপড় হয়। আসমানি রংএর কাপড় তৈয়ার করিতে হইলে নীল সুতার টানা ও লাল সুতার পড়েন হওয়া আবশ্যক।

বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, সুদৃশ্য অল্পমূল্য দেশী রংএর পরিবর্ত্তে আজকাল বিলাতী রংএর আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকাংশ দেশী রংই স্থায়ী। এদেশ হইতে চাখড়ি, চাউল, মসিনা প্রভৃতি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যাইতেছে ও রংএর উপাদান প্রস্তুত হইয়া পুনরায় এখানে আসিতেছে। দুবার রেল ও জাহাজ ভাড়ায় এই সকল দ্রব্যের মূল্য যে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এদেশে যাহাতে রং প্রস্তুতের উপযোগী যন্ত্রাদি তৈয়ার হইয়া দুই চারিটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, অচিরে তাহার বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। রংএর মূল্য স্বরূপ অনেক টাকা বৎসর বৎসর বিদেশিগণের হস্তগত হইতেছে, তাহা বন্ধ হইলে আমরা বিশেষ লাভবান হইব এবং আমাদের রং শিল্পিগণের দুরবস্থার উপশম হইবে।

তিসি।

(Flax, Linseed ; অতসী, মসিনা)

অতি পূর্ব্বকাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশে তিসি বা মসিনার চাষ হইতেছে,এবং ইহার ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতবর্ষে কেবল বীজের জন্যই ইহার আবাদ হইয়া থাকে; কিন্তু অপর সকল দেশে প্রধানতঃ মসিনাছালের আঁশের (flax) জন্য ইহার

কেম্ব্রিক (Cambric) লিনেন (Linen) প্রভৃতি কাপড় তিসিছালের আঁশ হইতে প্রস্তুত হয়। বাইবেলে সূক্ষ্ম লিনেনের বহুল উল্লেখ আছে; মিসরীর পিরামিডে রক্ষিত শব-দেহের আবরণে সূক্ষ্ম লিনেন ব্যবহৃত হইয়াছিল। আধুনিক কালে যেরূপ সূক্ষ্ম লিনেন প্রস্তুত হয়, ঐ সকল লিনেনও তদপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; সুতরাং প্রাচীনকালে এই শিল্পের যে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতে আদিম কাল হইতে পরিধেয়ের জন্য কার্পাস ব্যবহৃত হওয়ায়, এবং কার্পাস তুলা অনায়াস-লভ্য ও এই তুলায় সূতা প্রস্তুত করা সহজ-সাধ্য বলিয়া, কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক মসিনা ছালের আঁশ বাহির করিবার জন্য লোকের আগ্রহ ছিল না।

তিসির চাষ ভারতবর্ষে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৭৬ হইতে ৮১সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে এদেশ হইতে প্রতি বৎসর ৭০ লক্ষ মণ, ১৮৯৯ হইতে ১৯৯৪ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রায় এক কোটী মণ এবং ১৯০৪-০৫ সালে এক বৎসরে প্রায় দেড় কোটী মণ তিসি বীজ রপ্তানী হইয়াছিল। এক্ষণে প্রতিবৎসর প্রায় বিশ হাজার মণ মসিনা তৈলও রপ্তানী হইতেছে। ভারত ব্যতীত অপর অনেক স্থলেই তিসির আবাদ হইতে বীজ ও আঁশ উভয়ই সংগ্রহ করা হয়; তাহাতে লাভও যথেষ্ট হয়। আমাদের দেশে কেবল মাত্র বীজ সংগ্রহ করা হয় বলিয়া তিসিচাষে সেরূপ লাভ হয় না; কিন্তু চেষ্টা করিলে অনেক স্থলেই আঁশ ও বীজ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আঁশ সংগ্রহের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট ও কয়েকটী সাহেব কোম্পানি কয়েক বৎসর এ দেশে তিসির পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া বিস্তর চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন; কিন্তু অনেকস্থলে ফল সন্তোষ-জনক হয় নাই; সেই জন্যই সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে। চেষ্টা বিফল হওয়ায়, এ দেশের জলবায়ু তিসির আঁশ উৎপাদনের অনুপযোগী বিবেচিত হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন স্থলের আবাদে বিশেষ সন্তোষজনক ফলও হইয়াছিল; তথাপি সেই সকল স্থানেও আঁশের জন্য আবাদ পরিত্যক্ত হইল কেন, তাহার বিশেষ সংবাদ পাওয়া যায় না। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয়, স্থান বিশেষে বীজ ও আঁশের জন্য আবাদ বেশ লাভ-জনক হইতে পারে। যে সকল স্থানে বীজের জন্য তিসির চাষ হইতেছে, সেই স্থানের কৃষকগণ যদি কতক পরিমাণ করিয়া জমিতে বীজ ও আঁশ সংগ্রহের জন্য কয়েক বৎসর পরীক্ষা করে, তাহা হইলেই

প্রকৃত পরীক্ষা হয়। কিন্তু কৃষকগণের সেরূপ শিক্ষা ও শক্তি নাই; শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকের কেহ কেহ আজ কাল কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন, তাঁহারা পরীক্ষার জন্য যত্নশীল হইলে, এদেশে একটী প্রধান কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে। পাটের অপেক্ষা তিসির আঁশ বিশেষ মূল্যবান; সুতরাং এরূপ পরীক্ষায় কেহ কেহ অগ্রসর হইতে পারেন।

তিসির গাছ ক্ষুদ্র, পাতা সরু, এবং ফুলের রং সুন্দর নীলবর্ণ। ইহার সংস্কৃত নাম অতসী। ইহা ওষধি-জাতীয়; অর্থাৎ এক বৎসর ফল প্রসব করিয়া মরিয়া যায়; সুতরাং প্রতি বৎসর ইহার আবাদ করিতে হয়। শীত বা গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ, সকল দেশেই তিসির আবাদ হয়। সকল প্রকার জমীতেই ইহা জন্মিয়া থাকে। সকল দেশেই ইহার আবাদ বেশ লাভজনক। মিসর ও ভারতবর্ষে হেমন্তকালে তিসির আবাদ হইয়া, বসন্তকালে যে সময় শস্য সংগ্রহ করা হয়, সে সময়ে শীতপ্রধান স্থানে ইহার আবাদ আরম্ভও হয় না।

মসিনা তিন জাতীয়; বীজের বর্ণ হইতেই ইহার জাতি বিভেদ জানিতে পারা যায়; শ্বেত, লোহিত ও পিঙ্গল এই তিন বর্ণের বীজ হইয়া থাকে। বীজ পেষাই করিয়া তৈল বাহির করা হয়। কাঁচা তিসি হইতে কিম্বা বীজগুলি ২০০ ডিগ্রী উত্তাপে গরম করিয়া তাহা হইতে তৈল বাহির করে। সিদ্ধ তিসি তৈল কাঁচা তৈল অপেক্ষা শীঘ্র শুষ্ক হয়। সত্বর শুষ্ক হয় বলিয়াই তিসিতৈলের বিশেষ আদর; এই জন্যই ইহা রং ও বার্ণিসের কার্য্যে এবং ছাপার কালির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার খইল (oil cake) গবাদি পশুর বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য। মসিনা বীজ পুল্‌টিসের (poultice) জন্য ব্যবহৃত হয়; হৃদ্‌রোগে, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগে সেবনের জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তিসির ছাল হইতে যে আঁশ বাহির হয়, তাহাতে দড়ি এবং মোটা ও মিহি সকল প্রকার বস্ত্রের উপযোগী সুতা প্রস্তুত হইতে পারে। প্রধানতঃ এই আঁশের জন্যই ইউরোপের প্রায় সকল দেশে, এবং মিসর ও আমেরিকায় ইহার চাষ হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট আঁশ পাইবার জন্য বীজ ঘন করিয়া বপন করা হয়; ইহাতে গাছ গুলি দীর্ঘ, সরল ও অধিক শাখা-বিহীন হইয়া থাকে। বীজ পাকিলে গাছের ছাল শক্ত হইয়া যায় বলিয়া, ঐ সকল দেশে বীজ [illegible]-বার পূর্ব্বেই গাছ তুলিয়া লইয়া থাকে। বীজের জন্য আবাদ হয় [illegible]য়া,

ভারতবর্ষে মসিনা বীজ পাতলা করিয়া বুনিয়া থাকে; ইহাতে অধিক ফলন হয় এবং বীজগুলি বড় আকারের ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু গাছে অধিক শাখা প্রশাখা হওয়ায়, কাণ্ড দীর্ঘ হইতে পায় না ও আঁশ বাহির করিবার উপযোগী হয় না। বীজ পাকিবার পর গাছ শুকাইয়া গেলে তাহা জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কেবলমাত্র বীজের জন্য তিসির আবাদে ধান্য গোধূমাদির আবাদের ন্যায় লাভ হয় না; সে জন্য সাধারণতঃ ধান্যাদির অনুপযোগী অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমীতে এ দেশে ইহার চাষ হইয়া থাকে। অনেক স্থলে ধান কাটিবার পর সেই সকল জমীতে তিসি বুনিয়া থাকে। আঁশ সংগ্রহের জন্য আবাদ করিলে তিসির একমণ শুষ্ক গাছ হইতে /৫ সের আঁশ বাহির করা যাইতে পারে। একমণ আঁশের দাম প্রায় ত্রিশ টাকা। বিলাতের এক বিঘা জমীর তিসি গাছ হইতে গড়ে ২ দুই মণের উপর আঁশ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে স্থান বিশেষে আঁশের জন্য তিসির চাষ করিতে পারিলে বিশেষ লাভজনক হইতে পারে। অনেক স্থানে মজুরীর হার অতি সামান্য; বালক ও স্ত্রীলোক-গণও ইহাতে নিযুক্ত হইতে পারে, কেননা ইহাতে অধিক শক্তির প্রয়োজন হয় না। সুতরাং যেখানে অধিক মজুর পাওয়া যায়,সেখানে তিসির চাষ তাহা-দের মঙ্গলকর। গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে তিসির আঁশ মোটা হয়; কিন্তু মোটা আঁশেরই কাটতি অধিক। পাটের দাম তিসির আঁশ অপেক্ষা অনেক কম হইলেও, যখন এদেশে বিস্তর পাটের চাষ হইতেছে, তখন আঁশের জন্য তিসির আবাদ না হইবার কোন কারণ নাই।

ভারতীয় তিসির গাছ এক হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। এবং অধিক শাখা ও শুঁটী-বিশিষ্ট হয়। সিন্ধু প্রদেশে বীজ ঘন বুনিয়া ও রীতিমত জল সেচন করায় এক বৎসর আবাদেই দুই ফুটের অধিক উচ্চ গাছ হইয়াছিল। সগর ও নর্ম্মদা জেলায় এক প্রকার সাদা তিসির আবাদ হয়; একবার ইহার বীজ লইয়া ত্রিহুত জেলায় চাষ করা হইয়াছিল; কিন্তু পোকা লাগিয়া প্রায় বার আনা ফসল নষ্ট করিয়া দেয়; অথচ নিকটেই যে কাল তিসির আবাদ ছিল, তাহার কোন অনিষ্ট হয় নাই।

সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী যেস্থানে আবাদের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা থাকায় বায়ুর উত্তাপের অধিক কমবেশী হয় না, সেই সকল স্থান আঁশের জন্য তিসির আবাদের বিশেষ উপযোগী; এইরূপ স্থানে ঘন করিয়া

বুনিলে গাছ ২॥০ হইতে ৩ তিন ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়; গাছ সোজা ও সরু হয় এবং অধিক শাখা প্রশাখা হয় না। আর্দ্রবায়ু-বিশিষ্ট স্থানে গাছ বেশ সতেজ হয়। অধিক দিনব্যাপী অনাবৃষ্টিই তিসি আবাদের বিশেষ বিঘ্নকর।

তিসির আবাদ অতি অল্প সময়-ব্যাপী; বীজ বুনিবার তিন মাস পরেই শস্য সংগ্রহ করা যায়। ভালরূপে চাষ দিয়া আগাছা পরিষ্কার করিয়া, মই দিয়া ও সার দিয়া তিসির জমী প্রস্তুত করিতে হয়। গোমূত্রের সহিত রাই সরিষার খইল মিশাইলে উত্তম সার প্রস্তুত হয়। আঁশের জন্য চাষ করিতে হইলে, প্রতি বিঘা জমীতে ২॥০ মণ বীজ বপন করিতে হয়। বীজ বুনিবার পর মই দিয়া মাটী টানিয়া বীজ ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। এক ইঞ্চি আন্দাজ মাটী চাপা দিলেই যথেষ্ট হইল। বীজ বপনের পর একবার হাল্‌কা রোলার চালাইয়া মাটীর উপরিভাগ অল্প পরিমাণে শক্ত করিয়া দিলে ভাল হয়।

তিসির চারা ২।৩ ইঞ্চি উঠিবার পর যদি অধিক দিনব্যাপী অনাবৃষ্টি ও রৌদ্রের কিরণ প্রখর হয়, তাহা হইলে সেই সময় জল দিবার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে চারাগুলি মরিয়া যায়। গাছ বড় হইলে জলাভাবে বিশেষ ক্ষতি হয় না। গাছ সমভাবে আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হইতে পারিলেই আঁশ উৎকৃষ্ট হয়।

বীজ সম্পূর্ণ পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে তিসি গাছ উঠাইয়া না লইলে আঁশ ভাল হয় না। অধিক পূর্ব্বে উঠাইলে আঁশ ভাল হয় বটে, কিন্তু আঁশের অনেকাংশ এবং বীজও লোকসান হয়; পাকিবার পর উঠাইলে আঁশ মোটা হয়। যখন বীজের বর্ণ সবুজ হইতে কটা রংএ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং ডাঁটার অর্দ্ধেকের কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণের রং হরিদ্রাবর্ণ হইয়াছে, তখনই গাছ উঠাইবার উপযুক্ত সময়।

আঁশ সংগ্রহের জন্য তিসির গাছ মূল সহিত উঠাইয়া আঁটি বাঁধিয়া ধান্যের মরাইএর ন্যায় গাদি দিয়া রাখিতে হয়; কিন্তু ধান্যের শীষ যেমন গাদির ভিতরে থাকে, তিসির অগ্রভাগ সেরূপ ভিতরে না রাখিয়া বাহিরের দিকে রাখিতে হয়। তাহাতে শুঁটি ক্রমশঃ শুষ্ক হওয়ায় ভিতরের বীজ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; তখন শুঁটির সহিত ডাঁটার অগ্রভাগ কাটিয়া লইলে গাদিতে ডাঁটা মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

কোন কোন স্থানে গাছ উঠাইবার পরই তাহা হইতে শুঁটি পৃথক করিয়া লইবার প্রথা আছে। এজন্য গাছের আঁটির অগ্রভাগ লৌহের আঁচড়ার

ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া সুঁটি পৃথক করিয়া থাকে। শণ আঁচড়াইবার জন্য যেরূপ আঁচড়া বা চিরুনী ব্যবহৃত হয়, ইহাও প্রায় সেইরূপ; কেবল লৌহের গোল শিকের পরিবর্ত্তে চতুষ্কোণ শিক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাতে বীজ পরিপুষ্ট হইতে পায় না।

ভালরূপ আবাদ হইলে এক বিঘা জমী হইতে ১৫।১৬ মণ ডাঁটা ও ৩.৪ মণ বীজ পাওয়া যাইতে পারে। ১৬/০ মণ ডাঁটা হইতে প্রায় ২/০ মণ আঁশ পাওয়া যায়; এই আঁশের মূল্য প্রায় ৬০৲ ষাইট টাকা ও ৪/০ মণ তিসিবীজের মূল্য প্রায় ২৪৲ টাকা।

চাষ ও আঁশ বাহির করিবার খরচ বাদে প্রতি বিঘা জমী হইতে প্রায় ৬০৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে।

দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে বিশদভাবে প্রমাণ করিয়াছি যে, আমাদের দেশব্যাপী দারিদ্র্যই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ; শস্যের অভাব দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ নহে। অনেকে সহজে ইহা বিশ্বাস করিতে সক্ষম হয় না; তাহারা দেখিতে পায়, যে বৎসর কোন স্থানে অল্প শস্য উৎপন্ন হয়, কিম্বা যেখানে অজন্মা উপস্থিত হয়, তৎসঙ্গে সেই স্থানের লোক দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অজন্মা বা অল্পজন্মা একটী অভিনব ব্যাপার নহে। চিরকালই সকল দেশে সময় সময় এরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়; আমাদের দেশেও পূর্ব্বে এরূপ দুর্ব্বৎসরের অসদ্ভাব ছিল না; কিন্তু দুর্ভিক্ষের এরূপ আতিশয্য আর কস্মিন্ কালেও এদেশে ছিল না। তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্বে লোকের অবস্থা উন্নত ছিল, প্রত্যেক ধনী ও মধ্যবিত্তের গৃহে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি সঞ্চিত থাকিত; সুতরাং অজন্মা বা অল্পজন্মার বৎসরে তাহারা সঞ্চিত শস্যের উপর নির্ভর করিতে পারিত। এক্ষণে সঞ্চয়ের ক্ষমতা দূরে থাক, হাট, বাজার ও দোকানই অনেকের ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে; পয়সা বাহির করিতে না পারিলে দৈনিক ক্ষুন্নিবৃত্তি একরূপ অসম্ভব। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের শক্তি অনেকেরই নাই; গৃহস্থের ৫।৭ জনের মধ্যে হয়ত

একজন মাত্র উপার্জ্জনক্ষম, অপর ৪।০ জন তাহার মুখাপেক্ষী। দেশে যে বৎসর সুফসল উৎপন্ন হয়, সে বৎসর এই একজনের উপার্জ্জিত অর্থে সকলের কায়ক্লেশে দিনপাত হইতে পারে, কিন্তু অল্পজন্মা বা অজন্মার বৎসর তাহাদের দুর্গতির অবধি থাকে না। এই সকল দুর্বৎসরে শস্যাদি মহার্ঘ হয়; উচ্চ-মূল্যের শস্য বিদেশীয়গণ অনায়াসে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু দেশের লোক অর্থাভাব-বশতঃ তাহা ক্রয় করিতে না পারিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতব্যাপী অজন্মা প্রায় কখনও হয় না; একপ্রদেশে অল্প শস্য হইলেও, অপর সকল প্রদেশে সেই সঙ্গে অজন্মা উপস্থিত হয় না; কিন্তু ঐ সকল প্রদেশে শস্যের মূল্য বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ উচ্চমূল্যের শস্য বিদেশীয়গণ বহুব্যয়ে আপনাদের দেশে লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেও, প্রথমোক্ত প্রদেশের লোক ভারতে থাকিয়াও অর্থাভাববশতঃ অপর প্রদেশের উচ্চমূল্যের শস্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় না। অপর প্রদেশের কথা কি, পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল প্রভৃতি কয়েকটী জেলায় গত বৎসর অল্প শস্য উৎপন্ন হওয়ায় চাউলের মূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে ও তৎসহ ঐ সকল জেলায় আজ কয়েক মাস হইতে অন্নকষ্ট উপস্থিত; অধিবাসিগণ দারিদ্র্যবশতঃ এই মহার্ঘ চাউল ক্রয় করিতে অশক্ত; কিন্তু বিদেশীয়গণ উচ্চমূল্য দিয়া এই সকল জেলারও চাউল ক্রমাগত আপনাদের দেশে লইয়া যাইতেছে। ইহাতে কি দেশের দারিদ্র্য সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় না?

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা দূরে থাক, এ বৎসরের বিষম জলপ্লাবনে অনেক স্থানের শস্য নষ্ট হওয়ায়, এই প্রকোপ প্রবলতর হইবার বিশেষ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। দেশের সকল লোকই অন্ধ নহে; অনেকেই চক্ষের সম্মুখে নিদারুণ অন্নকষ্টের ভীষণতর আক্রমণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছে। তথাপি রাজকর, মহাজনের ঋণ প্রভৃতির দায়ে আপনাদের জীবনোপায় বিক্রয়ে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। দরিদ্রগণ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে।

অনেকের ধারণা যে,আজকাল পয়সা শস্তা হইয়াছে। সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এ কথা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও দেশের অধিকাংশস্থলেরই লোক অবলম্বনবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা অর্থাগমের উপায় বিহীন, তাহাদের নিকট পয়সা যে অতি দুর্ম্মূল্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যাহারা উপার্জ্জনক্ষম,তাহাদের প্রতিপাল্য অক্ষম-

বিহীনগণের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের উপার্জ্জিত অর্থে কিছুতেই সঙ্কুলান হয় না। আবার, আধুনিক উৎকট সভ্যতার প্রকোপে লোকের অভাবও এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা বিদূরিত করিবার উপযোগী অর্থোপার্জ্জন অনেকেরই অসাধ্য।

দারিদ্র্যই যে এদেশের দুর্ভিক্ষের একমাত্র কারণ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে, যে ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষে সাড়ে বার লক্ষ লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, সে বৎসরও কি দেশে শস্যাভাব ছিল? গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত ঐ সালের বাণিজ্য বিবরণী হইতে দৃষ্ট হইবে যে, সে বৎসরও এদেশ হইতে প্রায় সাড়ে চারি কোটী মণ শস্য (তণ্ডুল, গোধূম প্রভৃতি) রপ্তানি হইয়াছিল। দেশের লোকের এই শস্য ক্রয়ের সঙ্গতি থাকিলে কি তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইত? ইহা তাহাদের অন্ততঃ দশগুণ-সংখ্যক লোকের এক বৎসর জীবনধারণ জন্য প্রচুর হইতে পারিত। এই রপ্তানি বাদেও দেশের মহাজনদিগের নিকট যে একমুষ্টি অন্নও সঞ্চিত ছিল না, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। তবে দেশেরই উৎপন্ন এবং সঞ্চিত শস্যও দেশের লোক ক্রয় করিতে পারিল না কেন? দেশের সাড়ে চারি কোটী মণ অন্ন বিদেশে পাঠাইয়া দিয়া, তাহারা স্বেচ্ছায় মৃত্যুর নিদারুণ আলিঙ্গন বাঞ্ছা করে নাই।

কেবলমাত্র দুর্ভিক্ষ কেন, আমাদের স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ক অবনতির মূল কারণ--দারিদ্র্য। দেশ বিদেশের চিন্তাশীল হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণের যিনিই নিরপেক্ষ ভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই ইহা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। কেবল আমাদের ভাগ্যদোষে ভারতগবর্ণমেণ্ট দেশের এই নিদারুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন!

বিলাতের লোকের প্রত্যেকের বাৎসরিক গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ ৬৭৫৲টাকা (৪৫ পাউণ্ড); আর আমাদের দেশের লোকের প্রত্যেকের বার্ষিক গড়পড়তা আয় ৩০৲টাকা (২ পাউণ্ড)। এই গড়পড়তার অনুপাতে দরিদ্রগণের আয় আরও অনেক অল্প; এবং এই সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদিগকে বাৎসরিক গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়। হা যে দৈনিক অর্দ্ধাশনেরও নিতান্ত অনুপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই; ইহাতে অপর বিবিধ প্রয়োজনীয় অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কো[illegible]?

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অবাধ বাণিজ্য নীতির পক্ষপাতী ; সুতরাং যাহার অর্থ-বল অধিক, সে প্রয়োজন বোধে অপরের অপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে স্বীকৃত হইলে, এদেশ হইতে যে কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে। যাহাদের আয় আমাদের দেশের লোকের আয়ের সাড়ে বাইশ গুণ, তাহাদের সহিত শস্য ক্রয়ে প্রতিযোগিতা এদেশের লোকের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। যখন কলিকাতায় যে কোন শস্যের "কাঁটা বসে," অর্থাৎ যখন কোন শস্য জাহাজে রপ্তানী হইবার জন্য ওজন হইতে থাকে, তখনই প্রায় বাঙ্গালা দেশে সেই শস্যের মূল্য অধিক হয়। সেই অধিক মূল্যের শস্য দেশের লোক ক্রয় করিয়া সঞ্চিত রাখিতে পারিলে ভালই, নচেৎ তাহাদের অর্দ্ধাশন বা উপবাসের ব্যবস্থা হইল। কারণ, এই রপ্তানী উদ্‌বৃত্ত পরিমাণ মাত্র শস্যের নহে ; দুর্ভিক্ষের বৎসরও বহু পরিমিত শস্যের রপ্তানী এবং দেশের বহুসংখ্যক লোক চির অর্দ্ধাশনে থাকিলেও প্রতি বৎসর এইরূপ শস্য রপ্তানী তাহার প্রমাণ।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, আমরা দারিদ্র্যবশতঃ আমাদের জীবনধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় শস্যাদি বিক্রয় করিতে দিয়া দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ আনিয়া উপস্থিত করিতেছি। অতএব দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে, আমাদের দেশের লোকের উপযোগী শস্য রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর। মনে করুন এদেশের লোকের প্রত্যেকের বার্ষিক গড়পড়তা ৩০৲ টাকা আয় হইতে রাজকর পরিধেয় গৃহসজ্জা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে ১৬৲ টাকা মাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং একজন লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বৎসরে গড়ে ৪৴০ মণ শস্যের প্রয়োজন হয়। তাহা হইলে শস্যের মূল্য মণপ্রতি ৪৲ চারি টাকার অধিক হইলে, লোকের সম্বৎসরের উপযোগী শস্যক্রয় অসাধ্য হইয়া উঠে। সুতরাং যদি দেশের লোকের শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া শস্যের সর্ব্বোচ্চ দর স্থিরীকৃত হয় এবং তাহার অধিক মূল্যে শস্য বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই দেশের প্রয়োজনীয় শস্য রক্ষা হইতে পারে ; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপার্জ্জন শক্তির অবস্থা জানেন না এবং জানিলেও উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুমোদন করিবেন না। তাহা না হইলে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থান হইতেও শস্যের রপ্তানী সম্ভবপর হইত না।

দেশের লোকের দারিদ্র্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া তাহাদিগকে শস্য রক্ষা সমর্থ করা দ্বিতীয় উপায়। কিন্তু প্রভূত ধনশালী বিদেশীয়গণের স হওয়া এদেশের লোকের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। দেশমধ্যে যতই কল

খানা স্থাপিত হউক না কেন, এদেশের লোকের আয় সাড়ে বাইস গুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত করিবার আশা সুদূরপরাহত। তথাপি আর্থিক অবস্থার উন্নতির সহিত শস্য রক্ষার শক্তিও যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অভাবই দারিদ্র্যের মূল কারণ; যাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হয় না, তাহার নিকট দারিদ্র্য শব্দই নিরর্থক। অন্নই মানবের প্রধান প্রয়োজনীয়; এ দেশে তণ্ডুল গোধূমাদি শস্য প্রচুর উৎপন্ন হয়; কিন্তু অপর বিবিধ অভাব পরিপূরণের জন্য দেশের অন্ন বিদেশে প্রেরিত হওয়ায়, দেশে অন্নাভাব উপস্থিত হইতেছে। এই শেষোক্ত প্রয়োজনীয় অভাবের যে পরিমাণ দেশজাত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইবে, সেই পরিমাণে এদেশের অন্ন রক্ষা হইতে পারে। এদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী; তাহারা শস্য উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করে এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই কৃষকশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় শস্য সঞ্চিত রাখিতে পারেনা; তাহাদের শস্যবিক্রয়-জনিত অর্থও যে সঞ্চিত থাকেনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহারা বৎসরের কয়েকমাস মাত্র কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে; ইহাদের অবসর সময়ের উপযোগী অবলম্বন পাইলে আপনাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিয়া অপর বিবিধ অভাব পূরণে সক্ষম হইতে পারে। দেশীয় শিল্পের সর্ব্বনাশ সাধিত হওয়ায়, অপর বৃত্ত্যবলম্বী বহুশ্রেণীর লোকের কৃষিই একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধিত হইলে তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারিত হইতে পারে। এক্ষণে কৃষিজাত দ্রব্যই আমাদের দেশের অর্থাগমের একমাত্র উপায় হইয়া উঠিয়াছে; শিল্পজাত দ্রব্যে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের সুবিধা হইলে শস্য বিক্রয়ের আধিক্য নিবারিত হইতে পারে।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। অর্থলোভপ্রদর্শন, উৎপীড়ন বা যেন তেন প্রকারেণ বিদেশীয়গণ তাহাদের প্রয়োজনীয় শস্য এদেশ হইতে সংগ্রহে উদ্যত হইলে, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা আমাদের প্রায় অসাধ্য; সুতরাং বিদেশে শস্য রপ্তানী একেবারে বন্ধ করাও প্রায় অসম্ভব। তাহা হইলে, আমাদের প্রয়োজনীয় শস্য দেশে রাখিয়া উদ্বৃত্ত কতক পরিমাণ শস্য রপ্তানী করিতে হইলে, আমাদের কৃষির উন্নতি নিতান্ত বিধেয়। দেশমধ্যে পরিমাণ শস্য এক্ষণে উৎপন্ন হয়, তাহা দেশবাসীর পক্ষেই যথেষ্ট; ভারতীয়দের উপযুক্ত পরিমাণের অধিক শস্য এক্ষণে এদেশে উৎপন্ন হয় না বলিয়াই

আমাদের বিশ্বাস। * কৃষিও ধনাগমের প্রধান উপায়। ইহার উন্নতি সাধিত হইলে আমাদের অর্থাভাব কতকপরিমাণে বিদূরিত হইবে এবং বিদেশীয়গণের শস্য-ক্ষুধা নিবারিত করিতে পারা যাইবে।

"স্পেন্সের তুলা।"

("Spence's cotton.")

গুজরাটের দীসা নামক নগরের নিকট স্পেন্স নামক একজন সাহেব গাছ কার্পাসের বিস্তৃত আবাদ করিয়া দীর্ঘ আঁশ তুলা উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছেন। এই তুলায় প্রস্তুত বস্ত্র গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনেরালের কলিকাতার আফিসে আসিয়াছে। এই বস্ত্র বেশ উত্তম হইয়াছে। বোম্বায়ের ওয়াদ্রি কোম্পানির মিলে ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। এপর্য্যন্ত বোম্বায়ের কাপড়ের মিলে ২০ হইতে ৩০ নম্বর সূতাই ব্যবহৃত হইত; কিন্তু এই কাপড় ৫০ নম্বর সূতায় প্রস্তুত। ভারতের অনেকস্থান যে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনের উপযোগী, তাহা আমরা তদ্বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আমাদেরই অধ্যবসায় ও উৎসাহের অভাবে ওপর্য্যন্ত এদেশে তুলা চাষের উন্নতি হয় নাই।

স্পেন্স সাহেব অমৃত বাজার পত্রিকায় এই তুলা সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"এদেশের ব্যবসায়িগণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, বিগত ২০।৩০ বৎসরের মধ্যে দেশীয় তুলার অবনতির জন্য অনেকে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। অনেকেই মনে করিতেছেন যে, যদি এইভাবে তুলার অবনতি হইতে থাকে, তাহা হইলে এদেশের এই প্রধান কৃষিজাত ক্রমশঃ এদেশের কাপড়ের মিলে যে মোটা সূতা ও কাপড় প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহারও অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং কিরূপে আধুনিক এই নিকৃষ্ট-জাতীয় তুলার পরিবর্ত্তে দীর্ঘ আঁশ তুলা এদেশের সর্ব্বত্র উৎপাদিত হইতে পারে, তাহা আজকাল সকলের এরূপ বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাকে ভারতের কৃষির পরশমণি (Philosopher's Stone) নামে অভিহিত করা হইয়াছে; এই পরশমণি

---

* বারান্তরে ইহার আলোচনায় ইচ্ছা রহিল।

এক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছে জানিলে দেশের সর্ব্বত্র সকলে আপ্যায়িত বোধ করিবেন।

আমি ভাগ্যক্রমে দেখিলাম, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের বিবিধ স্থানে যে একপ্রকার প্রায় দেশজ বৃক্ষ জন্মে, তাহার তুলা, শ্রেণি বিভাগ ও আঁশ সম্বন্ধে, আমেরিকার তুলা হইতে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, এবং শ্রেণিবিভাগ অনুসারেও মিসরীর তুলা তাহার তুলারূপ হইতে পারেনা। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সিপাহি বিদ্রোহের সময় হইতে, কিম্বা বোধ হয়, তাহার আরও একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই বৃক্ষের অস্তিত্ব জানা থাকিলেও, এই বৃক্ষজাত তুলার উপযোগিতা এ পর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। হিন্দু দেবালয়ে প্রদত্ত প্রদীপের সলিতা এবং লেপ, তোষক, বালিস প্রভৃতির জন্যই এই তুলা এতদিন ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

আমি প্রথমে দীসা নামক স্থানে আমার এক বন্ধুর বাগানে এই গাছ দেখি; ইহার তুলা পরীক্ষা করিবামাত্র ইহার মূল্য বুঝিতে পারিলাম; এবং নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ইহার আদিম উৎপত্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম; আমি দেখিলাম, অপর বাগানেও এইরূপ কতকগুলি গাছ আছে; এবং সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে একটী বৃহৎ বেড়া এই কার্পাস বৃক্ষেই নির্ম্মিত। এই সকল গাছ হইতে আমি নমুনার জন্য বিস্তর তুলা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বিশেষ ভাবে পরীক্ষা দ্বারা নিঃসন্দেহে আমার এই মত প্রকাশ করি যে, সম্ভবতঃ কালক্রমে ইহা ভারতের তুলাচাষের যুগান্তর উপস্থিত করিবে। তাহার পর আমি বোম্বাই ও লিবারপুলে নমুনা পাঠাই। প্রথম স্থানের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ইহাকে উৎকৃষ্ট (Fine), শ্বেতবর্ণ, ১$\frac{1}{8}$ হইতে ১$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি দীর্ঘ আঁশের, এবং ইহাতে ৬০ নম্বর পর্য্যন্ত সূতা প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া বিবেচনা করেন। শেষোক্ত স্থানে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট (Super fine), শ্বেতবর্ণ, ১-$\frac{3}{16}$ হইতে ১$\frac{1}{4}$ ইঞ্চি দীর্ঘ আঁশের এবং আমেরিকার মধ্যম (Middling) প্রকার তুলা অপেক্ষা পাউণ্ড প্রতি প্রায় এক আনা ($\frac{7}{8}$ pence) অধিক মূল্যের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তখন আমি ইহার বিস্তৃতভাবে চাষে উদ্যত হইলাম; যত বীজ সংগৃহীত হইতে পারে তাহা ক্রয় করিলাম, এবং নিকটে ভবিষ্যতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাও সংগ্রহ করিবার বন্দোবস্ত করিলাম।

এই কৃষিক্ষেত্রে এক্ষণে এক লক্ষের অধিক গাছ হইয়াছে। গাছগুলি

বেশ সতেজ, ৪ হইতে ৫॥ ফুট দীর্ঘ, ফুল ও ফলে পরিপূর্ণ এবং ছয়মাস পূর্ব্বে আবাদ হইলেও প্রতিদিন তুলা উৎপাদন করিতেছে। ১৯০৬ সালের নূতন ফসলের তুলা, আদিম বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত তুলা অপেক্ষা শ্রেণিবিভাগ ও আঁশ উভয় সম্বন্ধেই শ্রেষ্ঠ। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন যে, প্রথম বৎসরে প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে ন্যূনকল্পে এক হইতে দুই ছটাক তুলা উৎপন্ন হইবে। একার প্রতি ৩২০৪ টী (বিঘাপ্রতি প্রায় ১১০০) বৃক্ষ থাকায়, প্রতি একারে ৪০০ হইতে ৮০০ পাউণ্ড (প্রতি বিঘায় ১॥৬ সের হইতে ৩।২ সের) তুলা উৎপন্ন হইবে। এইরূপ ফসল মিসরের সাধারণ ফসল অপেক্ষা অধিক এবং ভারতের সাধারণ ফসল অপেক্ষা আট হইতে ষোল গুণ অধিক, দ্বিতীয় বৎসরের ফসল সম্ভবতঃ প্রথম বৎসরের দ্বিগুণ এবং তৃতীয় বৎসরে দ্বিতীয়ের দ্বিগুণ হইবে। প্রত্যেক পরবর্ত্তী বৎসরের ফসল নিশ্চয়ই ক্রমশঃ অধিক হইবে; কারণ বিশেষরূপে জানা গিয়াছে যে, এই শ্রেণীর প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে তৃতীয় বৎসরের পর, বৃক্ষের জীবিত কাল, বিশ কিম্বা ততোধিক বৎসর পর্য্যন্ত, প্রতি বৎসর পাঁচ হইতে দশ পাউণ্ড (/২॥ হইতে /৫ সের) পরিষ্কৃত তুলা পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, যদি ভারতের তুলাক্ষেত্রের তৃতীয়াংশ মাত্র পরিমাণ জমীতে এই বৃক্ষের আবাদ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় বৎসরের ফসলই এই দেশ ও আমেরিকার একত্রীকৃত ফসলের অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। ইহার গুণ এত উৎকৃষ্ট যে, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পিগণের সমক্ষে ইহা একটী অভিনব কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। দেশের উন্নতি ইহার উপর নির্ভর করায়, ইহার প্রয়োজন অতিরঞ্জিত করা সম্ভব নহে।

আমি পূর্ব্বে প্রায় বিশ বৎসর লিবারপুলের তুলার দালাল সমিতির সভ্য ছিলাম এবং মিসরে পাঁচ বৎসর থাকিয়া তুলা চাষে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। এই তুলার প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করিয়া ইহাকে ব্যবসাক্ষেত্রে পরিচিত করিয়াছি বলিয়া আমার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইহাকে "স্পেন্সের তুলা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

অনেক জাতীয় তুলার, বিশেষতঃ পেরু ও ব্রেজিল দেশীয় তুলার, চাষের জন্য এদেশে পরীক্ষা হইয়াছে; কিন্তু পেরু দেশীয় তুলা এদেশের সমতল ভূমিতে (plain) জন্মিবে না; এবং ব্রেজিল দেশীয় তুলা এদেশের জলবায়ু অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। "স্পেন্সের তুলার" সুবিধা এই

ইহা প্রায় দেশজ, ইহা পশ্চিম ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে এবং পূর্ব্ব ভারতেও যে জন্মিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ; ইহা এদেশের যে কোন জমিতে ভালরূপ জন্মিতে পারে।”

স্পেন্স সাহেব লিখিত উপরোক্ত বিবরণী যে বিশেষ আশাপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই। উৎকৃষ্ট তুলা অভাবে আমাদের দেশে মোটা সূতাই অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দীর্ঘ আঁশ তুলা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিলে দেশীয় সূক্ষ্ম সূতারও আধিক্য হইবে এবং আমাদের সূতার অভাব মিটিলে দেশীয় বস্ত্রেরও অভাব মিটিতে পারে। আমরা এই জাতীয় তুলার আবাদ করিয়া পরীক্ষার জন্য সাধারণকে অনুরোধ করি। বুড়ী কার্পাস, ব্রাহ্মকার্পাস, দেবকার্পাস বা দেও কার্পাস নামে যে সকল গাছ-কার্পাস এদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মিয়া থাকে, স্পেন্স সাহেবের কার্পাসও ইহাদের অন্তর্ভূত হওয়াই সম্ভব। তাঁহার নিকট হইতে সামান্য পরিমাণ বীজ আনাইয়া ও আমাদের দেশজ উক্ত কার্পাসের বীজ এদেশে আবাদ করিয়া দেখিলেই এক বৎসরে ইহার জাতি চিনিতে পারা যাইবে। আমাদের দেশের গাছ-কার্পাসও ৮।১০ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকিতে দেখিয়াছি। ইহার তুলাও সূক্ষ্ম এবং ফলনও প্রচুর হয়। অনেক স্থানে এখনও ইহা দেবালয়ের কার্য্যে এবং ব্রাহ্মণগণের উপবীত প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

কৃত্রিম হস্তীদন্ত।

(Artificial Ivory)

নিম্নলিখিত যে কোন উপায়ে কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত করা যাইতে পারে :—

১ম :—৪ ভাগ গালা (Shellac) ও ১৬ ভাগ এমোনিয়া (Ammonia) একত্রে মিশ্রিত করিয়া পাঁচ ঘণ্টা কাল ৯৯½ ডিগ্রী উত্তাপে গরম করিতে হইবে। গরম করিবার সময় ক্রমাগত উত্তমরূপে নাড়িতে হইবে। এজন্য ঘূর্ণন চোঙ্গার ন্যায় পাত্র (revolving cylinder) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গালা দ্রবীভূত হইয়া পাতলা সরবতের ন্যায় পদার্থ উৎপন্ন হইবে ; ইহাতে [illegible] (zinc oxide) উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া [illegible]

বা শিলে পেষণ কর। এখন ছাঁচে ফেলিয়া চাপ দিলেই কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইবে।

২য় ঃ—ব্রাণ্ডি (Brandy) ও আইজিং গ্লাসের (Isinglass) সহিত ডিমের খোসার সূক্ষ্ম চূর্ণ একত্রে বাটিয়া, মোমের মত কর। ইহার সহিত ইচ্ছামত রং মিলাইয়া গরম অবস্থায় ছাঁচে ঢাল। ছাঁচে তৈল মাখাইয়া ঢালিতে হইবে। শুষ্ক হইলেই হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইল।

৩য় ঃ—ভেড়া বা ছাগলের হাড় ক্লোরাইড অফ লাইমের (chloride of lime) জলে ১০।১৫ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবার পর পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া শুকাইতে দাও। এই হাড়ের সহিত ছাগশিশু, হরিণ প্রভৃতির শাদা চামড়ার কতক পরিমাণ টুকরা একত্র করিয়া একটী লৌহপাত্রে রাখিয়া ষ্টীম (Steam) সংযোগে গালাইতে হইবে। ইহার সহিত শতকরা ২২ ভাগ ফটকিরি (alum) মিশ্রিত কর। হাড় প্রভৃতি গলিবার পর উপরে গাদের ন্যায় ফেণা ভাসিতে থাকিবে। এই ফেণা উঠাইয়া লইতে লইতে ক্রমশঃ গলিত পদার্থ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হইয়া আসিবে। ইহার সহিত এক্ষণে ইচ্ছামত রং মিশাইয়া ইহাকে রঞ্জিত করিতে পারা যায়। ইহা গরম থাকিতে থাকিতে কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া অপর পাত্রে ঢালিয়া ঠাণ্ডা কর। আটার মত হইয়া আসিলে কেম্বিসের (Canvas) উপর বিস্তৃত করিয়া হাওয়ায় শুষ্ক করিতে দাও। ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ওজনের ফটকিরি জলে মিশাইয়া সেই জলে ইহাকে ৮।১০ ঘণ্টা কাল রাখিবে। কাপড়, সূতা প্রভৃতি রং করিবার জন্য কিম্বা অপর কার্য্যে একবার ব্যবহৃত ফটকিরির জল এই কার্য্যের উপযোগী। এই জলে রাখিলে ইহা কঠিন হইয়া হস্তিদন্তের ন্যায় পদার্থে পরিণত হইবে।

৪র্থ ঃ—/৪ সের ক্লোরোফরমে (chloroform) /॥০ আধসের বিশুদ্ধ রবার (India Rubber) গলাইয়া ইহার ভিতর বিশুদ্ধ এমোনিয়া (Ammonia) বাষ্প প্রবিষ্ট করাইয়া দাও। ১৮৫° ডিগ্রী (F) উত্তাপে ইহাকে গরম করিয়া ক্লোরোফরম উড়াইয়া দাও। ইহার সহিত এক্ষণে গরম থাকিতে থাকিতে কার্ব্বনেট অফ্ জিঙ্ক (carbonate of zinc) কিম্বা ফস্‌ফেট অফ্ লাইম (Phoshate of lime) মিশ্রিত করিয়া ছাঁচে ঢালিয়া চাপ দিয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও। প্রথম পদার্থের যোগে ইহা [illegible] শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট হইবে, কিন্তু দ্বিতীয় পদার্থের যোগে ঠিক হস্তিদন্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইবে।

পশুচর্ম্ম।

সভ্যতার আদিম অবস্থায় বৃক্ষের ত্বক্ ও পশুচর্ম্ম পরিধেয়রূপে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে বৃক্ষজাত কার্পাস, লিনেন (মসিনার আঁশ) প্রভৃতি ও পশুজাত পশমই পরিধানের জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু চর্ম্মের ব্যবহারও নিতান্ত সামান্য নহে; সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত ইহা ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কলকারখানার কার্য্যে চামড়া বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। জুতা, পাদত্রাণ (Legging), ঘোড়ার সাজ, ব্যাগ (Bag) গাড়ির লাইনিং (Lining) বহিবাঁধা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে চামড়ার প্রয়োজন। যে সকল কার্য্যে চামড়া ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রত্যেকটীর জন্য ইহা সম্পূর্ণ উপযোগী; ইহাতে বোধ হয় যে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে মানবগণ পশুচর্ম্মের ব্যবহার আরম্ভ করায়, ইহা যে সকল কার্য্যের উপযোগী তাহা স্থির করিয়া লইয়াছে।

কাঁচা চামড়া দৃঢ়, নরম ও নমনীয়, এবং দেখিলেই বোধ হয় যেন পরিধানের উপযোগী; কিন্তু শুকাইলে ইহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়; তখন ইহার জলাভেদ্য শক্তি থাকে না এবং জল বা জলীয় বাষ্প লাগিলে পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। কিন্তু চামড়ার পাইট করিয়া লইলে ইহা দৃঢ় ও জলাভেদ্য হয়, এবং পচিবার ভয় থাকে না।

আমাদের দেশে চামড়ার পাইট ভাল হয় না। কানপুরে গবর্ণমেণ্টের চামড়ার পাইটের বিস্তৃত কারখানা আছে। ভারতের অপর কোন স্থানে এরূপ কারখানা নাই। দেশীয় মুচিরা চামড়ার ভালরূপ পাইট করিতে জানে না। প্রতিবৎসর বিদেশীয়গণ এদেশ হইতে প্রায় ৯।১০ কোটী টাকার অপরিস্কৃত চামড়া এবং চামড়া পাইটের উপযোগী কষের জন্য প্রায় এককোটী টাকার হরিতকী, খদির প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য আপনাদের দেশে লইয়া গিয়া সেখানে চামড়ার পাইট করিয়া প্রায় ৪।৫ গুণ মূল্যে বিক্রয় করে। আমাদের দেশের অনেক ভদ্রসন্তান সাহেবী জুতার দোকানে চাকরী স্বীকার করিতে আগ্রহ-সম্পন্ন, কিন্তু চামড়ার পাইটের কারখানা করিতে লজ্জা বোধ করে। [illegible]কাল স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বোধ হয় কেহ কেহ চাকরীর প্রতি বী[illegible]দ্ধ হইয়া, জুতার দোকানের চাকরী পরিত্যাগে চামড়ার কারখানা

স্থাপনে অগ্রসর হইতে পারে। বাষ্পীয় যন্ত্রের বিনা সাহায্যেই চামড়ার কারখানা চলিতে পারে ; সুতরাং অধিক মূলধন না থাকিলেও এরূপ কারখানা স্থাপন করা যায়।

চামড়া হইতে মাংস ও চর্ব্বি পৃথক করিয়া, ইহাকে কষযুক্ত জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ট্যানিন নামক পদার্থযুক্ত কষই এজন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাবলার ছাল, গরাণের ছাল, গাবফল ও ছাল, খদির, বনরিঠার ছাল, পলাশের ছাল, আমলকি ফল, পাতা ও ছাল, শিউলি (সেফালিকা) ছাল, আসান বা পিয়াসালের ছাল, হরিতকী, বহেড়া প্রভৃতি অরণ্যজাত অনেক দ্রব্যে এইরূপ কষ থাকে। ইহার অনেকগুলিই অনায়াসলভ্য এবং বহু পরিমাণে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। সুতরাং চামড়ার পাইটের কার্য্য বিশেষ লাভজনক হওয়াই সম্ভব।

কষে ভিজাইলে সমস্ত কষ টানিয়া লইয়া চামড়া শক্ত ও জলাভেদ্য হয়। ফটকিরির জলে কিম্বা তৈল বা চর্ব্বিতে ভিজাইলেও চামড়ার কতক পরিমাণে উক্তরূপ পরিবর্ত্তন হয়।

শিল্প-সংবাদ।

কড়ির বোতাম, সেফ্‌টী পিন, বোতামের রিং এবং মাথার কাঁটা। কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দত্ত এই সকল জিনিস প্রস্তুত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে শিল্পোপযোগী দ্রব্যের অভাব কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আমাদের চেষ্টা ও শিল্পোন্নতি বিষয়ে ঔদাসীন্য হেতু এই সকল দ্রব্যের আমাদের দ্বারায় প্রকৃত ব্যবহার না হইয়া পরহস্তগত হইতেছে অথবা অব্যবহার্য্য তুচ্ছ পদার্থের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। আজকাল স্বদেশী আন্দোলনের কল্যাণে অনেক অব্যবহার্য্য তুচ্ছ পদার্থ শিল্পজগতে বিশেষ আদরণীয় হইতেছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ দত্ত প্রস্তুত কড়ির বোতাম নানাপ্রকারের। তন্মধ্যে আমরা সকল গুলিই দেখিয়া বুঝিয়াছি যে সকল শ্রেণীর ভদ্রলোকেই এ সকল বোতাম অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারেন। এই সকল বোতাম বিলাতী বোতাম চাকচিক্যে ও মূল্যে পরাস্ত করিয়াছে। সেফ্‌টী পিন ইত্যাদিও বিলাতী

অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। একমাত্র প্রাপ্তিস্থান- "স্বদেশী নিকেতন", ৩৪৪নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ছুরী, কাঁচি। কাঞ্চননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দে দ্বারায় প্রস্তুত ছুরী, কাঁচি ইত্যাদি আমরা উপহার পাইয়াছি। কাঞ্চন নগরের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী সকলের শ্রেষ্ঠ এবং বহুদিন হইতে এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু আমরা যতদূর দেখিলাম, রাখালের প্রস্তুত ছুরী, কাঁচি প্রেমচাঁদের প্রস্তুত দ্রব্য অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। এই সকল ছুরী, কাঁচি বিলাতী রজর্সের অপেক্ষা মূল্যে অনেক কম। অথচ গুণে সম্পূর্ণ সমকক্ষ। আশা করি, আমাদের দেশের ভদ্র মহোদয়গণ এই সকল দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিয়া প্রস্তুতকারকদের উৎসাহিত করিবেন। ৩৪৪নং অপার চিৎপুর রোডস্থ ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স ইহার সোল এজেন্টস।

স্বদেশী লেড্‌পেন্সিল। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি স্বদেশীর আচরণে আবৃত করিয়া কয়েকপ্রকারের বিলাতী লেড্‌পেন্সিল বাজারে বেশ চলিতেছে। আমরা হুগলী জেলার অন্তর্গত কুমীরমোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেনের কারখানায় গিয়া দেখিয়াছি, ইনি সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে লেড্‌পেন্সিল প্রস্তুত করিতেছেন। উক্ত পেন্সিলের আপাততঃ কিছু দোষ থাকিলেও আমরা সমগ্র ছাত্রবর্গকে বিলাতী স্থানে এই পেন্সিল ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেনের সোল এজেন্টস্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, স্বদেশী নিকেতন, ৩৪৪নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

স্বদেশী টুথ্‌পাউডার। আমরা আর, পি, দের প্রস্তুত দাঁতের মাজন উপহার পাইয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশী উপাদানে প্রস্তুত এবং আমাদের বিবেচনায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

কেশতৈল, কেওড়া ইত্যাদি—আমরা এম, এন কোম্পানীর নিকট হইতে "অমিয়া" তৈল ও কেওড়ার নির্য্যাস উপহার পাইয়াছি। যতদূর দেখা গেল, তাহাতে এগুলি ভদ্রলোকের উপযোগী হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ঐ কোম্পানীর অম্লপিত্তের ঔষধাদি অম্লরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিগত বিজয়া দশমীর দিন মাড়োয়ারিগণ ২১ হাজার গাঁইট কাপড়ের চুক্তি করিয়াছে শুনিয়া অনেকে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। এখন শুনিতেছি, এই একুশ হাজারের মধ্যে ১৯ হাজার গাঁইট্ সূতার অর্ডার। দেশে সূতা প্রস্তুতের জন্য বিশেষ চেষ্টা না হইলে আমাদের উপায়ান্তর নাই।

নৈনিতাল জেলায় ভাওয়ালি নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের টার্পিণ প্রস্তুতের কারখানা আছে। চীর নামক বৃক্ষের রস হইতে টার্পিণ প্রস্তুত হয়। এখানে এই বৃক্ষ প্রচুর। বিগত দশ বৎসরের পরীক্ষার ফলে এই ব্যবসায় লাভজনক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রথমে দশহাজার মাত্র গাছ চিরিয়া রস বাহির করা হইত; এক্ষণে এই গাছের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ। ইহা হইতে ৬।৭ হাজার মণ রজন উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে দশ হাজার গ্যালন টার্পিণ প্রস্তুত হইতেছে, তদ্ব্যতীত ৪ হাজার মণ কলোফনি (colophony) প্রাপ্ত হওয়া যায়। টারপিনের মূল্য প্রতি গ্যালন ২।০ ও কলোফনির মূল্য প্রতি মণ ৮॥০ টাকা। এই ব্যবসায়ে অধিক মূলধনের আবশ্যক হয় না; ৬।৭ হাজার টাকা মাত্র মূলধন হইলেই এই ব্যবসা চলিতে পারে। কেহ ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্ট সকল তথ্য জানাইতে প্রস্তুত আছেন। নৈনিতালের ডেপুটী কন্সারভেটর অফ ফরেষ্টের নিকট সকল সংবাদ পাওয়া যায়।

মহেশচরণ সিং নামক একজন হিন্দু যুবক আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তথায় একটী প্রয়োজনীয় বিষয় আবিষ্কার করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কফির সহিত অপর দ্রব্য ভেজাল থাকে; এ পর্য্যন্ত কেহ এই ভেজালের পরিমাণ স্থির করিতে পারে নাই; মহেশ বাবু এই ভেজালের পরিমাণ স্থির করিবার উপায় বাহির করিয়া আমেরিকাবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আশা করি তিনি দেশে ফিরিলে দেশের উন্নতিকর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

পশ্চিম বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের ভাদুই ধান্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম ঃ—

এপ্রেল মাসে ও মে মাসের প্রথম ভাগে বৃষ্টি না হওয়ায় প্রেসিডেন্সি

বর্দ্ধমান বিভাগের বপন কার্য্যে বিলম্ব হয়, তাহার পর বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা বিভাগের প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই উপযুক্তরূপ বৃষ্টিপাত হয় নাই এবং বেহারে ভয়ানক বন্যা উপস্থিত হয়। নদিয়া, মুরসিদাবাদ, যশোহর ও হুগলী জেলায়ও বন্যার জন্য অল্প বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলার ধান্যে পোকা লাগিয়া কতক পরিমাণে অনিষ্ট করিয়াছে। ফলতঃ এই ধান্যের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। এই প্রদেশের দুই কোটী বিরানব্বই বিঘা জমীতে এই ধান্য হয় বলিয়া স্থির হইয়াছে; ইহার মধ্যে বিগত বৎসর দুই কোটী বায়াত্তর লক্ষ বিঘা এবং এ বৎসর দুই কোটী সাতষট্টি লক্ষ বিঘা মাত্র জমীতে আবাদ হইয়াছে। জেলার কর্ত্তৃপক্ষগণের হিসাবে এপ্রদেশে বিগত বৎসরের শতকরা ৭২ ভাগের পরিবর্ত্তে এবৎসর শতকরা ৭০ ভাগ (অর্থাৎ প্রায় এগার আনা রকম) ফসলের আশা করা যায়। গয়া, হাজারিবাগ ও রাঁচি এই তিনটী জেলায় পুরা ফসল, পাঁচটী জেলায় শতকরা ৯০ হইতে ৯৯ ভাগ, অপর পাঁচটীতে শতকরা ৮০ হইতে ৮৯ ভাগ, আটটিতে ৭০ হইতে ৭৯, চারিটীতে ৬০ হইতে ৬৯ ভাগ এবং অবশিষ্ট আটটি জেলায় শতকরা ৬০ ভাগেরও কম কম ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। শেষোক্ত আটটী জেলার মধ্যে নদিয়ায় ৫৯ সারণে ৫৯, পুর্ণিয়ায় ৫১, মুরসিদাবাদে ৫৯, চম্পারণে ৪৯, দ্বারবঙ্গে ২৯, মুঙ্গেরে ২৬ ও মজঃফরপুরে ২৩ ভাগ মাত্র ফসল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব।

হৈমন্তিক ধান্য সম্বন্ধে উক্ত সরকারের মন্তব্য এইরূপ :—

পশ্চিম বঙ্গের ৩৩টী জেলার মধ্যে সম্বলপুর ও রাঁচি জেলায় ষোল আনার উপর ফসল আশা করা যায়। সাঁওতাল পরগণা ও সিংভূমে পুরা ফসল হওয়া সম্ভব। বীরভূম, হুগলী, ভাগলপুর ও হাজারিবাগে শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ ভাগ নয়টী জেলায় ৮০ হইতে ৮৯ ভাগ, সাতটীতে ৭০ হইতে ৭৯ ভাগ, এবং পাচটীতে ৬০ হইতে ৬৯ ভাগ ফসল হইতে পারে। অবশিষ্ট চারিটী জেলার মধ্যে মুরসিদাবাদ ও মজঃফরপুরে ৫৬ হইতে ৫৮ ভাগ, দ্বারবঙ্গে ৩৮ ভাগ ও চম্পারণে ৫৯ ভাগ ফসল হইতে পারে। মোটের উপর পশ্চিম বঙ্গপ্রদেশে শতকরা ৮২ ভাগ (বা তেরআনা রকম) মাত্র ফসলের আশা করা যাইতে পারে। গত বৎসর শতকরা ৮৮ ভাগ (বা চৌদ্দ আনা রকম) ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এ বৎসর সুচারুরূপে বৃষ্টি না হওয়ায় এবং বন্যায় অনেকস্থানের ধান্য নষ্ট হওয়ায় এই তের আনা রকম ফসলের আশাই যথেষ্ট।

এ বৎসর কংগ্রেসের সহিত কলিকাতায় যে শিল্প প্রদর্শনী বসিবে, তাহাতে কলিকাতা মিউনিসিপালিটী দশ হাজার টাকা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এই প্রদর্শনীর অরণ্য, কৃষি, রেশম প্রভৃতি বিবিধ বিভাগ সরকারী খরচে সজ্জিত করিয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন।

দিল্লীতে যমুনা নদীর উভয় তটের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দুই পার্শ্বের জমী জলপ্লাবিত হইয়াছে; বহুগ্রাম ও শস্যের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এবৎসর অনেকস্থানেই বন্যার বিশেষ প্রকোপ।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেটে উক্ত প্রদেশের হাঁসপাতালসমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরাল ঘোষণা দিয়াছেন যে, দেশীয় সামরিক হাঁসপাতাল এসিষ্টাণ্ট ছাত্র শ্রেণীর জন্য ১৪ জন মুসলমান বা অ-বাঙ্গালী ছাত্রের প্রয়োজন; ইহাদিগকে সরকারের ব্যয়ে আগ্রায় শিক্ষা দেওয়া যাইবে। ফুলারের বাঙ্গালীবিদ্বেষ এখনও পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছে।

ত্রুটী স্বীকার।

বিগত সংখ্যায় "মানুষ না রাক্ষস" শীর্ষক প্রবন্ধটী "সময়" পত্রিকা হইতে এবং "অম্বালায় কাচের কারখানা" প্রবন্ধটী "সন্ধ্যা" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল; ভ্রমক্রমে ঐ সংখ্যায় ইহা স্বীকার করা হয় নাই।
